হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

(সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।)

ষষ্ঠবিংশতি ভাগ-ষষ্ঠবিংশতি বর্ষ।

(১৩২৭ সালের বৈশাখ মাস হইতে ১৩২৭ সালের চৈত্রমাস পর্য্যন্ত
দ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ।)

কলিকাতা—হাটখোলা দত্তবাটী, ৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট,

জন্মভূমি কার্য্যালয় হইতে

সত্ত্বাধিকারী—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত

ব্রাদার্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

Culcutta

Printed by N. Dutt at the

Janmabhumi Press.

39, Manick Bose's Ghat Street.

1921.

বার্ষিক মুল্য ২৲ দুই টাকা।] [ডাঃ মাঃ।৵৹ ছয় আনা।

জন্মভূমির ২৬শ বর্ষের সূচীপত্র।

সংখ্যা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা।
১।	অবুঝ (কবিতা)	সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগচী সরস্বতী	৪৬
২।	অধ্যাত্মবিদ্যা মহামহোপাধ্যায়	,, প্রমথনাথ তর্কভূষণ	১২০
৩।	অর্থের ব্যর্থতা	,, প্রমথনাথ রায় চৌধুরী বি, এ,	১৯৪
৪।	অমিয়া (গল্প)	শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী	২২৭
৫।	অনাথ (কবিতা)	শ্রীযুক্ত রসময় লাহা	২৮০
৬।	আমার মনিব (কবিতা)	,, ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১১৮
৭।	আবাহন (কবিতা)	ডাঃ ,, নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি,	১৯২
৮।	আগমনী	পণ্ডিত ,, কালিপদ মুখোপাধ্যায়	২৪৪
৯।	আর্য্যভেষজ প্রভাব	কবিরাজ ,, মেঘনাথ দত্ত	৩৭৪
১০।	আশা	ডাঃ ,, নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি,	৪৫৪
১১।	উচ্ছৃঙ্খল	ডাঃ ,, নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি,	৩৩৩
১১।	উচ্ছ্বাস	পণ্ডিত ,, রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী	৪২
১২।	উপহার	ডাঃ ,, নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি,	৪২৩
১৩।	কবিরাজ স্বর্গীয় দুর্গাপ্রসাদ সেন	... ...	৯২
১৪।	কর্ম্মফল	শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ,	২০৭
১৫।	কামনা (কবিতা)	সঙ্গীতাচার্য্য ,, দেবকণ্ঠ বাগচী সরস্বতী	১৯১
১৬।	কৌতুককণা	... ...	১৭৪, ২৯৩, ২৮৮
১৭।	কোষ্ঠীশিক্ষা	শ্রীযুক্ত পশুপতি সরকার—	২১০,২৮১,২৫১,৩০৯,৩৬৯,৪২৩
১৮।	গুপ্তেশ্বর	,, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়	২২
১৯।	ঠান্‌দিদি (গল্প)	,, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল,	৫৯
২০।	ডবাকের সংস্থান	,, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	৪৯
২১।	ডাক্তার বাবু (গল্প)	,, শ্যামলাল গোস্বামী	১৪০
২২।	তারা (গল্প)	,, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫৭
২৩।	তাইভালো (কবিতা)	ডাঃ ,, নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি,	১৫১
২৪।	দার্শনিক তত্ত্ব	,, আদ্যনাথ কাব্যতীর্থ	১৭৭
২৫।	দেবতার সঙ্কেত (গল্প)	,, সত্যেন্দ্রকুমার বসু বি, এ,	৩১৫
২৬।	দেবী	সঙ্গীতাচার্য্য ,, দেবকণ্ঠ বাগচী সরস্বতী	৪৫৭

সংখ্যা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা।
২৭।	ধনাগমের সহজ উপায়	... ...	৪৫৫
২৮।	নারী	শ্রীমতী প্রকাশিরাণী সিংহ	১৩৪
২৯।	নিত্যকৃত্য	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র বিদ্যাভূষণ	৮৫
৩০।	নিরাশে (কবিতা)	,, দেবকণ্ঠ বাগচী সরস্বতী	৩৩২
৩১।	নির্ভর (কবিতা)	ডাঃ ,, নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি,	৪৬১
৩২।	পাঁচফোড়ন (উপন্যাস)	,, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল,	১১৩
৩৩।	প্রাপ্তি স্বীকার	... ...	৩৩৬
৩৪।	প্রত্যাবর্ত্তন	ডাঃ ,, নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি,	৯৭
৩৫।	প্রেম	শ্রীমতী চারুলতা দেবী	৩৮০
৩৬।	বয়োবৃদ্ধি	... ...	১
৩৭।	ব্যথিতা	শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী	৪০১
৩৭।১।	বাল্য-প্রণয়	,, শ্যামলাল গোস্বামী	৩০৩
৩৮।	বিধবা না চির সধবা	শ্রীমতী হরিরমা সিংহ	৭
৩৯।	বিষ্ণু	শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল,	২৭
৪০।	বীরেন্দ্র	শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী	৪১২
৪২।	"ব"এর বাহাদুরী	শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী	১৬৯
৪৩।	বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু	,, শ্যামলাল গোস্বামী	১৮২
৪৪।	ব্যথিতের বন্ধু	,, সত্যেন্দ্র কুমার বসু বি, এ,	২১৭
৪৫।	বিজয়া (কবিতা)	,, কালিপদ মুখোপাধ্যায়	২৮২
৪৬।	বিবিধ প্রসঙ্গ	... ...	৩৯৮, ৪৬১
৪৭।	ভাষার নমুনা	নাট্যাচার্য্য ,, অমৃতলাল বসু	২৩৪
৪৮।	ভারতী বন্দনা	শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী	১
৪৯।	ভাবিতব্যতা (গল্প)	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী	১০৯
৫০।	ভারতে যুবরাজ	... ...	৪৩
৫১।	ভারতগৌরব মহাত্মা গুরুদাস	বন্দ্যোপাধ্যায় ,, শ্যামলাল গোস্বামী	২৩৬
৫২।	ভগবান ভরসা (গল্প)	শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী	২৯৭
৫৩।	ভাগ্যচক্র	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ	৪৪৫
৫৪।	মহাকবি সেক্সপীয়র	,, দেবেন্দ্রনাথ বসু	৩৩৭
৫৫।	মাতৃহীন	,, অসিতমোহন ঘোষ হাজরা বি, এ,	৫
৫৬।	মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র	বিদ্যাভূষণ ,, রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ	২৬৪

সংখ্যা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
৫৭।	মেঘমুক্ত (গল্প)	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত	১২
৫৮।	মানব সঙ্গীতাচার্য্য	,, দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী সরস্বতী	৪৭
৫৯।	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	মণ্ডলেশ্বররাজর্ষি ত্রৈলোক্যমোহন রায়চৌধুরী	৪৫৮
৬০।	মুগ্ধ (গল্প)	,, শ্যামলাল গোস্বামী	৫৪
৬১।	মুক্তার হার (গল্প)	শ্রীমতী হরিরমা সিংহ	১২২
৬২।	মনিষী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী	১৪৬
৬৩।	মনের কথা	,, রসময় লাহা	১৬১
৬৪।	মেঘ (কবিতা)	,, হরিদাস বিদ্যাবিনোদ	১৬৬
৬৫।	রাক্ষসগণ	,, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,	৩৯৩
৬৬।	রাজলক্ষ্মী পণ্ডিত	,, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,	১৫৩
৬৭।	রঙ্গরস	... ...	৫৯৯, ৪৬৩
৬৮।	লর্ড রেডিং বাহাদুর	...	৩৫৩
৬৯।	শান্তি-গীতি (কবিতা)	,, দেবেন্দ্রনাথ বসু	১৪২
৭০।	শাশ্বতী বাণী	শ্রীমৎ স্বামী যোগেশ্বরানন্দ এম, এ,	৮১
৭২।	শৈশব সঙ্গীত	শ্রীমতী হরিরমা সিংহ	৩৮৭
৭৩।	শোক সঙ্গীত	,, হরিরমা সিংহ	৩৭৮
৭৪।	শিশু	,, স্বরেণুবালা দেবী	৩৯২
৭৫।	সদুপদেশ সঙ্গীতাচার্য্য	শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী সরস্বতী	১৩২
৭৬।	সমালোচনা	... ৪৭,২৯৫,১৩৫,১৭৫,২১৫,২৯৫,৩৩৫	
৭৭।	সে সঙ্গীতাচার্য্য	,, দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী সরস্বতী	৪৫
৭৮।	সাধক কমলাকান্ত	,, দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৯৮,৩৪৬
৭৯।	সাধুনিন্দা	,, বিজয়নারায়ণ আচার্য্য	১৩৭
৮০।	সাধক সঙ্গীত পণ্ডিত	,, শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ	৩৫২,৩৯৭,৪৪৪
৮১।	সহধর্ম্মিণী	,, সত্যেন্দ্রকুমার বসু	৩৫৬
৮২।	সাধ্বী (গল্প)	শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী	৩৮১
৮৩।	সেজদি (গল্প)	... ...	৪৩৩
৮৪।	রমণী সঙ্গীতাচার্য্য	শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী সরস্বতী	৪৬
৮৫।	হাসি ও অশ্রু (কবিতা)	,, সতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী M. A. B. L.	২
৮৬।	হিতৈবিপরীত (কবিতা)	,, রসময় লাহা	২৮৭

ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

জন্মভূমি

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

২৬শ বর্ষ। | ১৩২৭ সাল, বৈশাখ। | ১ম, সংখ্যা।

বয়োবৃদ্ধি।

দেখিতে দেখিতে আর একটি বৎসর চলিয়া গেল। ১৩২৬ সাল কালগর্ভে লুপ্ত; ১৩২৭ সাল কালতরঙ্গে উত্থিত। জগন্ময়ী জগদ্ধাত্রী জগদম্বার কৃপায়, আজ "জন্মভূমি" ষড়বিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিল। সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম, নীতি, সমাজ, সাহিত্যালোচনায় কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের পথ যে আরও কিছু বিস্তৃত হইয়া পড়িল, তাহা বলাই বাহুল্য। জন্মভূমির গ্রাহক, পাঠক ও লেখক পৃষ্ঠপোষক মহোদয়গণের ভরসায় আমরা "অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু" এই চিরপূত বাণীর সাফল্য স্মরণ করিয়া নবোৎসাহে আবার জননী জন্মভূমির সেবায় প্রবৃত্ত হইলাম। আমাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং সংকল্পসিদ্ধির পক্ষে মা! জগদম্বার আশীর্ব্বাদ এবং হিতৈষীগণের শুভেচ্ছাই আমাদের সম্বল।

ভারতী-বন্দনা।

(কথা ও সুর—শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী।)

নমামি ত্বাং ভারতি হৃদয়-কমল-দল-বাসিনি!
নমামি ত্বাং বাণি রাগ-রাগিণী-বিকাশিনি!
নমামি ত্বাং নন্দনন্দিতাং সুরনরবন্দিতাং বীণাপাণি!
তব প্রেম-পরশ-রস-রাগে,
পুলকিত মোহিত চিত নিত জাগে—
গীত অনুরাগে—
নমামি ত্বাং বাগ্‌বাদিনি সরস্বতি—
ভক্তচিত্তেদিব্যজ্যোতির্বিভাসিনি!

হাসি ও অশ্রু।

(শ্রীসতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এম্-এ, বি-এল্ লিখিত।)

ভাল, হাসি ও অশ্রু এই উভয়ের মধ্যে কাহার ক্ষমতা বেশী, কোন্‌টি বেশী প্রীতিকর? কোন্ রসিক পুরুষ এ উভয়ের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিবেন? এই দুয়ের ভিতর কার গুণ বেশী, লোকে কারে চায়, কে কোন মনোভাব প্রকাশ করে, জনসমাজে কা'র জয়জয়কার, এ কথার সদুত্তর কোন্ সুজনের নিকট পাওয়া যাইবে? কি উপায়ে কোন্ মাপকাঠীতে ইহাদের দোষ-গুণ সমালোচনা করিব, কি ভাবে নরের উপর ইহাদের প্রভাব পরিমাপ করিব? ইহাদের গুণাগুণ জানিবার প্রয়োজন কি এবং এই ব্যর্থ আলোচনার সময় ও শক্তি প্রয়োগ করিবার স্বার্থকতা কি, কেহ যদি এই প্রশ্ন উপস্থিত করেন, তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, এই দুইটী পদার্থকে সংসারের সর্ব্বত্র দেখিতে পাই, যেন ইহারা প্রত্যেক মানবেরই জনম-মরণের সাথী; কতবার কত উপলক্ষে, কত শতভাবে যে ইহারা আমাদিগের সমক্ষে উপস্থিত হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই; তাই ইহাদের যথার্থ মূল্য এবং প্রকৃত স্বরূপ জানিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক। যদি মনীষিগণ এই সত্য নিরূপণ বিষয়ে সহায়তা করিতে ইচ্ছুক অথবা সক্ষম না হন, তবে কাজেই একবার অক্ষম লোকের চেষ্টা করিয়া দেখিতে হয়, কারণ যে কাজে হস্তক্ষেপ করিতে জ্ঞানী-লোকেরা ভয় পান, নির্ব্বোধেরা নিঃসঙ্কোচেই তাহা করিতে প্রয়াস পায়।

হাসি সাধারণতঃ সুখের ভাবই ব্যক্ত করে, আর অশ্রু দুঃখের কথা নীরবে প্রকাশ করে। লোকে অতি কষ্টের সময়েও না কি হাসিয়া থাকে, কিন্তু সেটা বড় বিরল; আর তাহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে হাসি বলাও চলে না; কারণ, সে হিসাব পাগলের হাসিকেও হাসি বলিতে হয়। অশ্রু শোকেরও যেমন আছে, সুখেরও তেমন আছে, একথা সকলেই জানেন; আর যদি না জানেন, তবে সাধারণ দুই একটা উদাহরণ দ্বারাও বুঝান যাইতে পারে। "দেবীচৌধুরাণী" অথবা "আনন্দমঠ" "উত্তর চরিত" অথবা "হ্যাম্‌লেট" "ওথেলো" অথবা "কিংলিয়ার" কিম্বা অন্য কোন করুণ-রসাত্মক ভাব গ্রন্থে পড়িতে পড়িতে অনেকেই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন না, কিন্তু সে অশ্রুকে দুঃখের অশ্রু বলা চলে না, তাহা সুখেরই; কারণ, সে

সব গ্রন্থের অধ্যয়নে ঐ অশ্রুর উৎস খুলিয়া দেয়, পাঠক তাহাই বারংবার পড়িতে ইচ্ছা করে; দুঃখের অশ্রু হইলে কেহই সেরূপ ইচ্ছা করিত না, কারণ দুঃখ একবার অনুভব করিয়া তাহার পুনরায় প্রাপ্তির বাসনা কেহ করে না, লোকে সুখকেই বারবার চাহে, দুঃখকে চাহে না। আবার এরূপ সময়ে সময়ে দেখা যায়, বহুদিন পরে কোন প্রবাসী বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিলে অথবা কোন নিরুদ্দিষ্ট আত্মীয় হঠাৎ গৃহে ফিরিয়া আসিলে পরস্পরের প্রথম সম্মিলনের দ্বারা যে গভীর আনন্দের উদ্ভব হয়, তাহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, একমাত্র নীরব অশ্রুই সেই ভাবের ব্যঞ্জক হইয়া থাকে। অতএব সুখেরও অশ্রু আছে। তবে অল্পসুখে অশ্রুপতন হয় না। অনেকে অল্প দুঃখেই কান্দিয়া থাকে বটে, কিন্তু সাধারণতঃ লোকে দুঃখের পরিমাণ বেশী না হইলে অশ্রু বিসর্জ্জন করে না। কেহ কেহ কথায় কথায় চোখের জল ফেলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সে অশ্রুর কেহই মূল্য দেয় না। আসল কথা এই যে, সুখ অথবা দুঃখ গভীর না হইলে, অশ্রুপতন সাধারণতঃ হয় না। হাসিতে এই গভীরতার অভাব। লোকে সামান্য সুখের কারণ হইলেই হাসিয়া থাকে, গভীর সুখের সময়ে হাসি বড় দেখা যায় না, তখন ভাবপ্রবণ লোকের চোখে শিশির বিন্দুর মত স্নিগ্ধ অশ্রুবিন্দুই দেখা যায়; আর যিনি সরলচেতা, তিনি চোখের জলকে প্রতিরুদ্ধ করিয়া থাকেন; কিন্তু তৎতৎস্থানে হাসি কখনও দেখা দিবে না। এইটীই হাসির পরাজয় স্থল; গভীর বিষয়ে হাসি নাই, হাসি যেন সফরী, গণ্ডূষ জল-বিহারিণী, আর অশ্রু যেন রত্ন, পয়োনিধির অগাধ সলিলতলের নিবাসী। যেখানে তাশ, পাশা, গান, গল্প, সেখানেই হাসির হর্‌রা, আর যেখানে ভাবের কথা, প্রাণের অন্তস্তলের কথা, নির্জ্জলা খাঁটী রসের কথা, সেইখানেই অশ্রুর ফোয়ারা।

কাব্যবাণীকে নবরস সংযুক্ত বলা হইয়া থাকে, ঐ নয়টীর একটী একটী রস, হাসি ও অশ্রুর ভাগে পড়িয়াছে, কাব্য নাটক প্রভৃতিতে করুণ-রসটি স্বাভাবিক নিয়মেই ফুটিয়া উঠে, কিন্তু হাস্যরস অনেকস্থলে অস্বাভাবিক উপায়ে সৃষ্টি করিতে হয়, তাহাও অনেক ক্ষেত্রেই কবিও নাটককারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, শুধু একশ্রেণীর লোকের মনরক্ষার জন্য। বালক ও অশিক্ষিত লোকে হাসি চায়, কাজেই সঙ্গতি থাকুক আর নাই থাকুক, বয়স্য, বিদূষক, ভাঁড় প্রভৃতি যাত্রা ও থিয়েটারের পুস্তকে চিরস্থায়ী দখল পাইয়া বসিয়াছে। নায়ক না থাকিলেও বরং কাব্য চলিতে পারে, কিন্তু ভাঁড় না হইলে নাটক চলে না।

এটা যে শুধু আমাদের বাংলাদেশেই আছে তাহা নহে, সমস্ত মানব-সাহিত্যেই এইরূপ। কাজেই প্রকৃত কবি সেক্সপিয়ার কোন কোন স্থলে এই অত্যধিক সঙ্গতিহীন হাস্যরস, দিদৃক্ষার প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিয়াছেন। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, করুণরস সর্ব্বত্রই স্বাভাবিক ভাবে বিদ্যমান, ইহাকে বাদ দিয়া কাব্য নাটক চলে না, হাসিকে বাদ দিলেও চলে। ভাল নাটক সমস্তই করুণ-রসসিক্ত এবং বিয়োগ-বিচ্ছেদ-পূর্ণ, মানব-জীবনের দুঃখ কষ্টের প্রতিধ্বনিমাত্র। এ বিষয়ে কবি ৺দ্বিজেন্দ্রলালের উক্তি আছে।—

"ভালবাসে শ্রোতা পাঠক
বটে মিলনান্ত নাটক
কিন্তু আমরা অসমাপ্ত গল্প শুধু শুনাই তথা ;
পূর্ণ জীবন যদি লিখি
দেখাই তাহার সমাপ্তি কি
সব নাটকই বিয়োগান্ত কহি যদি সত্য কথা।'

যিনি যাহাই বলুন, হাসিকে একেবারে বাদ দেওয়া চলে না, একেবারে ঠেলিয়া ফেলা চলে না। হাসির এতদিনে মানবের উপর যে সত্ত্ব জন্মিয়াছে, তাহা সহজে লোপ করা যায় না, আর তাহার দরকারই বা কি ? হাসি তাহার নিজের ভাবে থাকুক, আর অশ্রুও অশ্রুর ভাবে থাকুক। হাসি যেন আমাদিগকে ফাঁকি দিয়া অশ্রুর স্থান দখল করিতে না চাহে।

হাসি দুই রকম, সশব্দ ও শব্দহীন ; অশ্রুও দুই রকম, সরব ও নীরব। হাসি সরব নীরব দুই-ই উপভোগের জিনিস, যদি খাঁটী হয় ; স্থান-কাল-পাত্র-বিশেষে দুই-ই ভাল লাগে ; কেহ অস্ফুট বিজলী খেলার মত অধর কম্পন দেখিলেই জীবন ধন্য মনে করেন, আবার কেহ বলেন, গলা খুলিয়া হো হো করিয়া না হাসিলে হাসিই নহে। আমি বলি, পাত্রবিশেষে দুই-ই ভাল।

উভয় রকম হাসিই কৃত্রিম হইতে পারে। দুষ্টলোকেরা কৃত্রিম হাসিকে কাষ্ঠহাসি বলিয়া থাকে। কাষ্ঠহাসি সশব্দই বেশী দেখা যায়, কারণ লোকে শব্দের নিনাদে নিজের প্রকৃত মনোভাব গোপন করিতে চেষ্টা করে ; তবে নীরব হাসিও কখন কখন কৃত্রিমতাপূর্ণ দেখা যায়। বলা বাহুল্য, কৃত্রিম হাসির মূল্য কিছুই নাই, তাহা ভাঁড় এবং তোষামোদক ছাড়া কেহই উপভোগ করিতে পারে না। তবে আজ-কাল জীবনের সমস্ত বিভাগেই খাঁটী

জিনিস অপেক্ষা মেকীর আদর বেশী হইয়া উঠিয়াছে, কাজেই কৃত্রিম হাসিও কখন কখন খাঁটী হাসির অপেক্ষা বেশী আদর পাইয়া থাকে। কিন্তু আমার মনে হয়, পৃথিবীতে এমন নির্ব্বোধ লোক কেহই নাই যে, কাষ্ঠ হাসির ফাঁকা আওয়াজ শুনিবামাত্র তাহার কৃত্রিমতা ধরিতে পারে না। তথাপি পৃথিবীর বহুতর লোক অন্যের মনরক্ষার জন্য বিকৃত মুখভঙ্গী দ্বারা হাসির ভাব দেখাইতে চাহে ; কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলে, অপরের দেখা দেখি হাসিল অথবা কাহাকে খুসী করিবার জন্য হাসিল। সমঝ্‌দারের কাছে এ হাসির কিছুই মূল্য নাই।

হাসির সম্বন্ধে যে নিয়ম, অশ্রুর বেলায় তাহার বিপরীত। গালভরা "হো হো"কর হাসি অনেক সময়েই ভাল লাগে, কিন্তু সরব অশ্রু কোন সময়েই ভাল লাগে না ; ইহাকে চলিত ভাষায় কান্না বলে। কান্না সময়ে সময়ে শুধু শব্দগর্ভাই হইয়া থাকে, তাহার সঙ্গে গভীর মনোবেদনা-প্রকাশক অশ্রুর সংযোগ থাকে না, এই কান্না সর্ব্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর। কোন কবি লিখিয়াছেন, "হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না অভিমান।" অভিমান ভালবাসার জিনিস বটে এবং উহাই প্রেমের বৈচিত্র্য এবং মাধুর্য্য বৃদ্ধি করে, কিন্তু কান্নাকে হাসির চেয়ে প্রশংসা করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই, কবির এমন বাছনিকে কবিত্বহীনই কহিতে হইবে। পাঠকগণের মধ্যে কেহ কেহ কান্নার মহিমা উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন, তাঁহাদের নিকট ইহার দোষ গুণ বিশেষ বলিবার প্রয়োজন দেখি না, স্থান এবং পাত্রবিশেষে, কান্নার ক্ষমতাও যে অসীম তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে সকল পাঠকই বোধ হয় একবাক্যে বলিবেন, "কবির গান ও ঢাকের বাদ্যের" মত কান্না থামিলেই লাগে ভাল। অলমিতি বিস্তারেণ।

মহাকবি সেক্সপীয়ার।

লেখক,—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

স্থান রঙ্গমঞ্চ'পরে, কাল অভিনয় করে ;
বিশ্বদৃশ্য-কাব্য-বিরচন।
সত্যরূপে সে আভাস, সুষমায় স্বপ্রকাশ,
কবির হৃদয় তার বিমল আসন॥

জন্ম লোক-শিক্ষা তরে, আসি এ অবনী'পরে,
নির্ম্মল আনন্দ করে দান।
পাপী, তাপী, সাধুগণে, সমদৃষ্টি সর্ব্বজনে,
সবার ব্যথার ব্যথী প্রাণ॥
উজ্জ্বল আদর্শ তার, মহাকবি সেক্সপীয়ার,
কবিকুল-শিরোমণি গরিমা-আখ্যান।
স্বরোপে স্বাধীন জাতি, রাখে যারে মাথা পাতি,
উল্লাসে অবনী যার করে জয় গান॥
ভূত, ভাবী, বর্ত্তমান, অসীম অনন্ত স্থান,
বিদ্যমান দৃষ্টি পরে মুকুরে যেমন।
যশের গৌরব-রবি, মৃত্যুঞ্জয় মহাকবি,
ছবি যার ছায়ালোকে বিচিত্র মিলন॥
মানব-হৃদয়গত, অদ্ভুত রহস্য যত,
দিব্যজ্ঞানে বিদিত সকল।
যাদুমন্ত্রবলে যার, হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার,
হয় অনর্গল॥
কল্পনা-কুহক-বলে, স্বর্গমর্ত্ত্য রসাতলে,
ইচ্ছামত অবাধ বিহার।
রিপুচয় আজ্ঞাকারী, অশরীরী নরনারী,
দেহধারী—আদেশে যাঁহার॥
ষড়ঋতু সহচর, কাব্যকুঞ্জ পিকবর,
ইন্দ্রজালী কে আর এমন।
চক্ষুর ইঙ্গিতে যার, মরুভূমে বহে ধার,
ধূলির ধরণী ধরে কাঞ্চন কিরণ॥
বাণীর পাগল ছেলে, নাচে গায় হাসে খেলে,
অবহেলে হৃদয় মাতায়।
কভু ভৃঙ্গ গুঞ্জ গান, কখন উন্মাদ তান,
হাসি ফুটে অশ্রু ছুটে কথায় কথায়॥
উজ্জ্বলে মলিনে মেলা, মেঘে বিজলীর খেলা,
দৃশ্যকাব্য চিত্র যার ভুবনমোহন।

প্রতিকূল ঘটনাতে, উঠে ঘাত-প্রতিঘাতে,
হৃদিদ্বন্দ্ব আন্দোলিয়ে দর্শকের মন॥
অশ্রুসনে হাসি মিশে, প্রণয় সংশয় বিষে,
রসের উচ্ছ্বাসে ভাসে মানব-হৃদয়।
নিপুণ স্বভাব কবি, শূন্য গায় আঁকে ছবি,
হেরিয়ে বিস্ময় মানে আপনি বিস্ময়॥

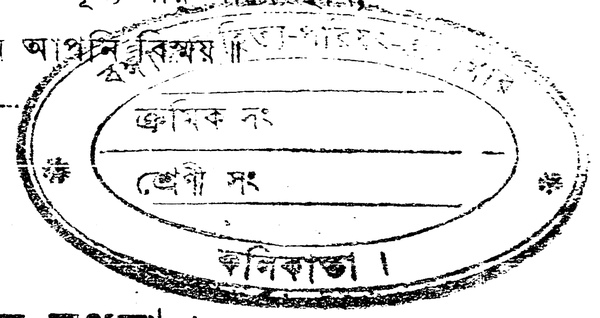

বিধবা না চির সধবা।

(ক্ষুদ্র গল্প।)

লেখিকা—শ্রীমতী হরিরমা সিংহ।

(১)

যশোহর জেলার বেত্রবতী তীরে আঁধারকোটা গ্রাম। স্থানে স্থানে বেতসকুঞ্জ-পরিবৃত জীর্ণ দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, ইহার প্রাচীনত্ব প্রমাণে সচেষ্ট। এই গ্রামে বিশ্বেশ্বর চূড়ামণির বাস। কথকতা ও পুরাণের ব্যাখ্যায় তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি। বৎসর বৎসর ষাণ্মাসিক পরিক্রমণের পর যখন চূড়ামণি মহাশয়, তৈজস সম্ভারে নৌকাযোগে ভবনে প্রত্যাগমন করিতেন, তখন তাহা দেখিয়া অনেক ধনী লোকেরও তাক্ লাগিয়া যাইত। অনেক অজ্ঞলোকে মনে করিত, চূড়ামণি মহাশয়ের কোথাও জমীদারী আছে।

কথক চূড়ামণি মহাশয়ের পরিবারের মধ্যে তাঁহার একমাত্র কন্যা প্রসাদী, তাঁহার স্ত্রী করুণাময়ী, ইহা ব্যতীত একটী পুরাতন ভৃত্য—ভোলা।

দুইটী আনন্দ শৈবলিনী ধীরে ধীরে তাঁহার জীবনের দুই পাশে বহিয়া যাইতেছিল। ইহাতে চূড়ামণি মহাশয় কতকটা ধূর্জ্জটীর মত, অথবা প্রয়াগ তীর্থের মত শোভা পাইতেছিলেন। তাঁহার দুই দিকে গঙ্গা যমুনার ঢেউ খেলিতেছিল। করুণা নির্ঝরিণী, করুণাময়ীর সখীত্বে, স্নেহবৎসলা জনকানন্দ বর্দ্ধিনী প্রসাদীর আনন্দ নৃত্যে, সে গৃহে আনন্দের অবধি ছিল না। দরিদ্রের জন্য তাহা আবার শতমুখে তাহার শত দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল।

(২)

অপত্যস্নেহই বোধ হয় সংসারের সম্মিলিত জীবনের সুখের অশরীরী বন্ধন। চূড়ামণি মহাশয়ের গৃহে তাহা বেশ উপভোগ্য। যে সময়ে প্রসাদী জন্মে নাই, তাঁহার স্ত্রী করুণাময়ী একটী সন্তানের জন্য ষষ্ঠী ঠাকুরুণকে কত উৎকোচ মানিস করিতেন, সে দিনও কথক চূড়ামণি মহাশয়ের গৃহে এক প্রকার সুখ ছিল, আনন্দ ছিল; কিন্তু তাহা যেন এই পৃথিবীতে কাহার ধার ধারে না। দুইটী প্রাণ সেখানে অনবরত মিলনের চেষ্টা করিয়াও মিলিত না। একটী কোমল গ্রন্থির অভাব।

ষষ্ঠী ঠাকুরুণ করুণাময়ীর ঘুষে তুষ্ট হইলেন। প্রসাদী জন্মিল। গৃহে তখন পূর্ণানন্দ। প্রসাদীর মার্জ্জার শিশুটী পর্য্যন্ত তখন স্নেহের দাবি পাইল। ক্ষুদ্র পরিবার সত্যই তখন একটি বৃহৎ পরিবারে পরিণত হইল। একটী সীমাসূচক ক্ষীণ আলোকরেখা দৃষ্টি বেলায় তখন একবারে কোথায় মুছিয়া গেল। ইহাই ত সংসারের বৈচিত্র।

(৩)

সময় চলিতেছে। সে কাহার অপেক্ষা করে না। দেখিতে দেখিতে প্রসাদীর বিবাহের বয়স পিতা মাতার অজ্ঞাতসারে সাড়া দিল। আনন্দ ও বিস্ময়ে তখন উভয়ের মনে এক অভূত চাঞ্চল্যের ছায়া দোলাইয়া দিল। প্রসাদী এত বড় হইয়াছে? লজ্জাবনত আরক্ত মুখ চাহিতে বলিতে হেঁট। চোখ দুটী ভীতা বিহঙ্গীনীর মত ব্যাকুল। শৈশব ও যৌবনের সম্মিলনে এক অপূর্ব্বভাব। কথক-চূড়ামণি কন্যার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইলেন, দিন কয়েকের জন্য তাঁর পুরাণ পাঠও বন্ধ করিতে হইল। অনবরত চারমাস অন্বেষণের পর একটী পাত্র স্থির করিলেন, জাত্যাভিমানে কুলীন, বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান; গৃহিণী কন্যাদানে প্রথমতঃ একটু আপত্তি করিলেন, পরে কথক চূড়ামণি মহাশয় বুঝাইয়া দিলেন যে, এই ছেলেটীর দ্বারা তিনি জামাই ও পুত্রের সাধ একত্রে মিটাইয়া লইতে পারেন, তখন আর তাঁহার এ বিবাহে আপত্তি থাকিল না। ছেলেটীর মা-বাপ কেহই নাই, নিতান্ত নিরাশ্রয়। শুভদিনে শুভক্ষণে রুক্মিণীকান্ত ও প্রসাদীর বিবাহ যথাসম্ভব সমারোহে সম্পন্ন হইল।

(৪)

সুখের উপর দুঃখ চিরকালটাই সঙ্গিন চড়াইয়া আছে। হর্ষে বিষাদ

সাধে বাদ, ইহা যেন বিধাতার অভিসম্পাত। প্রসাদীর বিবাহের পাকস্পর্শের দিন রাত্রে চূড়ামণি মহাশয়ের স্ত্রী করুণাময়ী বেশ একটু জ্বর অনুভব করিলেন। দারুণ পিপাসাও সঙ্গে সঙ্গে যোগ দিল। কোনও ডাক্তার কবিরাজের ঔষধে আর সে পিপাসার নিবারণ হইল না। "কই মা প্রসাদী, জল—কই মা প্রসাদী, একটু জল।" এইরূপে সপ্তাহকালান্তে তাঁহার শেষ পিপাসার শান্তি হইল। বেত্রবতীর শৈবালস্নিগ্ধ নির্ম্মল জলরাশি তাঁহার চিতা ধুইয়া দিল। প্রসাদী মাটিতে পড়িয়া "মা, আমার মা গো" ইত্যাদি ছন্দে সুর ধরিয়া অনেক কাঁদিল। জীবনে এই তাহার প্রথম শোক বুকে বড় বাজিল।

রুক্মিণীকান্ত নিজের উদাহরণ দেখাইয়া প্রসাদীকে অনেক বুঝাইলেন; প্রসাদী একটু শান্ত হইল। চূড়ামণি মহাশয়কে আর কাহারও বুঝাইতে হইল না, তিনি নিজেই বুঝিলেন। তাঁহার কোঠরাবিষ্ট চক্ষু দুটী একটু আর্দ্র হইয়া আসিতেছিল, একবিন্দুও জল মাটিতে গড়াইয়া পড়িল না। ভোলার বড়ই কষ্ট হইল, তাহার মা-জীর মত আর কি কেউ তাকে যত্ন করিয়া খাওয়াইবে? যথাবিধি করুণাময়ীর শ্রাদ্ধ সমাপনান্তে কথক চূড়ামণি কথকতার নাম করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন। এক বৎসর কাটিয়া গেল, আর তিনি গৃহে ফিরিলেন না। লোক-পরম্পরায় শুনা গেল যে, তিনি ৺কাশীধামে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

(৫)

রুক্মিণীকান্ত এখন গৃহস্বামী ও প্রসাদী গৃহিণী। আর সেই ভোলা ভৃত্য। কপোত-কপোতীর মত উচ্চ বৃক্ষচূড়ে নীড় বাঁধিয়া প্রসাদীর জীবন বড় সুখে কাটিল না। এখন রুক্মিণীকান্তের আদর, যত্ন, সোহাগ, ভালবাসা আর সে বনবিহঙ্গিনীকে একটী সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আটকাইয়া রাখিতে পারিত না, প্রসাদীর কি যেন অভাব, কি যেন নাই। কেহ প্রসাদীর কাছে সীতা-সাবিত্রীর কথা পাড়িলে প্রসাদী বলিত, "এক দিনেই মানুষ ভগবানের ভক্ত হইয়া যায় না। এক দিনেই স্ত্রী পতিকে নারায়ণ বোধ করিতে পারে না। নিজের সুখ কামনা অল্পে অল্পে ত্যাগ করিয়া পতিসেবার জন্য দুঃখ অভ্যাস চাই। ইহাই স্ত্রী-সাধনা।" প্রসাদী তার বাবার জন্য বড় কাঁদিত। ঘুমের ঘোরে রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়া উঠিয়া বসিত, রুক্মিণীকান্ত জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, "বাবাকে স্বপ্নে দেখিলাম, মাথায় জটা, ত্রিশূল হাতে, কপালে সিন্দুরের অর্দ্ধচন্দ্র, বাবা এসে আমাকে কোলে লইলেন। প্রসাদী মাকে স্বপ্নে এক-

দিনও দেখিত না। প্রসাদীর মা যেখানে ছিলেন, সে পুরী বোধ হয় স্বপ্নের অতীত।

(৬)

একদিন শীতকালের শেষ রাত্রে রুক্মিণীকান্ত হঠাৎ কলেরাক্রান্ত হইলেন। গ্রামের আশে পাশে তখন কলেরা দেখা দিয়াছিল। অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা নিষ্ফল হইল। রুক্মিণীকান্ত আর কিছুতেই প্রাণ পাইল না।

প্রসাদী আগেই বুঝিয়াছিল যে, স্বামীকে মানুষ বোধ থাকা পর্য্যন্ত তাঁহার নারীজন্ম বৃথাই রহিল, তাই প্রসাদী সাধনার মত কিছুই করিত না, কত কি ভাবিত। প্রসাদী জানিত, স্বামী দেবতা, তাই প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া প্রত্যহ প্রণাম করিত, আর কঁদিত, কবে আমি দেবতাকে দেবতা বলিয়া দেখিব? কখন ভাবিত, একি হইল? মা গেল কেন? লোকেও বলিত, যেই এই দেবতার আবির্ভাব, অমনি তাহার স্নেহময়ী জননী জন্মের শোধ বিদায়, সে কি পাইয়া কি হারাইল?

রুক্মিণীকান্তের পার্থিব স্নেহ-ভালবাসা তাই তখন পর্য্যন্ত প্রসাদীকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই। তাহার অবসর থাকিতে না থাকিতে, সে অভ্যাস অভ্যস্থ হইতে না হইতে অরোপ বন্ধন ছিঁড়িয়া গেল।

প্রসাদী একটু কাঁদিল না। সে স্বতঃপ্রবৃত্তা হইয়া শ্মশানে শব বাহিগণের অগ্রগামিনী হইল। আজ তাহার হৃদয় শ্মশান, গৃহও শ্মশান। নদী, জল, আকাশ প্রসাদীর কাছে আজ সবই শ্মশান।

বেত্রবতী তীরে যেখানে করুণাময়ীর দেহ-ভস্মাবশেষ ধৌত হইয়াছিল, আজ আবার সেইখানে রুক্মিণীকান্তের চিতা সজ্জিত হইল।

প্রসাদী যথাবিহিত শাস্ত্রানুশাসিত স্নানক্রিয়া সমাপনান্তে সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া স্বামীর মুখাগ্নি করিল। মনে পড়িল, তাহার বিবাহের সময়ে এইরূপ সাতবার সে স্বামীকে প্রদক্ষিণ করিয়াছিল। ইহার কোন্‌টা ঠিক? একবার বন্ধন গ্রহণ, আর একবার তাহার উন্মোচন।

মুখে অগ্নি দিবার সময়ে প্রসাদী একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। সে চিরপরিচিত মুখখানি যেন অগ্নির মধ্যে অট্টহাসি হাসিয়া উঠিল। প্রসাদীর নয়ন ঝলসিয়া আসিল। শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছুটিয়া গেল। আর স্থির হইয়া সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না, দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে ছুটিল। পথি

মধ্যে জটা মাথে, ত্রিশূল হাতে, কপালে সিন্দূরের অর্দ্ধচন্দ্র এক সন্ন্যাসী প্রসাদীকে দৃঢ় বাহুমূলে জড়াইয়া ধরিল। প্রসাদী চিনিল, এ সেই স্বপ্নের সন্ন্যাসী, তাহার পিতা।

(৭)

বিধবা কন্যাকে পিতা ৺কাশীধামে আনিলেন। প্রসাদী প্রথম দিন আসিয়াই গঙ্গাতে স্নান করিল, পরে বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা দেখিয়া আসিল। মনে মনে বলিয়া আসিল, তোমাদের আশ্রয়ে আসিলাম, প্রত্যহ যে যাত্রা করিব, তেমন অবস্থা আমার নাই। আমি বিধবার ধর্ম্ম যে ব্রহ্মচর্য্য তাহাই আচরণ করিব। ঠাকুর আমার কর্ম্ম নিষ্পত্তি তোমায় করিতে হইবে। প্রসাদী কাহারও সহিত মিশিত না, কিন্তু ক্রমে ক্রমে দুই একজন করিয়া পরিচিতের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। সধবাকালে প্রসাদীর যে রূপ ছিল, বিধবা হইয়া প্রসাদীকে যেন আবার কেহ ভাঙ্গিয়া গড়িল। প্রত্যহ গঙ্গাস্নান, একবেলা সাত্বিক ভোজন, আর প্রাণপণে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ, এই সকলে প্রসাদী মূর্ত্তিমতী দেবী হইয়া উঠিল।

(৮)

কথায় কথায় একদিন বিধবার বিবাহ হওয়ার কথা উঠিল। প্রসাদী অনেকক্ষণ কোন কথাই কহিল না। কেহ বলিল, "এই যে খালি প্রাণে বিধবার একটা অতৃপ্ত বাসনা থাকিয়া যায়, যার জন্য বিধবা একটা হা-হুতাশ লইয়া থাকে, আর ব্রহ্মচর্য্য পারে না, তাই কোথাও একটু রূপ বা গুণ দেখিলে ভ্রান্ত হইয়া ভালবাসিয়া নিশি দিন তাই চিন্তা করে, সুবিধা পাইলে কত স্থানে কত ব্যভিচার হইয়া যায়, কত স্থানে কত ভৈরবী, কত যোগিনী, কত সন্ন্যাসিনী সাজিয়া বসে; এ সমস্ত নিবারণের জন্য বিধবার বিবাহ মন্দ কি?" আর একজন বলিল—বিবাহ দিলেই যদি দুঃখের প্রতিকার হইত, তবে সধবার আর কোন কষ্ট, কোন দুঃখ থাকিত না, যখন সধবারও দুঃখ দেখা যায়, তখন সধবাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য তাহাদেরও বিবাহ দিতে হয়।" আর একজন বলিল,—"কথা সত্য, বিধবার দুঃখ অপেক্ষা বহু সধবার জীবন আরও বিষাদময়।"

বহু কল্পনা জল্পনা হইতে লাগিল। প্রসাদী কোনই উত্তর করিল না। মনে মনে প্রসাদী কি যেন প্রার্থনা করিতেছিল। সহসা সকলে দেখিল, জটা মাথে, ত্রিশূল হাতে, কপালে সিন্দূরের পূর্ণচন্দ্র এক সন্ন্যাসী প্রসাদীর

নিকটে। সন্ন্যাসী বলিলেন, ধর্ম্ম রক্ষাই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। ধর্ম্ম রক্ষা ভিন্ন শরীর, বাক্য ও মনের ছন্দ থাকে না। জীব স্বচ্ছন্দে না থাকিতে পারিলে বৃথা পাপ জীবন বহন করে। স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম সতীত্ব, বিধবার বিবাহে সতী-ধর্ম্ম নাশ হয়। সধবা জীবনেও যদি ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা না হয়, তবে সতীধর্ম্ম নষ্ট হয়। বিধবা হও বা সধবা হও, মা, তোমরা সতীধর্ম্ম বুঝিয়া রক্ষা কর। কথা শেষ হইল। সকলে অবাক্ হইয়া দেখিল, প্রসাদী নাই, সেই অবধি কাশীতে কেহ আর প্রসাদীকে দেখিল না।

মেঘমুক্ত।

(১)

"মা! আমি থিয়েটারে যাব।" চাঁপাতলা গলির একখানি একতলা বাড়ীর সদরের বৈঠকখানায় একটি ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা তাহার জননীকে ঐ কথা বলিল।

ভদ্রলোকের বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা বৈঠকখানায় কেন, এ প্রশ্ন উঠিতে পারে,—কিন্তু এ বাড়ীর স্ত্রীলোক সর্ব্বদা অন্তঃপুরে বাস করেন না, তাহার কারণ যথাসময়ে প্রকাশ পাইবে।

কন্যা থিয়েটারে যাইতে চাহিল। জননী বলিলেন, "এই ত সে দিন দেখে এলি, আবার কি? বার বার থিয়েটারে যাওয়া হতে পারে না। সমাজের কর্ত্তারা বারণ করেন। আমাদের কর্ত্তাও থিয়েটারের নামে তুষ্ট নন। তিনি নব্য-সভ্য-সমাজের সভ্য কি না, থিয়েটারের নাচ তামাসা তিনি ভালবাসেন না। আমিও সেই সমাজের সভ্য হয়েছি, তোকেও সভ্য হতে হবে। থিয়েটারে যাওয়া আসা চল্‌বে না। লুকিয়ে চুরিয়ে যাই, ক'দিন লুকোচুরি চলে? সমাজের কর্ত্তারা জান্‌তে পার্‌লে অনর্থ বাধাবেন।"

কন্যা বলিল,—"নব্য-সভ্য-সমাজের সভ্য হলে কি উপকার মা!" মাতা বলিলেন, "এ সমাজের সভ্য হলে ধর্ম্মের ও সমাজের সকল বাধা বিঘ্ন দূর হয়, প্রাচীন রীতি-নীতির, বর্ব্বরযুগের প্রথার প্রতি অবহেলা করিলে সকলেই সম্মান করেন। এ সমাজে স্ত্রী-পুরুষ সমান অধিকার পাইয়া থাকে, স্ত্রীশিক্ষা ও

স্বাধীনতা প্রদানের জন্য এই সমাজের সভ্যগণ সতত যত্নবান। কুরুচি বর্জ্জন ও সুরুচি প্রচার করাও সমাজের অন্যতম উদ্দেশ্য। তাই তোমায় বার বার থিয়েটারে যেতে নিষেধ করি।"

(২)

এইবার এই পরিবারের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। বাড়ীর কর্ত্তার নাম সনাতন রুদ্র, গৃহিণীর নাম মায়াবতী, কন্যাটির নাম সোণামুখী। বাড়ীতে আর আর যাহারা আছে, তাহাদের সহিত এ আখ্যায়িকার বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই, কেবল এই তিনটিকেই আমাদের দরকার।

জননীর কথাগুলি শুনিয়া সোণামুখী ম্লানমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন মা, সমাজের কর্ত্তারা থিয়েটারে যে'তে বারণ করেন কেন? তাঁদের বাড়ীর মেয়েরা কি থিয়েটারে যায় না?"

মায়াবতী বলিলেন,—"তা যাবে না কেন, খুব যায়। ঐ যে একটা কথা আছে, দেবতার বেলা লীলাখেলা, পাপ লিখেছেন মানুষের বেলা। আপনারা মেলায় যান, থিয়েটারে যান, বায়স্কোপে যান, যা ইচ্ছে তাই করেন, পরের বেলাই আঁটা আঁটি।"

সোণামুখী বলিল,—"তবে আমি তোমাদের সভ্য সমাজের সভ্য হ'ব না; আমি থিয়েটারে যাব। কেবল দেখ্‌তে যাব না, থিয়েটারে আমি সাজ্‌বো, মেয়েরা কেমন সখী সাজে, পুরুষ সাজে, কেমন গান গায়, কেমন ঘুরে ঘুরে নাচে, আমিও সেই রকম সাজ্‌বো, আমিও তাদের মতন নাচ্‌বো, লোকে আমায় বাহবা দেবে।"

হাস্য করিয়া মায়াবতী বলিলেন,—"ওমা, সে কি কথা! গৃহস্থ ঘরের মেয়েরা কি থিয়েটারে সাজে? ভদ্রলোকের মেয়েরা কি থিয়েটারে নাচে? কে তোকে এমন বুদ্ধি দিলে?"

সোণামুখী বলিল,—"কেন, তাতে দোষ কি? গুরু মা বলেন, তাঁদের দেশের বড় বড় ঘরের মেয়েরা সব থিয়েটার করে, তাদের বাপ, ভাই, স্বামী সকলেই তাদের অভিনয় দেখে, অভিনয় শুনে কতই খুসী হয়। তিনি কতদিন আমাকে ঐ কথা বলেছেন। সাহেবেরা পৃথিবীর মধ্যে বড় দরের সভ্য জাতি, তাদের দেশে যখন ঐ রকম চলে, তখন আমাদের দেশে কি এতই দোষ! পুরুষ স্ত্রী উভয়ে মিলে ত সমাজ। পুরুষ সমাজের সভ্য হইয়া ইচ্ছামত আমোদ প্রমোদ কর্‌বে, স্বাধীনভাবে বিচরণ কর্‌বে, আর আমরা অন্ধকারে ঢাকা থাক্‌বো!

স্ত্রীলোককে ঘরে আবদ্ধ ক'রে রাখা সেই প্রাচীন বর্ব্বর যুগের প্রথামাত্র, এরূপে স্ত্রী-স্বাধীনতার গৌরব রক্ষা পাইবে না। আমি তোমার কথা শুন্‌বো না, আমি নব্য সভ্য সমাজের সভ্য হ'ব না, আমি থিয়েটারে যাবো—সাজ্‌বো।"

মায়াবতী বলিলেন,—"তাদের দেশে আর আমাদের দেশে অনেক তফাৎ। সে দেশের মেয়েরা সব পুরুষের উপর টেক্কা দেয়, ভাল রকম লেখাপড়া জানে, ইচ্ছামত কাজ করে, তাদের কথা আলাদা। আরো কি জানিস্, থিয়েটারে নবরসের খেলা হয়; সব রসের মধ্যে বীররস খুব বড় রস; তুই কি বীররসের খেলা কোর্‌তে পার্‌বি?"

সোণামুখী জিজ্ঞাসা করিল,—"বীররস কি মা!"

মায়াবতী বলিলেন,—"বড় শক্ত রস। হিন্দুর প্রাচীন ইতিহাস যদিও মিথ্যা, কিন্তু কবিরা বীররসের বর্ণনায় বেশ পটু। পুরাতন কবিদের কথা আমি তুলবো না, বাঙ্গালার একজন নূতন কবি মাইকেল মধুসূদন; সেই মধুসূদন হিন্দুদের রামায়ণের আর মহাভারতের বীররস বেশ দেখিয়ে গিয়েছে; তুইও তা পড়েছিস। লক্ষ্মণের বাণে ইন্দ্রজিৎ যখন মরে, সেই সময় বীর-দর্পে লক্ষ্মণকে বলেছিল,—

"জলধির অতল সলিলে—
ডুবিস্ যদিও তুই, পশিতে সে দেশে—
রাজরোষ; বাড়বাগ্নিরাশি সমতেজে,
দাবাগ্নি সদৃশ তোরে দহিবে কাননে
সে রোষ; কাননে যদি পশিস্ দুর্ম্মতি!
দানব মানব দেব, কার সাধ্য হেন,
ত্রাণিবে সৌমিত্রি তোরে রাবণ রুষিলে!

এই গেল রামায়ণের কথা, মহাভারতের কথা একটা বলি। অভিমন্যু বধের পর জয়দ্রথ বধের নিমিত্ত অর্জ্জুন এই ভাবে প্রতিজ্ঞা ক'রেছিল,—

"কোথা জয়দ্রথ এবে! রোধিল যে বলে
ব্যূহমুখ! শুন কহি ক্ষত্ররথি যত,
তুমি হে বসুধা শুন, তুমি স্বর্গ শুন,
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ তারা, জীব এ জগতে—
আছ যত, শুন সবে; না বিনাশি যদি—
কালি জয়দ্রথে রণে, মরিব আপনি—

অগ্নিকুণ্ডে পশি তবে যা'ব ভূত দেশে,
না ধরিব অস্ত্র আর এ ভব-সংসারে।"

"এই সব বীররস! তুই কি সমান তেজে এই রকম বীর রসের প্লে কর্‌তে পার্‌বি?

সবে মাত্র মায়াবতীর মুখ হইতে এই শেষ কথাগুলি নির্গত হইয়াছে, ঠিক সেই সময়ে কর্ত্তা আসিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। কর্ত্তা গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, মুখে দীর্ঘ দীর্ঘ গোঁপ দাড়ী, মাথায় লম্বা লম্বা চুল, পশ্চাৎ দিকে খোঁপা বাঁধা, হস্তে একটি রূপাবাঁধা হুকা, হুকার মুখে বংশীবটের পাতার দীর্ঘ নল, পায়ে উৎকল দেশের রংকরা আগা তোলা চটীজুতা। দিব্য চেহারা, কপালে রক্তচন্দনের একটী দীর্ঘ ফোঁটা থাকিলে বেশ মানাইত; কিন্তু নব্য সভ্যতার যুগে কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা পরিতে নাই, সেই জন্য একটু অঙ্গহীন।

বটপত্রের নলের ধূম উদ্গীরণ করিয়া, একটু হাসিয়া, গৃহিণীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো! এখানে তোমাদের কিসের খেলা চোল্‌ছে? বীররসের ব্যাখ্যা হচ্ছে? বাংলা দেশে বীররসের গল্প তুলেছ কেন? সে কালের কথা, কবিদের কথা এখন কি এই বাংলা দেশে খাটে? এদেশে এখন বাবুলোকের লীলা-খেলা! বাবুরা বীররসের খেলা করেন! বাবুদের নাম কামিনীবাবু, যামিনীবাবু, রমণীবাবু, নলিনীবাবু, বনিতাবাবু, অবলাবাবু, সুন্দরীবাবু, মোহিনীবাবু। এই সব বাবু বীররস জাগান! রঙ্গভঙ্গ দেখ্‌লেই, গলাবাজী শুন্‌লেই হাসি পায়! নামের সঙ্গে বীররসের মাখা-মাখি! আজ-কালকার দাড়ি গোঁফ কামান, কাছাখোলা, লুঙ্গিপরা বাবুকে দেখে ও-পাড়ার হরিঘোষ বলেছিল, মাগী ভায়া! ঠিক কথা। মেয়ে-মানুষের নামধারী বাবুলোকেরা বীর হবে, আমি যেন এটা তাজ্জব-ব্যাপার মনে করি। বীররসের কথা নিয়ে, হিন্দু পুরাণের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে মেয়েটিকে কি শিক্ষা দেওয়া হচ্চে?"

সোণামুখী থিয়েটারে যেতে চায়, সেই কথাটা স্বামির সাক্ষাতে প্রকাশ না করিয়া কৌশলক্রমে মায়াবতী বলিলেন,—"তোমাদের বাবুরা বীরদর্পে বীরত্ব দেখাবে, সে কথা আমি বোলছিলেম না, মাইকেল মধুসূদনের কাব্যে কি রকম বীররস আছে, তারি দুই একটা শুনিয়ে দিচ্ছিলেম।"

শুষ্ক হাস্য করিয়া, একটু যেন রোষভরে সনাতনবাবু বলিলেন,—"শাক

দিয়ে মাছ ঢাকা আমার কাছে খাট্‌বে না। তুমি একজন নব্য শিক্ষিতা, তোমাকে নিত্য নিত্য কত শিক্ষা দিই, তারি বুঝি এই ফল? আমার কাছে মিথ্যা কথা? জানলার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার সব কথা আমি শুনেছি। মেয়েটাকে তুমি একেবারে নষ্ট কর্‌বার যোগাড় কচ্ছ। আমি আশা করি, সোণামুখী একটি সুশীলা বালিকা হবে, সেই আশা ক'রে আমি সোণামুখীকে নব্য তন্ত্রের ভাল ভাল উপদেশ শুনাই, সেই আশাতে তেরো বছরের মেয়েকে আইবুড়ো রেখেছি, তুমি কি না উল্টো সুর ধরেছ। মেমের কাছে মেয়ে পড়ানো ভাল, আমার এই একটা ধারণা ছিল; এখন দেখ্‌ছি, বিপরীত! মেমের কাছে সোণামুখী শুনেছে, সাহেবের দেশে মেয়েরা থিয়েটার করে, সেই কথা শুনেই আমার মেয়ে আজ থিয়েটারের অ্যাক্‌ট্রেস হবার লোভে নেচে উঠেছে; তুমি আরও তাতে মিথ্যা পুরাণের, মিথ্যা কাব্যের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে দেখিয়ে, উস্কে উস্কে দিচ্ছ; সোণামুখী কুমারী কন্যা, সম্পূর্ণরূপে আমার অধীন, তার ইচ্ছামত সে চলিতে চায়, সে আমাদের মতে চলিতে চায় না, আমাদের সভার সভ্য হবে না বলেছে, সব আমি শুনেছি, এই রকম যদি হয়, আবার যদি আমি এই রকম কথা শুনি, তবে আমি তোমাদের দু-জনকেই বাড়ী থেকে বার করে দিব, তোমাদের স্বাধীনতা ঘুচাইব, কালই আমি সেই বিবির আসা বন্ধ ক'রে দিব। হায়! হায়! আজ আমার ভ্রান্তি ঘুচেছে।"

মনে মনে কত কি আলোচনা করিয়া, মায়াবতী অবশেষে মৃদুস্বরে বলিলেন,—"আমি বল্‌ছিলেম এক কথা, তুমি বুঝেছ উল্‌টো কথা। আড়িপেতে আড়ালে দাঁড়িয়ে পরের কথা শোনা উচক্কা মেয়েদের কাজ, তুমি পুরুষ-মানুষ, তাতে আবার নব্য সভ্য, তোমার আড়িপাতা রোগ আছে, সেটা আমি জান্‌তেম না। তা যাই হোক, ওসব কথা ছেড়ে দাও, ভাল একটি বর দেখে মেয়েটির বিয়ে দাও। বিয়ে হলে ওসব খাম-খেয়ালি ছেড়ে দেবে, সুপথে আস্‌বে, যা কিছু পাগলামি আছে, সে সব সেরে যাবে, শুধ্‌রে উঠবে। তুমি শীঘ্র মেয়ের বিয়ে দাও।"

গর্জ্জন করিয়া সনাতন বাবু বলিলেন,—"তোমার পরামর্শ শুন্‌লেই প্রতুল আর কি! কচি মেয়ের বিয়ে দাও! ছোটবেলা বিয়ে দিলে কি দশা হয়, তা কি তুমি জান না? আমার কাছে ন্যাকা হও। ছোটমেয়ের ছেলে-পিলে হলে সে ছেলে বাঁচে না, যার গর্ভে ছেলে জন্মে, জন্মের মত তারও

দফা রফা হয়ে যায়। সমাজের বাবুরা বলেন, কুড়ি বছরের কমে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া বড় পাপ। পঁচিশ বৎসরের বর আর কুড়ী বৎসরের মেয়ে উত্তম মিলন; তার চেয়ে কম বয়সের ছেলে মেয়ের যে বিবাহ হয়, সে বিবাহের নাম বাল্য-বিবাহ। তুমি মেয়েমানুষ, তুমি জান না, বাল্য-বিবাহ হতেই এ দেশের এত দুর্গতি হয়েছে। তোমার কথায় কখনই আমি কচি মেয়ের বিয়ে দিব না, সাত বৎসর না হয়, আর তিন বৎসর আমি আমার মেয়েকে আইবুড়ো রাখ্‌বো।"

মুখ ভারী করিয়া মায়াবতী বলিলেন, "তুমি আমাকে নব্য সভ্য হতে বল, হয়েছিও কতক কতক, ঠাকুর পূজো ছেড়েছি, গঙ্গাস্নান ভুলেছি, মুখের ঘোমটা খুলেছি, সিঁতের সিঁদুর মুচেছি; যা ছিলেম, তার চেয়ে অনেক উচুঁতে উঠেছি, তবুও আমি তোমার কথায় ভুলবো না; যা ছিলেম, আবার আমি তাই হ'ব। সভ্য সমাজের সভ্য হয়ে, তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পেয়েছে, কাণেও খাটো হয়েছ। এক শুন্‌তে আর এক শুনেছ। ছোট ছোট ছেলেরা যখন আব্দার ধরে, তখন তাদের ভাল কথা বলে শান্ত রাখ্‌তে হয়। সুরুচি ও সুনীতি প্রচার ক'রে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, তুমি একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে এলে; বাহিরে স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রচার কর; ঘরে আমাদের শাসন কোরে স্ত্রী-স্বাধীনতা ঘুচাতে চাও, আমাদের দু-জনকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে বল্লে। আমি বল্লেম, মেয়ের বিয়ে দাও, সে কথায় তুমি জবাব দিলে কি না, কুড়ি বছরের কমে মেয়ের বিয়ে দেওয়া বড় পাপ। তোমার মুখে ঐ পাপের কথাটা আজ আমি নূতন শুন্‌লেম। ধাড়ী মেয়ের বিয়ে দিলে মহাপুণ্য হয়, এই তোমার যুক্তি; তোমাদের দলের সকলেরই ঐ রকম যুক্তি। এটা যদি আমি আগে জান্‌তেম, তা হলে নব্য সভ্যতার দোহাই দিয়ে, ঠাকুর দেবতার পূজোয় অবহেলা ক'রে ইহকাল পরকাল হারাতেম না। আমি পিতা মাতার একমাত্র আদরিণী কন্যা হয়ে, তোমার খাতিরে তাঁদের স্নেহ-মমতায় জলাঞ্জলি দিয়েছি; তাঁদের নিকটে ক্ষমা চেয়ে অদ্যই আমি তিনকড়িকে আস্‌বার জন্য পত্র লিখবো। আমার পিতার কিসের অভাব? দোল দুর্গোৎসব কোন পর্ব্ব আমাদের বাড়ীতে বাদ যায় না, আমাকে সেইখানে পাঠিয়ে দাও। তুমি নব্য সভ্য হয়েছ, ঘরে বসে তপস্বী হয়েছ, বেশ করেছ; কিন্তু দেশের সনাতন হিন্দুসমাজের খবর কিছু রাখ কি? আজকাল ভদ্রলোকের ঘরে বারো তেরো বছরের মেয়েরা ছেলের মা হচ্ছে;

এ সময় কুড়ি বছর পর্য্যন্ত মেয়েদের আইবুড়ো রাখ্‌লে কত পুণ্য হবে, স্বপ্নেও তা কি তুমি ভাবো? নব্য সভ্যতার ধ্বজা উড়্‌বে, ধ্বজার মাথার উপর বোসে কা-কা রবে দাঁড়কাক ডাক্‌বে! তোমরা এখন সমাজের সংস্কার চাও, রকম রকম পরিবর্ত্তন চাও, তা আমি বুঝেছি। নিজে রোজগার কত্তে পার না; মেয়ের বিয়ে দিতে গেলে টাকা চাই; তাই সমাজ-সংস্কারের দোহাই দাও; তোমাদের দলের ব্রাহ্মণের ছেলেরা পৈতে ফেলে দিচ্ছে, ভিন্ন ভিন্ন জাতির ধাড়ী ধাড়ী মেয়েগুলোকে বিয়ে কচ্ছে, তাতে কোরে বাংলাদেশের সমাজের কত সংস্কার হচ্ছে, কত উপকার হচ্ছে, তোমরাই তা জানো। তুমি কায়েতের ঘরে জন্মেছ, এই সংস্কারের তুফানে অনেক কায়েতের ছেলে পৈতে পর্‌বার জন্য নেচে উঠেছে; তারা যে শূদ্র নয়, তারা তার প্রমাণ শাস্ত্রে পেয়েছে। আশী বছরের বুড়ো বুড়ো কায়েত সাদা সাদা পৈতে গলায় দিয়ে বর্ম্মণঃ হয়েছে; এটা একটা সমাজের বেশ পরিবর্ত্তন!—তুমিও কেন তাদের দলে মেশো না? তুমিও ত শিক্ষিত হয়েছ, অনেকগুলো পাশ করেছ, একটা ত কাজ চাই, এক গোছা সুতো গলায় দিয়ে বর্ম্মণঃ সেজে বক্তৃতা দিয়ে কম পয়সায় মেয়ের বিয়ের চেষ্টা কর না? সব গোল চুকে যাবে; জাত ধর্ম্ম দুই বজায় থাক্‌বে।"

আগে রুদ্র মহাশয়ের অল্প অল্প রাগ হইয়াছিল, এইবার সেই রাগের আগুন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; তিনি একেবারে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন; মহাক্রোধে হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিলেন, "তোমাদের আমি তাড়াবো,—নিশ্চয় তাড়াবো! স্ত্রীলোকের এত স্পর্দ্ধা, তোমাদের রক্ষা করে, তেমন সাধ্য কাহারও হবে না।"

বাবু সনাতন রুদ্র এই সব কথা বলিয়া, সেখানে আর এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইলেন না, ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে চঞ্চলপদে সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন; অন্দরে প্রবেশ করিলেন কিম্বা বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন, তাহা জানা গেল না।

(৩)

এই ঘটনার দুই দিন পরে শুক্রবার; সেই শুক্রবার বৈকালে একখানা ঠিকাগাড়ী করিয়া একটি যুবক সেই বাড়ীতে আসিলেন। তাঁহার হাতে একটা ছোট রকম চামড়ার ব্যাগ, বগলে একখানা রং-করা কেতাব। তিনি সোণামুখীর মাতুল। যুবকটি দেখিতে দিব্য সুন্দর; বয়স অনুমান বাইশ তেইশ

বৎসর, বিবাহ হয় নাই; বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভ করিয়া সম্প্রতি পৈতৃক বিষয় সম্পত্তির পর্য্যবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়া পিতাকে অবসর দিয়াছেন; নাম শ্রীযুক্ত তিনকড়ি ঘোষ।

বাহিরের বৈঠকখানা গৃহে প্রবেশ করিয়াই ভগ্নিপতি সনাতন রুদ্র মহাশয়কে খোঁজ করিলেন; দুই দিন যাবৎ তাঁহার জামাই বাবু কোথায়? তাহার কোন সংবাদ নাই। তিনকড়ি বাবু একখানি চেয়ারের উপর বসিলেন। সংবাদ পাইয়া সোণামুখী ও তাহার মাতা সেই ঘরে আসিল; মাতুলকে প্রণাম করিয়া সোণামুখী অনতিদূরে আর একখানি চেয়ারে বসিল। মাতা সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া ভূমে বসিলেন, সোণামুখী হাসিমুখে দাদা মহাশয়, দিদি মা প্রভৃতি মাতুলালয়ের যাবতীয় ব্যক্তির কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিল; তাহার মুখে যে হাসিটুকু ছিল, ক্ষণেকের মধ্যে সে হাসি লুকাইল; মুখখানি রক্তবর্ণ। ভাব দেখিয়া মাতুল তাহাকে কি কথা জিজ্ঞাসা করিবার উপক্রম করিতেছিলেন, কথা না শুনিয়াই বিরসবদনে সোণামুখী বলিল, "মামাবাবু! আমাদের আর এ বাড়ীতে থাকা হবে না। বাবা ভারী রেগেছেন; মাকে আর আমাকে, দুজনকেই বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিবেন।"

কথার ভাব বুঝিতে না পারিয়া মাতুল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি অপরাধে তোমার বাবা তোমাদের উপর রাগ করেছেন? কি অপরাধে তাড়াইয়া দিতে চাহেন?"

সোণামুখী বলিল, "অপরাধ আমি জানি না; এই বুধবার মাতে আমাতে এইখানে বোসে থিয়েটারের কথা বলাবলি কচ্ছিলেম, আড়াল থেকে শুনে বাবা ধাঁ ক'রে ঘরের ভিতর এসে কত কি বকাবকি আরম্ভ করে দিলেন, শেষকালে রেগে উঠে গালাগালি দিয়ে বোল্লেন, আমাদের দুজনকে বাড়ী থেকে বার কোরে দিবেন। আজ দুদিন তিনি বাড়ীতে নাই, আজ যদি আসেন, আপনাকে যদি দেখ্‌তে পান, আপনাকেও এ বাড়ীতে আস্‌তে বারণ কোর্‌বেন।"

সোণামুখী মাতুলের নিকটে যাবতীয় বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিল, মাতুল ভগ্নীর প্রতি এক একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। মায়াবতী ক্রন্দনের সুরে ভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "পাড়া প্রতিবাসীরা বলে কি! ছি, ছি—এত কলঙ্ক শেষে কি আমার অদৃষ্টে ছিল! আমি যখন জন্মেছিলাম, তখনই না কেন আমায় নুন খাইয়ে গুন চাপা দেন নাই!

আমার জীবনে ধিক্। আমি তোমার সঙ্গে এ বাড়ী থেকে চলে যাবো, আর কলঙ্কের বোঝা বইতে পারবো না; আমি তোমার সঙ্গে বাড়ী যাবো, যদি না নিয়ে যাও, আজই কেরোসিন তৈলে আত্মহত্যা কোর্‌বো।"

মায়াবতীর মনের অবস্থা দেখিয়া তিনকড়ি বাবুর চক্ষে জল আসিল। তিনি উভয় সঙ্কটে পড়িলেন; পিতা মাতাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া ভগ্নীকে বাড়ীতে লইয়া যাওয়াটা সঙ্গত কি অসঙ্গত, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অন্তরের বেদনা গোপন করিয়া সোণামুখীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "থিয়েটারের কি কথা?"

সোণামুখী বলিল, "আপনি ত শিক্ষিত, আপনি ত জানেন, বিলাতের বিবিরা থিয়েটার করে, গুরুমার মুখে শুনে আমার থিয়েটারে সখী সাজবার সাধ হয়েছিল, মাকে আমি সেই কথা বোলছিলেম, তাইতেই এই অনর্থ ঘটেছে।"

মাতুল তিনকড়ি বাবু এতক্ষণ ভাল করিয়া সোণামুখীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখেন নাই, সোণামুখীর কণ্ঠস্বরে কিঞ্চিৎ জড়তা অনুভব করিয়া সচমকে মুখ তুলিয়া নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সন্দেহে সন্দেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সোণামুখী! তুমি কি কাঁদছিলে? চক্ষু দুটি রক্তবর্ণ দেখ্‌ছি, মুখখানিও রক্তবর্ণ দেখ্‌ছি; কেন কাঁদছ? তোমার দুঃখ কিসের, তুমি ত দু-দিন পরে শ্বশুরবাড়ী যাবে, তোমার মারই বা নাই কে? সব আছে, মা আছেন, বাবা আছেন; তোমাদের ভাবনা কি! তোমার পিতার ব্যবহারে সব থাকিয়াও কেহ নাই।"

নেত্র মার্জ্জন করিয়া সোণামুখী উত্তর করিল, "কাঁদি নাই; এ বাড়ীতে থাকা হবে না, আপনারাও আমাদের ত্যাগ করেছেন, আমরা যাই কোথায়? আমাদের উপায় কি? আর ভাব্‌ছি, বাবা কি নিষ্ঠুর! এত নিষ্ঠুর স্বপ্নেও জানতাম না। এই সব চিন্তায় আপনা হতে চক্ষে জল আসে। মামা! আমাদের দশা কি হবে?"

কি একটু চিন্তা করিয়া মাতুল বলিলেন, শুনিয়াছি, তোমার বাবা প্রাচীন রীতি নীতি পরিত্যাগ ক'রে নব্য সভ্যতালোকে জীবনে উন্নতি লাভ করেছেন, খবরের কাগজে পাঠ করেছি, নব্য ধর্ম্ম নীতি সমাজ সম্বন্ধে বক্তৃতা ক'রে তোমার বাবা নব্য সভ্য সমাজের নেতা হয়েছেন। হায়, হায়, আজ বুঝিলাম, যে সকল বিষয় তিনি নিজে বুঝ্‌তে পারেন না, সে সকল বিষয় নব্য সভ্য

সমাজকে অবলীলাক্রমে বুঝিয়ে দিতে পারেন। বাস্তবিক যারা ধর্ম্ম নীতি সমাজের উপাসনা করে, তাদের এত রাগ দ্বেষ থাকে না; সুশিক্ষিত নব্য সভ্যলোকের এত রাগ! কি রকম নব্য সভ্য সমাজের নেতা, দেখা পাইলে একবার জিজ্ঞাসা ক'রতাম। যা হউক, দুঃখ করিও না, তোমাদের একটা উপায় না করিয়া আমি যাইব না, আমারও ত একটা কর্ত্তব্য আছে।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সোণামুখী বলিল, "কি জানি মামাবাবু, আমার জন্য বাবা মার উপরেও ভারী রেগেছেন, আমাদের তাড়াবেন, এই ভাবনায় মাও আজ তিন দিন অন্ন জল ত্যাগ করেছেন, দিবা রাত্র কেবল রোদন কর্‌ছেন, আপনি আজই আমাদের একটা উপায় করুন।"

সোণামুখী ও মায়াবতীর অবস্থা দেখিয়া তিনকড়ির কান্না পাইল। সে বেশ বুঝিয়াছে, বিকৃত শিক্ষা ও সংসর্গদোষে ভগ্নিপতির মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে। ভগ্নিকে বলিলেন, "দিদি! আপনার কান্না দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। যা হবার হয়ে গেছে; এখন কি কর্‌লে ভাল হয় বলুন, তাই করি।"

মায়াবতী চক্ষু তুলিয়া তিনকড়ির পানে চাহিয়া বলিলেন, "বাড়ী যাব, মার কাছে, বাবার কাছে, পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাহিব, তুমি আজই আমাদের লইয়া চলো; তাঁরা আমায় অবশ্যই ক্ষমা কর্‌বেন।"

তিনকড়ি মধুর বচনে বলিলেন, "দিদি! তুমি ভেবো না, তুমি কেঁদো না, শান্ত হও, তোমার কোন ভয় নাই। তোমরা প্রস্তুত হও, আমি বড় রাস্তা হতে গাড়ী ডেকে আন্‌ছি।

যথাসময়ে তিনকড়ি গাড়ী ডাকিয়া আনিল, মায়াবতী ও সোণামুখীকে সেই গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া তালতলায় সনাতন বাবুর শ্বশুরের একখানি ভাড়াটে বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন; তিনকড়ি বাবুর আদেশে সে বাড়ীখানি যাঁরা ভাড়া লইয়া ছিলেন, তাঁহারা দ্বিতলের একখানি গৃহ খালি করিয়া দিলেন; শুক্রবার রজনী, সে রজনী তথায় অতিবাহিত হইল।

(৪)

পরদিন প্রাতঃকালে তিনকড়ি পৈতৃক বাস-ভবনে গমন করিয়া, পিতা ও মাতার নিকটে ভগ্নিপতির হঠকারিতা, মায়াবতী ও সোণামুখীর কাতরোক্তির আমূল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বলিলেন। পিতা বলিলেন, "যাও, সত্বর তাহাদের লইয়া আইস, আমার কন্যা আমার বাড়ীতে থাকিবে,

সে খৃষ্টান হয় নাই, সমাজের ভয় কি? এখন সমাজে কন্যার বিবাহে অনেক টাকা খরচ হয় ব'লে, সকল ঘরেই ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ বৎসরের আইবুড়ো মেয়ে বর্ত্তমান। দোষ কি? টাকায় না হয় কি? বিধবা সধবা হয়, অজাত জাত পায়, কুলের কালি মুছিয়া যায়; আমি এই মাসেই পাঁচ হাজার টাকা খরচ ক'রে সোণামুখীর বিয়ে দিব; যাও, তাদের লইয়া আইস।"

শনিবার বেলা এগারটার সময় মায়াবতী কন্যাকে লইয়া পিতৃ-ভবনে পদার্পণ করিলেন।

সোণামুখীর থিয়েটারে সাজিবার সাধ পূর্ণ হইল না; প্রায় দেড় মাস পরে সোণামুখীর সহিত বোসেদের বড় বাবুর মেজ ছেলের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। মায়াবতীর সাধ পূর্ণ হইল।

বাবু সনাতন রুদ্রের শ্বশুর একজন জমিদার। বার্ষিক প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা আয়; কন্যা মায়াবতীর বিবাহ দিবার সময় ভাবিয়াছিলেন, ছেলেটি বি-এ, পাশ করিয়াছে; একজন উকীল হইবে; কিন্তু ঘটনাচক্রে নব্য সম্প্রদায়ের সহিত মিশিয়া কেমন বিকারগ্রস্ত হইয়াছিল। শ্বশুর মহাশয় একটা ডেপুটী করিয়া দিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কন্যা মায়াবতীর এমনই পোড়া অদৃষ্ট—জামাতা কেবল সমাজ সংস্কারের দোহাই দিয়া বক্তৃতা করিয়া বেড়াইত; আর পৈতৃক সামান্য আয়ে অতি কষ্টে জীবনাতিবাহিত করিত; অথচ নব্য সভ্য-সমাজে সৌখীন বাবু বলিয়া পরিচিত ছিল;—সভাসমিতিতে স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষ সমর্থন করিত, কিন্তু গৃহে স্ত্রীস্বাধীনতার সূত্রপাতে কি অনর্থ ঘটিল পাঠক তাহা হৃদয়ঙ্গম করুন।

গুপ্তেশ্বর।

লেখক,—শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জব্বলপুরে আমি যখন আমার জামাতা শ্রীমান্ হরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য গিয়াছিলাম, তখনই আমি "গুপ্তেশ্বর মহাদেও" দেখিয়া আসি।

এই গুপ্তেশ্বরের সহিত একটু ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত। আর এ

স্মৃতিও আবার যার তার নয়, গড়মণ্ডলেশ্বরী রাণী দুর্গাবতীর। কাজেই গুপ্তেশ্বরকে দেখিবার জন্য আমার মনটা বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

যে বাঙ্গলোতে আমার জামাতা বাস করিতেন, সে বাঙ্গলোখানি ক্ষুদ্র হইলেও বড়ই সুন্দর স্থানে ছিল। চারিদিকে পাহাড়—পাহাড়ের উপর গভীর জঙ্গল, উপরে উন্মুক্ত আকাশ, প্রকৃতির স্নেহময় অঞ্চল-পরিচালিত মুক্ত-বাতাস, সবই যেন আমার ভগ্নস্বাস্থ্যের অনুকূল।

শরীর ও মন ক্রমাগতঃ মানসিক পরিশ্রমে বড়ই নিস্তেজ হইয়া গিয়াছিল, এখানকার সুন্দর জল-হাওয়ার গুণে সে অবস্থাটি কাটিয়া গেল।

খুব ভোরে উঠিয়া আমার জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র শ্রীমান্ দেবকুমারকে সঙ্গে লইয়া পাহাড়ের উপত্যকায় বেড়াইতে যাইতাম। গাছের পাতার আড়ালে বসিয়া পাখী গান গাহিতেছে, প্রভাতের স্নিগ্ধ সমীরের বুকে ক্ষুদ্র বনকুসুম তাহার মিষ্টগন্ধ ছড়াইয়া দিতেছে, উপরে নীলাকাশে বালার্ক-কিরণ স্বর্ণবৃষ্টি করিতেছে। ঠিক যেন প্রকৃতির আনন্দভরা—উৎসাহভরা—প্রফুল্লতাভরা লীলা-কানন। হায়! তখন এই প্রভাত ভ্রমণে কতই না আনন্দ পাইতাম! কলিকাতার জাগ্রত কোলাহল, আর এই নির্জ্জন প্রকৃতির গাম্ভীর্য্য-ভরা নিস্তব্ধ ভাব—এর মধ্যে কত পার্থক্য।

একদিন আমার দৌহিত্র আসিয়া আমায় বলিলেন,—"দাদা! আপনি গুপ্তেশ্বর মহাদেও দেখিয়াছেন কি?"

আমি বলিলাম,—"না—তুমি হইতেছ এখানে আমার গাইড। কই, তুমি ত আমায় এ সম্বন্ধে কোন কিছু বল নাই?"

দেবকুমার একটু হাসিয়া বলিল,—"বলি নাই, তার কারণ গুপ্তেশ্বরে যাইতে হইলে, গাড়ীর সাহায্য খুব কম পাইবেন। কেন না, কতক রাস্তায় গাড়ী চলিবে, কতক বা হাঁটিয়া যাইতে হইবে। এখান হইতে স্থানটী দুই ক্রোশের উপর। পথের চড়াই ওৎরাই উঠা নাবা করা আপনার শক্তিতে বোধ হয় কুলাইবে না, তাই ভাবিয়া আমি বলি নাই।"

আমি বলিলাম,—"যখন নর্ম্মদা প্রপাত দেখিতে গিয়া "ভৃগুক্ষেত্রের" পাহাড় উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছি, তখন এটাও পারিব। চল, আজই আমরা যাই। যতটা পথ টাঙ্গা যাইবে, ততটাই আমাদের লাভ। তারপর হাঁটিব। টাঙ্গাওয়ালাকে একটা সুবিধাকর জায়গায় রাখিয়া আমরা অপ্রশস্ত পথে হাঁটিয়া যাইব!"

যখন শুনিলাম যে, এই মহাদেব লিঙ্গমূর্ত্তি রাণী দুর্গাবতীর প্রতিষ্ঠিত, তখন দেবদেবকে দেখিবার জন্য প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িল। চোখের সম্মুখে ইতিহাসবিশ্রুত ঐশ্বর্য্যময়ী বীর ললনার পবিত্র মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল। যিনি রমণী হইয়াও ভারতবিজয়ী সম্রাট আকবর সাহের বিরুদ্ধে সেনা চালনা করিয়াছিলেন, যাঁর কীর্ত্তিকাহিনী ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে তাহার পৃষ্ঠায় লিখিয়া রাখিয়াছে, তিনি নিজে যে মহাদেবের নিত্য পূজা করিতেন, তাহা যে সর্ব্বাগ্রে দর্শনীয়, এ ধারণাটা আমার মনে বড়ই একটা আধিপত্য প্রকাশ করিল।

যাহা হউক, "শ্রেয়াংশি বহু বিঘ্নানি" ভাবিয়া সেই দিনই যাওয়া স্থির হইল। যে টাঙ্গাওয়ালা আমাদের গুপ্তেশ্বরে লইয়া যাইবার জন্য নিযুক্ত হইল, সে হিন্দু। স্থানটাও তার পরিচিত। সে বলিল, "বাবু সাহেব, একটা সহজ পথ আছে, সেটা দিয়া গেলে আপনার প্রায় আধ ক্রোশ পথ বাঁচিয়া যাইবে। তবে মধ্যে মধ্যে গাড়ী হইতে নামিয়া হাঁটিতে হইবে। কেন না, চড়াইএর পথে, ঘোড়া তিন জন সওয়ারী লইয়া উঠিতে পারিবে না।"

আমরা ইহাতেই স্বীকৃত হইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। টাঙ্গা যতদূর সরল পথ পাইল, খুব বেগেই চলিতে লাগিল। তারপর চড়াই ওৎরাই আরম্ভ হওয়ায় তাহার গতি ক্রমশঃ মন্থর ও যন্ত্রণাকর হইয়া পড়িল।

যাহা হউক, এক ঘণ্টা পরে কতক হাঁটিয়া, কতক টাঙ্গাতে চড়িয়া, আমরা আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলাম।

কিন্তু আমাদের সমস্ত শ্রান্তি-ক্লান্তি যেন সেই স্থানের সুন্দর দৃশ্যে তখনই বিদূরিত হইল। চির করুণাময়ী পর্ব্বতবাসিনী নিসর্গসুন্দরী যেন অঞ্চল ব্যজনে আমাদের ললাটের স্বেদবিন্দু মুছাইয়া দিতে লাগিলেন।

সূর্য্যদেব গগনপ্রান্তে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। তরুশিরে বিরল অন্ধকার। অসংখ্য বন-বিহঙ্গের মিশ্রিত কাকলী! চারিদিকে পাহাড়। চারিদিকে বিরাট নিস্তব্ধতা। কি প্রাণারাম শান্তিরসাস্পদ স্থান! সম্মুখেই দেবালয়ের প্রবেশ দ্বার। এই দ্বারের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিলে একটী ক্ষুদ্র উঠান। চারিদিকে কয়েকটী দালান। কিন্তু সেই নিস্তব্ধ দেবালয় সম্পূর্ণরূপে জনশূন্য। জন-প্রাণীও সেখানে নাই।

এই দেবালয় আধুনিক। একজন ধনবান শেঠী নিজ ব্যয়ে এই চত্বরগুলি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া গুপ্তেশ্বরের স্মৃতি পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন।

দেখিলাম, এক দিকের একটী নির্জ্জন অন্ধকারময় কক্ষ মধ্যে একজন সন্ন্যাসী ধুনি জ্বালাইয়া ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসিয়া আছেন। শ্বেত শ্মশ্রু শ্বেত জটা, তেজপূর্ণ গাম্ভীর্য্যমাখা মুখ, স্তিমিত নেত্র। দেখিয়া বড়ই ভক্তি হইল। আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মহাদেব দেখিতে গেলাম।

এই মন্দিরের একদিকে পাহাড়। সেই পাহাড়ের বুকের উপর বিস্তৃত গহ্বর। এই গহ্বর মধ্যেই লিঙ্গমূর্ত্তি "গুপ্তেশ্বর" বিরাজ করিতেছেন। শিবলিঙ্গটী দেড় হাতের বেশী প্রকট হয় নাই।

তাঁহার আশে পাশে ফুল-বিল্বপত্র। নিশ্চয়ই কোন বেতনভোগী পূজক আছেন যিনি নিত্য পূজা করেন। কিন্তু কই, তাঁহাকে ত দেখিতে পাইতেছি না।

রাণী দুর্গাবতীর "মদনমহল" নামক রাজপ্রাসাদ এই স্থান হইতে বেশী দূর নয়। এরূপ জনপ্রবাদ আছে, মদনমহলের প্রাসাদ হইতে এই "গুপ্তেশ্বরের গুহা পর্য্যন্ত এক সুড়ঙ্গ ছিল। এই সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া প্রতিদিন প্রত্যুষে রাণী তাঁহার অভীষ্ট দেবতা এই গুপ্তেশ্বরের পূজা করিয়া যাইতেন।

আমরা দেবাদিদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম। বাহিরে আসিয়াই সেই মন্দিরের পুরোহিত মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি কোন কাজের জন্য একটু দূরে গিয়াছিলেন। আমরা দেবদর্শনার্থী—আর কলিকাতার অধিবাসী জানিতে পারিয়া, তিনি আমাদের পুনরায় দেব-মন্দিরের মধ্যে লইয়া গেলেন। আমরা একটী মুদ্রা দিয়া দেবাদিদেবকে প্রণাম করিলাম।

এই পূজকটী প্রবীণ। তাঁহার কপালে রক্তচন্দনের ত্রিপুণ্ড্রক। কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা। গৈরিক বসন পরিধান। বয়স, তিনি বলিলেন, "তিন কোড়ী দুই"—অর্থাৎ বাষট্টি। কিন্তু তখনও তাঁহাতে যেন যৌবনের উৎসাহ, তেজ বর্ত্তমান। পাহাড়ে দেশের সংযমময় জীবনের ফলে তিনি এখনও যুবকের কান্তিপূর্ণ, যৌবনের উৎসাহে দীপ্যমান। সে মূর্ত্তি যেন সেকালের রাজপুত চারণের মত গৌরবমণ্ডিত। পূজক ঠাকুর আমাদের এক শিলাসনে বসাইয়া রাণী দুর্গাবতীর গল্প আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষদের মধ্যে একজন যে তাঁহার কুলপুরোহিত ছিলেন, একথাটীও উল্লেখ করিতে ছাড়িলেন না। কিন্তু এ সকল গল্প কিম্বদন্তীমূলক; ঐতিহাসিক মূল্য তাহার কিছু নাই।

পুরোহিত ঠাকুরজী আমাদের কিছু মিষ্টান্ন প্রসাদ দিয়া বলিলেন,—"বাবুজী! এ মহাপ্রসাদ আর গঙ্গাজল খাইলে, আপনার দেহ পবিত্র হইবে—শরীরে কোন ব্যাধি থাকিবে না।"

আমরা ভক্তিভরে সেই প্রসাদগুলি খাইলাম। পুরোহিত ঠাকুর এক লোটা জল আনিয়া দিলেন। আমি ভাবিলাম, এখানে গঙ্গা আসিবে কিরূপে? ইহা নর্ম্মদার পবিত্র সলিল।

পুরোহিত ঠাকুরকে এই কথা বলিবামাত্রই তিনি বলিলেন,—"জলটা পান করিয়া লউন। আপনাকে গঙ্গা যমুনা দেখাইয়া আনিতেছি। এই জাগ্রত দেবতা গুপ্তেশ্বরের সেবার জন্য রাণী দুর্গাবতী গঙ্গা ও যমুনাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।"

তিনি আমাদের মন্দিরের বাহিরে একটি ক্ষুদ্র উদ্যান মধ্যে আনিয়া পাশা পাশি দুইটী কূপ দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "ইহার একটীর নাম গঙ্গা, অপরটী যমুনা। উভয়ের জল দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন।"

আমরা সবিস্ময়ে দেখিলাম, পুরোহিত ঠাকুর যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ঠিক। গঙ্গার জল সাদা। আর যে কূপটী যমুনা বলিয়া পরিচিত, তাহার জল মিশ কালো,, ঠিক যমুনার জলের মত। এই কূপ দুইটীর ব্যবধান ৪।৫ হাত। প্রকৃতি দেবীর অদ্ভুত লীলা! তাহা না হইলে পাশা পাশি অবস্থিত এই দুইটী কূপের একটীর জল গঙ্গাজলের মত সাদা, আর অপরটী যমুনার জলের মত কাল হইবে কেন?

কূপ দুটি আমাদের দেশের "পাতকুয়া" নহে। পশ্চিমাঞ্চলে যে সব বড় বড় "ইন্দারা" দেখিতে পাওয়া যায়, এ দুইটী সেই শ্রেণীর।

পুরোহিত ঠাকুরের কথা যদি ভিত্তিহীন অলীক উপন্যাস না হয়, তাহা হইলে ধরিয়া লইতে হইবে যে, তিন শত বৎসরের উপর কাল এই কূপ দুইটীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা রাণী দুর্গাবতী কর্ত্তৃক হয়। কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে ইহার জল খারপ হয় নাই বা "ইহাকে নূতনভাবে খনন করিতে হয় নাই।

বিনু।

লেখক,—শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্।

(১)

সন্ধ্যার পর লাইব্রেরী-ঘরে নলিনীনাথ পরদিনের কেসের কাগজ-পত্র দেখিতেছে, এমন সময় হ্যাটকোটাবৃত মহিষাসুরগুম্ফিত এক ব্যক্তিকে লইয়া বেলিয়াঘাটার বিখ্যাত ধনী অম্বিকাবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অম্বিকাচরণ নলিনীনাথের বাল্যসখা, সুহৃদ ও প্রধান মক্কেল। কুসঙ্গের ভয়ে অম্বিকাচরণ সেকেণ্ড ক্লাস হইতেই বিদ্যালয় হইতে বিদায় লইয়া মা-লক্ষ্মীর চরণ-রেণুর প্রত্যাশায় রাধাবাজারে এক কাপড়ের দোকানের শূন্য বখ্‌রাদার হন। কমলার কৃপা চঞ্চলা হইলেও প্লাবময়ী; অসম্ভবনীয় অল্প-দিনেই অম্বিকাকে প্রাসাদে তুলিয়াছিল। বি-এল ফাইনালে স্বর্ণপদক পাইয়া পুলক-নম্র-হস্তে তিন মাসের কন্যা বিনুকে নিজের কম্পিত বক্ষে ধরিয়া তাহার কোমল কচিগালে আনন্দের বেগ রাখিয়া, নলিনীনাথ যখন নিজেকে ধন্য মনে করে, তখন কলিকাতার ধনী-সমাজে অম্বিকাচরণ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট অফিসারদের দাক্ষিণ্য-শিষ্টতায়, বুনিয়াদী জমিদারদের সাগ্রহ আলাপে উকীলবাবুদের যশোস্তবে, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কল্যাণ স্তুতিতে ও উমেদার আত্মীয়ের চাটু-সাধুবাদে কাপড়ওয়ালার মনের অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছিল কি না, ঠিক জানি না; তবে নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি, তাহার সুখ-স্মৃতিময় বাল্য-স্নেহের কোন হ্রাস হয় নাই। নলিনীনাথ আলিপুরে প্র্যাকটিস্ আরম্ভ করিয়াছে শুনিয়া, তাহাকে নিজের ল' বিজিনেসের ভার দিয়া অম্বিকা সুস্থির হইল। অম্বিকার সৌভাগ্যজড়িত অকপট সৌহৃদ্যে নলিনীনাথও অল্পদিনে পসার জমাইয়া ফেলিল।

অম্বিকাকে দেখিয়া নলিনীনাথ বলিল,—"এত রাত্রে, এই বৃষ্টিতে?"

অম্বিকা বলিল,—"বিশেষ দরকারে। প্রথমে আমার বন্ধু মিঃ হালদারের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দি। ইনি ব্যারিষ্টার-এট-ল, পলিটিশিয়ান, লেবার লিডার, বঙ্গের সন্তান, ভারতের শিশু, দেশের আশা, পৃথিবীর আকাঙ্ক্ষা। দেশীয় বাণিজ্যের উৎকল্পে অযাচিত ভাবে আমায় এক প্ল্যাটিনামের খনি যোগাড় করিয়া দিয়াছেন।"

Willsএর নেভিকাট সিগারেট সযত্নে অধরে সংযোগ করিয়া, Gressneilthএর ফুলনানায় সিঞ্চিত ফ্রেঞ্চ সিল্কের রুমাল সাদরে কোটের বা শ্লিভে বেষ্টিত করিয়া রিষ্ট-ওয়াচের Geneva Band সন্তর্পণে ঘুরাইয়া, একটু বক্র ধীর হাসি হাসিয়া, মিঃ হালদার বলিলেন,—"দেশের অবস্থা প্রকৃতই শোচনীয়। দেশের লোক রুটী-মাখমের অভাবে হাহাকারে মারা যাচ্ছে, আর ধূর্ত্ত, স্বার্থপর বিদেশীয় বণিক দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর দেশ থেকে সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি অর্থ নিয়ে যাচ্ছে। যদি দেশের সমস্ত ধনী আমাদের দেশানুরাগী, উদার, মহান্, সদয় অম্বিকা বাবুর ন্যায় শিল্প ব্যবসায় মূলধন খাটাইয়া, দেশের শিক্ষিত যুবক বিশেষতঃ যাহাদের জাপান, আমেরিকা ও ইউরোপে ঘোরা আছে তাহাদের হস্তে নিশ্চিন্ত বিশ্বস্ত চিত্তে কারবারের ভার দিতে পারেন, তাহা হইলে অল্প দিনেই ম্যাজিকের ন্যায় দেশের—দশের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। এই আমাদের—"

বাধা দিয়া অম্বিকাচরণ বলিল,—"থাক্ এখন কাজের কথা শোন। হালদার যে খনিটী যোগাড় করেছেন, তার দখল এখনও পাই নাই। টাইটেলের কি গোল আছে। এখন মামলা কর্‌তে হ'বে। হালদার এই আর্‌জি তৈয়ার ক'রেছেন, তোমায় দেখে দিতে হ'বে।"

কাগজখানি হাতে লইয়া নলিনীনাথ তাহাতে বিলুপ্ত হইয়া গেল। কখনও তাহাতে দুটি কথা কাটিতেছে, কখনও চারিটি বসাইতেছে, এমন সময় চাকর আসিয়া খবর দিল, বিন্নুর অসুখ করিয়াছে। "আজ থাক, আজ থাক" বলিয়া নলিনীনাথ ঘর হইতে চলিয়া গেল।

অবাক্ ভাবে মিঃ হালদার বলিল,—"লোকটা কি রকম?"

হাসিয়া অম্বিকা উত্তর দিল, "ঐ রকম।"

(২)

আবেগ, উৎকণ্ঠিত, উদ্‌ভ্রান্ত পদে শয়নকক্ষে আসিয়া নলিনীনাথ দেখিল, বিন্নু ঘুমাইতেছে, শিয়রে সুহাসিনী তাহাকে ব্যজন করিতেছে। কম্পিত হৃদয়ে শয্যার পার্শ্বে বসিয়া নলিনীনাথ অনেকক্ষণ অনিমিষ নয়নে বিন্নুর মুখের দিকে ব্যাকুলভাবে চাহিয়া রহিল। পরে কাতর-নম্র-মৃদুস্বরে আস্তে আস্তে সুহাসিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "কতক্ষণ এমন হয়েছে?"

আঁচলে চোখ মুছিয়া সুহাসিনী ধীরে ধীরে কহিল, "চোখের পলকে।

দোর্ম্মা খাবে ব'লে বায়না ধরে, আমি পটল ছাড়াচ্ছি, অমনি শুয়ে পড়্‌লো, কোলে ক'রে ঘরে নিয়ে এলুম, বাছা আর চাইতে পার্‌লে না, বিছানা নিলে, ঘুমিয়ে পড়্‌লো, একটুও ছট্‌ফট্ কর্‌তে পার্‌লে না।"

একটা উষ্ণ নিশ্বাস রাখিয়া নলিনীনাথ বলিল,—"বিন্নুর এই ঘুমটা কি অস্বাভাবিক। সুস্থ ঘুমে চোখের পাতা কেমন মিলিয়ে যায়, এ যেন জড়িয়ে রয়েছে।"

সুহাসিনী বলিল,—"তাই তো খবর দিলুম।"

"গা কি গরম হয়েছে" বলিয়া নলিনীনাথ প্রথমে বিন্নুর, পরে নিজের, পরে সুহাসিনীর, এইরূপে বারংবার সকলের কপালের তাপ নির্ণয় ও তুলনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিল, বিন্নুর কপাল উত্তপ্ত না হইলেও তীব্র—অসুস্থ দুর্ব্বল রুদ্ধ; এক কথায়, অস্বাভাবিক। নলিনীনাথ আর দেরী করিল না, ডাক্তার ডাকিতে ছুটিল।

(৩)

ডাক্তার আসিয়া সব শুনিয়া বিন্নুর হাত দেখিয়া বলিলেন,—"ও কিছু নয়, ঘুম ভাঙ্‌লেই খেলা কর্‌বে।"

নলিনী। ঘুমটা অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে না?

ডাক্তার। কেন?

নলিনী। চোখের পাতা তো ভাল মিলোয় নি, যেন রুদ্ধ দুর্ব্বলতায় জড়িয়ে দিয়াছে।

ডাক্তার বাবু তখন ঘরের সাদা মার্ব্বেলের মেঝে, মেহগ্নি পালিস দরজা, অয়েলপেণ্টিং করা দেয়াল হইতে বিলাতি ওকের পালঙ্ক, কর্পূর কাটের ড্রেসিং, বিউরো সেগুনের গিল্‌টি করা গ্লাসকেস দ্রুত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নিজের মনে নলিনীনাথের মাসিক রোজগারের আয়াতন নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। নলিনীনাথের কথায় চমক ভাঙ্গিয়া বলিলেন,—"দেখি।"

বিন্নুর চোখের পাতা পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার বলিলেন,—"ঘুমটা ভাল বলে মনে হচ্ছে না।"

নলিনী। আচ্ছা, এর এ রকম হয় কেন?

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চিন্তাজড়িত স্বরে ডাক্তার বলিলেন,—"কখন কখন দেখেছি, Cerebral headache থেকে এরূপ prostration আসে, আবার অনেক কেসে heart affection থেকে Brain con-

gestion হয়ে এরূপে nerve shatter ক'রে দেয়। এর heartটা একবার দেখি।"

Heart examine হইয়া গেলে ডাক্তার বলিলেন,—"heartটা বড় দুর্ব্বল দেখলুম।"

নলিনী। এর কি কোন প্রতিকার নাই?

ডাক্তার। তাই ভাব্‌ছি, কি দিব।

নলিনী। Temperatureটা একবার দেখবেন না?

ডাক্তার। হাত দেখেছি, তবুও Scientifically accurate হওয়া ভাল।

পকেট হইতে জ্বরকাটি বাহির করিয়া তাহা ঠিক করিয়া লইলেন। রোগীর পিতা তখন তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়াছিল, ভুলে তিনি থারমোমেটারের উল্টাদিক বিনুর বগলে দিলেন। নলিনীনাথ তখন "কি হইবে" ভাবিতেছিল, ডাক্তারের ভুল দেখিতে পাইল না।

আলোর কাছে থারমোমেটার ধরিয়া ডাক্তার বাবু বলিলেন,—"Temperature বড় suppressed দেখ্‌ছি।

নলিনী। তবে কি Pox হ'বার আশঙ্কা কর্‌চেন?

ডাক্তার। কতদিন আগে Vaccination হয়েছে?

নলিনী। তা প্রায় মাস ছয়েক হবে।

ডাক্তার। তা হ'লে তত ভয়ের কারণ নাই।

নলিনী। বড় Pox হচ্ছে না?

ডাক্তার। হ্যাঃ, তবে এ কেসে হলেও খুব mild formএর হবে।

নলিনী। তা হ'লে কি ওষুধ দিবেন? শুনেছি, Pox কি measlesএর আশঙ্কা থাক্‌লে ওষুধ দিলে খারাপ হয়।

ডাক্তার। ও একটা ভ্রান্তি কুসংস্কার, ওষুধ না দিলে কি অসুখের উপশম হয়?

নলিনী। ঠিক বলেছেন।

লম্বা ব্যবস্থা-পত্র লেখা হইল, একটা খাবার ওষুধ, একটা মালিস, একটা পাউডার। তখনই ডাক্তার বাবুর ডিস্পেন্সারি হইতে ওষুধ আনাইয়া বিনুকে খাওয়ান হইল।

নিদ্রা, তন্দ্রা, জাগরণের মাঝে সে রাত্তির বিনুর শয্যার পাশে নলিনী ও সুহাসিনী এক রকমে কাটাইল।

(৪)

পনর দিন কাটিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে ডাক্তার বাবুকে প্রত্যহ চারিবার আসিতে হইয়াছিল, Consultationএর জন্য সাহেব ডাক্তারও ডাকা হয়, একজন নার্সকেও নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তাহাদের যৌথচিকিৎসা ও শুশ্রূষায় সুহাসিনী ও নলিনীর উদ্বেগ-কাতর প্রার্থনায়, বিনু এখন পথ্য পাইয়াছে। কিন্তু অবিলম্বে হাওয়া পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন। কোন্ জায়গার জল হাওয়া ভাল ও বিনুর সহ্য হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্য সেদিন ডাক্তার বাবুকে ডাকা হইয়াছে। রেলওয়ে ম্যাপ ও Pocket Hygiene এর সহিত নিস্তব্ধ আলাপনের পর ডাক্তারবাবু বলিলেন,—"রাঁচি মন্দ হবে না।"

নলিনী। রাঁচিতে ম্যালেরিয়া হয় শুনেছি।

ডাক্তার। তা, সে সব জায়গায়ই পাবেন।

নলিনী। জায়গায়টা বড় ঠাণ্ডা নয় কি?

ডাক্তার। ওঃ, ও কথাটা ভাবিনি। বিনুর ধাতটা বায়ুপ্রধান।

নলিনী। হাজারিবাগ কেমন হবে?

ডাক্তার। মন্দ নয়। তবে সেখানে বড় সর্দ্দির ভয়।

ডাক্তারবাবু চক্ষু মুদিলেন, নলিনীনাথও ছাদের কড়ি বরগা হইতে ভাব কর্ষণের প্রয়াস পাইল। ক্ষণেক পরে ডাক্তারবাবু বলিলেন,—"ডেরী-অনসোন কিরূপ মনে করেন? নদীর বালুকায় স্বতঃই ফিলটার হওয়া জল, তাতে আবার উপযুক্ত পরিমাণে অভ্র-কণা"

নলিনী। একদিন ডাঃ ফেরারের লেক্‌চারে শুনেছিলাম, অভ্রে পেট একটু নরম করে।

ডাক্তার। কতকটা বটে।

আবার গভীর গবেষণায় ২।১ মিনিট কাটিল। আলোকিত নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া নলিনীনাথ সিমুলতলার কথা তুলিল। ডাক্তারবাবু আপত্তি করিলেন,—সেখানে জলে লোহার ভাগ বেশী, পেট আঁটিয়া যায়, হাওয়ায় রং ময়লা করে। তারপর দারজিলিং, শিলং, শিলীগুড়ী, মধুপুর, বৈদ্যনাথ, দেওঘর, কারসিয়ং, মুসৌরি, চুনার, এটোয়া, মুঙ্গের, ওয়ালটেয়ার প্রভৃতি অনেক স্বাস্থ্য আশ্রমের উপকারিতা—কাশী, পৈরাগ, গয়া, মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, লছমনঝোলা, কামরূপ, সেতুবন্ধ আদি তীর্থের মাহাত্ম্য ও বম্বার, কানপুর,

লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, দিল্লি, জয়পুর, আজমির, বরোদা, সুরাট, পুনা, মহীসুর আদি, ঐতিহাসিক স্মৃতিজড়িত অনেক সহরের মনোহারিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হইল। শেষে আবিষ্কার বিস্ফারিত নয়নে দক্ষিণ হস্তের দ্বিতীয়াঙ্গুলী নাড়িয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন,—'পুরী, পুরী, পুরী। পুরীই ঠিক সুট কর্‌বে। একাধারে স্বাস্থ্য-আশ্রম, তীর্থস্থান। সেখানের জলে—কল্পনা, হাওয়ায় ভাব, বালুকায় সাধনা, মৃত্তিকায় মুক্তি।

নলিনী। অনেকের কাছে শুনেছি, পুরীতে বড় পেট ফাঁপে।

ডাক্তার। তাদের ভুল ধারণা! পুরীর জল, হাওয়া, বালি, মাটি সব এনালিসিস করিয়া দেখা হইয়াছে, তাহাতে পেট ফাঁপিবার কোন জিনিষ নাই।

নলিনী। জায়গাটা নোনা নয় কি?

ডাক্তারবাবু হাসিয়া বলিলেন,—"নোনা, নোনা। সমুদ্রের জল লবণাক্ত ব'লে মনে কর্‌ছেন, কিন্তু সি বাথের মত বলকারক আর কি আছে? তা ছাড়া, পুরীতে একটা জিনিষ পাবেন, যা আমাদের দেশে আর কোথাও নাই। ঢেউএর সংঘর্ষণে পুরীর সমুদ্রে Natural phosphorous উত্থিত হয়, সেই phosphorous রাত্রে জ্বলিয়া vapourএ পরিণত হয়। সেই vapour হাওয়ায় মিশে ওজোন (ozone) হইয়া যায়, এই ozone বিজ্ঞানের মতে মৃত-সঞ্জীবনী।

নলিনী। ঠিক বলেছেন। সাধারণ বাতাসই কত স্নিগ্ধ, তৃপ্তিদায়ক। ozone নিশ্চয়ই তার চেয়ে বলকারক হইবে।

পুরী যাওয়াই স্থির হইল।

(৫)

পুরীতে দুই মাস কাটিয়াছে। বিনু কতকটা জোর পাইয়াছে, কিন্তু এখনও ছুটিবার সময় তার পা কখন কখন একটু কাঁপে। নলিনীনাথ স্থির করিল, আরও তিন মাস থাকিবে, দরকার হইলে পূজার ছুটিও পুরীতে কাটাইবে। বাড়ীর লিস্ বাড়াইয়া লওয়া হইল। সেই সময় অম্বিকাবাবু চিঠি দিলেন, শীঘ্রই তাহার নূতন জমিদারী সংক্রান্ত এক জেদের মোকদ্দমার শোনানী হইবে, নলিনীনাথকে যাইতে হইবে। "কি করিব" ভাবিতে ভাবিতে নলিনীনাথের তিন দিন কাটিয়া গেল। অম্বিকাবাবু এবার তার পাঠাইলেন—তারপর আবার চিঠি, আবার তার। নলিনীনাথ কর্ত্তব্য-সঙ্কটে

পড়িল একদিকে অম্বিকা, অন্যদিকে বিনু; একদিকে সখা, অন্যদিকে তনয়া; একদিকে সৌহৃদ্য, অন্যদিকে স্নেহ; একদিকে উপকারক, অন্যদিকে অধীনা; একদিকে শক্তিমান পুরুষ, অপর দিকে অসহায়া শিশু। নলিনীনাথ স্থির করিল, সব কথা জানাইয়া এবারের মত অম্বিকার নিকট ক্ষমা চাহিবে; লিখিবার জন্য কাগজ কলমও বাহির করিল। কিন্তু "ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বয়।" ঠিক সেই সময়ে তার আসিল, নলিনীনাথের শ্বশুর মহাশয় পুরীর সিভিল সার্জ্জন পদে বদলী হইয়াছেন, পরদিন আসিয়া পৌঁছিবেন। নলিনীনাথ সুস্থির হইল।

(৬)

বিনুকে শ্বশুর মহাশয়ের জিম্মায় রাখিয়া, সুদীর্ঘ সপ্তাহের জন্য, আজ রাত্রের ট্রেণে নলিনীনাথ কলিকাতায় ফিরিবে। যাত্রার আয়োজন আদি শেষ করিয়া, বিরহ অধিবাস-বিহ্বলা সুহাসিনীকে লইয়া নলিনীনাথ অপরাহ্ণ বায়ুসেবনে বাহির হইল, সঙ্গে বিনুও চলিল।

বাড়ীর কম্পাউণ্ড পার হইতেই সুহাসিনীর শ্রান্ত পায়ের জুতা বালিতে বসিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে লুক্কায়িত তেশিরা ফণা বিস্তার করিয়া দেখা দিল। তেশিরা নীচ, ক্রূর, খল—নইলে সরস সুশীতল মৃত্তিকা হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া কেন সে মরিল না; না মরিয়া কেন সে কর্কশ উত্তপ্ত বালুকায় বাসা করিল,—নীচাশয় মানিনীর মর্য্যাদা রাখিল না, এই সুযোগে সুহাসিনীকে দংশন করিল। তখনই নত হইয়া কাঁটা উপড়াইয়া নলিনীনাথ নিজের সিল্কের রুমালে ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিল; তারপর বামহস্তে সুহাসিনীর ভার লইয়া দক্ষিণ হস্তস্থ যষ্টিতে বিদ্রোহী তেশিরা দমন করিতে করিতে সাগরতটে আসিয়া পৌঁছিল।

অন্য দিনের ন্যায় আজ বেশী বেড়ান হইল না, অল্পক্ষণেই ক্লান্তা হইয়া প্রথম নিভৃত স্থানে আহতা সুহাসিনী নলিনীনাথের কাঁধে ভর দিয়া বসিয়া পড়িল। সুযোগ বুঝিয়া বিনু ঝিনুক কুড়াইতে আরম্ভ করিল।

দুই জনে অনেকক্ষণ সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিল—সাগর তখনও নাচিতেছে, বেলা ব'য়ে এলো, তবুও ভ্রূক্ষেপ নাই, একটুও বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, কেবল আমোদে মাতোয়ারা, যেন প্রবল প্রেমে লুটিতেছে।

নলিনীনাথ কি ভাবিতেছিল জানি না, হঠাৎ কোমল কম্পিত ভগ্নস্বরে ডাকিল,—"হাঁসি।"

"বীণার তারে উত্তর হইল, "নলিন্!"

"ভগবান সুন্দর সাগর গড়েছেন, তাহা দেখিবার বিরাম দেন নাই কেন, হাঁসি?"

"সাগর কি এতই সুন্দর, নলিন?"

"তুমি কি তাকে সুন্দর দেখ না, হাঁসি?"

"কেন সে এত সুন্দর, নলিন?"

"ভালবাসার মত সে যে অগাধ, অন্তহীন, বিরাট, সীমাশূন্য—শুধু ব'হে যায়।"

"ভালবাসা ভালবেসে বন্দী হ'য়ে সুখে থাকে—সাগর ত ধরা দেয় না।"

উত্তরের অন্বেষণে নলিনীনাথ হাঁসির মুখের দিকে চাহিল—যেন তার কানে কানে কি বলিবে, এমন সময় বিন্নু ডাকিল,—"বাবা বাবা! দেখ, আকাশ কেমন রাঙা হয়েছে।"

চমকিয়া, মুগ্ধ নয়ন আকাশের দিকে ফিরাইয়া, নলিনীনাথ দেখিল, ধরিত্রী-রস-পুষ্ট তপন অনিচ্ছুক পশ্চাৎগতি থামাইয়া স্বাদ-লুব্ধ লোহিত লোচনে দাঁড়াইয়াছে—বিচ্ছেদ-ভয়ে মলিনা ধরিত্রীও তাকে ধরিবার আশে সমুদ্র-তরঙ্গে গা ঢালিবার প্রয়াস করিতেছে, রবি ধরা দিতে নত হইল, এমন সময় কে যেন নিষ্ঠুর হাতে তাকে সমুদ্র-গর্ভে ডুবাইল, ধরাও আঁধারে লুটাইল।

(৭)

হাঁপাইতে হাঁপাইতে ষ্টেশনে পৌঁছিয়া নলিনীনাথ শুনিল, ফার্ষ্ট বেল বাজিতেছে, নিজের Berth অন্বেষণে তখনই প্লাট্‌ফরমে ছুটিল। গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে, এমন সময় "হ্যালো নলিনীবাবু!" বলিয়া মিঃ হালদার তাহাকে একখানি রিসার্ভ সেলুনে টানিয়া লইল, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীও ছাড়িয়া দিল।

কামরায় উঠিয়া নলিনীনাথ দেখিল, এক আরাম-চেয়ারে নিতাইবাবু বসিয়া আছেন। নিতাইবাবু নলিনীনাথের বহুদিনের আলাপী একজন সাহিত্যিক সম্পাদক, রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্বেও সংশ্লিষ্ট থাকেন, তবে ভাগিরথীর ন্যায় তাঁহার রাজনৈতিক ভাবযুক্তির জোয়ার ভাঁটা খেলে।

কবে আসিয়াছিল, কয়দিন ছিল, আবার কবে আসিবে, এই সব পরিচয় দিবার পর নলিনীনাথ শুনিল, ভারতীয় বাণিজ্য সভায় বঙ্গের জুট-মিল-কুলীদিগের পক্ষে ডেলিগেট হইয়া মিঃ হালদার ও নিতাইবাবু পুরী আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের দলের অধিনায়ক এই উপলক্ষে কুলী সর্দ্দারদিগকে একদিনের মজুরী চাঁদা তুলিতে বলিয়াছিলেন; প্রপীড়িত দুর্ভাগ্য কুলীদিগের সামর্থ্যে তাহা কুলায় নাই, তাহারা মাত্র চারি পয়সা করিয়া মোট ১১,২৩১৲ টাকা চাঁদা তুলিয়াছিল, কাজেই দলের প্রধান লিডার আসিতে পারেন নাই।

দেশের অরাজকতা, দরিদ্রতা, উৎপীড়ন, ঐক্যতা, উদ্ধার, রক্ষা ইত্যাদির সমালোচনা করিয়া, মিঃ হালদার জানাইল, তাঁহাদের দল হইতে পৃথিবীব্যাপী সমর-আন্দোলন করিবার জন্য পাঁচজন ডেলিগেট নির্ব্বাচন করা হইয়াছে, তাঁহারা শীঘ্র বিলাত যাইবেন, তাঁহাদের সম্মানার্থ পরদিন সভা-ভবনে একটি বিদায়-ভোজ হইবে; সেই জন্য মিঃ হালদার ও নিতাইবাবুকে আজ ফিরিতে হইতেছে, নহিলে কুলীদের কল্যাণার্থ আরও দিন কতক পুরীতে থাকিতেন। দলের তরফ হইতে মিঃ হালদার ভোজ-সভায় নলিনীনাথকে নিমন্ত্রণ করিলেন, নলিনীনাথ যাইতে স্বীকার করিল।

পরে টিফিনবক্স হইতে বোতলাদি বাহির করিয়া মিঃ হালদার ব্রাণ্ডি ও সেরি মিশ্রণে একটি পাঞ্চ (puuch) প্রস্তুত করিলেন ও তাহা কাঁচের গেলাসে ঢালিয়া নলিনীনাথকে অফার (offer) করিলেন। নলিনীনাথ বিনয় সহকারে,—"আমার ও সব আসে না" বলিয়া ক্ষমা চাহিল। নিতাই বাবু অপেক্ষা করিতে পারেন নাই, গলা ভিজিলে বলিলেন,—"ওহে হালদার, পারবে না, আমরা অনেক চেষ্টা করে এ্যলে গেছি।"

মিঃ হালদার। কেন, আপনি কি ড্রিঙ্ক করেন না, নলিনীবাবু?

নলিনীনাথ। না।

মিঃ হালদার।—কেন?

নলিনীনাথ।—কি দরকার?

মিঃ হালদার।—দরকার! আপনি কি বল্‌ছেন, নলিনীবাবু!

নিতাইবাবু তখন দ্বিতীয় গেলাসের অর্দ্ধেক নিঃশেষ করিয়াছেন, হালদারের উক্তিতে বলিলেন,—"ওহে, ও অমন অনেক কথা বলে। বৃথা—"

বাধা দিয়া মিঃ হালদার বলিলেন,—"নলিনীবাবু, আপনি যা বল্‌ছেন, তা বুঝ্‌ছেন না। আমাদের শাস্ত্র কি বল্‌ছে? ড্রিঙ্ক শক্তি-উপাসনায় অত্যাবশ্যক, একেবারে Indispensible necessary. ইতিহাসের প্রমাণ কি? ড্রিঙ্ক ছাড়া কোন জাতি প্রভুত্ব করিতে পারে নাই। বর্ত্তমান সভ্যতা

কি বলে? জাতীয় বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সকল সভাতেই ড্রিঙ্ক দরকার। আপনি কি একথা অস্বীকার করেন?"

নলিনী।—না। তবে জিনিষটা ত ভাল নয়।

মিঃ হাল্লদার। ভাল নয় কেন, কিসে খারাপ?

নলিনী। খারাপ আমি বল্‌ছি না—তবে অনেক সময় নেশা হয়, অসুখ করে।

মিঃ হালদার; সে যারা অত্যধিক পরিমাণে খায় তাদের। ভাত রুটিও বেশী খেলে ঐ রকম হয়।

মিঃ হালদার অনেক কারণ দর্শাইল, তবুও নলিনীনাথ আপত্তি তুলিল। শেষে নিশ্চেষ্টভাবে চক্ষু মুদিয়া হালদারসাহেব চুরুট টানিতে লাগিলেন, তখন নিতাই বাবু বলিলেন,—"ইনভেষ্টমেণ্টই ধরাতে পার্‌বে না, তুমি আবার সুদ খাবে?"

এ কথার কোন উত্তর না দিয়া হালদার সাহেব খানসামাকে ডিনার ঠিক করিতে আদেশ দিল। ডিনার সাজান হইলে, তিন জনে আহারে বসিলেন—নলিনীনাথ ডিনারে কোন আপত্তি করিল না।

রুটিতে মাখম মাখান শেষ হইলে, হালদার সাহেব বলিলেন,—"নলিনী বাবু, আপনাকে ড্রিঙ্ক করিতে বলিয়াছিলাম, ক্ষমা করিবেন।

নলিনী।—বিলক্ষণ, কি বল্‌ছেন?

মিঃ হালদার।—না নলিনীবাবু, নিশ্চয়ই আপনি ড্রিঙ্ক করা গর্হিত মনে করেন, নিশ্চয়ই আপনি আমাদের ঘৃণা করেন।

নলিনীনাথ অনেক বুঝাইল, বার বার বলিল,—ড্রিঙ্ক করা গর্হিত মনে করি না, ড্রিঙ্ক করার জন্য কাহাকেও ঘৃণা করি না, হালদার সাহেবকে বন্ধুর চক্ষে দেখি। কিন্তু হালদার সাহেব ইহাতে আশ্বাসিত হইলেন না, নিতাইবাবুও তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। উভয়ে যুগপৎ নলিনীনাথকে জানাইলেন। নলিনীনাথের শুভাকাঙ্ক্ষার নিদর্শন না পাইলে তাঁহাদের ক্ষোভ জীবনে যাইবে না। কোমল সরলহৃদয় নলিনীনাথ এই কাতর আক্রমণ সহিতে পারিল না, অগত্যা দুই বন্ধুকে আশ্বাসিত করিবার জন্য হালদার সাহেবের হস্তস্থিত গেলাসের সুধারস একচুমুক টানিয়া লইল—তারপর উপরোধে আর এক চুমুক, অনুরোধে দুই চুমুক এইরূপে ক্রমে গেলাস খালি হইয়া গেল। তারপর হালদার সাহেবের কেস খুলিয়া নলিনীনাথ একটি সিগারেট ধরাইল, ইতিপূর্ব্বে কেহ তাঁহাকে সিগারেট বা তামাক খাইতে দেখে নাই।

সিগারেট টানিতে টানিতে নলিনীনাথ একখানি আরাম-কেদারা

আশ্রয় লইল, অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল—কি ভাবিতেছিল জানি না, হঠাৎ গাহিয়া উঠিল,—

তারা চাঁদ ঐ চলে যায়, ঐ ব'লে যায়
মলয় হাওয়ার কানে কানে,
আমরা দু'জনে প্রেম-বিরাগী
থাক্‌বো না আর এ গগনে।

এই কয় কলি গাহিয়াই নলিনীনাথ থামিল, সঙ্গে সঙ্গে হস্তস্থিত সিগারেট পড়িয়া গেল।

(৮)

পরদিন সন্ধ্যার পর হালদার সাহেব আসিয়া নলিনীনাথকে লইয়া দলের সভা-ভবনে উপস্থিত হইল। নলিনীনাথ এতদিন শুধু ওকালতী, আর বিন্দু ও হাঁসির চিকিৎসায় ব্যস্ত ছিল, দশ ও দেশের কথায় লিপ্ত থাকিবার সুযোগ খোঁজে নাই; বিজুলীমালায় আলোকিত সজ্জিত প্রশস্ত কক্ষে সমবেত খ্যাতনামা প্রসিদ্ধ জনতায় নিজেকে দেখিয়া যেন একটু বিচলিত হইল, পুলক বিস্মিত নয়নে দেখিল, একতারে গাঁথা ভিন্ন বৃক্ষচ্যুত কুসুম-হারের ন্যায় সকলেই একই মহাব্রতে জড়িত। এ ব্রত ধর্ম্মভেদ করে না, জাতি বিচার মানে না, প্রলয়োন্মাদিনী শক্তিতে পোষাক পরিচ্ছদ, ভাষা, ভাব, ঐতিহাসিক সূত্রতা, এই সবের বিরোধ চুরমার করিয়া হিন্দু, পার্শী, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান সকলকেই সমান অধিকার দেয়। দেশের এই নূতন জাতীয়তার কথা নলিনীনাথ এতদিন ভাবিবার সাবকাশ পায় নাই,—নব হিন্দুস্থানের এই নবভাবে হঠাৎ আলোড়িত হইয়া, সে বিমুগ্ধ তন্ময় হইয়া গেল।

"চলুন, মিসেস্ লাবণ্য রোজা হোসেনের সহিত আলাপ করাইয়া দি"—বলিয়া হালদার সাহেব তখন নলিনীনাথকে কার্পেটমণ্ডিত, এরিকা পামে সজ্জিত কাষ্ঠবেদীতে লইয়া গেলেন। যাইতে যাইতে মিসেস্ লাবণ্য রোজা (Rosa) হোসেনের পরিচয় দিতে ভুলিলেন না। ভারতের জাতীয় শক্তির তিনি সমষ্টি, উৎকর্ষ, আদর্শ, আধার। জাতীয়তার উৎকল্পে, দেশের কল্যাণে ফিরিঙ্গীকৃটতা-বিচ্ছেদিত হিন্দু-মুসলমান ভায়ের পুনর্মিলন অভিলাষে, সঙ্কীর্ণ-হৃদয় পিতা মাতার শ্লেষ অভিসম্পাত উল্লঙ্ঘন করিয়া, যৌবনানুরাগ বিসর্জ্জন দিয়া, তিনি পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ নেতা কেরামত আলি হোসেনকে আত্মদান করিয়াছেন। তাঁহারই উৎসাহে আজ হিন্দু তার মুসলমান ভায়ের খালি-

ফতের জন্য অনাহারে উপবাসে প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তাঁহারই শিক্ষায় আজ ফিরিঙ্গী-প্রপীড়িত হিন্দু-মুসলমান নূতন বলে সঞ্জীবীত।

কোমল করমর্দ্দনে থামিয়া নলিনীনাথ দেখিল, বঙ্কিমগ্রীবা হেলাইয়া, মিসেস্ লাবণ্য রোজা হোসেন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতেছে। পরিধান তাঁর বাদামী রেশমী সাড়ী, কিন্তু সে সাড়ীর চপলতা নাই, হীরকখচিত ব্রুচে বিদ্ধ হইয়া, মিসেস্ লাবণ্যের ব্লাউস-স্কার্টমাখা অঙ্গ সজোরে বেষ্টন করিয়াছে। পার্শ্বস্থ একখানি খালি চেয়ারে আহুত হইয়া নলিনীনাথ তথায় বসিল। মিসেস্ লাবণ্যের সহিত অনেক কথা হইল। কি কথা হইয়াছিল, নলিনীনাথের তাহা মনে নাই, আমাদেরও বলেন নাই—কাজেই আমরা জানি না। তবে শুনিতে পাই, নলিনীনাথের মানস-গগন সেদিন বাল্য-পরিচিত জোয়ান অফ-আর্কের ছায়ায় দীপ্ত হইয়াছিল।

সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। প্রথমে গান, সমবেত মহিলাকণ্ঠে লাবণ্য রচিত দেশের গান। তারপর দেশের টোষ্ট—সভাপতি প্রস্তাব করিলেন, মিসেস্ লাবণ্য সমর্থন করিলেন। সকলে দাঁড়াইয়া তাহা অনুমোদন করিল; নলিনীনাথও অবাধে দেশের টোষ্টের মর্য্যাদা রাখিল। তারপর দেশের হিতার্থে, দশের কল্যাণ কামনায়, দলের সম্মানে, ডেলিগেটদের মর্য্যাদায় এইরূপে ক্রমান্বয়ে পরে পরে ষ্টোট চলিল। তারপর হালদার সাহেব বক্তৃতা দিতে উঠিলেন—দেশের দেশীয় বৈরী ধ্বংসার্থে অনেক গর্জ্জাইলেন, দেশের উদ্ধারার্থ অনেক কাঁদিলেন, পরিশেষে জানাইলেন, আলিপুরের উদীয়মান খ্যাতনামা উকিল ভারতের সুসন্তান, বঙ্গের গৌরব শ্রীযুত নলিনীনাথ ঘোষ মহাশয় তাহাদের দলে যোগদান করিয়াছেন। সমবেত করতালিতে সভাগৃহ বধির হইল। তখন হালদার সাহেব প্রস্তাব করিলেন, আগামী কাউন্সিল ইলেক্শানে নলিনীবাবুকে দলের ক্যানডিডেট নির্ব্বাচন করা হউক। মিসেস্ লাবণ্য এ প্রস্তাব সমর্থন করিলেন—নিতাইবাবু তাহা সাগ্রহে অনুমোদন করিলেন—একটুও প্রতিবাদের স্বর শোনা গেল না—সর্ব্বসম্মতিক্রমে নলিনীনাথ দলের ক্যাণ্ডিডেটত্বে বরিত হইল!

লাবণ্য রোজার ইঙ্গিতে নলিনীনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল, কম্পিতস্বরে সমবেত দেশের সকলকে ধন্যবাদ জানাইল, মাতৃভূমিকে এতদিন ভক্তি-কল্পনায় স্থান দেয় নাই বলিয়া নিজেকে ভৎর্সনা করিল, দেশের কি প্রয়োজন

দেশীয়ের কি কর্ত্তব্য, তাহা আজ বুঝিয়াছে বলিয়া লাবাণ্য রোজার কাছে ঋণ স্বীকার করিল, তার পর দেশের ছবি আঁকিতে আঁকিতে অশ্রুতে তাহার নয়ন ভরিয়া গেল।

(৯)

নির্ব্বাচন সংগ্রামের আয়োজনে তিন মাস কাটিয়া গিয়াছে। নলিনীনাথের বাটিতে এখন রোজই দলের বৈঠক বসে। হালদার সাহেব ও নিতাই বাবু একদিনও কামাই দেন না, লাবণ্যও প্রায় আসিয়া থাকে। ইঁহাদের সম্মানার্থ দেশ যজ্ঞের আহুতি দিবার জন্য নলিনীনাথকে বড় হলঘরের টেবিলে স্যাম্পেন, সেরি, ক্লারেট, ব্রাণ্ডি, হুইস্কি আদি নবরত্নকে কাট্-গ্লাসের ডিকেণ্টারে বন্দী করিয়া রাখিতে হইয়াছে—বন্ধন-ক্লেশ লাঘব করিবার জন্য দৈনিক ২।৩ বার তাহাদের অন্যত্র পাঠান হয়। মাঝে মাঝে নলিনীনাথ ভাবিত, তাহাদের মুক্তি দিবে—কিন্তু দেশের অমঙ্গল আশঙ্কায় এবং হালদার সাহেব, নিতাইবাবু ও লাবণ্যের মনোকষ্টের ভয়ে তাহা পারিত না।

লাবণ্য রোজার ঘন ঘন আসা যাওয়াতে পল্লিতে একটা কানাঘুষা চলিতে লাগিল, ক্রমে একটা মিথ্যা কুৎসিত জনরব পুরীতে গিয়া পৌঁছিল। সুহাসিনী তাহা বিশ্বাস করিল না—তখনও প্রত্যহ একবার ডাকঘরে যাইবার অবকাশ নলিনীনাথ করিয়া লইত। ক্রমে ব্যতিক্রম ঘটিতে লাগিল, সন্দেহ কুজ্ঝটিকা সুহাসিনীকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল। সুহাসিনী তবুও সামলাইল, বোধ হয় নলিনীনাথের আড়ালে নিজেকে রক্ষা করিতে পারিত। কিন্তু সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিল, ব্যস্ত নলিনীনাথ আসিতে পারিল না—খবর আসিল, ইলেকশানের পূর্ব্বে কলিকাতা ছাড়া তার পক্ষে অসম্ভব। সুহাসিনীর হৃদয়-দুয়ারে প্রবল ধক্কা লাগিল—মনে করিল, বিন্নুকে লইয়া ফিরিবে, কিন্তু লজ্জায় কিছু বলিতে পারিল না। সেই সময় সিডিশন্ চার্জ্জে কেরামত আলি হোসেন ধৃত হইল। কর্ত্তৃপক্ষ জানাইল, রাজার পক্ষে সাক্ষী দিয়া সব কথা বলিলে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। মুক্তি লাভের আশায় কেরামত আলি অনেক ইতস্ততঃ করিল; কিন্তু লাবণ্য রোজার দৃঢ়তায় বিশ্বাসঘাতকতা পাপ হইতে সে রক্ষা পাইল। নলিনীনাথ চমৎকৃত হইল, লাবণ্যের আদর্শে নিজেকে গঠিতে সুহাসিনীকে লিখিল।

(১০)

ইলেকশানের আর রাত্রিমাত্র বাকী। অধিবাস উপলক্ষে আজ নলিনী-

নাথের বাটীতে একটি ছোট খাট পার্টি। সন্ধ্যার পর ডিনার টেবিল সাজান, তত্ত্বাবধারণ করিতে করিতে নলিনীনাথ শুনিল, কে যেন তাহাকে ডাকিতেছে, দীর্ঘ পরিচিত মধুর কাতর গলায় বলিতেছে "নলিন, কাছে এস।" বাড়ীর ভিতর গিয়া দেখিল, সুহাসিনী নাই। মনে পড়িল, সে এখনও পুরীতে। ডিনার কামরায় ফিরিয়া নলিনীনাথ একখানি চৌকিতে বসিয়া পড়িল, খানসামাকে কি আদেশ দিবে, এমন সময় দেখিল, বিনু ছুটিতে ছুটিতে ঘুমাইয়া পড়িল। নীরব প্রচ্ছন্নতা নলিনীনাথকে ঘিরিয়া ফেলিল! কোন আদেশ না পাইয়া খানসামা এক গেলাস সেরি তাহার সম্মুখে ধরিল, এক চুমুকে নলিনীনাথ তাহা শেষ করিল। কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া নলিনীনাথ সেদিনের কাগজ পড়িতে লাগিল, তারের কলমে দেখিল, প্রবল বসন্ত মহামারি পুরী আক্রমণ করিয়াছে, শ্মশানে স্থান পাওয়া যায় না, প্রত্যহ শত শত লোক মারা যাইতেছে। কাগজ ফেলিয়া নলিনীনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল, সঙ্গে সঙ্গে হালদার সাহেব ও নিতাইবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"বাঃ! এই যে সব ঠিক দেখছি," বলিয়া দুই জনে যুগপৎ দুই গেলাস হুইস্কি উদরস্থ করিলেন। নলিনীনাথ যোগদান করিল না, দেখিয়া নিতাই বাবু বলিলেন,—"আজ এত বিমর্ষ কেন, নলিন?" নলিনীনাথ কোন উত্তর দিল না, চুপ করিয়া আবার বসিয়া পড়িল। "সুলক্ষণ ওয়াটারলুর পূর্ব্বে ওয়েলিংটন এইরূপ চিন্তাকুল হ'ন"—এই কথা বলিয়া হালদার সাহেব একটি বৃহৎ কাঁচের গামলায় সমস্ত বোতল ডিকেণ্টারে ঢালিয়া নবরস মিশ্রিত পাঞ্চ প্রস্তুত করিতে বসিলেন—নলিনীনাথ শূন্যনয়নে তাহা দেখিতে লাগিল।

এমন সময় চাকর আসিয়া নলিনীনাথের হস্তে একখানি তার দিল। হালদার সাহেব ও নিতাইবাবু তখন পাঞ্চ পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছে। নলিনীনাথ তার খুলিয়া পড়িল, "সুহাসিনী, বিনু ও বসন্ত মরিয়াছে। আরও কি লেখা ছিল, নলিনীনাথ তাহা দেখিতে পারিল না, পুরীত্যাগ হইতে আজ অবধি সমস্ত ঘটনাগুলি ঝঞ্ঝার মত তাহাকে আলোড়িত করিল, মনে ধিক্কার আসিল। হঠাৎ উঠিয়া দেয়াশালাই জ্বালাইয়া পাঞ্চের গামলায় ফেলিয়া দিল, পাঞ্চ ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে ডিনার টেবিলও প্রজ্বলিত হইল। "ফায়ার, ফায়ার" বলিয়া হালদার সাহেব ও নিতাইবাবু দ্রুত পলায়ন করিলেন। উন্মত্ত হুতাশনের সাম্‌নে নলিনীনাথ ক্ষণেক স্থির অটলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, পরে অচেতন হইয়া ঘরের মেঝেয় পড়িয়া গেল।

দুই দিন পরে নলিনীনাথের জ্ঞান হইল,—চক্ষু মেলিয়া দেখিল, কে এক শুভ্রবসনা সুন্দরী শিয়রে বসিয়া তাহাকে ব্যজন করিতেছে। নলিনীনাথ ভাবিল, এ কি স্বপ্ন? আবার চক্ষু মুদিয়া তালবৃন্তের বাতাস বেশ অনুভব করিতে পাইল। বুঝিল, স্বপ্ন নয়, সত্য। আবার চাহিল, ঈষৎ ফিরিয়া দেখিল, রমণী অবগুণ্ঠনা। ভাবিল, এ রমণী কে? উঠিবার চেষ্টা করিল, চাপা গলায় রমণী বারণ করিল, বলিল, "ডাক্তার বাবুর নিষেধ আছে।" নলিনীনাথ বিস্মিত হইল,—এ যে সেই স্বর! ঘূর্ণির মত গত কয় মাসের কথাগুলি তার মনের মাঝ দিয়া বহে গেল। ভাবিল, স্বর্গ হ'তে কি সুহাসিনী তাকে তিরস্কার করিতে আসিয়াছে? দুঃখে, ক্ষোভে তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল, সে বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে রমণীর হাতের পাঁখা পড়িয়া গেল, রমণীও অদৃশ্য হইল। নলিনীনাথ আর থাকিতে পারিল না, শয্যায় উঠিয়া বসিল, চারিদিকে চাহিল, কোথাও রমণীকে দেখিতে পাইল না। চিৎকার করিয়া ডাকিল, হাঁসি! হাঁসি! কোথাও উত্তর পাইল না। নলিনীনাথ ক্ষিপ্তপ্রায় হইল, ছুটিয়া বাতায়নে দাঁড়াইল, আকাশের পানে চাহিয়া ডাকিল,—"হাঁসি, হাঁসি! একবার—আর একবার তুমি স্বর্গ হ'তে নেমে এস, আমায় ক্ষমা ভিক্ষা দাও, বল, তুমি আমায় ক্ষমা কর্‌বে। আমি যে বড় অভাগা।" নলিনী আরও কি বলিতে যাইতেছিল,—হঠাৎ তার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, সে পড় পড় হইল, এমন সময় পালঙ্কের পাশ হইতে দ্রুত বাহির হইয়া সুহাসিনী তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। নলিনীনাথ দেখিল, সত্যই হাঁসি, তাকে হৃদয়ে টানিয়া লইল, দুইজনে অনেক ক্ষণ নীরবে অশ্রুমোচন করিল।

তারপর কত কথা হইল, পরস্পরের ব্যথা, দুঃখ, ক্ষোভ, উদ্বেগ, বিরহ কথা যেন ফুরায় না। এই মিলন আলাপে নলিনীনাথ জানিতে পারিল, তাহার শেষ চিঠি পাইয়া হাঁসি ব্যাকুলা হইয়া পড়ে, ৩।৪ দিন গুম্‌রাইয়া লজ্জার মাথা খাইয়া, শেষে মা'র কাছে আব্দার ধ'রে সেই দিনেই ফিরিবে, অগত্যা মেজ দাদা, বসন্তের সহিত প্যাসেঞ্জার ট্রেনে পিতা তাহাকে পাঠাইয়া দেন। ষ্টেশন হইতে নলিনীনাথকে টেলিগ্রাম করা হয়,—"সুহাসিনী, বিনু ও বসন্ত ছাড়িয়াছে, কাল সকালে পৌছিবে।" অনুসন্ধানে পরে জানা গিয়াছে, অহিফেনের মৌতাত তখন সবে মাত্র তার-বাবুকে ধরিয়াছে, তার পাঠানর সময় তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন, বসন্ত কখনও ছাড়িয়া যায় না, কাজেই অফিস ফরমে "ছাড়িয়াছে"র বদলে "মরিয়াছে" লিখিলেন।

নলিনীনাথের অধরে ঈষৎ হাসির রেখা দিল,—সেই সময় লাফাইতে লাফাইতে বিন্নু আসিয়া তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

উচ্ছ্বাস।

(শুক্লা দ্বাদশীতে।)

লেখক,—শ্রীরামসহায় বেদান্ত-শাস্ত্রী।

দেখ, দূরে ঐ নীল নভোমধ্যস্থলে আজিকার দ্বাদশীর চাঁদ কেমন হাসিতেছে! কি মিষ্ট, কোমল, মুগ্ধকারী ঐ হাসি! দেখিয়াছ কি?—আরও দেখ, ঐ শান্ত কোমল গগনতলে—ঐ শান্ত কোমল চাঁদের মত—কেমন শান্ত কোমল—ঐ তারাগুলি! হেথায়—সেথায়—দূরে—দূরে একটী একটী করিয়া সন্নিবিষ্ট; উজ্জ্বল, দীপ্ত, মনোহর! কোন্ মিতব্যয়ী অথচ সূক্ষ্মশোভাজ্ঞানশালী সজ্জাকর আজি আকাশের গায়ে, এমন একটি একটি করিয়া নিপুণভাবে এ রত্ন বসাইল! মরি মরি! কি সুন্দর রে!

বাসন্তী রাত্রিতে দ্বাদশীর চাঁদ গগনমধ্যস্থলে হাসিতেছে। চারিদিক বিজন, স্তব্ধ, উজ্জ্বল, শান্ত। রহিয়া রহিয়া, জুঁই, মালতী, মল্লিকা ও চম্পার গন্ধ লঘু গতি দক্ষিণ বাতাসে ভাসিয়া আসিয়া প্রাণ মাতাইতেছে; রহিয়া রহিয়া এক একটা নিশাচর পক্ষী কণ্ঠস্বরে আপনার গোপন আবাসস্থলের কথা জানাইয়া দিতেছে; রহিয়া রহিয়া, দুই একখানি লঘু মেঘখণ্ড চাঁদের উপর দিয়া শান্ত আকাশের গায়ে প্লবমান দ্বীপের ন্যায় ভাসিয়া যাইতেছে। আকাশে, বাতাসে, ধরণীতে যেন জ্যোৎস্নার বাণ ডাকিয়া গিয়াছে। মহাকায় বৃক্ষের শীর্ষদেশ হইতে ক্ষুদ্র তৃণের সর্ব্বাঙ্গ পর্য্যন্ত আলোকস্পর্শে এই মধ্য-যামিনীতে জাগিয়া উঠিয়াছে; উঠিয়া আলো ও আকাশের সহিত মৌনভাষায় কি বলাবলি করিতেছে। আজ আকাশ ও ধরণী পরস্পর পরস্পরকে ভোগ করিয়া ধন্য হইতেছে। উজ্জ্বল আকাশ, উজ্জ্বলা ধরণী না জানি কোন্ উজ্জ্বলতর নেপথ্য জগতের সূচনা করে! এই বিজন, স্তব্ধ চন্দ্রালোকিত রাত্রে আমার মনে অতীত সুখস্বপ্নের মত ধীরে ধীরে কাহার কথা জাগিয়া উঠিতেছে!

বুঝিয়াছি, সুখের শোভা সন্দর্শনে সুখের স্মৃতি জাগিয়া উঠে। সুখের স্মৃতি জাগিয়া উঠিলে, মন সর্ব্ব সুখের আকর প্রিয়জনের প্রতি ব্যাকুল আগ্রহে ধাবিত হয়; প্রিয়জনকে কাছে আনিয়া, বক্ষে রাখিয়া, সে আপনার সর্ব্বাঙ্গীন সম্পূর্ণতা লাভ করিতে চায়। নহিলে, প্রস্ফুটিত পদ্মরস শরৎ-শোভাবিকসিত চম্পা দেখিয়া রামচন্দ্র কাঁদিয়াছিলেন কেন? নহিলে, মেঘোদয় দেখিলে রাধিকা শ্যামের জন্য কাঁদিতেন কেন? নহিলে এই সুখের রাত্রিতে, এত সুখ ও শোভার মধ্যে বসিয়াও আমি তোমার জন্য কাঁদিব কেন প্রাণাধিক?

এস প্রিয়তম—এস প্রাণাধিক—আজি আকুল হৃদয়ে, কাতর আহ্বানে, যুক্তকরে আমি তোমায় ডাকিতেছি,—তুমি এস। সুদূর উচ্চ হইতে চন্দ্রালোক আসিয়া ধরণীর বক্ষে ধরা দিয়া, যেমন এই শ্যামবসন্ত সুষমাকে উজ্জ্বল ও সুন্দর করিয়াছে, তুমি তোমার উচ্চ হৃদয়ে প্রেমের আলোক লইয়া আমার এই দীন বক্ষে একবার এস—আমাকে উজ্জ্বল কর—আমার তুচ্ছ বিদ্যা, খ্যাতি, রূপ সব মুহূর্ত্তের জন্য সুন্দর ও সার্থক কর। এই দুই বাহুর ডোরে তোমায় বাঁধিয়া এই হৃদয়ের অভ্যন্তরে তোমায় রাখি; রাখিয়া তোমার প্রতি চাহিয়া থাকিতে থাকিতে এই চন্দ্রালোকিত ধরণীর মত নিঃশব্দে ঘুমাইয়া পড়ি। আমার বাহুর উপরে তুমি তোমার শিরোদেশ ন্যস্ত কর, হৃদয়ে হৃদয় সংযোগ করিয়া পরস্পর পরস্পরে মিশিয়া যাই। মরি মরি! কি অপূর্ব্ব রোমাঞ্চকর—অপরূপ রসের সুখ রে!

ভারতে যুবরাজ।

গ্রেট-বৃটনাধিপতি ভারতসম্রাট মহামান্য পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র মান্যবর প্রিন্স এড্‌ওয়ার্ড মহোদয় আগামী শীত ঋতুর প্রারম্ভে ভারতবর্ষে শুভাগমন পূর্ব্বক চিররাজ-ভক্ত ভারতবাসী প্রজাসাধারণকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিবেন ও প্রায় তিনমাস কাল ভারতবর্ষে অবস্থান করিবেন। আমাদের বর্ত্তমান যুবরাজ ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ২৩এ জুন তারিখে ভারত-সাম্রাজ্ঞী মেরীর পিত্রালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতামহ শান্তি-সুহৃৎ নরপতি সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে অকস্মাৎ লোকলীলা সম্বরণ করায়, ১৯১১

(প্রিন্স-অব-ওয়েলস্।)

খৃষ্টাব্দের দ্বাবিংশ দিবসে পিতা বর্ত্তমান ভারতসম্রাট রাজ-সিংহাসনে অধিরোহণ করিলে পর, যুবরাজ তাঁহার জন্মদিবস উপলক্ষে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার প্রাসাদে প্রিন্স-অব-ওয়েলস্ উপাধি গ্রহণ করিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন; ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই তারিখে খাস ওয়েলস প্রদেশের কারণারভন প্রাসাদে যৌব্যরাজ্যের অভিষেক-মহামহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে, ভারত সম্রাট ও ভারত সাম্রাজ্ঞী রাজপরিবারবর্গ, প্রধান মন্ত্রী মিঃ আস্‌কুইথ, রাজস্ব সচীব লয়েড্ জর্জ্জ এবং বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ এই অভিষেক সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। এই মাঙ্গলিক মহোৎসবে আনন্দিত হইয়া ইংলণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন সভাসমিতি হইতে যুবরাজকে কয়েকখানি অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হইয়াছিল, যুবরাজ সেই সকল অভিনন্দন-পত্রের উত্তরে বলিয়াছিলেন, "আমার বয়ঃক্রম সপ্তদশ বর্ষ মাত্র। পরম শ্রদ্ধাস্পদ জনক-জননীর উপদেশমতেই আমি কার্য্য করিতেছি, চিরজীবন তাঁহাদের উপদেশানুসারেই কার্য্য করিব।"

পিতৃ-মাতৃভক্ত যুবরাজের এই উদার অঙ্গীকার বস্তুতই সর্ব্বতোভাবেই শ্লাঘনীয়।

বর্ত্তমান ১৯২০ সালের জুন মাসে, যুবরাজ ষড়বিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। সস্ত্রীক যুবরাজ ভারতবর্ষে শুভাগমন করিলে ভারতবাসীর অধিকতর প্রীতিপ্রদ হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ঐক্ষণে আমরা ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সুস্থদেহে যুবরাজ ভারতে শুভাগমন করিয়া ভারতবাসীর অভিলাষ পূর্ণ করুন।

সে।

লেখক,—শ্রীদেবকণ্ঠ বাগ্‌চী সরস্বতী।

এক সায়াহ্ন বেলা—
মম হৃদয়-মুকুরে পড়েছিল তার ছায়া,
করেছিনু তারে হেলা—
মম অগোচরে তার ছায়া ধরেছিল কায়া,
এ হৃদে করিতে খেলা!

নিশাকালে আনমনে,
আমি আপনার ভাবে ছিলাম আপনা হারা,
নিমেষহীন নয়নে—
শুধু নিরালয়ে বসি গণিয়াছিলাম তারা,
চাহিয়া নীল গগনে!

দেখি পরদিন প্রাতে—
সে যে আমার মরমে রচেছে কঠিন কারা,
আমি বাঁধা আছি তাতে—
মোর নয়নে বহিছে কাতর সলিল-ধারা—
সে দেখে হাসে তফাতে!

রমণী।

সে চায় আমারে—কিবা আমি তারে চাই,
এই ভাবি ভাবি মোর কাটে নিশিদিন!
আমার সমান মূঢ় আর কেহ নাই,
সুখের আশ্বাসে সেধে হই পরাধীন!
তার কতখানি আমি করেছি দখল,
সে আছে জুড়িয়া বসি আমার হৃদয়—
অমৃত গঠিত পাত্রে রাখিয়া গরল,
চাহে পিয়াইতে মোরে—হায় কি নির্দ্দয়!
সরলা বলিয়া নারী কহে এ সংসারে,
কোথা হায় সরলতা! গড়া দিয়া ছল—
নিমেষে বাঁচায় পুন নিমেষেই মারে!
বিধিও বুঝিতে নারে নারীর কৌশল!
আদিতে রমণী খেলি প্রলোভন খেল—
পতিত করেছে নরে—বলে বাইবেল!

অবুঝ।

পাব না তাহারে ব'লে আমি মোর মনে
বুঝায়েছি কত দিন। কিন্তু মম মন
শোনে নি সান্ত্বনা-বাণী—আমার গোপনে
আজো কয়ে হায় তার চিন্তা সর্ব্বক্ষণ!
থাকিতে সে চাহে ভাল সতত বিরলে,
লোকালয়ে ঢাকে মুখ দিয়া সে বসন,
ভিতরে ভিতরে আঁখিভরে যায় জলে—
নাসিকায় দীর্ঘশ্বাস জীর্ণ পুরাতন!
দিন দিন রবি-তাপে শুষ্ক সরসীতে
দিন দিন শুষ্ক হয় যথা কুবলয়—

মরমের তাপে ক্রমে দহিতে দহিতে
দিন দিন শুকাইয়া গেল এ হৃদয়!
সকল সান্ত্বনা মোর হইল বিফল,
আপন ছায়ায় হয় কে কবে শীতল।

মানব।

ধরণীর শ্রেষ্ঠজীব হে মানব তুমি,
মস্তিষ্ক-তীক্ষ্ণতা তব ভুবনে বিদিত!
আফ্রিকার প্রাণহর সেই মরুভূমি,
খনিয়া হরেছ হীরা—হও নাই ভীত!
যেই স্থান মানুষের অতীব দুর্গম,
অন্বেষিয়া সে আঁধার মহা সিন্ধুতল—
হরিয়া এনেছ তুমি মণি অনুপম,
দেবতা-দুর্লভ তব আশ্চর্য্য কৌশল!
ক্ষিপ্ত ধূমকেতু কবে উদিবে আকাশে,
কখন ঘটিবে রবি-শশীর গ্রহণ—
গণিয়া দিতেছ তুমি তাহা অনায়াসে,
ধন্য বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান ধন্য সে গণন!
মৃত্যুপরে এ ধরার যদি কোন বিত্ত—
হ'রে নিয়ে যেতে পার—বুঝিব কৃতিত্ব!

সমালোচনা।

বৃহৎ রাশিজ্ঞান দীপিকা ও বৃহৎ চিকিৎসাতত্ত্ব বারিধি। (ষষ্ঠ সংস্করণ)

কুষ্ঠাদি চর্ম্মরোগ-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ শর্ম্মা কবিরঞ্জন এম, ডি, এইচ, আই, ঐ, এস্ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। মূল্য ৩৷৷০ টাকা। পরিশিষ্ট খণ্ডের মূল্য ১৷৷৵০ আনা মাত্র।

গলিতকুষ্ঠ, বাতরক্ত, পারদদোষ এবং ধবলাদি চর্ম্মরোগ চিকিৎসায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিরঞ্জন মহাশয়, এই সকল পীড়ার কারণ ও প্রতিকারের উপায়

সম্বন্ধে এই পুস্তকে আলোচনা করিয়াছেন। আলোচ্য বিষয়ের বিশ্লেষণে তাঁহার চর্ম্মরোগ-চিকিৎসক সুনাম জন-সমাজে সুবিদিত। ব্রহ্মচর্য্য ও সংযম-হীনতার এই দারুণ দুর্দ্দিনে, সংযম ও স্বাস্থ্যরক্ষার সদুপদেশ সকল বিশ্লেষণ করিয়া দিয়া সমাজের একটা মহদুপকার সাধনের সম্ভাবনা সংঘটন করিয়াছেন। জ্যোতিষসম্বন্ধে যে সকল তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন, যাঁহারা জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই, তাঁহারাও অনায়াসে এই পুস্তকের সাহায্যে জ্যোতিষ সম্বন্ধে স্বাস্থ্যরক্ষার যাবতীয় তথ্য জ্ঞাত হইবেন। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা পরম প্রীতিলাভ করিলাম।

নববিভাকর পঞ্জিকা ও ডাইরেক্টরী (সন ১৩২৭ সাল।)

হাওড়া কদমতলাস্থ শম্ভুচন্দ্র চতুষ্পাঠী হইতে প্রকাশিত।

বর্ত্তমান বৎসরের এই নামধেয় নূতন পঞ্জিকা আমরা একখণ্ড উপহার পাইয়াছি। বঙ্গদেশের সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত অধ্যাপকমণ্ডলী এই পঞ্জিকার গণনা, জ্যোতিষস্মৃতি-শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবস্থা বিধি সকল অনুমোদন করিয়াছেন। এই পঞ্জিকায় বহু নূতন প্রয়োজনীয় বিষয় সন্নিবেশিত করা হইয়াছে; প্রথমেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণাশ্রিত বিশ্ববিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দের চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা আশা করি, স্বধর্ম্মানুরাগী মহোদয়গণের নিকট নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য এই নূতন পঞ্জিকাখানি সমাদরে ব্যবহৃত হইবে। এই পঞ্জিকার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

স্নেহাশীস্।—

শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন বসু প্রণীত। গ্রন্থকার তাঁহার কন্যা শ্রীমতী অমিয়বালার শুভ-বিবাহে কন্যা ও জামাতাকে স্বস্তিবাচন করিয়া পতি-পত্নীর জীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে কয়েকটী সুন্দর হৃদয়গ্রাহী উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই এই ক্ষুদ্র পুস্তকে বিবৃত করিয়াছেন। পুস্তকের ভূমিকায় বঙ্গের শিক্ষিত সমাজের নেতা প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম-এ, বি-এল, মহাশয় গ্রন্থকারের সঙ্কলিত উপদেশগুলির সার্থকতার অনুমোদন করিয়াছেন। যুবক যুবতীগণ "স্নেহাশীস্" পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

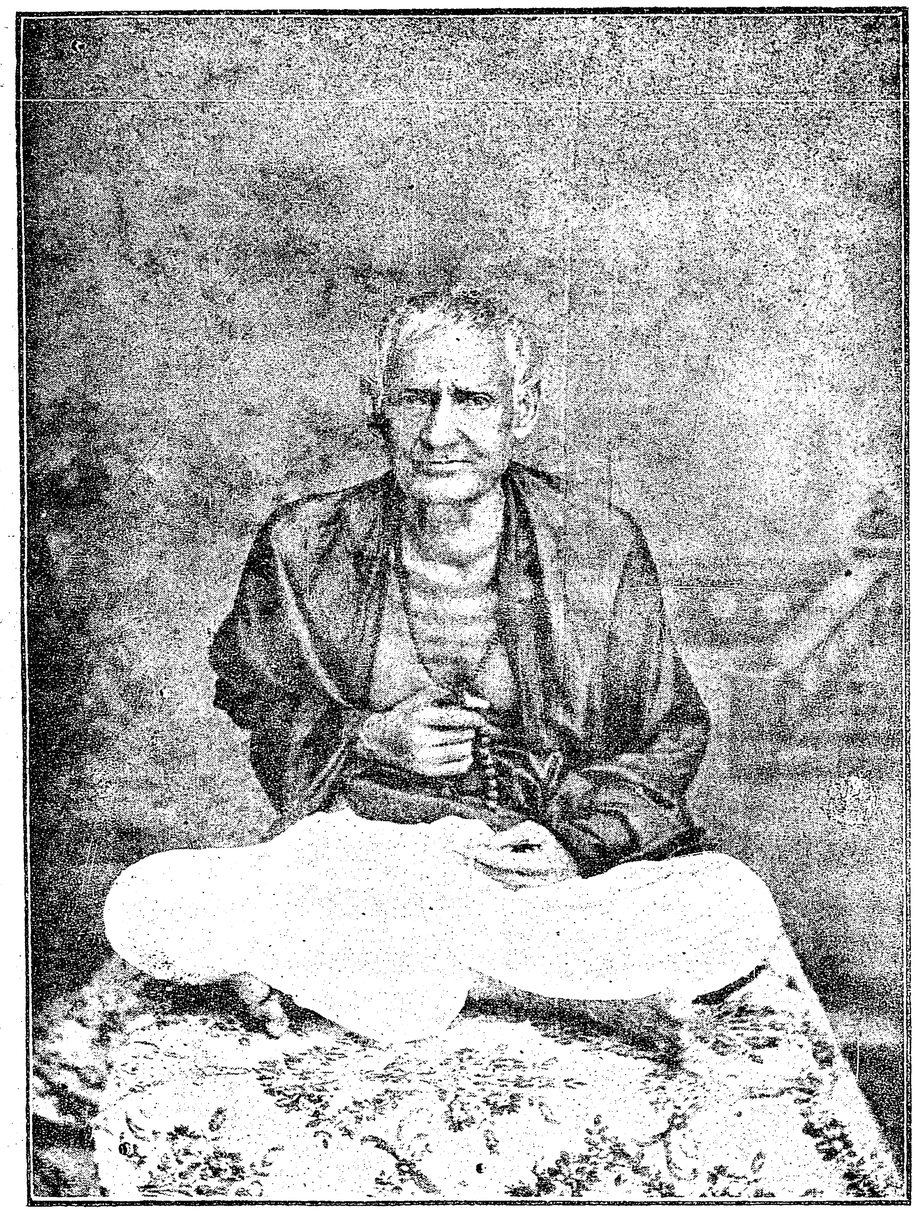

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

জন্মভূমি

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

২৬শ বর্ষ। | ১৩২৭ সাল, জ্যৈষ্ঠ। | ২য়, সংখ্যা।

ডবাকের সংস্থান

লেখক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্তের দিগ্‌বিজয়ের কথা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত অনূ্যন ৩৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতৃদেবের বিপুল প্রতাপদ্যোতক এক বিস্তৃত প্রস্তরলিপির প্রচার করেন। কবি হরিষেণ এই স্তম্ভলিপির রচয়িতা। এই লিপিতে ৩২টী ছত্র আছে। তন্মধ্যে প্রথম ১৬টী পংক্তি কবিতায় লিখিত, অবশিষ্ট পংক্তি কয়টী গদ্যে ক্ষোদিত। এই প্রয়াগ-স্তম্ভলিপির দ্বাবিংশ পঙ্‌ক্তির পাঠ এইরূপ—

"সমতট—ডবাক—কামরূপ—নেপাল—কর্ত্তৃপুরাদি প্রত্যন্তনৃপতিভির্ম্মালবার্জুনায়ন যৌধেয়মাদ্রক আভীর প্রার্জুনসমকানীক কাক খরপরিকাদিভিশ্চ সর্ব্বকরদানাজ্ঞাকরণ প্রণামাগমন"

এই ছত্র হইতে স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে, সমতট, ডবাক, কামরূপ, নেপাল, কর্ত্তৃপুর প্রভৃতি প্রত্যন্ত প্রদেশের নৃপতিগণ সমুদ্রগুপ্তকে কর প্রদান করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা 'ডবাক" কোথায় সংস্থিত ছিল তাহারই আলোচনা করিব।

প্রথমেই আমাদের একটা বিষয় স্থির করিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। সমুদ্রগুপ্ত সমতট, ডবাক প্রভৃতি স্থান কিরূপে বশীভূত করিয়া-

ছিলেন? প্রথমে সমতট, তারপর ডবাক, তারপর কামরূপ, অতঃপর নেপাল, তৎপরে কর্ত্তৃপুর এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে দেশগুলিকে বশে আনিয়াছিলেন, অথবা এই দেশগুলি পর্য্যায়ক্রমে একের পর অপরটী বিজিত হয় নাই। ইহাদের পরম্পরা নিরর্থক। যদি দ্বাবিংশ ছত্রটী কবিতায় অঙ্কিত থাকিত, তাহা হইলে বরং আমাদের এরূপ অনুমানের অবসর থাকিলেও থাকিতে পারিত। কিন্তু যখন ইহা গদ্যে লিখিত, তখন এরূপ কল্পনা করিতে যাই কেন? বিশেষতঃ আমরা দেখাইব যে, এই প্রত্যন্ত দেশগুলি প্রায় পরস্পর সংলগ্ন এবং সমুদ্রগুপ্তের পক্ষে পর্য্যায়ক্রমে একের পর অন্যটীতে গমন করা স্বাভাবিক।

প্রথমেই সমুদ্রগুপ্তকে যদি সমতটে আসিতে হয়, তাহা হইলে তিনি কোথায় আসিবেন? যূয়ন-চুয়ঙ্ সমতটের যে বিবরণ দিয়াছেন, তদনুসারে বিশেষ সতর্কতার সহিত বিচার করিয়া দেখিলে বুঝি যে, সমতট উত্তরে ও পূর্ব্বে গারো ও খাসি পাহাড় এবং ত্রিপুরা পর্ব্বত দ্বারা বেষ্টিত, ইহার পশ্চিম সীমা লৌহিত্য বা প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র নদ এবং দক্ষিণ সীমা বঙ্গোপসাগর; সুতরাং ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্বস্থিত বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জেলার পূর্ব্বার্দ্ধ শ্রীহট্টের অধিকাংশভাগ এবং সম্পূর্ণ ত্রিপুরা ও নোয়াখালি জেলা সমতটের অন্তর্ভূত ছিল। আমাদের বন্ধু শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় বিশেষ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। ঢাকা রিভিউ Feb. ও March 1918 সংখ্যা দ্রষ্টব্য। এই সমতট যে প্রত্যন্ত প্রদেশ, তৎসম্বন্ধে সন্দেহই থাকিতে পারে না। তাহার পরেই ডবাক। ডবাকের পর প্রত্যন্ত প্রদেশ হইতেছে কামরূপ। বর্ত্তমান আসাম, ভূটান, পশ্চিমে করতোয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত উত্তর-বঙ্গ, প্রাচীন ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ময়মনসিংহের কিয়দংশ—১৭০০ মাইল বিস্তৃত এই ভূভাগ প্রাচীনকালে কামরূপ বলিয়া পরিচিত ছিল। যূয়ন-চুয়ঙের বিবরণের সহিত ইহার অনৈক্য নাই। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ সকলেই উল্লিখিত স্থানগুলিকে কামরূপের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সমতট অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত কামরূপে যাইবার পূর্ব্বে যে প্রত্যন্ত ভূমি পার হইয়া যাইতে হয়, তাহারই নাম 'ডবাক' হওয়া উচিত। সমতট ও কামরূপ এই উভয় ভূমির মধ্যে যে প্রত্যন্ত প্রদেশ পড়িতেছে, তাহাই ডবাক। ডবাক পশ্চিমে কাছাড়, জয়ন্তিয়া পাহাড় ও কপিলি নদী দ্বারা বেষ্টিত, দক্ষিণে মণিপুর এবং

পূর্ব্বে ইরাবতী নদী দ্বারা বেষ্টিত। ইহার উত্তরাংশ পর্ব্বত ও নদী বেষ্টন করিয়া আছে। এই ভূভাগ সমুদ্রগুপ্তের সময়ে ডবাক নামে যে পরিচিত ছিল এরূপ মনে করিবার আমাদের যথেষ্ট কারণ আছে। সম্প্রতি আমি নওগঙ্ জেলা হইয়া কপিলি নদীর আশপাশ দেখিতে গিয়াছিলাম। কপিলি নদীর পূর্ব্বদিকে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া একটী স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই স্থানটীর নাম অদ্যাপি ডবক। আজকালকার মানচিত্রেও আপনারা ঐ স্থানটিকে ডোবোক (Doboka) নামে অভিহিত দেখিবেন। বর্ত্তমানকালে এইখানের কয়েক ক্রোশব্যাপী স্থান ডবক নামে পরিচিত আছে বটে, কিন্তু আমি বহুদূর গিয়া পাহাড়িয়াদের নিকটে স্থানীয় জঙ্গলময় পাহাড়িয়া স্থানকে ডবক নামে পরিচয় দিতে শুনিয়াছি। এইরূপ শুনিবার পর এই স্থানটি সমুদ্রগুপ্তের লিপির 'ডবাক' হইতে পারে মনে করিয়া পরে এ সম্বন্ধে আলোচনা করি।

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে টলেমী আমাদের নির্দ্দিষ্ট এই অঞ্চল ও উত্তর বর্ম্মার কিয়দংশকে Dabasaiদিগের দেশ বলিয়া তাঁহার ভূগোলে স্থান দিয়াছেন। টলেমীর মতে Dabasai জাতির দেশ ভারতের উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলে অবস্থিত। Chindwin ও ইরাবতী নদীর সঙ্গমস্থলের উত্তরদিকের ভূখণ্ড যে Dabasai-দিগের দেশ তাহা য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণও স্বীকার করেন। তবে আমরা ইহাকে পশ্চিমে বর্ত্তমান ডবক পর্য্যন্ত টানিয়া আনিয়াছি। ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত Hervey ও Gerini বলেন, Daba বা Dabassa হইতেছে Dabasai দিগের দেশ। পূর্ব্বভারতের ভাষার রীত্যনুসারে দ-কার ল-কারে এবং বর্গীয় ব অন্তঃস্থা বকারে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। চৈনিক ঐতিহাসিকগণ বলেন, খৃষ্টীয় ১ম শতক হইতে "লাউ" নামক চীনজাতি পশ্চিম Yunnan অধিকার করিয়াছিল। ইহারা চৈনিক আধিপাত্য বিস্তার করিবার জন্য এইখানে Ai-Lan ও Po-nan, নামক দুইটী সাম্রাজ্য স্থাপন করে। ভাষাতত্ত্বহিসাবে লাউ, লাব, দাব বা দব পরস্পর সম্পর্কশূন্য না হইতে পারে। Ma Tuan-lin (p. 190) বলেন, Ai-Lan পশ্চিমে Kia-to পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই Kiato—Mo-ka-to বা মগধদেশ। Gerini বলেন—

If we take Kia-to and Mo-ka-to to be indentical and to refer both to Magadha, there is nothing extraordinary in the statement as to the Ai-Lan bordering upon the Magadha

kingdom, So long as we consider Davaka as part of the Ai-Lan territory. The proof is supplied to us in Samudragupta's inscription···where Davaka is mentioned not only as a frontier country of that monarch's dominions, but also as a tributary state. The dependence further results from the fact of the Gupta era being employed at least upon one Sanskrit insription which was found at Pagan, dated Gupta Samvat 163 (A.D. 481). There are besides numerous tradition of princes from Magadh having emigrated to U Burma, western Yunnan and Laos, where they founded dyuasties several centuries previous to Samudra Gupta's period, and built temples amongst the ruins of which Tablets bearing inscriptions in Gupta characters are still to be found. Then we have from Chinese writers the statement as regards the intercourse of the Ai-Lao country with the next, to further confirm the close relations of Dava or Davaka with Magadha. All these data.....are perfectly consistent mutually corroborate themselves." P 60—61.

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী ও তৎপরবর্ত্তী কাল হইতে আরবদেশীয় পর্য্যাটক ও ভৌগোলিকগণ 'তফোক' বা 'তাফন্' নামে ভারতের উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলের একটী দেশের নাম করিয়াছেন। অলমসৌদী বলেন, তফোক পরাক্রান্ত বলহরা-রাজ্যের ও রোহ্‌মী রাজ্যের সীমান্তে পর্ব্বত সমূহের মধ্যে অবস্থিত। রোহ্‌মী বলিলে রহমন্ বা রামঞ্‌ঞ অর্থাৎ পেগু ও আরাকান্ দেশকে বুঝায়। সুতরাং তফোক ও ডবাক এক, একথা বলা যাইতে পারে।

শানজাতিদিগের ইতিকথায় ১২২৮ খৃষ্টাব্দে ইহা 'ত-বি' বা 'ত-বৈ' নামে কথিত হইয়াছে।

চীন মহাকোষ গ্রন্থ—Tu-Shu-chi-chieng আমাদের নির্দ্দিষ্ট ডবাক নামক স্থানকে Mo-gaung নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহার মতে Mo-gaungএর পূর্ব্বে Ta-gaung এবং পশ্চিমে No-gaung, Mo-gaung শব্দের অর্থ মধ্যারণ্য-প্রদেশ। বর্ম্মায় আবিষ্কৃত Po-Daung

লিপিতে Mo-gaung বা Mohnyin দেশের নাম আড়বী দেওয়া হইয়াছে। আড়বীর সংস্কৃত আকার আটবী। অটবী শব্দের অর্থ অরণ্য—বন। দব শব্দের অর্থও তাই। কখন কখন আড়বী এই নাম Chieng Rung রাজ্য বুঝাইতে ব্যবহৃত হইত। সুতরাং আড়বী এক সময়ে যে মধ্যবর্ত্তী সমস্ত প্রদেশই বুঝাইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। ডবাক শব্দের অর্থও "অরণ্য প্রদেশ"। পশ্চিম-ভারতে আটবী বা আড়বী নামে একটী যবন দেশের কথা বৌদ্ধদিগের গ্রন্থে পাওয়া যায়। ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলে ঐরূপ নামে রাজ্য স্থাপন এ অঞ্চলের ইতিহাসে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা পশ্চিম বা উত্তর অথবা দক্ষিণ ভারত হইতে আসিয়া উপনিবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা তৎপ্রদেশের নামগুলিও বজায় রাখিয়াছেন। Parker China Reviewতে এরূপ বহুদৃষ্টান্ত দিয়াছেন। Hanদিগের সময় হইতে চীন লেখকগণ উত্তর বর্ম্মা বা ইহার অংশবিশেষকে "Tu-po" বা She-p'o নামে অভিহিত করিয়াছেন। চীন অক্ষরের প্রাচীন উচ্চারণ Canton বা Annam-বাসীদিগের উচ্চারণে অদ্যাপি সংরক্ষিত আছে। আনাম-দেশীয় উচ্চারণে ইহা Da-ba, Du-bo বা Hsa-ba. Journal Asiatiqueএর একটী চাম লিপিতে পাওয়া যায়, "পুকাম, শ্যাম, দক্ষম, মরই, মন।"

বৃহৎ-সংহিতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ভারতের উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলের একটী প্রদেশের নাম "দর্বী" দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বে এবং বিষ্ণুপুরাণের ২য় অংশের তৃতীয় অধ্যায়ে "দর্বী" নামে একটী দেশের নাম আছে। মহাভারতে দর্বী নামে একটী জাতিরও উল্লেখ আছে। ডবাক ও দর্বী এক হওয়া বিচিত্র নয়।*

সমুদ্রগুপ্ত এই ডবাকের পর কামরূপ, তৎপরে নেপাল এবং তারপর কর্ত্তৃপুর অর্থাৎ আলমোরা, গারওয়াল ও কুমাউন প্রদেশ জয় করেন।

সমুদ্রগুপ্তের দিগ্‌বিজয়ে দেশের নামের ক্রম ভঙ্গ না করিলে আমরা ডবাক বলিলে পূর্ব্বোক্ত সংস্থান বুঝিব।

Fleet সাহেব লিখিয়াছেন—Davaka a country perhaps the modern Dacca. (Daka)—V-A. Smith. তাহা অগ্রাহ্য করিয়া আধুনিক রাজসাহী বিভাগকে ডবাক রাজ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

* জেরিনির গ্রন্থ হইতে পূর্ব্বোল্লিখিত যুক্তিগুলি গ্রহণ করিয়াছি।

ষ্টেপ্‌লটন সাহেব বলেন, "ব্রহ্মপুত্র নদ গারো পর্ব্বতের যে স্থান হইতে মোড় ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে, তথা হইতে দক্ষিণে সাহাবাজপুরের উত্তরাংশস্থিত গঙ্গা ও মেঘনার প্রাচীন সঙ্গমস্থল এবং গঙ্গাতীরবর্ত্তী গৌড়নগরী হইতে উক্ত সংযোগস্থান পর্য্যন্ত সমুদয় ভূভাগই ডবাক রাজ্য বলিয়া কথিত হইত।" ইঁহাদের মধ্যে কেহ কোনরূপ যুক্তি প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহারা কেবল নিজমতই প্রকাশ করিয়াছেন। ঢাকার ইতিহাসে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় ষ্টেপ্‌লটনের উক্তির সমালোচনাচ্ছলে বলিয়াছেন যে, ষ্টেপ্‌লটন বঙ্গ ও ডবাক অভিন্ন বলিয়া মনে করেন! কিন্তু তাহা হইলে একই সময় ডবাক ও সমতট দুইটী পৃথক্ রাজ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইবার কারণ কি?" ইহার পর তিনি বলেন যে, সমতট ও ডবাক এই উভয় নাম পাশাপাশি থাকায় আধুনিক ঢাকাই ডবাক রাজ্য! কিন্তু এই সমস্ত মতই অগ্রাহ্য।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

মুগ্ধ।

(গল্প।)

লেখক—পণ্ডিত শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

(১)

সে ছিল এক কুম্ভকারের ছেলে। কৃষ্ণনগরের ধারে রাজীবপুরে তাহার বাস; শৈশবে মাতৃহীন বলিয়া পিতা আদর করিয়া তাকে মনোমোহন বলিয়া ডাকিত—সে সেই নামেই পরিচিত। মাটীর দেব-দেবীর মূর্ত্তি তৈয়ারী করাই তাহার পিতার কাজ ছিল। যথাসময়ে পিতা তাহাকে প্রতিমা গঠনে নিযুক্ত করিল, কিন্তু মনোমোহনের অবাধ্য মন ব'ড়ে পাকাইয়া, মাটী ছানিয়া, পরিশ্রম করিয়া, সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া, তোলাকে মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই মনে করিতে পারিত না। সুবিধা পাইলেই সে পলাইয়া গিয়া নদীর ধারে বসিয়া প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইত, বিহঙ্গের মধুর কাকলীর মধ্যে সে আপনাকে হারাইয়া ফেলিত। রবির শেষ রশ্মিটুকু কখন যে মুছিয়া যাইত, তাহা সে জানিতেই পারিত না। রাত্রিকালে যখন সে উদাস মনে বাড়ী ফিরিয়া আসিত, তখন পিতার তিরস্কারে তাহার চমক

ভাঙ্গিত; কিন্তু কিছুতেই যখন তাহার মন-প্রতিমা গঠনে নিযুক্ত হইল না, তখন তার পিতা হাল ছাড়িয়া দিল—মনোমোহনও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

(২)

সেদিন বাসন্তী সন্ধ্যায় ভাববিহ্বল মনোমোহন নদীর ধারে পদচারণা করিয়া বেড়াইতেছিল। সহসা একটি বালিকার প্রতি মনোমোহনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। বালিকা একাকিনী ঘাটে জল লইতে আসিয়াছিল। অস্ত গমনোন্মুখ সূর্য্যের সোণালী কিরণ তাহার মুখের উপর পড়িয়া মুখখানি তার আরও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার হাসিভরা মুখ, চঞ্চল চাহনি, মনোমোহনের বড় ভাল লাগিল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের উপাসক মনোমোহন আজ সমস্ত সৌন্দর্য্য তুচ্ছ করিয়া এই বালিকার সৌন্দর্য্যটুকুই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল। ক্রমে তাহাকে ছাড়াইয়া বালিকা ঘন-পল্লব-বেষ্টিত বৃক্ষের অন্তরালে অদৃশ্য হইল—সেও একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাটী অভিমুখে অগ্রসর হইল।

(৩)

পরদিন হইতে মনোমোহন তাহার পিতার নিকট প্রতিমা নির্ম্মাণের ইচ্ছা প্রকাশ করিল। বৃদ্ধ রামধন পুত্রের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কোনই কারণ খুঁজিয়া পাইল না। দেখিতে দেখিতে ছয় মাস অতীত হইয়া গেল, এই অল্প দিনের মধ্যে মনোমোহন প্রতিমা নির্ম্মাণে বেশ দক্ষতা লাভ করিয়াছে, সে এখন ভগবতী, দুর্গা, সরস্বতীর সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুচারুরূপে গড়িতে পারে। পুত্রের এই অপ্রত্যাশিত উন্নতিতে পিতা মনে মনে গর্ব্ব করিতে লাগিল। নবীন উৎসাহে পুত্রকে নূতন নূতন শিক্ষা দিতে লাগিল—মেধাবী মনোমোহনও অল্প সময়ের মধ্যে সেগুলি আয়ত্ত করিতে লাগিল। এইরূপে আরও ছয় মাস কাটিয়া গেল, মনোমোহন এখন একজন পাকা কুম্ভকার।

(৪)

মনোমোহন প্রত্যহই নদীতীরস্থ পথে দাঁড়াইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে যেন কাহার অনুসন্ধান করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। সহসা দূরে কোন রমণীমূর্ত্তি দেখিলে তাহার প্রাণ পুলকে নাচিয়া উঠে, শরীর কণ্টকিত হয়, সে আলকনেত্রে যেন কাহার আগমন প্রতীক্ষা করে। বালিকা নিকটে আসিলে উৎসুক চক্ষের চঞ্চল দৃষ্টি তাহার মুখের উপর স্থাপিত হইত, আবার চারিচক্ষু মিলিত

হইলে, লজ্জিত মনোমোহন চোখ নামাইয়া লইত। বালিকা যখন তাহাকে অতিক্রম করিয়া যাইত, একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মনোমোহন নদীর ধারে আসিয়া বসিত। সে মনে মনে বলিত, এ আমার কি হইল! বড় ঘরের মেয়ে সে, সামান্য গৃহস্থের ছেলে আমি! অসম্ভব তার সহিত আমার মিলন; লোকে শুনিলে হাসিবে, বিদ্রুপ করিবে! মনকে এখন হইতে সংযত করিতে হইবে। কিন্তু তাহার সুন্দর মুখ হৃদয়ের পটে যে গভীর ছাপ মারিয়া দিয়াছে তাহা ত সহজে মুছিয়া যাইবে না। ভাবিতে ভাবিতে তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিত। অশান্ত উত্তেজিত কণ্ঠে মনোমোহন বলিয়া উঠিত, "সে ব্রাহ্মণ কন্যা, আমি দরিদ্র কুম্ভকার! অসম্ভব আমাদের মিলন, তবু তাহার স্মৃতি আমি ছাড়িব না, তাহাকে ভুলিয়া যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব! তাহাকে হৃদয়ের নিভৃত মন্দিরে বসাইয়া দেবীর মত পূজা করিব।" এইরূপ ভালবাসার বুকভরা ব্যথা লইয়া সে নিত্য বাটী ফিরিত।

মনোমোহনকে এখন আর নদীর ধারে দেখা যায় না—পিতার কুম্ভশালায়ও এখন আর সে যায় না। আপনার শয়নকক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া সে আজ কিছুদিন হইতে একটি মৃণ্ময়-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে ব্যস্ত। প্রতিমা নির্ম্মাণে সে এত তন্ময় যে, আহার নিদ্রার কথাও সে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে। মনোমোহন নদীর ধারে যাওয়া বন্ধ করিয়াছে, কিন্তু সেই বালিকাটি প্রত্যহই সন্ধ্যার প্রাক্কালে একাকিনী নদীতে যায়। উৎসুক বালিকা সমস্ত পথটা তাহার ডাগর ডাগর চোখদুটি দিয়া তাকাইতে তাকাইতে যায়, কিন্তু সে সতৃষ্ণনয়ন যাহার দর্শন অভিলাষে ঘুরে তাহাকে সে দেখিতে পায় না। কতক্ষণ নদীর জলে মিছামিছি অপেক্ষা করিয়া বিরসমুখে বালিকা গৃহে ফিরিয়া যায়।

(৫)

পাঁচ মাস অক্লান্ত পরিশ্রমের পর মনোমোহন তাহার মানসী প্রতিমাখানিকে গড়িয়া তুলিয়াছে। এত দিন যে ছবিখানিকে সে হৃদয়ের নিভৃতকোণে লুকাইয়া রাখিয়া আরাধনা করিতেছিল, এতদিন পরে সে তাহাকে রং চং দিয়া বহির্জগতে চক্ষুর সম্মুখে স্থাপিত করিয়াছে। সে দিনরাত কেবল প্রতিমাখানিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখে—প্রতিমাখানি তাহার মানসকল্পিত জীবন্ত প্রতিমার সহিত মিলিয়াছে কি না! এই দীর্ঘ পাঁচ মাস মনোমোহন আহার নিদ্রা ভুলিয়া শুধু প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছে, আজ সে

একটু হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল—এতদিনে তাহার একটু স্বস্তিবোধ হইল। দীর্ঘ পাঁচ মাস পরে মনোমোহন নদীর ধারে বেড়াইতে গেল। যে পথ দিয়া সেই বালিকাটি জল লইতে আসিত, তৃষিতনয়নে সেই পথের দিকে তাকাইয়া রহিল; ক্রমে দিনমণি সোনার পাখা মেলিয়া উধাও হইয়া উড়িয়া গেলেন, সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকার গোধূলির ললাটের সিঁদুরবিন্দুটুকু মুছিয়া দিল; ভগ্ন-মনোরথ মনোমোহন একটা বুকভরা নিশ্বাস ফেলিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল। পরদিন মনোমোহন আবার নদীর ধারে বেড়াইতে গেল। প্রত্যহ যে স্থানে সে দাঁড়াইয়া থাকে, সেই স্থানে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া তাহার উদাস দৃষ্টিপথের শেষ সীমা পর্য্যন্ত ছুটাইয়া দিল। ঐ বুঝি বালিকা আসিতেছে। যতদূর দৃষ্টি চলে, মনোমোহন তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, তখনই তাহার মুখে নিরাশার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার ছায়া আসিয়া বসুন্ধরার মুখ আবৃত করিল—ভগ্ন-হৃদয় মনোমোহনও ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরিল। এই ভাবে দীর্ঘ দুই মাস কাটিয়া গেল। বালিকার দর্শন আশায় মনোমোহন প্রতিদিন নদীর তীরে যাইয়া উদ্‌গ্রীব চোখে একদৃষ্টে সেই পথের দিকে তাকাইয়া থাকে। যতক্ষণ ঘনান্ধকারে বৃক্ষপল্লবরাজি আবৃত না হয়, আর আকাশে দুই একটি ক্ষুদ্র তারকা উঠিয়া তাহাকে বিদ্রূপ না করে, মুগ্ধ মনোমোহন ততক্ষণ একদৃষ্টে সেই পথের দিকে তাকাইয়া থাকে। তারপর যখন সূচীভেদ্য অন্ধকারে আর সে কোলের মানুষ দেখিতে পায় না, তখন সে সেই নিস্তব্ধ সান্ধ্য-গগন-পবন কাঁপাইয়া—

"কতবার আসিয়া, কত ভাল বাসিয়া
গিয়াছি ফিরিয়া সখা কাঁদিয়া কাঁদিয়া,—
কতবার এসেছি, কত ভাল বেসেছি,
তবু দেখা পাই নাই কাঁদিয়া কাঁদিয়া—

বলিয়া গান গাহিতে গাহিতে বাটীতে যায়।

(৬)

তখন গ্রীষ্মকাল। প্রচণ্ড নৈদাঘ মার্ত্তণ্ডের প্রখর কিরণে গাছের ডালপালা-পত্র-পুষ্প সকল ঝল্‌সিয়া গিয়াছে। মাতা ধরিত্রীর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া যেন জ্বলন্ত অগ্নিশিখা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। এদিক্ ওদিক্ ফিরিয়া ঘুরিয়া উদাস মনোমোহন নদীর ধারে অশ্বত্থবৃক্ষের স্নিগ্ধছায়ায় পরিধেয় বস্ত্র বিছাইয়া নিদ্রা যাইতেছে। সে যে কতক্ষণ ঘুমাইয়াছে, তাহা সে

জানে নাই সহসা "হরি হরি বোল" এই দারুণ কণ্ঠস্বরে তাহার সুপ্তি ভাঙ্গিয়া গেল—মনোমোহন ভীতিবিহ্বল চিত্তে শিহরিয়া উঠিয়া বসিল। দেখিল, চারি-জন লোকে একটি শব লইয়া আসিতেছে, আর তাহার পশ্চাতে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে একটি বৃদ্ধা ও কয়েকটী ছোট ছেলে-মেয়ে আসিতেছে। বৃদ্ধার সেই মর্ম্মবিদারক ক্রন্দন শুনিয়া মনোমোহন স্থির থাকিতে পারিল না, কোন এক অজ্ঞেয় কারণে তাহারও চক্ষু দিয়া দু'ফোটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

শব-বাহনকারীরা নদীর তীরে শবদেহ নামাইয়া ধীরে ধীরে তাহা জ্বলন্ত চিতায় তুলিয়া দিল, অদূরে দাঁড়াইয়া কম্পিত-কলেবরে মনোমোহন দেখিল, মৃতা তাহারই হৃদয়াধিষ্ঠিতা স্বর্ণ-প্রতিমা। দীর্ঘ এক বৎসরের রোগে তাহার সোণার দেহ কালী হইয়া গিয়াছে, শুধু কয়েকখানি কঙ্কালমাত্র অতীত দেহের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ধূ ধূ করিয়া চিতার আগুন জ্বলিয়া উঠিল, নিমেষের মধ্যে প্রজ্বলিত অগ্নির লেলিহান জিহ্বা সে সোণার দেহ গ্রাস করিয়া ফেলিল; মনোমোহন কোনরূপে আত্মসংবরণ করিয়া গৃহে ফিরিল। পরদিন আর কেহ তাহাকে গ্রামে দেখিল না।

(৭)

এই ঘটনার দ্বাদশ বৎসর পরে রাজীবপুরের শ্মশানে বসিয়া শ্মশান-বিভূতি-মণ্ডিত, জটাজূটসমন্বিত একজন সন্ন্যাসী একদা গান করিতেছিল—

"শ্মশান ভালবাসিস্ ব'লে মা শ্মশান ক'রেছি হৃদি,
শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচ্‌বি ব'লে নিরবধি।
আর কোন সাধ নাই মা চিতে, দিবা নিশি জ্বল্‌ছে চিতে,
চিতাভস্ম চারি ভিতে

* * * * * * *

সন্ন্যাসীর সম্মুখে ছিল একটি মৃণ্ময় নারীমূর্ত্তি। সন্ন্যাসী সেই নারী-প্রতি-মার দিকে একবার তাকাইতেছিল আবার পঞ্চমে তান তুলিয়া গান করিতে-ছিল। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সেই সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্য আসিয়া-ছিল। দর্শকের ভিড় ঠেলিয়া হঠাৎ একটি বৃদ্ধা সন্ন্যাসীর সম্মুখে যাইয়া মৃণ্ময়-প্রতিমার গলা জড়াইয়া "এ যে আমার অমিয়া" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল, কতজনে কত চেষ্টা করিল, সে কান্না আর থামিল না। অমিয়ার গলা জড়া-ইয়া বৃদ্ধা, অমিয়া যে পথে গিয়াছে সেই পথে চলিয়া গেল। তখন সেই সন্ন্যাসীও—

"মিছে রূপের গুমর কর, ওরে আমার মন,
দেহ বড় পরিপাটী, নয়ন মুদ্‌লে হবে মাটী,
মাটীর দেহ হবে মাটি, মাটিতে পতন।
কোথায় রবে গাড়ী ঘোড়া, শাল দোশালা টাকার তোড়া,
মর্‌লে দেবে খালি গোবর ছড়া, কাঁদ্‌বে পরিজন।"

বলিয়া গাহিতে গাহিতে সেই জনতার মধ্য দিয়া কোথায় চলিয়া গেল, আর কেহ তাহাকে কখনও দেখিতে পায় নাই।

ঠান্‌দিদি।

লেখক,—শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল।

(১)

বেণিয়াটোলার ঘোষেদের বাড়ী আজ মহাধূম। মেজ বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র ভূপেন্দ্রনাথের ফুলশয্যা। ফুলশয্যার আলাপে, ছাদনাতলার শুভদৃষ্টি গাঢ় করিবার কামনায়, বর উৎকণ্ঠা—বিচলিত, অলস প্রয়োজনে বাড়ীর এদিক ওদিক ঘুরিতেছে। প্রথম প্রিয় সম্ভাষণের নীরব-বাসনা ক'নের নির্ব্বাসন-বেদনা সরাইয়া সবে সেই স্থান অধিকারের প্রয়াস করিতেছে, এমন সময় "ফুলশয্যা" আসিয়া পঁহুছিল, সঙ্গে সঙ্গে শাঁক বাজিয়া উঠিল, সংবাদও চাউর হইয়া গেল। এইবার ফুলশয্যা আহুত হইবে ভাবিয়া, ভূপেন্দ্রনাথ বাড়ীর ভিতর গেল। ফুলশয্যা দেখিবার জন্য তখন অন্দরমহল ব্যস্ত, বর ক'নের কথা ভুলিয়া, তাঁহারা ঠাকুর দালানের দিকে ছুটিলেন। হতাশমনে ভূপেন্দ্র-নাথ বাহির বাটিতে আসিল; দেখিল, বন্যার ন্যায় বাঁক কাঁধে, পরাগ, বার-কোষ, ঝুড়ি মাথায় লোক তখনও উঠানে ঢুকিতেছে; যেন তাদের শেষ নাই। ফুলশয্যায় দালান ভরিয়া গেল। ক্রমে সমালোচনা আরম্ভ হইল। পানা, পুকুরেই হইয়া থাকে, সমুদ্রে দেখা যায় না। এ ফুলশয্যায় কেহ খুঁত খুঁজিয়া পাইল না। সকলেই "বেশ দিয়াছে, খুব দিয়াছে" বলিল। বিশুর মা, ফকুরের পিসী, হরের মাসীও উপস্থিত ছিলেন, ফুলশয্যা পরীক্ষায় তাঁহা-দের হস্ত শলার মত চলে, চক্ষু সার্চ্চ-লাইটের মত ঘোরে, জিহ্বা ঝড়ের মত বয়। এ ফুলশয্যা তাঁহারা দেখিলেন, নাড়িয়া চাড়িয়া প্রত্যেক জিনিস পরপ

করিলেন ; শেষে হতাশ দুঃখিত স্বরে বিশুর মা স্বীকার করিলেন, "দিয়াছে বটে।" বরের বড় দিদি এ কথায় বলিলেন,—"দিয়াছে কি বল্‌ছো বিশুর মা, এমন কি কেউ দেয় ?"

তিন মাস পূর্ব্বে বাড়ীর বড় গিন্নির মেজো ছেলের বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার কুটুম্বেরা ভাল ফুলশয্যা পাঠান নাই, সকলের কাছে নিন্দা হইয়াছিল। সময়ে বড় গিন্নির এ ঘা শুকাইয়া আসিতেছিল, জায়ের কুটুমদের এ ফুল-শয্যায় তাহা জাগিয়া উঠিল। বিশুর মায়ের অভিমতে তিনি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন,—"তোমরা সকলে বেশ বেশ বলছো তাই, নইলে এমন আর কি দিয়াছে।" এই সুযোগে হরের মাসীর স্বভাব আর চাপা থাকিতে পারিল না, বলিল,—"আমিও তাই দেখ্‌ছিলুম, সবে সাড়ে বার গণ্ডা নারকুলে কুল দিয়াছে, দশ বাড়ীতে দিতে কুলোয় কি ?" কে এক-জন প্রতিবাদ করিল,—"শ্রাবণ মাসে আর কি দেবে বল ?" ফকরের পিসী উত্তর দিল, "না দিলেই ত পার্‌তো।"

ভাঁটার টান সুরু হইল। ক্রমে সব জিনিষই তাহাতে ভাসিয়া গেল। বেগতিক দেখিয়া বরের বড় দিদি বলিলেন,—"তোমরা ঐ সব নিয়ে রাত কাটাও, ফুলশয্যা করিয়ে আর কাজ নাই, বর কনে শুকিয়ে থাকুক।"

ভূপেন মনে মনে বড় দিদিকে কৃতজ্ঞতা জানাইল। রমণীর দল ফুলশয্যা ছাড়িয়া "ফুলশয্যা" করাইতে আসিল। ভূপেন প্রস্তুত ছিল, কনেকেও আনান হইল। "মালা বদল" ও "জল খাওয়ানয়" ভূপেনের সাদর আগ্রহ দেখিয়া নূতন ঠাকুরমা বলিলেন,—"ওলো, তোরা সব কি করছিস্, কনেকে যে বরের কোলে বসিয়ে দিতে হয়!" ফকুরের পিসী অগ্রসর হইল, কিন্তু কনেকে তুলিতে পারিল না। ভূপেন ধম্‌কাইয়া বলিল,—"তোমাদের ও সব কি বেয়াড়া রকম কাজ।" ভূপেনের তর্জ্জনে ঠানদিদির দল হটিয়া গেল। যাইবার সময় নূতন ঠাকুরমা বলিলেন,—"ওলো, নাতি আমাদের ভারি চালাক, হাজার হ'ক তিনটে পাশ করেছে ত। আমাদের সাম্‌নে কোলে কর্‌বে কেন বল ?" রাঙা ঠাকুরমা বলিলেন,—"তা দাদা, তোমার সরযূকে নিয়ে সুখে আমোদ-আহ্লাদ কর, আমরা আর দেরী ক'রে সাধে বাদী হই কেন ?"

ঠান্‌দিদির দল চলিয়া গেলেন বটে, কিন্তু বউ দিদির দল সহজে ছাড়িল না। ভূপেন তাহাদের চোখ রাঙাইতে পারিল না। তাহারা সকলে মিলিয়া

সরযূকে ভূপেনের কোলে ফেলিয়া দিল। সরযূ ক'নে-বউ সরমে আর সরিতে পারিল না ; লজ্জায় ভূপেনের হাতও সরযূর বাঁ কাঁধে আশ্রয় লইল। বড় বউ দিদি তখন বলিলেন,—"দেখ দেখি ঠাকুরপো, এইবার কেমন মানি-য়েছে!" মেজ বউ দিদি কবিতা পড়িতেন, উপমা দিলেন,—"যেন মেঘের কোলে সৌদামিনী।" সেজ বউ দিদির এ উপমা পছন্দ হইল না, একটু হাসিয়া, ঈষৎ চোখ টিপিয়া বলিলেন,—"এ যেন স্রোতের কোলে ফুল্ল নলিনী।" এ কথায় ভূপেনের মুখ লাল হইয়া উঠিল, পাড়ার মধুদত্তের ছোট মেয়ে নলিনীর সহিত ভূপেনের একবার সম্বন্ধ হয়, মেয়েটি বড় সুন্দর, ভূপেনও তাহার উদ্দেশ্যে দিস্তা দিস্তা কবিতা লিখিত ; উচ্ছ্বাসগুলি কি রকমে বউ দিদির হাতে পড়ে। সেজ বউএর উপমায় ঘরে একটা হাসির রোল উঠিল ; তাহা থামিয়া গেলে বড় বউ দিদি আব্দার ধরিল, তাহাদের সামনে ভূপেনকে ক'নে বউএর সঙ্গে দুটো কথা কইতেই হইবে। সকলে অনেক চেষ্টা করিল, শেষে বিফল হইয়া বর ক'নেকে একলা রাখিয়া চলিয়া গেল।

ভূপেন তখন অঙ্কস্থিতা সরযূর দিকে মুখ ফিরাইল, অনেকক্ষণ বিহ্বল নয়নে তাহার পানে চাহিয়া রহিল, শেষে ধীর কম্পিত কণ্ঠে মৃদুস্বরে বলিল,—"তুমি আমায় ভালবাস ?" উত্তর না পাইয়া ভূপেন আবার জিজ্ঞাসা করিল, "বল বল সরযূ, তুমি আমায় ভালবাস ?"

সেজ বউ দিদি আড়ি পাতিয়া আলমারির পার্শ্বে লুকাইয়া ছিলেন, খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন,—"ঠাকুরপো, তুমি কি রতিবল্লভ যে, দেখা না হ'তেই ক'নে বউ ভালবেসে তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়বে।"

(২)

দেখিতে দেখিতে আশ্বিন মাস আসিল। সরযূর মামার বাড়ী খুব ঘটার পূজা হয়। নিমন্ত্রিত হইয়া, ষষ্ঠির দিন ভূপেন সরযূকে লইয়া তথায় যাত্রা করিল। যাইবার সময় বড় বউ দিদি বলিলেন,—"ঠাকুরপো, এই প্রথম মামাশ্বশুর-বাড়ী যাচ্ছ, যেন বেশীদিন থেকো না, লোকে তা হলে নিন্দা কর্‌বে।" ভূপেন বলিল,—"না, আমি কালই ফিরিয়া আসিব।"

ট্রেণ ছাড়িলে, ভূপেন বলিল,—"কাল ফিরিতে হইবে।"

সরযূ জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন ?"

ভূপেন।—আমার যে দরকার আছে।

সরযূ।—তুমি আসিবে ?

ভূপেন।—হ্যাঃ।

সরযূ।—তা এস।

ভূপেন।—তোমাকেও আসতে হ'বে।

সরযূ।—আমি পূজা না হয়ে গেলে আসবো না।

ভূপেন।—তা কি হয়!

সরযূ।—বাঃ, তা বলে কি আমি মামার বাড়ী থাক্‌বো না?

ভূপেন।—তা, নয়। তবে আমার জন্য ত তোমার মন কেমন কর্‌বে?

সরযূ।—তা কেন কর্‌বে; সেখানে আমার কত সম-বয়সী আছে।

ভূপেন।—তুমি কি আমায় ভালবাস না, সরযূ?

সরযূ।—ভালবাসা কাকে বলে, বল না?

অনুরাগ অভিনয়ে অল্পক্ষণেই সময় কাটিয়া গেল। ট্রেণ চুঁচুড়া ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। চুঁচুড়ার নিকটবর্ত্তী এক বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে সরযূর মামার বাড়ী, বাড়ীখানি অনেক দিনের তৈয়ারী, তিন মহল অট্টালিকা, বরাবর সু-মেরামতে থাকায়, এখনও নূতন দেখায়। সাম্‌নে ২।৩ শত বিঘা জমি যুড়িয়া আম, কাঁটাল, লিচু ও জামগাছে ভরা এক প্রকাণ্ড বাগান।

ভূপেনও সরযূকে লইবার জন্য ষ্টেশনে গাড়ী আসিয়াছিল। ভূপেন কখনও কলিকাতার বাহির হয় নাই। পল্লীগ্রামের অভিনয় দৃশ্য দেখিয়া তার "হলুদ-গাঁয়ের কথা মনে হইল। ক্রমে গাড়ী বাগানের রাস্তায় আসিয়া পড়িল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। বাগানটা নীরব আঁধারে ঘেরা। যতদূর দেখা যায়, ভূপেন দেখিল, শুধু গাছ। মাঝে মাঝে দু-একটা পেচক নির্জ্জনতা কাঁপাইয়া তুলিতেছে। একটা বড় দিঘির পাশ দিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল। ভূপেনের তখন কালীদিঘীর ডাকাতির কথা মনে পড়িল। কম্পিত হস্তে সরযূকে হৃদয়ে চাপিয়া বলিল,—"কি নিবিড় জঙ্গল।" হাসিয়া সরযূ বলিল,—"এ বুঝি জঙ্গল?" ভূপেন জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি?" সরযূ বলিল,—"মামাদের বাগান।" তাহাতে ভূপেন বলিল,—"তবে এত গাছ কেন?" উত্তরে সরযূ হাসিয়া উঠিল।

(৩)

মেয়ে-মহলে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সকলে সরযূর বর দেখিতে ছুটিল। খোকন বাবুকে নামাইয়া অনুজা তাড়াতাড়ি নিজের হাতে বোনা একখানি কার্পেটের আসনে ভূপেনকে বসাইল, অনুজা সরযূর মেজ-মামার একমাত্র সন্তান, পিত্রালয়েই থাকেন! খোকন বাবু ঘুরিয়া ফিরিয়া ভূপে-

নকে বেশ করিয়া দেখিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"মা, মা, এ কে?" অনুজা তখন ভূপেনের জলখাবার সাজাইতে ছিলেন, বলিলেন,—"জামাই বাবু!" খোকন আবার ভূপেনের কাছে গিয়া তাহার কাঁধে হাত দিয়া বলিল, "তুমি দামাইবাবু!"

আসিবার সময় টাটকা ধোলাই করা মসলিনের পাঞ্জাবি, ভূপেন সবে ভাঙ্গিয়াছিল, খোকনকে একটু ব্যবধানে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি?" একজন বর্ষিয়সী তাহাতে বলিলেন, "আমাদের ময়লা কাপড় ব'লে এদিকে তাকাইবে না, না কি?" ভূপেন কি উত্তর দিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে অনুজা তাহার সাম্‌নে জলখাবারের রেকাব ধরিল। ভূপেন আবেদন করিল, বাড়ী হইতে খাইয়া আসিয়াছি। অনুজা তাহা মঞ্জুর করিল না। সকলের পীড়াপীড়িতে ভূপেন শেষে একখানি কচুরি মুখে তুলিল, কিন্তু তাহাতে দাঁত বসিল না। অগত্যা কচুরিখানি রেকাবে পুনঃ স্থাপন করিয়া ভূপেন বলিল,—"আমায় ক্ষমা করিবেন, এখন ক্ষিদে নাই।" অনুজা ছাড়িবার পাত্রী নন, জেদ করিয়া বসিলেন, ভূপেনকে না খাওয়াইয়া উঠিবেন না। খোকন বলিল, "দামাইবাবু, খাও।" অপর সকলও খোকনের সহিত যোগদান করিলেন। একজন বলিলেন,—"সহুরে বাবুরা কি গ্যাসের আলো খাইয়া বাঁচিয়া থাকেন?" ভূপেন কি উত্তর দিবে ঠিক করিতে পারিল না। তখন আর একজন বলিলেন,—"না খেলে কান মুলে দিব।" ভূপেন দেখিল, নির্ব্বিরোধে আদেশ পালনই যুক্তিসিদ্ধ; গাণ্ডিবীকেও প্রমিলার দেশে এইরূপে হার মানিতে হইয়াছিল। তবে এবার কচুরি বাদ রাখিয়া একখানি নিম্‌কি তুলিয়া লইল। মুখে দিতেই নিম্‌কি ভাঙ্গিয়া গেল। খোকন তালি দিয়া বলিয়া উঠিল,—"দামাইবাবু, মাথির নিম্‌কি খেলে, দু-দুয়ো। নিম্‌কি বাস্তবিকই পাতখোলা পাকে তৈয়ারী, বে-সহুরে মেয়েরা এখনও জামাইকে ঠকানর জন্য মাটীর খাবার, পিটুলির সন্দেশ গড়িয়া থাকে। অপ্রতিভ হইয়া ভূপেন দুই চুমুক জল খাইল, সঙ্গে সঙ্গে রমণীদের হাসির রোলে ঘর ভরিয়া গেল।

এইবার অনুজা সত্যিকারের জলখাবার ভূপেনের সাম্‌নে ধরিল। একবার ঠকিয়া ভূপেন আর খাইতে রাজী হইল না। অনুজা হলপ করিল, প্রত্যেক জিনিষ ভাঙ্গিয়া দেখাইল, যথার্থই খাবার, তাহাতে কোন তামাসা নাই। সকলে অনেক অনুনয় বিনয় করিল, তবুও ভূপেন বলিল,—"কেন বারবার বিরক্ত করিতেছেন, আমি কি কিছু বুঝি না।" তখন একজন ভূপেনের কান

মলিয়া দিল। ভূপেন ক্রোধব্যঞ্জকস্বরে বলিল,—"কেন এমন কর্‌ছেন?" তাহাতে আর একজন বলিল,—"না খেলে আরও কানমলা দেবো।" ভূপেন উত্তর দিল, "যখন এখানে আসিয়া পড়িয়াছি, আপনাদের যা খুসী করিতে পারেন। কিন্তু আমার মনে কষ্ট দিয়া কি লাভ? অনুজা বলিল, "তবে ভালমানুষের মতন খাও না।" ভূপেন চুপ করিয়া রহিল দেখিয়া, একজন প্রৌঢ়া তাহার মস্তকদেশে একটা টোকা মারিল। ভূপেন রাগিয়া বলিল, "কেন এমন কর্‌ছেন, আমি কি পাগল?"

ব্যাপার এইরূপে গুরুতর হইয়া উঠিল, কোথায় গড়াইত বলিতে পারি না। এমন সময় "কি গো অনুজা, আমাদের সরযূর বর এসেছে না কি।" বলিতে বলিতে কৌতূহলের স্রোতে আর একজন ঘরে আসিয়া পড়িল। "ঠানদিদি যে, কতক্ষণ এলে" বলিয়া অনুজা তাহাকে প্রণাম করিল। এতক্ষণ বাড়ী মানাল, তুমি না এলে কি চলে, বলিয়া সকলে তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। এখন সব আগে নাতজামাই দেখি, বলিয়া নবাগতা ভূপেনের কাছে অগ্রসর হইয়া বলিল, "ব্যাঃ, দিব্যি নাতজামাইটি ত, সরযূর আমাদের বরাত ভাল।" কথাগুলি ভূপেনের কানে গানের মত বাজিল, মাথা তুলিয়া দেখিল, লাবণ্যের পাখা মেলিয়া এক অপ্সরী তাহার পানে চাহিয়া আছে, রমণীর এত রূপ ভূপেন কখনও দেখে নাই।

ঠান্‌দিদির কথায় অনুজা বলিল, "ভাল-মানুষটির মতন দেখ্‌ছ বটে, কিন্তু মিট্‌মিটে ডান, ভারি হেঁজলদ্যাবাড়া, কিছুতেই জলখাবার খাচ্ছে না।"

সত্যি না কি, নাতজামাই বলিয়া, ঠানদিদি ভূপেনের কাছে বসিল, বলিল, "খাও দিকি দেখি।"

ভূপেন আর কোন দ্বিধা বা আপত্তি করিল না, অবাধে সমস্ত খাবারগুলি খাইয়া ফেলিল; অনুজা তাড়াতাড়ি আর একথালা জলখাবার আনিয়া দিল, ভূপেন তাহাও নিঃশেষ করিল।

তখন ঠানদিদি সম্পর্কের আর একজন ভূপেনকে বলিল,—"তবে শালা তোমার না কি ক্ষিদে নেই, এস ত এইবার ভাল ক'রে কান মলে দি।"

ভূপেনের কর্ণমূলে নিজের কোমল সুগোল হাতখানি দোলাইয়া ঠানদিদি ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "খবরদার, আমার শান্ত সুন্দর নাতিটিকে কেহ কিছু বলিও না।"

অনুজা চোখ টিপিয়া বলিল,—"তোমার যে ভারি দরদ দেখছি।"

ঠান্‌দিদি উত্তর দিল, "এমন নাতজামাই থাক্‌তে কি তোদের জন্যে দরদ হবে। যা এখন, সরযূকে পান আন্‌তে বল।"

সরযূ পান লইয়া আসিলে সকলে চলিয়া গেল। ভূপেন এতক্ষণ বসিয়াছিল, আস্তে আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘরের আলো কমিয়াছিল কি না বলিতে পারি না, তবে সরযূর হাত ভূপেন ঠিক লক্ষ্য করিতে পারিল না,—ঝন্‌ঝন্‌ করিয়া ডিবা পড়িয়া গেল।

পানগুলি কুড়াইতে আরম্ভ করিলে, সরযূকে ভূপেন বলিল, "তোমার ঠান্‌দিদি কে?"

বিস্মিত হইয়া সরযূ বলিল, "ঠান্‌দিদি কে?"

ভূপেন তাহাতে বলিল, "যিনি তোমায় পান আন্‌তে বল্‌লেন, তিনি কে?"

সরযূ উত্তর করিল, "ওঃ! নলিনী ঠান্‌দিদি?"

ভগ্নরুদ্ধ স্বরে ভূপেন বলিল, "নলিনী তোমার ঠান্‌দিদি?"

পানের ডিবা আবার ভূপেনের সাম্‌নে ধরিয়া সরযূ বলিল, "হ্যাঁ।"

ভূপেন পান লইতে ভুলিয়া গেল, বলিল, "উনি তোমার কে হন?"

উত্তরে সরযূ বলিল,—"সে অনেক দুর-সম্পর্ক, তবে মামাদের সঙ্গে বড় ভাব।"

ভূপেন স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল দেখিয়া সরযূ বলিল,—"পান খাবে ত নাও, ডিবা হাতে করে আমি আর দাঁড়াতে পারি না।"

চমক ভাঙ্গিয়া, একটা গভীর নিঃশ্বাস রাখিয়া জড়িতস্বরে ভূপেন বলিল, "নলিনী কি সুন্দর, যেন ছবির মতন।"

হাসিয়া সরযূ উত্তর দিল,—"সাবধান, দাদামহাশয়কে বলে দেব, জগৎ সিংহ আসিয়াছে।"

(৪)

প্রত্যূষেই সরযূ খিড়কীর পুকুরে স্নান করিতে আসিল। ঘাটে তখনও কেহ আসে নাই। সিঁড়ির জলে আল্‌তা-মাখা পা-দুখানি ডুবাইয়া সরযূ রাণার উপর বসিল। পুষ্করিণীর অপর পারে একটি বকুল গাছে দুটী পাপিয়া খেলা করিতেছিল, সরযূ তাহা দেখিতে লাগিল।

খানিক পরে, "কিলো, ভোরবেলাই উঠেছিস্‌ যে, নাত জামাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করেছিস না কি"—বলিয়া পুকুর আলো করিয়া ঠান্‌দিদি আসিয়া সরযূর পাশে বসিল।

হাসিয়া সরযূ বলিল, "কি আর করি বল, আয়েষা থাক্‌তে কি আর তিলোত্তমার সুখ হয় ?"

ঠান্‌দিদি। আয়েষা কি কেড়ে নেয়—শুধু বিলুতে জানে।

সরযূ। এ আয়েষা যে আমার জগৎ সিংহকে মজিয়েছে।

ঠান্‌দিদি। দূর পোড়ারমুখী।

সরযূ। যাই বল, কাল কিন্তু সারারাত ঘুমোয় নি, তোমায় স্বপ্ন দেখেছে।

ঠান্‌দিদি। বলিস্ কিলো!

সরযূ। সে আর কত বল্‌বো। প্রথমে ছবি ক'রে তোমায় ফ্রেমে বাঁধালে, তার পর অপ্সরি করে ইন্দ্রের সভায় নিয়ে গেল, শেষে দেবী বানিয়ে মন্দিরে তুললে।

ঠান্‌দিদি। তা হলে টোপ গিলেছে, এইবার টেনে তুলি, কি বল ?

"তুমি চুলোয় যাও" বলিয়া সরযূ ঠান্‌দিদির পিঠে সোহাগের একটা কীল কিল বসাইল। এই সময় অনুজা আসিয়া উপস্থিত হইল। ঠান্‌দিদিকে দেখিয়া বলিল,—"ঠান্‌দিদি যে এক রেতেই শুকিয়ে গেলে! এর মধ্যেই বিরহ লাগ্‌লো ?

ঠান্‌দিদি। তোরা সব সে দিনের ছুঁড়ি। বিরহের কি বুঝ্‌বি ? আমার এই পঁচিশ বছরের জমান পিরীতে কি আর কাল-বৈশাখীর বিদ্যুৎ খেলে ? গণ্ডী পেরলেই ভাদ্দুরে গুমোট বয়।

অনুজা। কি বল ঠান্‌দিদি ? ২৫ বৎসর হলো তোমার বিয়ে হয়েছে ?

ঠান্‌দিদি। তা হলো বৈ কি। তুই তখন সবে আঁতুড়ে।

সরযূ। তোমায় যে আমার চেয়ে ছোট দেখায়।

ঠান্‌দিদি। তা হলে এইবার তোকে নাগর করে বেরিয়ে যাব।

সরযূ। দাদামহাশয় তাহলে কি আর আমায় আস্ত রাখ্‌বে।

ঠান্‌দিদি। তবে দেখছি, তুই আমার নাগর হবার যুগ্যি ন'স।

সরযূ কি উত্তর দিতে যাইতেছিল, এমন সময় ঢাক বাজিয়া উঠিল। "চ চ, সব পূজার যোগাড় করে দিইগে" বলিয়া ঠান্‌দিদি তাড়াতাড়ি স্নান করিতে আরম্ভ করিল।

(৫)

গোলেমালে, আমোদে আহ্লাদে পূজার কয়দিন কাটিয়া গেল। সপ্তমীর দিন আহারাদির পর ভূপেন ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল। সরযূর ইঙ্গিতে

অনুজা থাকিবার জন্য তাহাকে অনেক অনুরোধ করিয়াছিল, ভূপেন শোনে নাই ; উড়ানি অবধি কাঁধে ফেলিয়াছিল, সেই সময় ঠান্‌দিদি আসিয়া পড়ায়, ভূপেন আর বাঁ পায়ের জুতা পরিতে পারে নাই। ঠান্‌দিদি আক্ষেপ করে, "তুমি গেলে কার জন্যে আর সন্দেশ গড়িব ?" শুনিতে পাই, সেদিন সকালে ঠান্‌দিদির দেওয়া দুইটী পিটুলীর সন্দেশ খাইয়া তাহা নবীন দাসের বসন্ত বাহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রতিপন্ন করিতে গিয়া ভূপেন সকলকে খুব হাসাইয়াছিল। ঠান্‌দিদির এ কথায়, ভূপেন গায়ের পাঞ্জাবি খুলিয়া আলনায় রাখে ; তার পর আর যাইবার কথা তোলে নাই।

আজ বিজয়া। বাঙ্গালীর পবিত্র মিলনের দিন। এখন আমরা পাশ্চাত্য আলোকে অন্ধ, নহিলে এ সনাতন প্রথা উপেক্ষা করিয়া, কি আর নূতন প্রণালীতে জাতীয়তা গড়িতে চাই!

ভাসানের পর সকলে শান্তিজল লইল। তারপর বিজয়ার হুড়াহুড়িতে বাড়ী ভরিয়া গেল। ভিড়ের মাঝে কেহ বিশেষ কিছু খোঁজ লইল না দেখিয়া, ভূপেন আস্তে আস্তে বাহির হইল। তাহার রাস্তা জানা ছিল না, ঘুরিতে ঘুরিতে নদীতটস্থ এক ঘাটে আসিয়া পৌঁছিল। ঘাটটি সান-বাঁধানো, রাণায় রাণায় একটি করিয়া তুলসীমঞ্চ। উপরে প্রশস্ত চাতাল,—তাহার দুই পার্শ্বে কেয়ারী করা নিকুঞ্জ ; তলায় শীতল শ্বেতপাথরের বেদিকা বসিতে আহ্বান করিতেছে। এ ঘাট সরযূর মাতুলালয়ের খিড়কী-বাগানের সামিল, মেয়েদের গঙ্গাস্নানের সুবিধার জন্য নির্ম্মিত। চাতাল হইতে রমণীরা বাচ খেলা দেখেন। বিজয়ার রাত্রে মাঝ গঙ্গা হইতে অনেক রকম আতস বাজী ছাড়া হয়, তাহা দেখিতেও মহিলারা তথায় জমায়েৎ হন।

ভূপেন আস্তে আস্তে একটি বেদীতে বসিল। কলঙ্কের বোঝা সহিতে না পারায়, চাঁদ তখন ভাগিরথী-গর্ভে ডুব দিয়াছে—জাহ্নবীর পবিত্র নীরে কালিমা ধৌত হওয়ায় খাঁটি জোছনার লহরী নদীবক্ষে দল বাঁধিয়া আনন্দ-কোলাহলে ছুটিতেছে। এ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে ভূপেন মোহিত হইয়া গেল, ভাবিল, তাহার জীবন-প্রবাহ কি এইরূপ সুখ-তরঙ্গে বহিবে ? তাহার অনেক কথা মনে পড়িল। শৈশবের সহচরী নলিনী—তার সঙ্গে সে কত সুখের খেলা খেলিয়াছিল, তারই আননে তাহার কিশোর হৃদয় উদ্ভাসিত হয়েছিল। সফলের মুখে ত সে স্বপন কোয়াসায় বিলীন হয়ে গেল। তার কতদিন পরে আর এক-দিন সে হৃদয় আবার আবেগে নাচিয়াছিল। সে সেদিন, যেদিন কুসুমহারে

গাঁথা বুকভরা ভালবাসার ডালি সরযুর সামনে ধরেছিল, সরযূ কি সে ডালি গ্রহণ করিবে না? সে কি তাকে ভালবাসে? তার অপাঙ্গে ত কটাক্ষ নাই, হাসিতে ত চপলতা নাই, নিঃশ্বাসে ত হুতাশ নাই। বহুযত্নে সাজান তাহার এই সঞ্চিত প্রেমের ডালি তবে কি ভেসে যাবে? ঠান্‌দিদি তো সে দিন তাঁহার দুঃখে দুঃখী হয়েছিল, অনুজার শ্লেষ উপেক্ষা করিয়া তাহার প্রতি করুণ মমতা জানাইয়াছিল, তাহার ফিরিবার কথায় কত কাতর হইয়াছিল। ঠান্‌দিদি ও নলিনী, কিন্তু নলিনীর চেয়ে সে কত সুন্দর, তার প্রতি অবয়বে সর্ব্বাঙ্গে কি মাধুর্য্য ঢালা। ঠান্‌দিদির কথা ভাবিতে ভাবিতে ভূপেন ক্রমে বিভোর হইয়া গেল।

বামা-কলরবে চমক ভাঙ্গিয়া ভূপেন দেখিল, চাতালে একদল রমণী আসিয়া জমিয়াছে। তাহারা কে? ভূপেনের ভয় হইল, কাহার প্রমোদ-উদ্যানে বোধ হয়, অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে। আসিবার সময় একজন পাঁড়েজীকে দেখিয়াছিল মনে হওয়ায়, তাহার এ ভয় দৃঢ়ীভূত হইল। ভূপেন ভাবিল, রমণীদের কাছে ক্ষমা চাহিয়া চলিয়া যাইবে। কিন্তু পাঁড়েজীর হাতের বৃহৎ লাঠি তাহাকে আত্মপ্রকাশ করিতে দিল না। গোপনে প্রস্থান যুক্তিসিদ্ধ স্থির করিয়া, ভূপেন সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। সুযোগও হইয়া আসিতেছিল, এমন সময় "বাবা গো, কে"—বলিয়া সরযূ একেবারে তিন হাত লাফাইয়া পড়িল, আঁধারে আলোয় সে ভূপেনকে চিনিতে পারে নাই। পরিচিত স্বরে ভূপেন আশ্বস্ত হইল, সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠদেশে বস্ত্রের আকর্ষণ অনুভব করিল। সে কিছু বলিবার আগেই চকিতের ন্যায় মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার গালে, পিঠে, মাথায় চড়, চাপড়, কিল বর্ষণ করিয়া কে তাহাকে বেদী হইতে টানিয়া লইয়া কর্কশ তীব্রস্বরে বলিল, "ড্যাকরা ছোড়া, বাবুদের খিড়কীতে ঢুকেছিস, চ ছুঁচো চ।" অকস্মাৎ অপ্রিয় বর্ষণে ভূপেনের বাক্‌শক্তি রহিত হইল। বেদীতে পুনরায় বসিবার চেষ্টা করায় সেই কর্কশ কণ্ঠ 'ছোঁড়া, আবার বসে যে" বলিয়া তাহার গলদেশে গামছা-খানি বেশ পাকাইয়া ধরিল। অনুজা তাহাতে বলিল, "পালাবে যে, তুই চেঁচিয়ে পাঁড়েকে ডাক না।" পাঁড়ের নামে ভূপেন লুপ্ত বাক্‌শক্তি ফিরিয়া পাইল, "আমি" "আমি" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

"এ যে নাতজামাইয়ের গলা" বলিয়া তখনই ঠান্‌দিদি ক্ষ্যান্তিকে ঠেলিয়া ভূপেনের পার্শ্বে আসিল।

ক্ষ্যান্তি বাবুদের মহলের পাইকের মেয়ে, পূজা উপলক্ষে আসিয়াছিল, ভীতা সরযুর চীৎকারে তখনই ক্ষিপ্রহস্তে সে ভূপেনকে আক্রমণ করে। নিমেষে ভূপেনের গলদেশ মুক্ত করিয়া, নিজের আঁচল দিয়া ঠান্‌দিদি তাহার চোখ মুছাইয়া দিল। তার পর হাত ধরিয়া সাদরে তাহাকে বেদীতে বসাইল। প্রণয়ের এই দুটী নিদর্শনে ভূপেন তন্ময় হইয়া গেল। ভয়ে, লজ্জায়, ঘৃণায় সরযূ জড়সড় হইয়া গেল, অনুজা মুখ তুলিতে পারিল না, অপর সকলেরও চপলতা যেন কোথায় গিয়া লুকাইল।

ভূপেনকে আশ্বস্ত করিয়া ঠানদিদি ক্ষ্যান্তিকে অনেক ভৎর্সনা করিল। ক্ষ্যান্তি বড় লজ্জা ও দুঃখ পাইয়াছিল। ভূপেনের পদপ্রান্তে পড়িয়া অনেক-বার নিজের কাণ মুলিল, নাকে খত দিল, ও ঢিপ ঢিপ করিয়া মাথা খুঁড়িল। ইহাতে বোধ হয় তাহার মনটা খানিক হাল্‌কা হইল। তখন ভূপেনকে প্রণাম করিয়া বলিল, "হাঁ গা জামাইবাবু! আমি ত চাষার মেয়ে মুরখু। তুমিই বা কেমন মানুষটা বল দেখি বটেক। জামাই হয়ে এ্যামন ক্যারে চোরটির মতন দিদিমণিকে ডর দিইলে ক্যেনো বলো তো? আর এই ক্ষ্যান্তি হারামজাদি যখোন তোমার গলাটিতে গামছা দিলে, মুখ্যে কি একটী র‍্যাঃ সরলো না? এখোন এ পোড়ারমুখটি গিন্নী মায়েদের দ্যাখাই ক্যামনে বলো দ্যাখি।"

ক্ষ্যান্তির এই দীর্ঘ বক্তৃতায় ভূপেন "না, না, তুই কিছু ভাবিস নে" বলিয়া তাহাকে একটি টাকা ফেলিয়া দিল। ইহাতে নিজেকে অপমানিত মনে করিয়া ক্ষ্যান্তি বলিল,—"হ্যাঁগা, তোমরা কলকাতার মানুষ, জমিদ্যারের বাড়ি বিয়্যা কোরে কিমোনে করো সকলেই কি তোমার টাকার গোলাম? তোমার এই টাকাটীতে কি ক্ষ্যান্তি বাঁদরির মনের দুক্কু যাবে? পুরুষ হয়্যা রমণীদের কি এই ব্যথা দেওয়া সাজে।"

ভূপেন এ কথায় হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "আচ্ছা, তোকে টাকা নিতে হবে না।"

ভূপেনের হাসিতে সকলে হাঁফ ছাড়িল। গুমোট কাটিয়া গেল, ক্রমে রহস্য আলাপে অপ্রিয় ঘটনাটি অল্পক্ষণেই বিস্মৃতিতে লুকাইল। তারপর বাজী ছোড়া আরম্ভ হইল। গোপিকা-বেষ্টিত বংশীধারীর মত ভূপেন তাহা দেখিতে লাগিল।

বাজী পোড়ান শেষ হইলে, সকলে ভূপেনকে গাহিতে ধরিল। অনেক-

বার "জানি না, জানি না" বলার পর, ঠানদিদির কথায় ভূপেন গাহিল :—

(আমি) পিয়াসিত প্রাণে, তৃষিত এ মনে,
যেতেছিনু ওগো মরুতে দহিয়া ;
(তুমি) কেন গো আসিলে, কেন গো চাহিলে,
করুণ প্রণয় অমিয় লইয়া ;
(আমি) তোমারি আশায়, ব্যাকুল হিয়ায়,
নিরাশার খেদ ফেলেছি মুছিয়া ;
(তুমি) সুখের লহরে, তুলিয়া আদরে,
দিও না যেন গো তুফানে ফেলিয়া ;
(আমি) ভালবাসা দিয়ে, তোমারে সাজায়ে,
পূজিব যতনে হৃদয়ে রাখিয়া
(তুমি) বিনিময়ে তার, সরোজ আধার
মাঝে মাঝে শুধু দেখগো চাহিয়া ॥

(৬)

ঠানদিদির প্রিয়সন্নিধানে ভূপেন যে ব্যথা অনায়াসে ভুলিতে পারিয়াছিল, নিশির নির্জ্জনে তাহা দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। সরযূ তাহাকে একটা সামান্য নীচ ইতর মাগীর দ্বারা সকলের সামনে অপমান করাইয়াছে, এ কথা ভূপেন মন হইতে মুছিতে পারিল না। পত্নীর পক্ষে পতির প্রতি এর চেয়ে আরও কি গর্হিত ব্যবহার হতে পারে, ভূপেন তাহা কল্পনায় আনিতে পারিল না। স্বামীর উপর কণামাত্র প্রিয়ভাব থাকিলে, কোন নারী যে নিজেকে এরূপ কলুষিত করিতে পারে, ভূপেনের তাহা সম্ভব বোধ হইল না। সরযুর উপর তাহার বড় রাগ হইল।

নিজের ভুলে সরযূর বড় ক্ষোভ হইয়াছিল। কম্পিত হৃদয়ে ঘরে ঢুকিয়া সে ভূপেনের দিকে অগ্রসর হইল ; ভাবিয়াছিল, তাহার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাহিবে। সরযূকে আসিতে দেখিয়া, ভূপেন মুখ ফিরাইয়া অন্যদিকে সরিয়া গেল। এ নির্ম্মম অবজ্ঞায়, সব কথা ভুলিয়া গিয়া সরযূ ঘরের মেঝেয় বসিয়া পড়িল। ভূপেন অনেক ক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, শেষে ঠানদিদির ধ্যানে বিভোর হইয়া শয্যায় আশ্রয় লইল। দুঃখে অভিমানে সরযূ মেঝেতেই রাত কাটাইল।

(৭)

আশার সুখময় স্বপনে, ভূপেনের নয়ন অনেক বেলা পর্য্যন্ত মুদিত রহিল। নিঠুর তপন শুধু দহিতেই জানে—সে যে হিংসা দিয়া গড়া ঈর্ষার আধার। ভূপেনের এ সুখ সে সহিতে পারিল না। সুদূর পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে ধূ ধূ আসিয়া এ নয়ন খুলিয়া দিল। মানুষের ঘড়ীতে তখন ৯টা বাজিয়া গিয়াছে।

উঠিয়া ভূপেন শয্যার উপর বসিয়া রহিল। কল্পনায় তখন স্বপনের স্থান ভরিয়া গেল।

পদশব্দে ফিরিয়া, ভূপেন দেখিল, অনুজা ; দেখিয়া বড় বিরক্ত হইল। আস্তে আস্তে শয্যার নিকট আসিয়া অনুজা জিজ্ঞাসা করিল,—"উঠ্‌তে এত বেলা হল, তোমার কি কোন অসুখ করেছে ?"

ঘাড় নাড়িয়া ভূপেন জানাইল, "না।"

অনুজা বলিল,—"তুমি ঘুমুচ্ছিলে বলে ঠানদিদি আর দেখা করিল না !"

বিস্ময়ে ভূপেন বলিল,—"কেন ?"

অনুজা বলিল, 'যাইবার সময় ঠানদিদি তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল ? তোমার তখন নাক ডাক্‌ছে দেখিয়া ফিরিয়া যায়।"

ভূপেন কিছু বুঝিতে পারিল না, জিজ্ঞাসা করিল, 'ঠানদিদি কি চলে গেছে ?"

অনুজা বলিল,—'আজ ৮ টার গাড়ীতে ত যাবার কথা ছিল।"

তড়িতের ন্যায় ভূপেন শয্যা হইতে নামিয়া পড়িল, তাড়াতাড়ি একসঙ্গে জুতা জামা পরিতে লাগিল। অবাক্ হইয়া অনুজা বলিল,—'মুখ-টুখ না ধুয়েই জামা পরছো ?"

উত্তেজিত স্বরে ভূপেন বলিল—"আমায় এখনই ফিরিতে হইবে।"

ভূপেনের এই অকস্মাৎ ব্যস্ততা বুঝিতে না পারিয়া অনুজা বলিল,—"তা কি হয়, আরও দিন কতক থাকিতে হইবে। কোজাগুরীতে যাত্রা হইবে, তারপর যেও।"

ভূপেন কোন কথা বলিল না, দ্রুতগতি ঘর হইতে বাহির হইল। অনুজা তাহার সহিত দর-দালানের শেষ অবধি যাইল, তাহাকে থাকিতে অনেক অনুরোধ করিল, ভূপেন কিছুতেই তাহা শুনিল না। অনুজা তখন কাকীমাকে ডাকিতে গেল—কাকীমা বাড়ীর গিন্নী ; তাঁহার কথা ভূপেন ঠেলিতে পারিবে না, এই বিশ্বাসে অনুজা ছুটিল।

ভূপেন অভিমানে চলিয়া যাইতেছে, শুনিয়া কাকীমা তখনই সদর বাড়ীর পথে যাইলেন, মাঝ মহলের দর-দালানে ভূপেনকে দেখিতে পাইলেন। রাস্তার জঙ্গলের কথা মনে পড়ায় ভূপেন তখন নিজের গতি থামাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। "ছিঃ বাবা, এমন করে, না খেয়ে কি যায়" বলিয়া কাকীমা ভূপেনকে বাড়ীর ভিতর যাইতে অনুরোধ করিলেন। ভূপেন এইরূপ একটা সুযোগই খুঁজিতেছিল, তবুও বলিল,—"আমায় তাড়াতাড়ি ফিরিতে হইবে।" কাকীমা তাহাতে বলিলেন—"খেতে আর কত দেরি হবে; আমি ততক্ষণ গাড়ী জুত্‌তে বলে পাঠাচ্ছি।" গাড়ীর কথায় ভূপেন ফিরিল; তাড়াতাড়ি স্নান আহার সারিয়া রওনা হইল। সরযূকে সে কোন কথাই বলে নাই, তবুও বাহিরে আসিয়া দেখিল, গাড়ীতে সরযূ বসিয়া আছে। অপর দিকের গদিতে উঠিয়া, ভূপেন গাড়ী হাঁকাইতে আদেশ দিল। সমস্ত রাস্তা ভূপেন মুখ ফিরাইয়া রহিল। ট্রেণের পথও এইরূপ সুদীর্ঘ নীরবতায় কাটিয়া গেল।

(৮)

বাড়ী পৌঁছিয়া ভূপেন তাড়াতাড়ি ধূতি ও জামা বদলাইয়া লইল। পরে আরসীর সাম্‌নে চুল ফেয়ারী করিতেছিল, এমন সময় বড় বউ দিদি আসিয়া বলিল, "কি ঠাকুরপো, একেবারে পূজা কাটিয়ে এলে যে?" 'আমায় ও রকম বিরক্ত করিও না" বলিয়া ভূপেন বাড়ীর বাহির হইল। বিবাহের পর সে কলেজ ব্যতীত অন্য কোথাও বাহির হইত না। নিভৃত আলাপের সুযোগ অন্বেষণে সরযূর ছায়ায় ছায়ায় ঘুরিত।

ট্রামে উঠিয়া ভূপেন ভবানীপুরের টিকিট লইল। শুনিয়াছিল, সেই অঞ্চলে ঠানদিদির বাড়ী, দাদা মশাই তথায় ডাক্তারী করেন। এলগিন রোডের মোড়ে নামিয়া ঠানদিদির অনুসন্ধান আরম্ভ করিল। রাস্তা বা পাড়ার নাম ভূপেনের জানা ছিল না; দাদামশায়ের নাম জানিবার তাহার অবকাশই হয় নাই। কাজেই ভূপেনকে অনেক ঘুরিতে হইল, শেষে হতাশ ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে কালীঘাট রোডের একখানি বাড়ীর র'কে বসিয়া পড়িল। তখন সন্ধ্যা হয় হয়।

ভূপেন নিজেকে অনেক ভৎর্সনা করিল। বেলা অবধি না ঘুমাইলে ঠানদিদির সহিত আসিতে পারিত, তাহার ঠিকানা জানিয়া লইত, এই ক্ষোভে ভূপেন আকুল হইয়া উঠিল। এখন কি করা যায় ভাবিতেছিল, এমন

সময় হঠাৎ দেখিল, রাস্তার অপর দিকে এক উন্মুক্ত খড়্‌খড়ির পিছনে ঠান্‌দিদির মতন কে একজন দাঁড়াইয়া আছে। বাড়ীর নীচে একটী ডাক্তারখানা, ভূপেন আর অপেক্ষা করিল না, খড়্‌খড়িতে দৃষ্টি রাখিয়া বাড়ীর দিকে ছুটিল। সেই সময়ে হুহু করিয়া বেগে একখানি রিক্‌শা আসিতেছিল। লম্বা সোয়ারী ছাড়িয়া, রিক্‌শার কুলী সবে এক ছিলিম গাঁজা টানিয়া গজল ভাঁজিতে ভাঁজিতে ছুটিতেছিল; সে ভূপেনকে দেখিতে পাইল না। ভূপেনের দৃষ্টি তখনও খড়্‌খড়িতে আবদ্ধ। হুড়্‌মুড় করিয়া রিক্‌শা তাহাকে চাপা দিল। বৃক্ষচ্যুত শাখার মত ভূপেন বাতাসে দুলিয়া রাস্তায় পড়িয়া গেল। মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের ঔদার্য্যে মুক্ত-প্রস্তরখণ্ড সর্ব্বদাই রাস্তার উপর ভাসিতে পায়, সেই সুযোগে তাহারা ভূপেনকে আক্রমণ করিল। ভূপেনের কপোলদেশে খরস্রোত বহিতে লাগিল।

(৯)

গোলমালের শব্দে খড়্‌খড়ির পাশ হইতে ঈষৎ মুখ বাড়াইয়া ঠান্‌দিদি দেখিল, অর্দ্ধ অচেতন একজনকে সকলে ধরাধরি করিয়া ডাক্তারখানায় আনিতেছে। ভূপেনকে চিনিতে পারিয়া, ঠান্‌দিদি তখনই তাহাকে উপরে আনিবার জন্য দাদামহাশয়কে খবর পাঠাইলেন। দাদামহাশয় ভূপেনকে চিনিতেন না, তবে গৃহিণীর আদেশে বুঝিলেন, নিশ্চয়ই কোন আত্মীয় হইবে। তাড়াতাড়ি কতকগুলি ঔষধ ও যন্ত্রাদি লইয়া তিনি ভূপেনকে উপরে তুলিলেন। ভূপেন তখন জীবিত কি মৃত তাহা সে নিজেই জানে না। দাদামহাশয় পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন, জীবিত বটে। ক্ষতস্থান বাঁধিয়া, তিনি ভূপেনকে এক ডোস্ ভাইনম্ গ্যালিসিয়া খাওয়াইলেন। এ ডোস্‌টী নেমক হারামী করিল না। অল্পক্ষণেই ভূপেনের ভয়-বিজড়িত নয়ন ঈষৎ নড়িতে লাগিল; সে বুঝিল, এখনও বাঁচিয়া আছে, পাশে কে যেন তাহাকে বাতাস করিতেছে। চক্ষু মেলিয়া দেখিল, ঠান্‌দিদি। পলকে পুলক তড়িতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া গেল, শুনিল, বীণার তানে ঠান্‌দিদি দাদামহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "কেমন দেখ্‌লে?" দাদামহাশয় উত্তর দিলেন,—"তেমন কিছু নয়, শুধু কপালের ছালটা একটু ছড়ে গেছে।" ঠান্‌দিদি আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"এমন নির্ঝুম হয়ে আছে কেন?" দাদামহাশয় বলিলেন,—"ও শুধু আতঙ্কে; এখনই উঠে বাড়ী যেতে পার্‌বে।"

এই নির্ম্মম কর্কশ অভিমতে ভূপেন চীৎকার করিয়া উঠিল, ছট্‌ফট্

করিয়া জ্ঞানহারা হইল। দাদামহাশয় আর এক ডোস্ ভাইনম গ্যালেসিয়া মেজার গেলাসে ঢালিলেন। ক্ষিপ্তের ন্যায় উঠিয়া ভূপেন তাহা খাইয়া ফেলিল, তারপর বজ্রমুষ্টিতে ঠান্‌দিদির হাত ধরিয়া শুইয়া পড়িল। আস্তে আস্তে হাত মুক্ত করিয়া, ঠান্‌দিদি দাদামহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল,—"হঠাৎ এমন বিকারের মতন হ'ল কেন?" "দেখ্‌ছি" বলিয়া দাদামহাশয় আবার ভূপেনকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, শেষে তাহাকে বলিলেন,—"তোমার কোথাও কোন কষ্ট হচ্ছে কি?" ঠান্‌দিদির দিকে চাহিয়া ভূপেন নিজের হৃদিস্থান দেখাইল। কাণে ষ্টেথিস্কোপ লাগাইয়া দাদামহাশয় শুনিলেন, হৃদ্‌পিণ্ডটা জোরে ধড়াস ধড়াস করিতেছে, বলিলেন,—"ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।" ঠান্‌দিদি তাহাতে বলিল,—"তা'হলে আজ আমারই কাছে থাক্, তুমি বাড়ীতে খবর দিয়ে এস।"

প্রেমানন্দে ভূপেনের হৃদয় নাচিয়া উঠিল।

(১০)

ঠান্‌দিদির হুকুম তামিল করিতে আসিয়া দাদামহাশয় দেখিলেন, মাধববাবু বাড়ী নাই। ঠান্‌দিদি তাঁহার হাতে একখানি পত্র দিয়াছিল; সেখানি চাকরের মারফৎ সরযূকে পাঠাইয়া দাদা মাহাশয় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ঠান্‌দিদি লিখিয়াছেন,—"তিলোত্তমা! তোর জগৎ সিংহ এখন আয়েষার শুশ্রূষায় মুগ্ধ। আসিয়া পড়িয়াছে আহত হইয়া—তবে পাঠানের তরবারি-আঘাতে নয়, চীনের রিক্‌শা চাপায়। হাকিম হাজির ছিলেন, বলিলেন, ভাবিবার কোন কারণ নাই, শুধু আর একবার পরীক্ষার প্রয়োজন। হাকিম স্বয়ং ওস্‌মান, তার কথায় কতটা বিশ্বাস করা যায় ভাবিয়া দেখিস্। ইতি—

ওসমানে অনুরক্তা তোর
আয়েষা।

অল্পক্ষণেই মাধববাবু ফিরিয়া আসিলেন। পুত্রের দুর্ঘটনার কথা শুনিয়া তিনি গৃহিণীকে লইয়া তখনই দাদা মহাশয়ের গাড়ীতেই রওনা হইলেন। ঠান্‌দিদির পত্র পাইয়া সরযূ যাইবার জন্য বড় ঠাকুরঝির কাছে দরবার করিয়াছিল, সেও সঙ্গে চলিল।

ঠান্‌দিদির বাড়ী পৌঁছিতে আধঘণ্টার বেশী সময় লাগিল না। পুত্রের অবস্থা দেখিয়া ভূপেনের মাতা কাতর হইয়া পড়িলেন, তাহাকে বাড়ী লইয়া যাবার কথা তুলিলেন। ভূপেন তাহাতে কাঁদিয়া উঠিল, বলিল,—"মা, আমার

বড় লেগেছে, উঠ্‌তে পার্‌বো না।" দাদা মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া মাধববাবু স্থির করিলেন, আজ নাড়া-চাড়া না করাই ভাল। অনেক রাত্রে তাঁহারা বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। ঠান্‌দিদির অনুরোধে সরযূকে তাহারা থাকিবার অনুমতি দিলেন।

শ্বশ্রূঠাকুরাণী চলিয়া গেলে, সরযূ নিঃশব্দে ভূপেনের পার্শ্বে আসিয়া বসিল। ভূপেন তখন ঘুমাইতেছিল। তাহার কপালে পটি দেখিয়া সরযূ শিহরিয়া উঠিল। স্বপ্নের ঘোরে ভূপেনের অধরে হাসির রেখা ভাসিয়া গেল। সরযূ আস্তে আস্তে তাহার শিয়রে হাত বুলাইতে লাগিল। কোমল স্পর্শে ভূপেন চোখ চাহিল। রঙ্গিন রেশমী আবরণে ঘেরা একটা বিজলীর আলো ঘরটাকে আঁধার আলোয় ঘিরিয়াছিল; তাহার গোলাপী আভা সরযূর আননে সরোজ শোভা ছড়াইয়া দিয়াছিল। ঠান্‌দিদি ভাবিয়া, সরযূর হাতখানি নিজের বুকে ধরিয়া, অনুরাগ বিহ্বলস্বরে, ভূপেন ডাকিল, "ঠান্‌দিদি! সরযূর বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। উত্তর না পাইয়া ভূপেন আবার বলিল,—"ঠান্‌দিদি! আমার সঙ্গে দেখা না ক'রে চলে এলে কেন?" সরযূ তবুও নিরুত্তর। রুদ্ধ কামনার আবেগে ভূপেন বলিল,—"বল ঠান্‌দিদি, বল; একবার দুটো কথা কও, আমি যে তোমায় বড় ভালবাসি।" হৃদয় ফাটিয়া অশ্রুর ফোয়ারা দর্‌দরধারে সরযূর নয়ন বহিয়া গেল। দুই ফোঁটা জল ভূপেনের ক্ষতস্থানে গিয়া পড়িল। ভূপেন তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল, বলিল,—"কাঁদ্‌ছো?" সরযূ কিছু বলিতে পারিল না। সাদর কম্পিত হস্তে তাহার মুখের কাপড় সরাইয়া ভূপেন দেখিল, সরযূ; তখন কোমল পরশ হইতে তাহার ব্যথিত হাতখানি ছুড়িয়া দিয়া বলিল,—"তুমি দুর হও।"

অযত্নের কুসুম মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

(১১)

পরদিন ভূপেনের কপালের পটি খুলিয়া দাদা মহাশয় দেখিলেন, একটী আঁচড় ছাড়া আঘাতের আর কোন চিহ্ন নাই। আর কোন ঔষধ দেওয়া তিনি দরকার মনে করিলেন না। সকালবেলাই ভূপেনের মাতা ও বড় দিদি আসিয়াছিলেন; তাঁহারা ভূপেনকে বাড়ী যাওয়ার কথা বলিলেন। সকাতর ভূপেন অনুযোগ করিল, এখনও তাহার বুকের ব্যথা মরে নাই, উঠিতে হইলেই সে আর বাঁচিবে না।

মাধববাবু নিজের ডাক্তারকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তিনি দাদা মহাশয়কে

বলিলেন,—"একবার এক্সরেজ (X Rays) দিয়া দেখ্‌লে হয় না?" পূর্ব্ব রাত্রে দাদা মহাশয়ও এই ব্যবস্থা স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু তারপর দরকার নাই বুঝিয়া, এ বিষয়ে আর মনোযোগ করেন নাই। ডাক্তারবাবুর প্রশ্নে তিনি আসিয়া বলিলেন,—"হানি কি!"

এক্সরেজ দিয়া ভূপেনকে পরীক্ষা করা হইল। তাহাতে কোথাও কোন আঘাতের দাগ বা চিহ্ন দেখা গেল না। মাধববাবুর মনের বোঝা নামিয়া গেল। ভূপেন কিন্তু বড় কাতর হইয়া পড়িল, বলিল,—"ডাক্তারবাবু, ভাল ক'রে দেখুন; আমার বড় কষ্ট হচ্ছে।" ডাক্তারবাবু অনেক বুঝাইলেন, এক্সরেজ কখনও মিথ্যা বলে না, বিজ্ঞানের কখনও ভুল হয় না, ভয়-সম্ভূত কাল্পনিক বেদনায় ভূপেন খামকা নিজের অনিষ্ট করিতেছে। ভূপেন ইহাতে বিরক্ত হইয়া বলিল,—"আমি আপনার বিজ্ঞান মানি না।" দাদা মহাশয় এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন, ভূপেনের অধীরতায় ডাক্তারবাবুকে বলিলেন,—"বোধ হয় ভিতরে গুরুতর ঘা খাইয়াছে, বাহিরে তাহা প্রকাশ পায় নাই।" ডাক্তারবাবু বলিলেন,—"তা সম্ভব নয়।" দাদা মহাশয় বলিলেন,—"অসম্ভবই বা কিসে?"

নানা যুক্তির পর স্থির হইল, আজও ভূপেনকে না সরানই ভাল। ইহাতে ভূপেন কতকটা হাঁফ ছাড়িল বটে, কিন্তু সুস্থির হইতে পারিল না। আজ সারাদিন সে ঠান্‌দিদিকে দেখিতে পায় নাই। অনেকবার ঠান্‌দিদি সামনের দালান দিয়া চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু একবারও ঘরে আসে নাই। সারাদিনের অদর্শনে ভূপেনের রুদ্ধ কামনা যতই জাগিয়া উঠিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে হতাশের ছায়া ততই ঘনীভূত হইয়া আসিতেছিল। দিবা অবসানের সঙ্গে সে অধৈর্য্য হইয়া উঠিল। তাহার মাতা, বড়দিদি ও বাড়ীর সকলে চলিয়া গিয়াছিল। ঘরে কেহ নাই দেখিয়া, ভূপেন শয্যা ছাড়িয়া ঘরে পায়চারী করিতে লাগিল। আশা নিরাশার মাঝে তখন সে ব্যাকুল।

হঠাৎ দাদা মহাশয় আসিয়া পড়ায় ভূপেন "গেলুম গেলুম" বলিয়া শয্যায় লুটিয়া পড়িল। ঠিক সেই সময় ঠান্‌দিদির ছায়া ঘরে আসিয়া পড়িল। ধীর-পদে শয্যার নিকটে আসিয়া ঠান্‌দিদি দাদা মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল,—"রোগীর অবস্থা কিরূপ?"

দাদা মহাশয় বলিলেন,—"ভালই বোধ হচ্ছে।"

ঠান্‌দিদি। তা হ'লে এত কাতর কেন?

দাদা। বোধ হয় বেদনায়।

ঠানদিদি। উপশমের কি ব্যবস্থা করেছ?

দাদা। দরকার বোধ করি নাই।

ঠানদিদি। তুমি মূর্খ আনাড়ী। আজ রাত্রে এ রোগীর চিকিৎসা-ভার আমিই গ্রহণ করিব।

দাদা। তুমি?

ঠান্‌দিদি। হাঁ।

দাদা। এ উত্তম।

ঠান্‌দিদি। কি উত্তম, ডাক্তার?

দাদা। নিশীথে একাকিনী যুবকের পরিচর্য্যা করা কুলবধূর পক্ষে উত্তম।

ঠান্‌দিদি। উত্তম কি অধম সে কথায় গোলামের প্রয়োজন নাই।

দাদা। আর গোলাম যদি কৈফিয়ৎ চায়?

ঠান্‌দিদি। তাহলে আমার উত্তর এই যে, এই যুবকই আমার সোহাগ।

ঠান্‌দিদির যেন কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। দাদা মহাশয়ও অন্য দিকে চলিয়া গেলেন। পুলক বিহ্বল হৃদয়ে ভূপেন শয্যা ছাড়িয়া দাঁড়াইল।

(১২)

যে আশার আলোড়নে এ কয়দিন অধীর হইয়া বেড়াইয়াছিল, তাহা যে এত অনায়াস-সাধ্য হইবে, ভূপেন প্রথমে মনে করে নাই। এখন ঈপ্সিত লাভ নিশ্চিত জানিয়া, সে একবারও ভাবিল না, কেন এত সহজে সে ঠান্‌দিদির হৃদয় অধিকার করিল। যে নিজেকে ভালবাসে, অপরের প্রণয় লাভে সে কি কখনও বিস্মিত হয়। দাদা মহাশয়কে প্রত্যাখ্যান করা ঠান্‌দিদির পক্ষে উচিত কি অনুচিত, এ চিন্তার ছায়াটুকুও ভূপেনের উল্লাস তরঙ্গে পৌঁছিল না। ঠান্‌দিদি ত তাহার বিবাহিতা পত্নী নয়।

সাদা পাথরের ব্র্যাকেটে রক্ষিত একখানি বড় আয়না ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গান ছিল। তাহাতে ভূপেন দেখিতে পাইল, একদিনের অযত্নে মাথার চুলগুলি স্থানভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। ব্র্যাকেটে টয়লেটের জিনিস সবই সাজান ছিল, কে যেন সোহাগের হাতে তাহারই জন্য রাখিয়া দিয়াছে। কুঞ্চিত কেশ-পাশ ললাটে কেয়ারী করিয়া ভূপেন নিজের মুখখানি মিল্ক-অফ-রোজে মুছিয়া লইল। তারপর এই মোহন সাজে ঠান্‌দিদির অপেক্ষায় বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। রাত ক্রমে গভীর হইল। নিশার আঁধারে দিবার কোলাহল নিভিয়া গেল। তবুও ঠান্‌দিদি আসিল না। অধৈর্য্য পরে ভূপেন তখন ঘরে বেড়াইতে লাগিল। টেবিলের উপর পালিশ করা রূপার ফ্রেমে ঠান্‌দিদির একখানি ফটো ছিল। হঠাৎ দেখিতে পাইয়া ভূপেন তাহা তুলিয়া লইল। সাম্‌নের একখানি চেয়ারে বসিয়া ভূপেন অনিমিষ মুগ্ধ নয়নে সেই রুদ্ধ রূপরাশি দেখিতে লাগিল। ফটোখানি অধরে তোলে তোলে এমন সময়ে খট্‌ করিয়া ঘরের আলো নিভিয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে দরজার কাছে মৃদু পদশব্দ হইল, শুনিল, ঠান্‌দিদি মধুর কণ্ঠে বলিতেছে,—"নাতজামাই, আমি এসেছি।" বিহ্বল কম্পিত স্বরে ভূপেন উত্তর দিল,—"ঠান্‌দিদি, ঠান্‌দিদি, কাছে এস।" নিজের গলা চাপিয়া ঠান্‌দিদি বলিল,—"আস্তে, তোমার দাদামহাশয় এখনও জেগে আছে।" আবেগ হৃদয় কি এ বাধা মানে? ভূপেন বলিল,—"ঠান্‌দিদি, ঠান্‌দিদি, একবার বল, তুমি আমায় ভালবাস?"

ঠান্‌দিদি। ভালবাসার জিনিষ কে না ভালবাসে?

ভূপেন। না, না, তুমি বল, শুধু আমায় ভালবাস।

ঠান্‌দিদি! তোমায় ডালবাস্‌বো না? তুমি যে আমার সরযূর বর।

ভূপেন। আমি সরযূকে চাই না; তুমিই আমার প্রাণেশ্বরী। বল, তুমি আমায় ভালবাস।

ঠান্‌দিদি। ছিঃ। তোমার দাদামহাশয়ের বাড়ী বসে ও কথা বল্‌লে যে আমার নেমকহারামী করা হবে।

ভূপেন। তবে তুমি আমার সঙ্গে চ'ল।

ঠান্‌দিদি। কোথায়?

ভূপেন। যেখানে আমাদের এই বুকভরা ভালবাসার মানা নাই, বিরাম নাই।

ঠান্‌দিদি। সে কোথায়?

ভূপেন। যেখানে দাদামহাশয় নাই, সরযূ নাই, সেইখানে।

ঠান্‌দিদি। সে যে সংসারের বাহিরে।

ভূপেন। তাতেই বা কি এসে যায়।

ঠান্‌দিদি। সংসার ছাড়া কি থাকা যায়?

ভূপেন। কেন?

ঠান্‌দিদি। লোকে যে নিন্দা করবে

ভূপেন। প্রণয় কি লোক-নিন্দায় কলুষিত হয়?

ঠান্‌দিদি। যদি নেশা কাটিলে তুমি আবার সরযূকে চাও?

ভূপেন। সে আমার জীবনের শনি। ঠান্‌দিদি, ঠান্‌দিদি, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমার সঙ্গে চল।

ঠান্‌দিদি। আমি গেলে তোমার দাদামহাশয়ের যে বড় কষ্ট হবে।

ভূপেন। সে কি তোমার ভালবাসার যোগ্য।

ঠান্‌দিদি। প্রণয় যে অন্ধ, যোগ্য অযোগ্য, উচিত অনুচিত, বিচার করে না!

ভূপেন। তুমি দাদামহাশয়কে ভালবাস?

ঠানদিদি। যদি বলি বাসি?

ভূপেন। না, তা হতে পারে না। নিশ্চয়ই তুমি ব্যঙ্গ করছো।

ঠান্‌দিদি। তাই নয় ধরে নিলাম, কিন্তু আমি না থাক্‌লে যে, সে বেচারা বড় বিপদে পড়্‌বে। কে তাকে সকালবেলা খাওয়াবে, দুপুর বেলা ভাত রেঁধে দেবে, রাত্তির বেলা মাথায় বাতাস কর্‌বে?

ভূপেন। ঠান্‌দিদি ঠান্‌দিদি, আর বলো না। আশার উন্নত শিখরে তুলে, আমায় ফেলে দিও না। আমি যে বড় অভাগা। তোমায় না পেলে আমি প্রাণে মারা যাব।

ঠান্‌দিদি। তা হলে যেতেই হবে। কিন্তু আমি ত তোমার মত হাঁট্‌তে পারবো না।

ভূপেন। আমি এখনই তোমার জন্য ট্যাক্সি আন্‌ছি। ভূপেন ট্যাক্সি আনিতে ছুটিল। ঠান্‌দিদি এতক্ষণ দরজা গোড়ায় দাঁড়াইয়াছিল। হঠাৎ ঘরের ভিতর আসিয়া, ভূপেনকে ডাকিল, বলিল,—"একটা কথা বল্‌তে ভুল হয়েছে।" দালান হইতে ফিরিয়া আবেগ রুদ্ধকণ্ঠে ভূপেন জিজ্ঞাসা করিল, "কি?" আস্তে আস্তে ঠান্‌দিদি বলিল,—"আমি চলে গেলে, সরযূ যদি আমার জায়গা দখল করে?" ভূপেন থমকিয়া গেল, একটা ঢোঁক গিলিয়া বলিল,—"না, না, তা কেন হ'বে, তা'কি হয়!" ঠান্‌দিদি বলিল,—"হাঁ গো নাতজামাই, আজ সারাদিন দু'জনে ফিস্‌ ফিস্‌ কর্‌ছে, কি যে মনে আছে জানি না!" জড়িত স্বরে ভূপেন বলিল,—"তোমার দাদামহাশয়, এই দু'জনে।" উত্তেজিত কণ্ঠে ভূপেন বলিল,—"সত্য বলছো?" ঠান্‌দিদি উত্তর দিল, "আমি যে দেখেছি। তখন খুব হাসিখুসী করছিল, আমি যেতে

থেমে গেল। প্রাণ থাক্‌তে আমি সরযূকে তোমার দাদামহাশয়ের হৃদয়ের অধিকারী হতে দেবো না।"

ভূপেন আর দাঁড়াইতে পারিল না, ঘরের মেঝেয় শূন্য আসনে বসিয়া পড়িল। আঁধারেও তাহার সিক্ত নয়ন জ্বলিয়া উঠিল, নীরব ব্যথায় সে আচ্ছন্ন হইল। ঠান্‌দিদি তখন আস্তে আস্তে তাহার কাছে অগ্রসর হইল, বলিল,—"তা সরযূ তোমার দাদামহাশয়ের হয় হ'ক গে। তাতে আমাদের কি এসে যাবে। আমরা দুজনে ত আমাদের হ'ব। বেশ হ'বে, চাঁদে চাঁদে বদলে যাবে। আমি তোমারই সঙ্গে যাব।" কথাগুলি ভূপেনের হৃদয়ে বিঁধিতে লাগিল, তাহার মনে হইল, সেগুলির অক্ষরে অক্ষরে শ্লেষ। ভূপেন কোন উত্তর দিল না। ঠান্‌দিদি আবার বলিল,—"চুপ করে ব'সে রইলে যে, গাড়ী নিয়ে এস।" রাগে, ক্ষোভে দুঃখে কাঁপিতে কাঁপিতে ভূপেন বলিয়া ফেলিল,—"তুমি শয়তানী, দূর হও।"

হো হো ক'রে হাসিয়া ঠান্‌দিদি চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের সমস্ত বাতিগুলি জ্বলিয়া উঠিল। আঁধার ঘর আলোয় ভরিয়া গেল। ভূপেন দেখিল, সামনের দরজা খোলা, পাশের ঘর উজ্জ্বল আলোয় নাচিতেছে, ঘরের মাঝে একখানি সোফায় সরযূ বসিয়া আছে, তাহার পরিধানে রেশমী ধূপছায়া সাড়ী, কুন্তলের সৌরভে আঁচলদেশ হেলিয়া পড়িয়াছে, যেন উল্লাসে উথলিয়া মাটিতে লুটাইতেছে, সোহাগে সে আঁচল ধরিয়া দাদামহাশয় সরযূর বেণী কুসুমহারে সাজাইতেছে।

এ দৃশ্য কখনও ভূপেনের কল্পনায় আসে নাই। তাহার চক্ষু ঝলসিয়া গেল, আর চাহিতে পারিল না। নয়ন মুদিয়া খানিক বসিয়া রহিল। মনের আবেগে আবার চাহিয়া দেখিল, সরযূর কম্পিত হাত দুখানি দাদামহাশয়ের মুষ্টিতে আবদ্ধ। ভূপেন আর থাকিতে পারিল না। পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া দাদামহাশয়কে জোরে ঠেলিয়া দিয়া, সরযূকে নিজের হৃদয়ে লইল। এমন সময় হাসিতে হাসিতে ঠান্‌দিদি আসিয়া বলিল,—"কৈ গো নাতজামাই, গাড়ী কই? আমি যে তোমার সঙ্গে যাব ব'লে মেজেছি।"

"মা" "মা" বলিয়া ভূপেন ঠানদিদির পায়ে লুটাইয়া পড়িল।

শাশ্বতী-বাণী।

লেখক,—শ্রীমৎ স্বামী যোগেশ্বরানন্দ এম, এ।

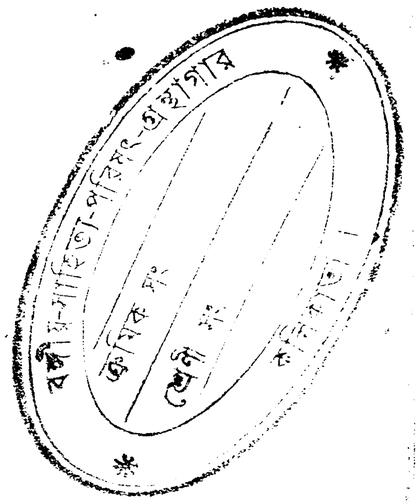

(১)

মহিমা বাণীর তব কে করে বর্ণন?
তোমারি অমৃতমাখা অমর বচনে
মোহিত জগৎ লভি নবীন জীবন;
অপূর্ব্ব গরিমাগীতি গাহে ক্ষণে ক্ষণে।
হৃদয়-আলয়ে পশি,
বাসনার বিষ নাশি,
করি প্রাণ সন্তাপবিহীন।
বাণী তব র'বে চিরদিন॥

(২)

আসে যায় কত শত নর-নারীগণ,
খেলে কত খেলাধূলা হাসে কাঁদে গায়,
কাম ক্রোধ কোলাহল উৎসাহ গর্জ্জন,
নীরব নীথর সব জীবন-সন্ধ্যায়।
জীবের জীবন হায়,
জোনাকির আলো প্রায়,
ক্ষণে জ্বলে, ক্ষণে হ'বে ক্ষীণ।
বাণী তব র'বে চিরদিন॥

(৩)

আজি এ শতাব্দীমাঝে নানা জাতিগণ,
বিপুল বিক্রমদম্ভে কাঁপায় ধরায়;
খেলিছে অনন্ত কিন্তু কাল অনুক্ষণ,
নাশিবে সকলি স্রোত-তরঙ্গের ঘায়।
বিদ্যা বুদ্ধি আস্ফালন,
শৌর্য্য কার্য্য অগণন,
ক্ষণমাত্র হবে ক্ষণে লীন।
বাণী তব র'বে চিরদিন॥

(৪)

বিচিত্র নটন-শালা মেদিনীর মাঝে,
রঙ্গে ভঙ্গে আজি যারা করিছে নর্ত্তন,
যাবে কালি দূরে ফেলি নিজ নিজ সাজে,
ফুরাবে সুখের গাথা, দুখের রোদন।
আসিবে নূতন দল,
দেখাইয়া বুদ্ধি বল,
হবে পুন শবদবিহীন।
বাণী তব র'বে চিরদিন॥

(৫)

চলে ধরা বেগভরে ধরি হৃদি 'পরে,
কোটি কোটি নরনারী জীব অগণিত,
মিশিবারে কালক্রমে কারণসাগরে,
বিরামবিহীন গতি, সতত ঘূর্ণিত।
সূর্য্য চন্দ্র গ্রহকুল,
তারারাজি জ্যোতি'ফুল,
শুখাইবে অম্বর-অন্তরে।
বাণী তব র'বে চিরতরে॥

(৬)

আছিল জগৎ যবে বিলীন কারণে,
অচল স্পন্দনহীন সুষুপ্ত সংসার;
অনাদি অনন্ত বাণী উঠি ঈশমনে
সৃজিল জাগাল ধীরে জগৎ আবার।
সূর্য্য চন্দ্র গ্রহগণ,
তারারাশি অগণন,
সেই হতে আলোকি গগন,
বাণী-গুণ ঘোষে অনুক্ষণ॥

(৭)

জ্ঞানহীন নর, নাহি বিবেক বিচার,
কামবশ, আত্মলাভে প্রযত্নবিহীন,

নেহারি বিচিত্র বাণী ধ্বনিল আবার;
ঋষিকুল শুনি বাণী আনন্দে বিলীন!
ভানুর আলোক সম,
বেদান্তের অনুপম
উপদেশ অমল অক্ষরে।
বাণী সেই রাজে চিরতরে॥

(৮)

যুগে যুগে যবে ধরা অধর্ম্মপীড়িত,
পাপরাশি যবে নাশি বিবেকবিচার,
ধরম ধার্ম্মিক গ্লানি করি সংঘটিত,
গ্রাসিতে নাশিতে উঠে সকল সংসার।
সেই সে বিষম ক্ষণে,
তারিবারে সাধুগণে,
স্থাপিবারে ধরম আবার।
বাণী তব আসে বারবার॥

(৯)

ত্যজি তথ্য সত্য-পথ বিপথেতে গতি,
অহংকারে অন্ধ-আঁখি নিজ লক্ষ্যচ্যুত,
সাধনা কর্ত্তব্য ভুলি কলহেতে মতি,
হেরি নরে দলাদলি কোলাহলরত।
বহুমতসমন্বয়,
জ্ঞানভক্তিভাবময়,
তৃষিত-যাচিত-বারি-মত।
বাণী তব পুন সমাগত॥

(১০)

জীবনদায়িনী পুতপ্রবাহিণী প্রায়,
দেশদেশান্তরে বাণী হেরি ধীরে যায়,
মধুর বাণীর ধ্বনি মোহিছে সবায়;
পাপ তাপ শোক মোহ সুদূরে পলায়।

নবপ্রাণে চঞ্চলিত,
হৃদি সব কুসুমিত,
অভিনব ভাব স্ফুরে তায়।
সাধনা-সামর্থ্যে বাণী সবারে জাগায়॥

(১১)

বিজনে বসিয়া যবে মুদিয়া নয়ন,
নিবারি ইন্দ্রিয়গণে বিষয়সঞ্চারে,
ধ্যানভরে হেরি তব রূপ বিমোহন,
জ্যোতি'জাল উজলিত হৃদয়মাঝারে।
অন্তরে তখন শুনি,
গরজি গরজি বাণী,
উঠি কহে,—"যাও দ্বারে দ্বারে।
পেয়েছ অমৃত-ফল, বিতর সবারে॥

(১২)

যাও যথা নর নারী করিছে ক্রন্দন,
ভুলিয়া কর্ত্তব্য কিম্বা মোহেতে মগন,
অজ্ঞান আঁধারে যথা ভয় অনুক্ষণ,
যাও সেথা, কর আঁখিবারি নিবারণ।
কহিয়া অভয়বাণী,
জ্ঞানের কিরণ আনি,
কর যত দু'খ বিমোচন।
লভেছ জীবন, সবে বিলাও জীবন॥"

নিত্য-কৃত্য।

লেখক,—পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।

৺ পিতৃ-মাতৃপদযুগে করিয়া প্রণাম।
নিত্য-কৃত্য লিখিবারে প্রবৃত্ত হইলাম॥ ১॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল।
শাস্ত্রানুসারে বর্ণিত আছে অবিকল॥ ২॥
শেষরাত্রে শয্যাকৃত্য হ'তে আরম্ভণ।
সমুদায় দিনকৃত্য রাত্রিতে শয়ন॥ ৩॥
আর্য্যজাতি স্ত্রী এবং পুরুষের কার্য্য।
ঋষিবাক্য অনুসারে হইয়াছে ধার্য্য॥ ৪॥
ওহে ধর্ম্মপরায়ণ! আর্য্যের সন্তান!
শ্রবণ করহ যদি জুড়াইবে প্রাণ॥ ৫॥
"নিত্য-কৃত্য" মৎকৃত জীবন শিক্ষার।
পরিশিষ্টরূপে হ'ল বঙ্গেতে প্রচার॥ ৬॥

শয্যাকৃত্য।—রাত্রিশেষে নিদ্রাভঙ্গের পরে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে * শয়নে থাকিতেই প্রথমে নিজের হিত চিন্তা করিয়া আগামী দিবস যাহাতে সুখে সুখে যায়, এজন্য ঈশ্বর, দেবতা, ঋষিগণ এবং ঈশ্বরানুগৃহীত মহাপুরুষদিগের গুণ কীর্ত্তন ও শুভ প্রার্থনা করিবে। যথা—

---

* "রাত্রেশ্চ পশ্চিমে যামে মুহূর্ত্তো যস্তৃতীয়কঃ।
স ব্রাহ্ম ইতি বিখ্যাতো বিহিতঃ সংপ্রবোধনে॥" (রাত্রের শেষ চারি দণ্ড ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত) আহ্নিকতত্ত্ব, সুস্তম।
"দ্বৌ দণ্ডৌ রাত্রিশেষস্তু ব্রাহ্মমুহূর্ত্তকং বিদুঃ। (যামল, শাক্তানন্দ)
(রাত্রির শেষ দুই দণ্ড ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত, ইহা তন্ত্রের মত)
"ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত স্মরেদ্দেববরান্ ঋষীন্।" (বামন পু.)
"প্রবুদ্ধশ্চিন্তয়েদ্ধর্ম্মমর্থঞ্চাস্যাবিরোধিনম্।
অপীড়য়া তয়োঃ কাম্যমুভয়োরপি চিন্তয়েৎ॥" (বিষ্ণু পু. ৩।১১।৫)
"রজনিপ্রান্তযামার্দ্ধং ব্রাহ্মঃ সময় উচ্যতে।
স্বহিতং চিন্তয়েৎ প্রাজ্ঞ স্তস্মিংশ্চোত্থায় সর্ব্বদা॥" (স্কন্দ ব্রহ্ম ধর্ম্মারণ্য ৫।৩১।

"প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাক্ষরদ্বয়ম্।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥ ১॥

"ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনি-রাহু-কেতবঃ, কুর্ব্বন্ত সর্ব্বে মম সুপ্রভাতম্॥ ২॥

"অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চ কন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং সৌভাগ্যং তস্য বর্দ্ধতে॥ ৩॥

"পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ॥" ৪॥

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥" ৫॥

রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন॥ ৬

নারায়ণপরা বেদা নারায়ণপরাক্ষরাঃ।
নারায়ণপরা মুক্তির্নারায়ণপরা গতিঃ॥ ৭॥

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" ৮॥

অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥ ৯॥

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তির্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥১০॥

(গোতমীয়)

লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে॥ ১১॥

যদীচ্ছসি ক্ষয়ং নেতুং পাপং জন্মশতার্জ্জিতম্।
প্রাতরুত্থায় ভূপাল কুরু গোবিন্দ-কীর্ত্তনম্॥ ১২॥

অর্জ্জুনঃ ফাল্গুনী জিষ্ণুঃ কিরীটী শ্বেতবাহনঃ।
বীভৎসুর্ব্বিজয়ী কৃষ্ণঃ সব্যসাচী ধনঞ্জয়ঃ॥

এতান্যর্জ্জুননামানি প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
উদ্যতেষপি শস্ত্রেষু হন্তা তস্য ন বিদ্যতে॥ ১৩/১৪॥

"কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনো নাম রাজা বাহুসহস্রধৃক্।
যেন সাগরপর্য্যন্তং ধনুষা নির্জ্জিতা মহী॥

যোঽস্য সংকীর্ত্তয়েন্নাম কল্যমুত্থায় মানবঃ।
ন তস্য বিত্তনাশঃ স্যান্নষ্টঞ্চ লভতে পুনঃ॥" ১৫।১৬॥

"বিশ্বেশং মাধবং ধুণ্ডিং দণ্ডপাণিঞ্চ ভৈরবম্।
বন্দে কাশীং গুহাং গঙ্গাং ভবানীং মণিকর্ণিকাম্॥" ১৭॥

"শিবঃ কাশী শিবঃ কাশী কাশী কাশী শিবঃ শিবঃ।
ইতি জপেন্নরো নিত্যং কাশীবাসফলং লভেৎ॥" ১৮॥

"শূলং শূলী চক্রমাদায় চক্রী বজ্রং বজ্রী পাশমাদায় পাশী।
ধাবত্যগ্রে পৃষ্ঠতঃ পার্শ্বয়োশ্চ দুর্গা দুর্গাবাদিনাং রক্ষণায়॥" ১৯॥

ইত্যাদি শ্লোক পাঠ করিয়া নিজের নিঃশ্বাস পরীক্ষা করিবে। নিঃশ্বাস কি দক্ষিণ নাসায় বহিতেছে? না বাম নাসায় বহিতেছে? যদি দক্ষিণ নাসায় নিঃশ্বাস বহে, তবে পুরুষের শুভ, স্ত্রীলোকের অশুভ জানিবে; ইহার বিপরীতে স্ত্রীলোকের শুভ, পুরুষের অশুভ জানিবে; ইহা সাধারণ নিয়ম।

এখন যে নাসায়ই নিঃশ্বাস প্রবাহ হউক না কেন? যে নাসায় নিঃশ্বাস বহে, পুরুষ দক্ষিণ হস্তে আর স্ত্রীলোক বাম হস্তে নিজের মুখ তিনবার মার্জ্জন করিয়া সেই অঙ্গে উভয় হস্ত স্থাপনপূর্ব্বক "দুর্গা দুর্গা, জয় দুর্গে শ্রীদুর্গে, জয় গণেশ শ্রীগণেশ" ইত্যাদি যাহার যেমন রুচি, তদনুসারে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে পুরুষ দক্ষিণ পার্শ্বে, আর স্ত্রীলোক বামপার্শ্বে ভর করিয়া শয়ন হইতে উঠিয়া বসিবে।

নারদপঞ্চরাত্রের মতে—পুরুষ দক্ষিণাঙ্গে ভর করিয়া উঠিয়া প্রথমে বামপাদ ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে।

"নরস্য দক্ষঃ শ্বাসশ্চ স্ত্রিয়া বামঃ প্রশস্যতে।" (প্রাণতোষণী, সূক্ষ্মস্বরোদয়)
"যত্রাঙ্গে চরতে বায়ু স্তদঙ্গস্য করস্তথা।
সুপ্তোত্থিতমুখং ঘৃষ্টং লভতে বাঞ্ছিতং ফলম্॥"
"বামে বা দক্ষিণে বাপি যত্র সঞ্চরতে শিবঃ।"
"নিশাবসানে শয়নাৎ স্মৃত্বা নারায়ণং বিভুম্।
উত্থায় দক্ষিণাঙ্গেন বামপাদং ন্যসেদ্ ভুবি॥"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

তৎপরে সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া মূলাধারস্থ স্বয়ম্ভু লিঙ্গকে সার্দ্ধত্রিবলয়-বেষ্টিতা (৩।° সাড়ে তিন বেড়) অসংখ্য বিদ্যুদ্বর্ণা সর্পাকৃতি কুলকুণ্ডলিনী মহাশক্তিকে প্রাণমন্ত্র "হংস"—নিঃশ্বাস উচ্ছ্বাস দ্বারা জাগরিতা করিয়া ধ্যান করিবে।

ধ্যানের প্রকার এইরূপ—কুলকুণ্ডলিনীর পরিমাণ এক বিতস্তি, অতি সূক্ষ্ম। তিনিই আমার অভীষ্ট দেবতা, তাঁহার অঙ্গপ্রভা অসংখ্য বিদ্যুতের মত, তাঁহার অঙ্গপ্রভায় নিজের আপাদমস্তক আলোকিত হইয়াছে।

তিনি জাগরিতা হইয়া মেরুদণ্ডের মধ্যে যে সুষুম্না নাড়ী, তন্মধ্যে বজ্রিণী, তন্মধ্যে চিত্রিণী, তন্মধ্যে ব্রহ্মনাড়ী। এই ব্রহ্মনাড়ীর মধ্য-পথ দিয়া ১ম মূলাধার পদ্ম, ২য় স্বাধিষ্ঠান, ৩য় মণিপূর, ৪র্থ অনাহত, ৫ম বিশুদ্ধ, ৬ষ্ঠ আজ্ঞাচক্র, এই ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া ভ্রূমধ্য হইতে উত্থিত শুভ্রবর্ণ দ্বাদশদল কমলে উপবিষ্ট, তদুপরি অধোমুখে ছত্রাকারে স্থিত যে শুভ্রবর্ণ সহস্রদল-বিশিষ্ট সহস্রার পদ্ম, তাহার নীচে বিরাজমান পরম গুরু—পরমশিব, তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া ক্রীড়া করিতেছেন, এইরূপে চিন্তা করিয়া কুলকুণ্ডলিনীকে নমস্কার করিবে।

এই শরীরে "আমি আমি" এইরূপ যে একটা সংস্কার, এই "আমি" আর অপর কেহ নহে, সেই সচ্চিদানন্দময়ী কুলকুণ্ডলিনীই সেই "আমি"; অতএব মা! আমার স্বরূপ যে তুমি, এই তোমাকে তুমি রক্ষা কর, এইরূপ চিন্তার সহিত নমস্কার করিবে।

তড়িৎকোটিপ্রভাদীপ্তিং চন্দ্রকোটিসুশীতলাম্।
সার্দ্ধত্রিবলয়াকারস্বয়ম্ভুলিঙ্গবেষ্টিতাম্। (নারদপঞ্চ)
উত্থাপয়েন্মহাদেবীং মহাবক্ত্রাং মনোন্মনীম্।
শ্বাসোচ্ছ্বাসাহ্বদ গচ্ছন্তীং দ্বাদশাঙ্গুলরূপিণীম্॥ (প্রাণতো, রুদ্রযামল)
"ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং সূক্ষ্মাং মূলাধারনিবাসিনীম্।
তামিষ্টদেবতারূপাং সার্দ্ধত্রিবলয়ান্বিতাম্॥"
"কোটিসৌদামিনীভাসাং স্বয়ম্ভুলিঙ্গবেষ্টিতাম্।
তামুত্থায় মহাদেবীং প্রাণমন্ত্রেণ সাধকঃ॥
উদ্যদ্দিনকরদ্যোতাং যাবচ্ছ্বাসং দৃঢ়াসনঃ।
অশেষাশুভশান্ত্যর্থং সমাহিতমনাঃ শিবম্।
তৎপ্রভাপটলব্যাপ্তং শরীরমপি চিন্তয়েৎ॥"

তৎপরে মেরুদণ্ডের মূলদেশ হইতে তাহার মধ্য দিয়া ক্রমে উর্দ্ধদিকে উঠিয়া ঘাড়ের ভিতরে বক্রভাবে তালু পর্য্যন্ত উর্দ্ধমুখে উঠিয়া "শঙ্খিনী" নাড়ীর উপরে শুভ্রবর্ণ অমৃতে প্লাবিত একটি সুবিস্তৃত সহস্রদল পদ্ম অধোমুখে রহিয়াছে। আবার তাহার নীচে ভ্রূমধ্য হইতে একটি দ্বাদশদল কমল উঠিয়াছে, তাহার কর্ণিকার উপরে উপবিষ্ট শুভ্রবর্ণ গুরু উপবিষ্ট আছেন, তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র শুভ্রবর্ণ, কণ্ঠে শুভ্রবর্ণ পুষ্পমালা, অঙ্গে শ্বেত চন্দনানুলেপন; গুরু এক হস্তে শিষ্যকে অভয়দান এবং অপর হস্তে বরদান করিতেছেন। গুরুদেবের বাম উরুর উপরে রক্তবর্ণা গুরুপত্নী উপবিষ্টা। উক্ত গুরুদেবকে শিবের তুল্য জ্ঞান করিবে। গুরুদেবের মুখ সর্ব্বদাই প্রসন্ন, নেত্র সুপ্রসন্ন, উক্ত এই অলৌকিক গুরুদেবকে লৌকিক মন্ত্রদাতা গুরু এবং গুরুপত্নীর নাম যোগ করিয়া ধ্যান করিবে। তাহার প্রকার এইরূপ—

"নমঃ শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্।
বরাভয়করং শান্তং স্মরেত্তন্নামপূর্ব্বকম্॥"
শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণং শ্রীঅমুক্যা দেব্যা রক্ত শক্ত্যা সহিতং।

উক্তরূপে ধ্যান পশ্বাচারিগণ করিবে। আর বামাচারিগণের পক্ষে এইরূপ,
"শ্রীঅমুকানন্দনাথং শ্রীঅমুকীং শক্তিমম্বাম্।"

"সহস্রদলপঙ্কজে সকলশীতরশ্মিপ্রভং,
বরাভয়করাম্বুজং বিমলগন্ধ-পুষ্পোক্ষিতম্।
প্রসন্নবদনেক্ষণং সকলদেবতারূপিণং,
স্মরেচ্ছিরসি হংসগং তদভিধানপূর্ব্বং গুরুং॥" নীল, প্রাণ।
"ব্রহ্মরন্ধ্রসরসীরুহোদরে নিত্যলগ্নমবদাতমদ্ভুতম্।
কুণ্ডলীবিবরকাণ্ডমণ্ডিতং দ্বাদশার্ণসরসীরুহং ভজে॥
তত্র নাথচরণারবিন্দয়োঃ কুঙ্কুমাসবঝরীমরন্দয়োঃ।
দ্বন্দ্বমিন্দুমকরন্দশীতলং মানসং স্মরতি মঙ্গলাস্পদম্॥" (পাদুকাপং)
"শশাঙ্কাযুতসঙ্কাশং বরাভয়লসৎকরম্।
শুক্লাম্বরধরং শ্রীমচ্ছুক্লমাল্যানুলেপনম্॥
বামোরৌ রক্তশক্ত্যা চ যুতং দেবাধ্যমব্যয়ম্।
শিবেনৈক্যং সমুন্নীয় ধ্যায়েৎ পরগুরুং ধিয়া॥" (যামল, শাক্তা)
"প্রাতঃ শিরসি শুক্লেঽব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্।
বরাভয়করং শান্তং স্মরেত্তন্নামপূর্ব্বকং॥" (বিশ্বসার, প্রাণ)

ধ্যানের সময় বামহস্তের উপরে দক্ষিণ হস্ত রাখিবে।

উক্তরূপে গুরু ও গুরুপত্নীর ধ্যান করিয়া "ঐঁ" এই গুরুমন্ত্র অন্ততঃ ১০ বার জপ করিয়া বিনা জলেই মনে মনে জপ সমর্পণ করিবে। তৎপরে গুরুকে নমস্কার করিবে। জপ সমর্পণের মন্ত্র এই—

"নমো গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু তৎসর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদাত্ত্বয়ি স্থিতে॥" * (তোড়ল ৫)

"ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোত্থায় চিন্তয়েদ্‌গুরুদৈবতম্।
স্বমূর্দ্ধনি সহস্রারে শিবাখ্যে পরমাত্মনি॥" (গোতমীয়, যামল, শাক্ত।)
"কর্পূরাভং স্মরেত্তত্র শ্রীগুরুং নিজরূপিণম্।
ত্যক্ত্বা মূত্রপুরীষঞ্চ দন্তধাবনমাচরেৎ॥
রাত্রিবাস স্ততস্ত্যক্ত্বা নির্ম্মলানন্দমানসঃ॥" (তারাপ্রদীপ, ২য় পং)
"ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় গুরুং নত্বা স্বনামভিঃ।
গুরুরানন্দনাথান্তশ্চাদ্যান্তা শক্তিরীরিতা॥" (পুরশ্চরণ রসোল্লাস।)
আনন্দনাথশব্দান্তে পূজয়েদথ সাধকঃ॥" (নিত্যাতন্ত্র)
"অথাতঃ প্রাতরুত্থায় শয্যাস্থঃ সুসমাহিতঃ।
শিরস্থকমলে ধ্যায়েৎ স্বগুরুং শিবরূপিণম্॥" (ভৈরবতন্ত্র)
"সর্ব্ববিদ্যাসু সর্ব্বেষু প্রাতঃকৃত্যাদিকর্ম্মসু।
ধ্যানযোগে বামহস্তে দক্ষিণং পরিধারয়েৎ॥" (তারারহস্য)
"ইতি স্তুত্বা গুরুং স্বাপে ধ্যায়েদিষ্টাঞ্চ দেবতাম্।
গুরুদেবতয়োরৈক্যং ভাবয়েচ্চ ভিয়াকুলঃ॥
ইষ্টার্থপ্রার্থনাং কৃত্বা আজ্ঞাং সংপ্রার্থয়েত্ততঃ।
ইষ্টদেবস্য ভূমৌ চ তস্যাং শ্বাসানুসারতঃ॥
বিন্যস্য পাদমুত্থায় কুর্য্যাদাবশ্যকী ক্রিয়া॥" (শিবার্চ্চনচন্দ্রিকা, সারসং)
"যত্রাঙ্গে চরতে বায়ুস্তদঙ্গস্য করস্তথা।
সুপ্তোত্থিতমুখং দৃষ্টং লভতে বাঞ্ছিতং ফলম্॥"
ন হানিঃ কলহো নৈব কণ্টকৈর্নাপি ভিদ্যতে।
নিবর্ত্ততে সুখেনৈব সর্ব্বোপদ্রববর্জ্জিতঃ॥" (সূক্ষ্মস্বরোদয়, প্রাণতো)
"নির্গমে শুভদা বামা প্রবেশে দক্ষিণা শুভা॥" (স্বরোদয়)

* "গুহ্যাতিগুহ্য" এই মন্ত্রটির "ত্বৎপ্রসাদাৎ ত্বয়ি স্থিতে" এই স্থলে "ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর" আর স্ত্রীদেবতার সময় "ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি" এইরূপ তিন প্রকার পাঠ, অনেক পুরাণে ও তন্ত্রে দেখা যায়, ইহাতে রুচিই কারণ।

নমস্কার—"নমঃ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

তৎপরে করন্যাস, অঙ্গন্যাস ও প্রাণায়াম এবং সমর্থ হইলে মাতৃকান্যাস করিয়া নিজ নিজ ইষ্টদেবতার ধ্যান পূর্ব্বক অন্ততঃ ১০ বার ইষ্টমন্ত্র জপ, জপসমর্পণ ও প্রণাম করিবে। তৎপরে শিবমন্ত্র জপ, জপসমর্পণ ও প্রণাম করিবে এবং নিজের অভীষ্ট প্রার্থনা ও তাহার আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া যে দিকের নাসায় নিঃশ্বাস বহে, সেই পা প্রথমে ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে।

প্রকারান্তর—সেই সময় যে নাসায় নিঃশ্বাস বহে, সেই দিকের হস্ত দ্বারা নিজের মুখ পুনঃ পুনঃ মার্জ্জন করিয়া নিঃশ্বাসের দিকের অঙ্গে উভয় হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক বাম নিঃশ্বাসের সময়, নিঃশ্বাস-প্রবেশের সময় এবং দক্ষিণ নিঃশ্বাসের নির্গমের সময় "নমঃ প্রিয়দত্তায়ৈ ভুবে নমঃ" এই বলিয়া পৃথিবীকে এবং "নমঃ কুলবৃক্ষেভ্যো নমঃ" এই বলিয়া হরীতকী প্রভৃতি কুলবৃক্ষকে নমস্কার করিয়া শয্যা হইতে অবতরণ করিবে। সেই সময়েই—

নমঃ সমুদ্রমেখলে দেবি পর্ব্বতস্তনমণ্ডলে।
বিষ্ণুপত্নি নমস্তুভ্যং পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে॥

এই মন্ত্রে পৃথিবীকে প্রণাম করিবে।

তৎপরে "দুর্গা দুর্গা জয় দুর্গে শ্রীদুর্গে, জয় গণেশ শ্রীগণেশ, জনার্দ্দন মধুসূদন" ইত্যাদি বলিতে বলিতে বাহির হইয়া দেবালয়ের নিকটে আসিয়া নারায়ণ, গণেশ এবং দুর্গাদি দেবতাকে নমস্কার করিবে।

প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণ, সধবা অথবা পুত্রবতী স্ত্রীলোক, অগ্নি, গো, অগ্নিকুণ্ড দেখিলে সেই দিন সুখে সুখে যাইবে। আর যদি পাপিষ্ঠ নরাধম অধার্ম্মিক, ভাগ্যহীনা স্ত্রী, মদ্য, উলঙ্গ বা নাককাটা লোক দেখে, তবে সেইদিন কুপ্রভাত, কাহারও সহিত ঝগ্‌ড়া, কলহ ইত্যাদি কষ্টে দিন যাইবে, ইহা বুঝিতে হইবে।

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় কুলবৃক্ষান্ প্রণম্য চ।
শিরঃপদ্মে সহস্রারে ধ্যায়েন্নিজগুরুং পরম্॥" (রুদ্রযামল)
"হরীতকী তথা ধাত্রী নিম্বাশ্বত্থকদম্বকাঃ।
ভুম্বুরুর্ব্বটবিল্বৌ চ তিন্তিড়ী নবমঃ স্মৃতঃ॥" (বৈষ্ণবীতন্ত্র, ৪র্থ পটল)
"শ্রোত্রিয়ং সুভগামগ্নিং গাঞ্চৈবাগ্নিচিতং তথা।
প্রাতরুত্থায় যঃ পশ্যেদাপদ্ভ্যঃ স বিমুচ্যতে॥
পাপিষ্ঠং দুর্ভগাং মদ্যং নগ্নমুৎকৃত্তনাসিকম্।
প্রাতরুত্থায় যঃ পশ্যেত্তৎকলেরুপলক্ষণম্॥" (ছন্দোগ পরিশিষ্ট)

স্বর্গীয় কবিরাজ দুর্গাপ্রসাদ সেন।

বঙ্গাব্দ ১২৩৯ সালের ২৯শে আষাঢ় তারিখে ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিখ্যাত কমরপুর গ্রামে স্বর্গীয় কবিরাজ দুর্গাপ্রসাদ সেন মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম স্বর্গীয় ধন্বন্তরিকল্প কবিরাজ নীলাম্বর সেন। কবিরাজ নীলাম্বর সেন মহাশয় তৎকালে ঢাকা সহরের মধ্যে বিশেষ অভিজ্ঞ কবিরাজ বলিয়া জনসমাজে সুপরিচিত ছিলেন; এমন কি, তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্য স্থানীয় অধিবাসীগণের নিকটে 'নীলাম্বরের বড়ি' বলিয়া প্রবাদবাক্যের মধ্যে স্থানলাভ করিয়াছিল। তাঁহার বৃদ্ধা মাতা ঠাকুরাণীর ৺গঙ্গালাভ কামনায় পরিবারবর্গ সহ তিনি কলিকাতায় শুভাগমন করিয়া কুমারটুলি পল্লীতে জাহ্নবী-তীরে বসবাস করেন। তাঁহার কলিকাতায় অবস্থান করিবার সঙ্গে সঙ্গেই জনসাধারণের নিকটে তিনি প্রতিষ্ঠাবান অসাধারণ কবিরাজ বলিয়া খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। অল্পকাল কলিকাতায় বস-বাস করিবার পরেই তাঁহার মাতার ৺গঙ্গালাভের পরিবর্ত্তে কবিরাজ মহাশয়ের ৺ গঙ্গাতীরে বাস করিবার কামনা পূর্ণ হয়; তিনি পুত্রের ক্রোড়ে শ্রীশ্রী৺গঙ্গালাভ করেন।

কবিরাজ দুর্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের জন্মের একাদশ দিবস গত হইলে পর, তাঁহার গর্ভধারিণী জননীর অকালমৃত্যু ঘটে। স্বীয় জ্যেষ্ঠা ভগ্নী (ঢাকা সোণারং নিবাসী বিখ্যাত কবিরাজ স্বর্গীয় দীনবন্ধু সেনের মাতা) স্তন্যাদি প্রদান করিয়া শিশুর লালন-পালন ও জীবন রক্ষা করেন। কিছুদিন পরে কবিরাজ নীলাম্বর সেন মহাশয় পুনরায় বিবাহ করেন। দুর্গাপ্রসাদের বিমাতা ঠাকুরাণী (পণ্ডিতপ্রবর কবিরাজ স্বর্গীয় অন্নদাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের মাতা) স্বভাব-সুলভ স্নেহশীলা রমণী ছিলেন। বাল্যকালে ইঁহার স্বভাব অতিশয় উগ্র, মেধাবী ও চঞ্চল-প্রকৃতি ছিল, পরে হঠাৎ কোনও এক বাল্যসুহৃদ তাঁহাকে মাতৃহীন বলিয়া অবজ্ঞা করিলে তিনি যার-পর-নাই ব্যথিত হইয়াছিলেন, এবং সেই সময় হইতে কবিরাজ মহাশয়ের জীবনের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটে। সেই সময় হইতে তিনি শান্ত, সুশীল স্বভাবের মাধুর্য্যতা, তেজস্বিতা, উদারতাগুণে সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

কবিরাজ নীলাম্বর সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র ভুবনবিখ্যাত স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন, তাই অনেক আত্মীয় স্বজন দুর্গাপ্রসাদকে তৎকালে নবপ্রবর্ত্তিত ইংরাজী শিক্ষা দিবার নিমিত্ত তাঁহার

পিতাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। নীলাম্বর বিজাতীয় ভাষা ও আচার ব্যবহারের প্রতি বিদ্বেষ্টা ছিলেন, পিতার অভিপ্রায়ানুসারে ইংরাজী বিদ্যালয়ে তাঁহার প্রবেশলাভ ঘটে নাই। শৈশবে গৃহে বর্ণমালা ও অন্যান্য শিশুপাঠ্য পুস্তকের পাঠ সমাপ্ত করিয়া দুর্গাপ্রসাদ স্বগ্রামবাসী ৺ পণ্ডিতপ্রবর রাজদুর্ল্লভ শিরোমণি মহাশয়ের নিকটে সমগ্র ব্যাকরণশাস্ত্র (কলাপ), পরে ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিখ্যাত সোণারং গ্রামে বহুকাল বাস করিয়া তথাকার বিখ্যাত পণ্ডিত স্বর্গীয় কালীকান্ত শিরোমণির নিকট সংস্কৃত সাহিত্য দর্শনাদি ও অন্যান্য হিন্দুশাস্ত্র-গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং কবিরাজ স্বর্গীয় কালিদাস গুপ্ত কবিরত্নের নিকট সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। স্বীয় পিতৃদেবের নিকট আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের ব্যবহারিক শিক্ষা এবং তাঁহার অগ্রজ কবিরাজ ৺ গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের সহকারীরূপে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা, রোগনিরূপণ, ঔষধনির্ব্বাচন প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

পিতৃবিয়োগের পর ঊনবিংশ শতাব্দির মধ্য যুগে কবিরাজ দুর্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের অগ্রজ যুবক গঙ্গাপ্রসাদ কলিকাতা মহানগরীতে কবিরাজী ব্যবসায় করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তি বিশেষ কিছুই ছিল না, পিতার খ্যাতি প্রতিপত্তি ও শুভাশীর্ব্বাদ সম্বল লইয়া প্রথম কয়েক বৎসর নিতান্ত কায়ক্লেশে দীনভাবে কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহকারিতায় কালাতিপাত করেন। ক্রমে পাঁচ সাত বৎসরের মধ্যেই বংশানুক্রমিক অভিজ্ঞতা, স্বর্গীয় পিতৃদেবের আশীর্ব্বাদে অসাধারণ প্রতিভা ও চিকিৎসা-নৈপুণ্যে গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয় কলিকাতাস্থ কবিরাজ সম্প্রদায়ের মধ্যে আপনার প্রাধান্য স্থাপন করিলেন; কলিকাতাস্থ ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুচিকিৎসা-নৈপুণ্যের পরিচয় পাইয়া তৎকালীন কলিকাতার বিখ্যাত বাঙ্গালী ও ইংরাজ ডাক্তারগণও বিস্মিত হইয়াছিলেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ৭২ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়; তৎপূর্ব্বে ৫০।৫১ বৎসর কাল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে তাঁহার চিকিৎসার খ্যাতি সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। কাশ্মীর, নেপাল, রেওয়া প্রভৃতি বহু স্বাধীন নৃপতিবৃন্দ ও অমাত্যগণ অনেক সময় তাঁহার চিকিৎসাধীনে থাকিয়া ব্যাধিমুক্ত হইতেন।

৺ স্বর্গীয় কবিরাজ দুর্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের অগ্রজ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদের মনস্বিতা, চরিত্রের দৃঢ়তা ও ব্যবসা বুদ্ধির প্রখরতায় কবিরাজ সম্প্রদায়ের

যথেষ্ট কল্যাণ ও উন্নতি হইয়াছে; গঙ্গাপ্রসাদের পূর্ব্বে কবিরাজগণ পীড়া আরোগ্য হইলে পর রোগী বা রোগীর আত্মীয়ের নিকট হইতে বিদায় স্বরূপ সামান্য অর্থ পাইতেন, কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট দর্শনী পাইতেন না; কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সাহেব ডাক্তারদিগের ন্যায় কলিকাতায় ১৬৲ টাকা ও বিদেশে দৈনিক ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দর্শনীর হার প্রচলন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে ঔষধের মূল্য নির্দ্দিষ্ট ছিল না, সকল সময় সকল রকম ঔষধ পাওয়া যাইত না। তিনি আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় স্থাপন করিয়া সে অভাব দূর করেন এবং শাস্ত্রীয় ঔষধ সমূহ যথারীতি প্রস্তুত করিয়া নির্দ্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় করিবার প্রথা প্রচলিত করিয়া, কবিরাজী ব্যবসায়কে অর্থকরী ব্যবসায়ে পরিণত করেন।

কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সকল অর্থকরী প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়া নিজে যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন, এমন কি কোন কোন বৎসর তাঁহার লক্ষাধিক টাকা উপার্জ্জন হইত, আবার মুক্তহস্তে সেই টাকা নানা সৎকার্য্যে ব্যয় করিতেন। কবিরাজী ব্যবসা অবলম্বন করিয়া ধনী হওয়া যায়, এবং কলিকাতার ন্যায় মহানগরীতে নগরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনীগণের সহিত সামাজিক ক্ষেত্রে সমকক্ষতা ও প্রতিদ্বন্দীতা করা যায়, তাহা কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ বাঙ্গালাদেশে সর্ব্বপ্রথম পথ দেখাইয়া গিয়াছেন।

কবিরাজ দুর্গাপ্রসাদ যৌবনের প্রারম্ভেই বাত-ব্যাধি রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রায় ইন্দ্রিয়শক্তি বিহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কোন ইন্দ্রিয়েরই শক্তি ছিল না। সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অচল অবশ হইয়া পড়িয়াছিল। বহু চিকিৎসকের চিকিৎসায় ব্যাধি আরোগ্য না হওয়ায় তিনি শ্রীশ্রী৺তারকনাথ দেবের শরণাগত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রী৺তারকনাথ দেবের প্রসাদি পায়সান্ন এবং তাঁহার স্বপ্নাদিষ্ট ব্রাহ্মণের পাদোদক ও পদরজঃ ১১।১২ বৎসরকাল পান করিয়া শ্রীশ্রী৺ তারকনাথ দেবের কৃপায় কঠিন দুঃসাধ্য রোগ হইতে মুক্তিলাভ করেন। প্রাচীন অবস্থায় মৃত্যুর প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি অর্দ্দিত Facial Paralysis রোগে আক্রান্ত হন। কোন দিন কোনও ঔষধ সেবন করেন নাই। কোন ব্যাধি হইলে কেবল দেবতা ও ব্রাহ্মণের পাদোদক পান ব্যতীত অন্য কোনও ঔষধ সেবন করিতেন না। আজীবন দেবতা ও ব্রাহ্মণের ভক্ত ছিলেন। কঠিন ও দুঃসাধ্য ব্যাধিগ্রস্ত স্বচিকিৎসিত রোগীদিগকেও তিনি বলিতে কুণ্ঠিত হইতেন না যে,—

"হইলে অসাধ্য ব্যাধি,—
বৈদ্যে কি তার করে বিধি।"

এইরূপ ব্যাধির ঔষধ কেবলমাত্র ব্রাহ্মণের পদরজঃ বলিয়া ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করিবার ব্যবস্থা প্রদান করিতেন। ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সমাধিবস্থা দর্শন করিয়া কবিরাজ দুর্গাপ্রসাদ ব্যাধি ব্যাধিই নহে, দৈব ভাবোদ্দীপক ক্রীড়া বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন।

সংসার-জীবনে তিনি সুখশান্তি লাভ করিতে পারেন নাই। অতি শৈশবে মাতৃহীন, যৌবনের প্রথমেই দুঃসাধ্য বাত ব্যাধিরোগে দীর্ঘকাল কষ্টভোগ, প্রৌঢ় অবস্থায় উপযুক্ত পুত্র মহামহোপাধ্যায়কল্প কবিরাজ নিশিকান্ত সেন মহাশয়ের ১৩১১ সালে বিয়োগ, তৎপূর্ব্ব বৎসর ১৩১০ সালে জ্যেষ্ঠ পৌত্র শ্রীমান্ বিধুভূষণ সেনের মৃত্যু; এতদ্ব্যতীত একমাত্র জামাতা অমৃতলাল মজুমদার, মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ বিজয়রত্নের মৃত্যু; পত্নী এবং অন্যান্য কয়েকটি পুত্র পৌত্রাদির বিয়োগ-বেদনা তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল।

কবিরাজ দুর্গাপ্রসাদ প্রতিদিন বহুসংখ্যক স্কুল কলেজ ও টোলের ছাত্রকে এবং অন্যান্য গৃহস্থ ভদ্র সন্তানকে অন্নদান করিতেন। প্রতি বৎসর কলিকাতা ৩নং কুমারটুলি ষ্ট্রীটস্থ ভবনে শ্রীশ্রী৺ অন্নপূর্ণা পূজা উপলক্ষে বহুসংখ্যক দরিদ্র নারায়ণকে অন্নদান ও অর্থ দান করিতেন। পিতা মাতার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমণ্ডলীকে বিদায় ও পরিতোষরূপে ভোজন করাইয়া দক্ষিণা প্রদান করিয়া জীবনকে ধন্য জ্ঞান করিতেন। ৺কাশীধামে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া মহাদেবের সুন্দর মন্দির ও নিত্য শিবপূজার সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া গিয়াছেন। ৺ বৈদ্যনাথধামেও সুদৃশ্য বাটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কেহ প্রার্থনা করিলে তথায় বিনা ভাড়ায় থাকিতে দিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমণ্ডলীকে বার্ষিক প্রদান, দুস্থদিগকে অর্থদান ও মুক্তহস্তে ঔষধাদি বিতরণ করিতেন। দিবা রাত্রির মধ্যে যে কোন সময়ে অন্নার্থিমাত্রকে অন্নদান করিতেন, বিরক্ত হইতেন না। নিজ ভবনে প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে হরিনাম সংকীর্ত্তন হইত, ব্রাহ্মণ, স্বজাতি ও অবস্থাহীন ভদ্র গৃহস্থের বাটীতে গিয়া তিনি বিনা দর্শনীতে চিকিৎসা করিয়া আসিতেন, বিনা মূল্যে ঔষধাদি ও পথ্যের জন্য অর্থ প্রদান করিয়া আনন্দানুভব করিতেন। নানাগুণের আধার হইলেও রোগে শোকে তিনি পরিত্রাণ পান নাই। করুণাময়ের অপার করুণায়, অলৌকিক ভগবদ্ভক্তি ও ধীরতার বলে, আশ্চর্য্যরূপে সংসারের সকল বেদনা, সকল শোকতাপকে দুর্গাপ্রসাদ জয় করিয়াছিলেন।

কবিরাজ দুর্গাপ্রসাদ মৃত্যুর প্রায় ৩২ বৎসর পূর্ব্বে স্বীয় অগ্রজ গঙ্গাপ্রসাদের অনুমতি অনুসারে সাংসারিক স্বচ্ছন্দতা ও স্বাধীনতা লাভের প্রত্যাশায় ৩নং কুমারটুলি ষ্ট্রীটস্থ ভবনে আসিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে পুত্র কবিরাজ স্বর্গীয় নিশিকান্তের সহকারিতায় আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয় স্থাপন করেন। অল্পদিনের মধ্যেই চিকিৎসা কার্য্যে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন; সঙ্গে সঙ্গে পুত্র নিশিকান্তেরও চিকিৎসায় সুনাম সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। পুত্র নিশিকান্তের অকালমৃত্যুর পর পূর্ণ উদ্যমে উপযুক্ত পুত্রের হস্তে চিকিৎসা কার্য্যের ভার ন্যস্ত করিয়া বৈষয়িক সকল কার্য্য হইতে দুই বৎসর অবসর গ্রহণ করত শারীরিক ও মানসিক শান্তিলাভ করিবার কামনা করেন, কিন্তু বিধাতা প্রতিকূল হইয়া নিউমোনিয়া রোগে কয়েক দিনের মধ্যেই কবিরাজ নিশিকান্তের মৃত্যু হয়, কবিরাজ দুর্গাপ্রসাদ তাঁহার অন্তিমকাল পর্য্যন্ত পৌত্র কবিরাজ শ্রীযুক্ত কালীভূষণ সেন কবিরত্ন মহাশয়কে লইয়া আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অনুশীলন ও আলোচনা, রোগ নিরূপণ, ঔষধাদি প্রয়োগ প্রণালী বিষয়ে সুশিক্ষা প্রদান করিয়া কলিকাতাস্থ খ্যাতনামা চিকিৎসক-শ্রেণীভুক্ত দেখিয়া গত ১৩২৪ সালের ৩০শে ফাল্গুন তারিখে দীর্ঘজীবনব্যাপী সংসার ধর্ম্ম পালন করিয়া সংসারের সকল রকম শোকতাপ, জ্বালা-যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অনন্ত শান্তিময়ের ক্রোড়ে চিরশান্তি লাভ করিয়াছেন।

কবিরাজ দুর্গাপ্রসাদ জীবনে রোগিদিগের রোগ নিবারণকল্পে সুব্যবস্থা প্রদান করিতে কখনও কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। ভোজনের সময়, বিশ্রামের সময়, যখন যে কোন রোগী বা রোগীর আত্মীয় পরিজন কবিরাজ দুর্গাপ্রসাদের নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন, তৎক্ষণাৎ রোগীর রোগশান্তির উপায় নিরূপণ করিয়া সুব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া সকলকেই সমাদর করিতেন। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত রোগীদিগের যত্নপূর্ব্বক প্রাতঃকালে ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছিলেন, রাত্রিকালে সুস্থ শরীরে হরিনাম সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া ভোজনান্তে শয়ন করেন, রাত্রি ৪৷৷০ সাড়েচার ঘটিকার সময় জাগরণ করিয়া শৌচান্তে নিজের অন্তিমকাল নিজেই বুঝিতে পারেন; আত্মীয় পরিজনগণকে ডাকিয়া আপনিই আপনার ব্যবস্থা করেন। অল্পকাল মধ্যেই ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করিয়া স্নেহাস্পদদিগের শুভাশীর্ব্বাদ করিয়া সংসার হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিয়া অল্পকাল মধ্যেই আত্মীয়গণের স্কন্ধে গঙ্গাতীরে নীত হন, একঘণ্টা সময়ের মধ্যেই গঙ্গাগর্ভে কবিরাজ দুর্গাপ্রসাদ নশ্বরদেহ ত্যাগ করেন, রাত্রি ৪৷৷০ সাড়েচারিটার সময় নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ৫টা ২০ মিনিটের সময় সজ্ঞানে শ্রীশ্রী৺ গঙ্গালাভ ঘটে, ইহা ধর্ম্ম জীবনের একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত।

কবিরাজ দুর্গাপ্রসাদের পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হইয়াছে; আমরা তাঁহার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

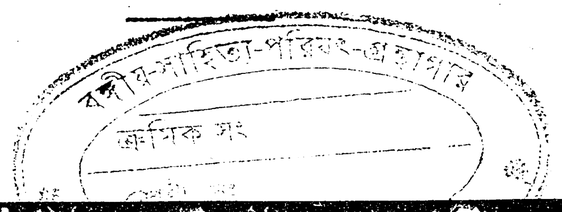
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

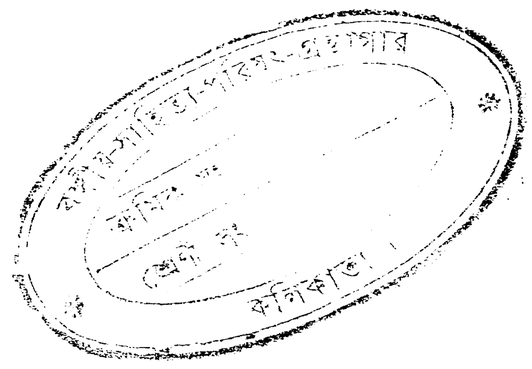
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

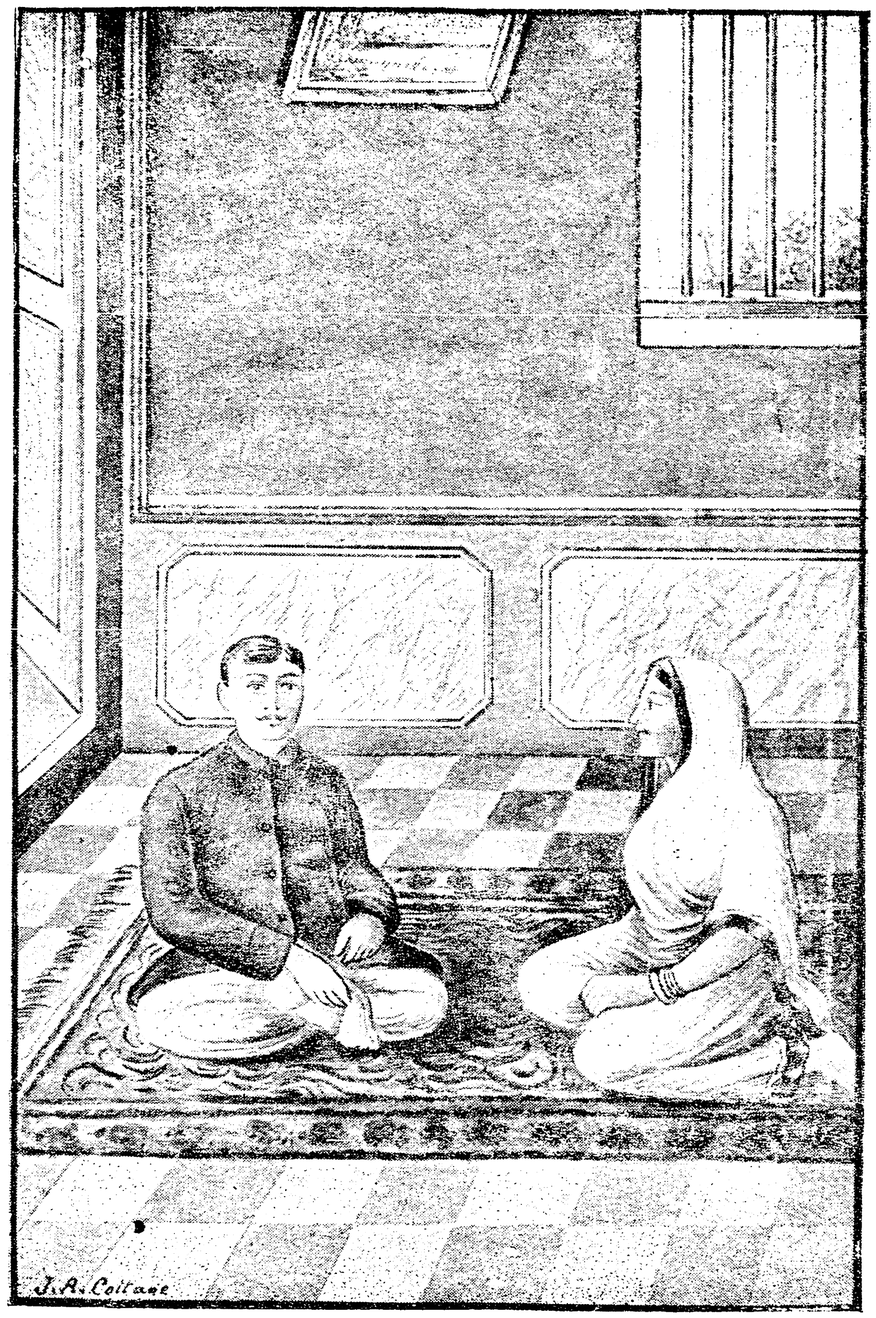

পরামর্শ।

জন্মভূমি

২৬শ বর্ষ। ১৩২৭ সাল, আষাঢ়। ৩য়, সংখ্যা।

প্রত্যাবর্ত্তন।

লেখক,—ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি,।

বিভো!

দিব্যচক্ষু লভিয়াছি লভিয়াছি দিব্যজ্ঞান।
তাই আজ আসিয়াছি করিতে হৃদয় দান॥
খুলিয়াছে মনশ্চক্ষু দেখেছি মানস-পটে।
তোমার অনিন্দ্যমূর্ত্তি আঁকা যেন চিত্রপটে॥
কর্ণে মোর পশিয়াছে অভয় সঙ্গীত তব।
হৃদয়ে জাগিছে তাই হর্ষ এক অভিনব॥
এতদিন বুঝি নাই স্বপথ কাহারে বলে।
আপন মঙ্গল আমি দলেছি চরণ-তলে॥

রক্তসিক্ত চরণেতে চলেছি কণ্টক বনে।
তাই আজ ফিরিয়াছি বিষাদ মথিত প্রাণে॥
খুঁজিয়াছি তোমা লাগি এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ভরি'।
দেখি নাই কিন্তু আমি হৃদয় উন্মুক্ত করি॥

জানি নাই আছ তুমি আমার হৃদয় মাঝ।
নিভৃতে বসিয়া সেথা সাধিছ আমারি কাজ॥

আজ কিন্তু প্রভাতের তরুণ অরুণ ভাতি।
দেখায়ে দিয়েছে মোরে তোমার মহিমা জ্যোতি॥

প্রভাতের শ্রুতিমুখ বিহঙ্গ কাকলী রব।
জাগায়েছে হৃদে মোর উদার উদাত্ত ভাব॥
তাই আজ ফিরিয়াছি তোমার চরণ-তলে।
আপনারে একেবারে সমর্পিয়া দিব ব'লে॥

লও মোর হৃদয়ের বাসনা কামনা যত।
মরমের মর্ম্ম-ব্যথা বিষয়-বাসনা শত॥
নিয়ে মোরে মুক্ত কর বিষয়-বাসনা হতে।
নিযুক্ত করহ মোরে তোমার ভজনা ব্রতে॥
এ বিশ্ব সংসারে আর মাগিব না অন্য ঠাঁই।
যদি তব পাদমূলে তিলমাত্র স্থান পাই॥

সাধক কমলাকান্ত।

লেখক,—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

প্রথম অংশ।

মঙ্গলময় ভুবনেশ্বরের ইচ্ছায় কতই মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া জগৎ পবিত্র করিয়াছেন। যাঁহাদের বাক্যাবলি, যাঁহাদের উপদেশ শোকের সময়, দুঃখের সময়, বিপদের সময় সন্তপ্ত-হৃদয়ে অমৃতধারা বর্ষণ করে, প্রেমরসে পরিপূর্ণ করে, মনকে দুঃখের সংসার হইতে কি এক পরমানন্দ-পূর্ণ স্থানে লইয়া যায়,—সেই সকল মহাত্মা কণ্টকপূর্ণ সংসার-কাননে প্রফুল্ল কুসুম। মানব মল ভ্রমরের ন্যায় তাঁহাদের বাক্যমধু পান করিয়া কণ্টক জ্বালা কথঞ্চিৎ বিস্মৃত হয়। পরমেশ্বরের ইচ্ছায় এক এক মহাত্মা পৃথিবীর এক এক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই সেই প্রদেশকে চির সুগন্ধজালে জড়ীভূত রাখিয়া অন্তর্হিত হন।

যে পুষ্পে সুগন্ধ নাই, সে পুষ্পই নহে, যে নদীতে স্রোত নাই, সে নদী

নহে, যে বাক্যে প্রেম ও ভক্তি নাই, সে বাক্য নহে। সাধক কমলাকান্তের গীতাবলি প্রেম ও ভক্তিপূর্ণ, সংসার-কাননে প্রসূন। দুঃখের সময়ে সন্তপ্ত-হৃদয়ে অমৃতধারা। বঙ্গের ভদ্রসমাজে, বৈটক মন্দিরে যাঁহার রচিত গীত সমুদয় তাল মান সহকারে চারিদিকে ভক্তি ও প্রেমের ধারা নিক্ষেপ করিয়া নৃত্য করে, দেব-দেবীর মন্দিরে উপাসনার স্থান অধিকার করে, মানব মনকে নিস্পন্দ করে, সংসার হইতে দূরে লইয়া যায়, নির্জ্জন প্রদেশে রাখাল-কণ্ঠে সুমধুর স্বরে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করে, পশু-পক্ষীকেও পর্য্যন্ত বিমোহিত করে, কে সে মহাত্মা কমলাকান্ত? বঙ্গের কোন্ প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া পবিত্র করেন? তাঁহার শৈশবের, যৌবনের, বার্দ্ধক্যের লীলাস্থান বা কোথায়? তাঁহার সমস্ত জীবন কি ভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল, ইত্যাদি সকলেরই জানিবার বাসনা হয়।

বঙ্গদেশে পুরাতন কবিদের এবং অনেক খ্যাতনামা মহাত্মার আদি পূর্ব্ব ইতিহাস পাওয়া যায় না। তৎকালে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, ইতিহাস লেখার পদ্ধতিও ছিল না। স্বভাবদত্ত ক্ষমতা দ্বারা ভক্তি ও প্রেম-পরিপূর্ণ কবিতা ও সঙ্গীতাবলি রচনা করিতেন। কল্পনার চাতুর্য্যে, রচনার মাধুর্য্যে, হৃদয়ের উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে তাঁহাদের বাক্যাবলি অমৃত তুল্য হইত, সাধারণ সাদরে গ্রহণ করিত, কণ্ঠস্থ করিত, বর্ত্তমানকালের যাত্রার ন্যায় সেই সকল কাব্য ও সঙ্গীতমালা স্থানে স্থানে অভিনীত, পঠিত, আলোচিত হইত, কবি ও গ্রন্থকার অমর হইতেন। কোন কোন স্থলে বিষয়ীগণ কবিরত্নদিগকে আশ্রয় দিয়া জগতের বিশেষ উপকার করিতেন। কবিকুলের সহিত তাঁহাদের নামও চিরস্মরণীয় হইত। তাঁহাদের কল্পনা ও রচনা লোক-শিক্ষার জন্য। বর্ত্তমানের ন্যায় পরিণীতা রমণী ও বিগতযৌবন পুরুষের প্রথম দর্শনই উৎকট প্রেমের প্রকটন তাঁহাদের গ্রন্থে স্থান পাইত না। দস্যু ও সমাজদ্রোহীগণের ভীষণ কর্ম্ম, কুলটাগণের কুটিলতা, নিচাশয়দিগের কল্পনাতীত চতুরতা জগতে বিরল না হইলেও তাঁহাদের গ্রন্থে উপাদান হইতে পারিত না। লোকশিক্ষা, প্রেম ও ধর্ম্মের জয়, দুঃখের সময় সন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তি প্রদান তাঁহাদের গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্য ছিল, স্বার্থের দিকে, নিজের যশের দিকে দৃষ্টি ছিল না, মনের আনন্দে ও উচ্ছ্বাসে কর্ম্মক্ষেত্রে নৃত্য করিতেন, তাই তাঁহারা নিজের ইতিহাস নিজ হস্তে লিখিয়া যান নাই। যশের সৌরভ ও কীর্ত্তির স্তম্ভ কর্ম্মভূমিতে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দেহত্যাগ করিলে তাঁহাদের সমকালীন বন্ধু-বান্ধবেরা তাঁহাদের

ইতিহাস হইতেন, তাঁহাদের কৃত কর্ম্ম তাঁহাদের অদ্ভুতশক্তি লোকের নিকট কীর্ত্তন করিতেন। সেই সকল ঘটনাবলি লোক-পরম্পরা শ্রুত হইয়া আজ তাঁহাদের ইতিহাসরূপে বর্ত্তমান। অনেকে বিবেচনা করেন, জনশ্রুতি সকল অতিরঞ্জিত কিন্তু রঞ্জিত হইলেও সে সকল সত্যের উপর সংস্থাপিত, এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। ইহাও স্বীকার্য্য, যাহার মূলে সত্য নাই, তাহা কখনও স্থায়ী হয় না। মিথ্যা সত্যের স্থান অধিকার করিতে পারে কিন্তু তাহা ক্ষণকালের জন্য। এ জগতে সত্য ও মিথ্যা উভয়েই কর্ম্মক্ষেত্রে অবস্থান করে। মিথ্যার অবস্থান সত্যের সারবত্তা প্রতিপন্ন করিবার জন্য, অসত্য স্থায়ী হয় না, মেঘাবৃত সূর্য্যের ন্যায় সত্যই সকলের নয়ন আকর্ষণ করে, অতএব লোক-পরম্পরা শ্রুত বিষয় কখনই একবারে অসত্য হয় না, বিশেষতঃ জনশ্রুতি বিশেষ ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া জীবিত থাকে। বীর-পুরুষদিগের অমানুষিক বীরত্ব, মাহাত্মাদিগের অলৌকিক কর্ম্ম, সাধ্বী রমণীগণের অকল্পিতভাবে সতীধর্ম্ম রক্ষা লিখিত ইতিহাসের অভাবে জনশ্রুতিকে আশ্রয় করে ও কালক্রমে রক্ষার নিমিত্ত বঞ্চিত হইলেও কখনও অবিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। অমানুষিক ও অসাধারণে অবিশ্বাস করা মানবের ভ্রম, কারণ আমাদিগের নিকট যাহা অসাধারণ ও বুদ্ধির অতীত, মহাত্মাদিগের নিকট অতি অনায়াসসাধ্য ও তাঁহাদের অনুকম্পার বশবর্ত্তী। এই বিশাল বিশ্বরাজ্যে কতই আশ্চর্য্য, কতই অমানুষিক নয়নগোচর হয়, সমস্তই আমাদের বাক মন ও বুদ্ধির অতীত; বিশ্বরাজ্যে মানবই তাহার দৃষ্টান্তস্থল। মানবের জন্ম, মানবের ক্রিয়া, মানবের চিন্তা চেষ্টা, মানবের মৃত্যু, মানবের বুদ্ধি ও ধারণার অতীত; মহাশক্তি-সমন্বিত এক মহাপুরুষের কর্ম্ম। সেই মহাশক্তি পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল অনুসারে কিম্বা অচিন্ত্যনীয় কোন কারণে কাহাতে অল্প, কাহাতে বা অধিক পরিমাণে সন্নিবিষ্ট হয়, তাই এক স্থানে জন্ম-গ্রহণ করিয়া ও একই প্রকৃতিতে পরিপুষ্ট হইয়া কেহ কেহ অদ্ভুতকর্ম্মা ও অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন হয়। সমকালবর্ত্তী সাধারণে তাঁহাদের অসাধারণ কর্ম্মে অবিশ্বাস করে, কিন্তু তাহা সহায়ী হয় না, পরবর্ত্তী লোকেরাও অনেক সময় নিজের ক্ষমতার বাহিরে যাইতে ইচ্ছা না করিয়া ভ্রমে পতিত হন ও অসাধারণ অবিশ্বাস করেন। তাই মহাকবি তুলসিদাস বলিয়াছেন, "অন্তর অঙ্গুল চারমে, আঁখসে কাণ হই, সব মানে দেখি কহি শুনি না মানে কই। চক্ষু ও কর্ণে, চার আঙ্গুলমাত্র ব্যবধান। লোকে শুনিয়া বিশ্বাস করে না, দেখিলেই বিশ্বাস

করে, কিন্তু জানে না, উভয়ের ব্যবধান চার অঙ্গুলিমাত্র। তাই বলিতেছিলাম, জনশ্রুতি ইতিহাস সত্যমূলক, যতই অদ্ভুত ঘটনাপূর্ণ হক, অবশ্য সত্যের উপর সংস্থাপিত। মহাত্মা কমলাকান্তের জীবনের অনেক ঘটনা, বহু অমানুষিক কর্ম্ম জনশ্রুতিকে অবলম্বন করিয়া জীবিত আছে, সেই সকল জনশ্রুতি বর্দ্ধমান ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে বিশেষরূপে প্রচলিত এ সকল জনশ্রুতিই তাঁহার ইতিহাসের উপাদান হইবে। তাঁহার জীবিত অবস্থায় সাধারণ সংস্পর্শীয় কোন কোন ব্যাপারে লিপিবদ্ধও আছে, তাহা হইতেও তৎকালিক আচার ব্যবহার, সুখ সম্পত্তি ও সমাজের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁহার লীলা-ক্ষেত্রের ও অনুগামীগণের চিত্রও অনুমিত হয়।

কমলাকান্তের জন্মস্থান অম্বিকা কালনা, বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সুরতরঙ্গিণীর তীরবর্ত্তী। এক সময় অম্বিকাকালনা বহু জনাকীর্ণ জনপদ ছিল। অভাব ও ব্যাধির অধিকার ছিল না, সুর-সৌন্দর্য্যে পূর্ণ থাকিত। হায় হায়! কালের কি ভীষণ পরিবর্ত্তন! মনোহর তরুলতাগণ মানবের সহবাস পরিত্যাগ করিয়া গভীর জঙ্গলের সৃষ্টি করিয়াছে, অম্বিকার কিয়দংশ জঙ্গলে পরিণত, কিয়দংশ বর্ত্তমান কালনার অন্তর্গত হইয়াছে। অম্বিকা কালনার গ্রাম সমূহের অবস্থাও শোচনীয়, কিন্তু তাহাদের পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য এখনও সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই। কোন কোন গ্রামে প্রবেশ করিয়া পরিদর্শন করিলে অনুমিত হয়, এক সময় ঐ সকল গ্রাম অঙ্গের অলঙ্কার ছিল। পথ সকল প্রশস্ত কিন্তু স্থানে স্থানে এরূপ বনাকীর্ণ যে সূর্য্যরশ্মিও তাহাতে প্রবেশ করে না। সুন্দর দেব-দেবীর মন্দির এখনও আকাশের কোলে মস্তক উন্নত করিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে, কিন্তু তাহার সে লাবণ্য নাই। সুধাসম শ্বেত কলেবরে শৈবালরাশির কালিমা তাহাকে শ্রীহীন করিয়াছে। অঙ্গ সংস্কার নাই, যত্ন নাই, অকালে বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কোন স্থানে বিদীর্ণ, কোন স্থান ভগ্ন। একদিন মন্দির মধ্যে সুস্থকায় সুন্দর সহাস্যবদন ব্রাহ্মণের মন্ত্রধ্বনি শ্রুত হইত, সকল সময়েই জনাকীর্ণ থাকিত, নানাবিধ পুষ্প-সৌরভে মন্দির মধ্য আমোদিত হইত। হায় হায়! আজ তাহা নিশাচর পশু পক্ষীর আবাস-ভূমি বিভীৎস শব্দে ও গন্ধে পরিপূর্ণ। গ্রামে দ্বিতল অট্টালিকার অভাব নাই, কিন্তু পরিত্যক্ত, মলিন, শ্রীহীন। ধ্বংসকারী কালের কর্ম্মক্ষেত্র। অট্টালিকার বহির্ভাগ গৃহস্বামীর পূর্ব্ব সৌভাগ্যের পরিচয় দিতেছে। বহির্ভাগ বিস্তৃত। সম্মুখে কাষ্ঠগ্রথিত লৌহআবরণ, অন্তর্দিকে অট্টালিকার দ্বিতল প্রকোষ্ঠ

সকল। বহির্ভাগে একদিন ভাগ্যবান সুস্থকায় পুরুষ সকল প্রবল গ্রীষ্মের সময় সমীর সেবন করিতেন। প্রকোষ্ঠ সকল হাস্য গীত মনোহর গল্পে মুখরিত হইত, আজ তাহা নির্জ্জন। দুর হইতে দেখা যাইতেছে, প্রকোষ্ঠ মধ্যে শোভিত কাষ্ঠফলকে চিত্র সমূহ স্থানভ্রষ্ট, যেন তাহারা মানুষের সহবাস সুখে বঞ্চিত হইয়া বিবর্ণ ছিন্ন ও নতশির হইয়াছে। প্রকোষ্ঠে সকলের কোনটীর রুদ্ধ দ্বার, কোনটীর বা দ্বার অর্দ্ধরুদ্ধ; কোনটীর বা একবারে দ্বারের আবরণ নাই। মানুষের পদশব্দ ও কণ্ঠস্বর শুনিয়া বন্য বিড়াল স্থিরনেত্রে পথের দিকে দৃষ্টি করিয়া এক প্রকোষ্ঠ হইতে অন্য প্রকোষ্ঠে গমন করিতেছে। অন্দর মহলের অবস্থাও সেইরূপ। একাকী প্রবেশের সাহস হয় না। অট্টালিকার পশ্চাৎভাগে পুষ্করিণী, তাহার তিনধারে প্রাচীর-বেষ্টিত উদ্যান। দেখিলেই বোধ হয়, পুষ্করিণী ও উদ্যান বড় আদরের ও বড় সাধের ছিল। আম্রবৃক্ষ সকল পূর্ব্ব যত্নে বঞ্চিত হইলেও উদ্যানস্বামীর সম্মান রক্ষার জন্যই যেন প্রফুল্লবদন, ফলভরে অবনত, পাদদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবিধ কণ্টক বৃক্ষকে আশ্রয় নিজ উদারতার পরিচয় দিতেছে। স্থানে স্থানে কুসুম কানন, কাননটী শ্বেত-প্রস্তর-বেষ্টিত। কুসুম কানন লতাজাল-জড়িত, প্রস্তর সকল বিক্ষিপ্ত ও স্থানভ্রষ্ট। পুষ্করিণীর চারিধারে চারিটী প্রস্তর-নির্ম্মিত ঘাট। শৈবাল সঞ্চিত, অনেক দিন কোন নরনারী পদস্পর্শ করে নাই। পুষ্করিণীর জল দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ, কিন্তু প্রায় অর্দ্ধ অঙ্গ জলদজালে আবৃত, বৃহৎ আম্রবৃক্ষ সকল প্রকাণ্ড শাখা বিস্তার করিয়া কোন কোন স্থানে পুষ্করিণীর স্বচ্ছ জলের ভিতর সূর্য্যরশ্মিতে প্রতিভাত হইতেছে।

গ্রামের মাঝে দুই এক ঘর লোকের বাস। তাহাদের প্রায় সকলেরই অবস্থা শোচনীয়—সংক্রামক জ্বর-রোগ-গ্রস্থ পিঙ্গল চক্ষু, শীর্ণ কায়। মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ভগ্ন ও পতিত গৃহও বিস্তর। অনুমান হয়, ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে এখানে অনেক লোকের বাস ছিল। ৩।৪টী দোকান ঘর একত্র দেখা যায়। দোকান-ঘরগুলি ভগ্ন। একদিন তথায় অনেক লোকের সমাগম হইত, ক্রয় বিক্রয় হইত। কত আহ্লাদ ও হাস্য পরিহাস হইত, আজ তাহারা সেই সব সম্পদে বঞ্চিত হইয়া মনস্তাপে যেন মাথা নামাইয়া বিকৃতভাবে ভূমিস্যাৎ হইতেছে। এখন লবণ কলাই প্রভৃতি রাখিবার স্থান সকল সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয় নাই। দুই একটী সালের খুঁটী বর্ত্তমান আছে। পণ্যদ্রব্য স্থাপনের মৃত্তিকা-নির্ম্মিত উচ্চ বেদী বিদ্যমান রহিয়াছে। এক পার্শ্বে দোকান ও অন্য

পার্শ্বে কাষ্ঠের তক্তাপোষ থাকিত, তাহার চিহ্ন এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। আহারান্তে বিশ্রামের পর সেই স্থানে স্থাপিত তক্তাপোষে বসিয়া মুদী পুণ্য-শ্লোক কবিকুলচূড়ামণি কাশিরাম দাসের মহাভারত পাঠ করিত। "মহাভারতের কথা অমৃত সমান" বলিতে বলিতে সম্মুখে শিক্‌লী বাঁধা পক্ষিটীকে ছোলা দিয়া আসিত, পাখীটী নূন দাও, কলাই দাও, বলিয়া নাচিতে নাচিতে দাঁড়ের এধার হইতে ওধার করিয়া বেড়াইত, মাঝে কঠোর শব্দ করিয়া ছোলা কাটিয়া ফেলাইত। দুই একজন শ্রোতাও ধুমপান করিতে করিতে মুদির মুখ-নিঃসৃত সুরসহ উচ্চারিত পয়ার মনোযোগের সহিত শুনিত। মুদী মহাভারতের কথা অমৃত সমান" বলিয়া মধ্যে থামিলে শ্রোতা হয় ত জিজ্ঞাসা করিত, হ্যাঁ ভাই, "তের" কথাটা কি? মুদীও যথাজ্ঞান উত্তর দিত, বলিত, 'তের' কথা কি জান, মহাভারত "তের" কথা লইয়া। যুধিষ্ঠির নকুল আদি পাঁচ সহোদর, দুর্য্যোধন আদি সপ্তরথি, আর দ্রৌপদী এই তেরটী লইয়া মহাভারত। শ্রোতা কিছুমাত্র সন্দেহ না করিয়া তাহাই যথার্থ বলিয়া বিশ্বাস করিত। হায় হায়, ধ্বংসমুখে অবস্থিত সেই সকল গ্রাম এক সময় কি সুখের স্থান ছিল। অভাব ছিল না, সংক্রামক ব্যাধি ছিল না, অকাল-মৃত্যু এরূপ ভীষণ বেশে ঘরে ঘরে নৃত্য করিয়া বেড়াইত না। এক সময় ঐ সকল প্রদেশ বঙ্গের কণ্ঠহার স্বরূপ ছিল ও মহাত্মা কমলাকান্ত কণ্ঠহারের মণি স্বরূপ হইয়া শোভা পাইয়াছিলেন।

মহাত্মা কমলাকান্ত প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গ-জননীর অঙ্কে শোভিত হইয়াছিলেন। তাঁহার জন্মকাল নিরূপণ করা তাদৃশ কষ্টসাধ্য নহে। বর্দ্ধমানাধিপতি বিদ্যোৎসাহী মহারাজাধিরাজ মহাতাপচাঁদ বাহাদুর মহাত্মা কমলাকান্ত বিরচিত কতকগুলি গীত সংগ্রহ করিয়া মুদ্রিত করান। সেই পুস্তকের উপক্রমণিকায় দেখা যায়, বিবিধ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর বঙ্গীয় ১২১৬ সালে মহাত্মা কমলাকান্তকে অম্বিকা হইতে বর্দ্ধমান লইয়া আইসেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম চল্লিসের অধিক, অতএব সাধক প্রায় ১১৭০ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গভূমি পবিত্র করিয়াছিলেন। জাল প্রতাপচাঁদ নামক গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, ১২২৭ সালে মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুরের পুত্র যুবরাজ প্রতাপচাঁদ বাহাদুরকে কাল্‌নায় গঙ্গাযাত্রা করা হয়। কথিত আছে, মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুরের পুত্র বিয়োগের সময় সাধক জীবিত ছিলেন না, তাহার পূর্ব্বেই তিনি দেহত্যাগ করিয়া-

ছিলেন। ইহাও কথিত আছে, প্রায় ৫৫।৫৬ বৎসর বয়সে তিনি মানব-লীলা সম্বরণ করেন। ইহা দ্বারা ঐ জন্ম সাল প্রতিপন্ন হয়। আজ প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে জনৈক অশীতিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধের মুখে শুনিয়াছিলাম, তাঁহারা কমলাকান্তকে দেখিয়াছিলেন। তাঁহার মুখ-নিঃসৃত প্রেম ও ভক্তিপূর্ণ ভুবন-বিমুগ্ধকারী সঙ্গীত শুনিয়াছিলেন। তখন বৃদ্ধের বয়স প্রায় ১২।১৩ বৎসর। তিনি বলিতেন, তাঁহারা গান বুঝিতেন না; কিন্তু কি এক বিমুগ্ধভাবে তিনি ও তাঁহার সমবয়স্ক বালকগণ গান শুনিতেন। তাঁহার অনুমানে তখন সাধকের বয়স প্রায় চল্লিশের অধিক হইবে। লিখিত ঘটনা ও এই সকল জনশ্রুতি সামঞ্জস্য করিয়া দেখিলে অনুমান হয়, প্রায় ১১৭০ সালে মহাকবি ও সাধক কমলাকান্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা চিরকালই সুজলাং সুফলাং শষ্য শ্যামলাং। বর্ত্তমান অবস্থায় স্থান বিশেষে উহা স্তুতিমাত্র হইতে পারে, কিন্তু ১৫০ শত বৎসর পূর্ব্বে যথার্থই বঙ্গজননী স্বচ্ছ সরিৎ সরোবর-শোভিতা ফলপুষ্পভারাবনতা, পাদপ-রঞ্জিতা বিবিধ শষ্যপূর্ণা ও শ্যামলাঙ্গী ছিলেন। তাঁহার শিরোদেশে ঐশ্বর্য্যের জ্যোতি, বদনে স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছলতার হাস্য, হৃদয়ে বল ও বাহুতে শক্তি বিদ্যমান ছিল। অভাব ও ব্যাধি-পিশাচের অভাবে সকল সংসারই বড় সুখের ছিল, আনন্দ ঘরে ঘরে বিরাজ করিত। বারমাসে তের পার্ব্বণ। প্রতি পার্ব্বণ মহোল্লাস ও সমারোহে অতিবাহিত হইত, প্রায় সকলেই গৃহবাসী ছিলেন। প্রবাসী কম ছিলেন। প্রবাসের সঙ্গে বিলাস আসিয়া পড়ে, বিলাসের সহচর অভাব ও দুঃখ। আজকাল বিলাস-প্রসূত যে সকল দুঃখ বঙ্গ-সংসারকে দুঃখের আগার করিয়াছে, তখন তাহা ছিল না। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই বিলাস-বিহীন। জামাতা, বৈবাহিক, আত্মীয়-স্বজন ও কুটুম্ব লইয়া আমোদ আহ্লাদ, অতিথি-সৎকার ও সকল প্রকার ব্রতের আচরণে পরম সুখভোগ করিতেন। বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা, জলাশয় প্রতিষ্ঠা, দেবালয় প্রতিষ্ঠাকে সংসারী জীবনের অতিকর্ত্তব্য কর্ম্ম বিবেচনা করিতেন। পরিধান বস্ত্র, উত্তরীয় ও স্থলবিশেষে পাদুকামাত্র পুরুষগণ ব্যবহার করিতেন। লক্ষ্মীস্বরূপিণী রমণীগণের সাধারণ অলঙ্কার শংখ্য, দুই একখণ্ড রৌপ্য ও কদাচিত স্বর্ণনির্ম্মিত অলঙ্কার দৃষ্ট হইত। সহাস্যবদনা ললনাগণ বিলাসের দিকে দৃষ্টি না করিয়া পতিসেবা, গুরুসেবা, সন্তান-প্রতিপালন, অভ্যাগত আত্মীয় ও কুটুম্বগণের সম্মান প্রদর্শন করিয়া সুখী হইতেন। এখন সে ভাব নাই। অতিথি-অভ্যাগতের কথা দূরে থাকুক,

দূরস্থিত আত্মীয়-স্বজনের অবস্থান দুই একদিন বেশী হইলে, তাদৃশ সংসারের অভাব না থাকিলেও, পুরুষগণ তাহা সহ্য করিতে পারেন না। মা লক্ষ্মীদিগেরও সেই ভাব। আজ কাল তাঁহাদের আর সেবা শুশ্রূষা বড় পোষায় না। অঙ্গ অলঙ্কার, তৈজস-পত্রের ব্যবস্থা ও শয্যাদির সংস্কার করিতেই সময়টুকু কাটিয়া যায়, অন্য পরিশ্রম বড় সহ্য হয় না। কোন কোন বিশেষ স্থলে এ ভাবের ব্যতিক্রম ও পূর্ব্ব ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা সংখ্যায় অতি অল্প। তখন প্রতিবেশীগণের মধ্যে হিংসা ও কলহের স্রোত এত প্রবল ছিল না। কথায় কথায় রাজদ্বারে বিচারালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত না। দেহ ধারণ করিলে ব্যাধির যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। সমাজভুক্ত থাকিলে কলহকে একেবারে সমাজচ্যুত করা কঠিন। তখন পরস্পরের মধ্যে বিবাদ উত্থাপিত হইলে গ্রামস্থ জ্ঞান-বৃদ্ধগণই তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন, কদাচিত রাজদ্বারে আশ্রয় লইতে হইত। গ্রাম পল্লী ও নগরবাসিগণের পরস্পরের প্রতি সাহানুভূতি ও আত্মীয়তা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। তখন জামাই, বেহাই, কি কুটুম্ব আসিলে আত্মপর বিবেচনা না করিয়া সকলেই সুখী হইতেন, পরস্পরকে সাহায্য করিতেন। অভ্যাগতদিগকে সহজে ত্যাগ করিতেন না। রমণীগণও পরম আহ্লাদের সহিত চর্ব্ব্য, চোষ্য লেহ্য, পেয় প্রস্তুত করিয়া, উত্তম হইয়াছে বলিলেই, স্বর্গসুখ ভোগ করিতেন। আহারের পর বহির্গৃহে বিশ্রামের পর অনেকে সমাগত হইয়া নানাবিধ ক্রীড়া-কৌতুকে, হাস্য-রসে সময় অতিবাহিত করিতেন। "দু তিন নয়, কচে বার, এই বড়ের কিস্তিমাত" ইত্যাদি শব্দে বৈঠক-গৃহ, এমন কি, পল্লী পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইত। সন্ধ্যার পর সঙ্গীত-চর্চ্চায় পরমানন্দ ভোগ করিতেন। ভদ্রলোকের পক্ষে মল্লবিদ্যা ও সঙ্গীত বিদ্যার পরিচর্য্যা না করা দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হইত। সাধারণের মধ্যে মল্লবিদ্যার অনুশীলন বিশেষরূপে চলিত, ভদ্রলোক মাত্রেই তাহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তখন সাধারণ, মধ্যবৃত্ত ও ধনাঢ্যদিগের সুখে সময় অতিবাহিত হইত। রাজ্যও নিরুপদ্রব। বঙ্গকাননে ব্রিটিস সিংহ পদার্পণ করিয়া শাসন পূর্ব্বক গর্জ্জন করিতেছেন। ভারতের অন্যান্য স্থলে যুদ্ধ হাঙ্গামা থাকিলেও বঙ্গে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। লর্ড কর্ণওয়ালিস সমাজের নানাবিধ উপকারে মনোযোগী। একদিকে রাজস্বের দশশালা বন্দোবস্ত, অন্যদিকে ব্যবহারিক উপকারের স্রোত চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। এই সুখকর সময়ে সাধক কমলাকান্তের আবির্ভাব হইয়াছিল।

মহাত্মা কমলাকান্ত অল্পবয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, এমন কি, কথিত
আছে, তিনি উপনয়নের পর হইতেই বিলাস ত্যাগ করেন। তাঁহার মাতার
অনুরোধে কিছুদিন সংসার বাস করিলেও সন্ন্যাসীর ন্যায় অবস্থান করিতেন।
তাঁহার এত অল্পবয়সে বৈরাগ্য অবলম্বনের কারণ আছে ও তদ্বিষয়ে জনশ্রুতিও
আছে। মহাত্মার উপবীত ধারণের পর একদিন তাঁহার মাতা কোন কার্য্যের
জন্য নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে পাঠান। একটী মাঠ ও ক্ষুদ্র নদী পার হইয়া
সেই গ্রামে যাইতে হয়। চৈত্রমাস, বসন্তদেব সৌরভে গৌরবে বন উপবন
পথ ঘাট সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন। অশ্বত্থ বট প্রভৃতি বনস্পতিগণ নব
কলেবর ধারণ করিয়াছেন। সুবর্ণময় কিসলয়গণ মৃদু পবনভরে নৃত্য করিয়া
বসন্তবাসরে প্রকৃতির নাট্যমন্দিরে মহাসমারোহ আরম্ভ করিয়াছে। এক-
দিকে কিংশুক লোহিত বর্ণের ছবির অভিনয় করিতেছে; অন্যদিকে
কোকিলগণের কুহু কুহু ধ্বনি। মলয়ানিল কুসুমরাশির সৌগন্ধে মণ্ডিত
হইয়া মৃদুভাবে চলিতেছে। বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত, সূর্য্যদেব কিঞ্চিৎ
প্রখর হইলেও অসহ্য নহেন। মুণ্ডিত মস্তক বালক কমলাকান্ত মাঠের পথে
চলিতেছেন। হাস্যময় গণ্ডযুগ। বিদ্ধকর্ণ, হরিদ্রারঞ্জিত যজ্ঞসূত্র। পরিধান
লোহিত বস্ত্র, তরুরাজির দিকে দৃষ্টি করিয়া চলিতেছেন। যাহারা তাঁহার
মুখনিঃসৃত ভক্তিপূর্ণ পদাবলি শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি,
তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি সুমধুর ছিল। প্রকৃতি-দত্ত না হইলে কোন শক্তিই
সারবান হইয়া যৌবনে ও প্রৌঢ়ে সুফল প্রদান করিতে পারে না। চেষ্টা ও
মার্জ্জনাদ্বারা মানবের শক্তি সকল পরিপুষ্ট হইলেও অক্ষুণ্ণ সাফল্য লাভে
কৃতকার্য্য হয় না। যাহা প্রকৃতিদত্ত, তাহা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত, ইহা অবশ্য
স্বীকার্য্য। উপার্জ্জিত বিদ্যা, উপার্জ্জিত জ্ঞান, মার্জ্জিত আত্মায় নিহিত শক্তি
ও ভক্তি বর্ষাকালের জলদ জালের ন্যায় সময়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। শৈশব-
কালেই তাহাদিগের আবির্ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। মহাত্মা কমলাকান্ত
প্রকৃতির সেই অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিয়া পরম পুলকভরে এই গান করিতে
করিতে চলিতেছেন;—

কে জানে মন কালী কেমন!
ষড়্দর্শনে না পায় দরশন!
কালী পদ্মবনে হংস সনে হংসীরূপে করে রমণ।
তাঁকে মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন।

আত্মারামের আত্মা কালী, প্রমাণ প্রয়োগ লক্ষ এমন,
তারা ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন।, ইত্যাদি।

এই গান মহাত্মা রামপ্রসাদের. তখন সাধক-শিরোমণি প্রকৃতির প্রিয়পুত্র
রামপ্রসাদের গান দেশব্যাপ্ত হইয়াছিল, আবাল বৃদ্ধ বণিতার মুখে শোনা
যাইত। ভাষার সারল্যে ভাবের উচ্ছ্বাসে ও ঔদার্য্যে, মানব-প্রকৃতির সহিত
সামঞ্জস্যে মহাত্মা রামপ্রসাদের গীতাবলী চিরকালই বাঙ্গালার অমূল্য রত্ন
বলিয়া গৃহীত হইত। মহাত্মা কমলাকান্তের বয়স অল্প হইলেও তিনি জ্ঞান-
বৃদ্ধ, গীতের মর্ম্ম হৃদয়গত করিতে পারিয়াছিলেন। পাতায় পাতায়, পুষ্প
পুষ্পে, ফলে ফলে, প্রতি বর্ণে বর্ণে, প্রতি কোকিলকূজনে প্রকৃতিময়ী বিশ্ব-
বিমোহিনী মহামায়ার অবস্থান অবলোকন করিতেছিলেন। মহাত্মার স্মিত
গণ্ডযুগে, চারুদন্তে, উজ্জ্বল নয়নে হাসির লহরী ছুটিতেছিল। কোকিল কূজনের
সহিত যোগ দিয়া সেই গীত গাহিতে গাহিতে চলিলেন। দিগন্তর প্রতি-
ধ্বনিত করিয়া, অমিয় স্রোত ছড়াইয়া কেদার-বাহিনী একটী ক্ষুদ্র নদীর নিকট
উপস্থিত হইলেন, পার ঘাটে বৃহৎ অশ্বত্থবৃক্ষ, সম্মুখে নদী, রজতবর্ণ জলস্রোত
স্বচ্ছ সুবর্ণবর্ণ বালুকার উপর সূর্য্যকিরণে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া সুবর্ণ-
হারের ন্যায় শোভা পাইতেছে। পার্শ্বে শ্মশান, অঙ্গার রাশি, অর্দ্ধদগ্ধ বংশ-
খণ্ড ও কলসী সকল বিকৃতভাবে পতিত। শব-শয়নের ভূমি সকল চিহ্নিত,
মায়া মোহ, আশা ভরসা, কাম, ক্রোধ অহঙ্কার, ভক্তি স্নেহ প্রভৃতির নিশ্চেষ্ট-
ভাবে চির শয়নের স্থান—ঘোর কলরবপূর্ণ বিকট ব্যাপার ব্যাপৃত লোক-
সমাজের একমাত্র নীরব নিশ্চেষ্ট শান্তির শয্যা। বালক কখনও অশ্বত্থ বৃক্ষের
দিকে, কখনও বা নদীর জলস্রোতের উপর, কখন শ্মশানের দিকে দৃষ্টি
করিতে লাগিলেন। সুখস্পর্শ শীতল সমীরসেবিত নব কিসলয়ের নৃত্য সৈকত
সংলগ্ন নির্ম্মল সলিলরাশির গমন বৈচিত্র্যে, শান্তিময় শ্মশানের মাধুর্য্যে স্থিরচিত্ত
হইলেন। প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ; নদীর ধার, শ্মশান; সাধারণ বালকের সহজেই
ভূতের ভয় আসিত, ভয়ের সঞ্চার হইত কিন্তু সাধক বালকের হৃদয় অন্য
উপাদানে গঠিত। যৌবনে, প্রৌঢ়ে যে শ্মশান তাঁহার সাধনার স্থল হইবে,
সেই শ্মশান দর্শনে তাঁহার প্রীতির সঞ্চার হইল, তিনি বৃক্ষতলে বসিয়া
শ্মশানের দিকে দৃষ্টি করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, শ্মশান হইতে
একজন লোক আসিতেছেন। তাঁহার পরিধান বল্কল। হস্তে ত্রিশূল,
সর্ব্ব শরীর ভস্মে আবৃত। গলে হাড়মালা, কপালে রক্তবর্ণ [illegible]

জটাজূট, নির্জ্জন শ্মশান মধ্যে এরূপ বিকৃত বেশধারী পুরুষের দর্শনে সামান্য বালক হয়ত মূর্চ্ছিত হইত কিম্বা চীৎকার করিয়া পলায়ন করিত কিন্তু কমলাকান্ত কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, বরং তাঁহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। যোগীপুরুষ ত্রিশূল হস্তে হাসিতে হাসিতে বালকের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এখানে কি করিতেছ? আমাকে দেখিয়া তোমার ভয় হয় নাই? বালক বলিলেন, আমি এই নদী পারে গ্রামে যাইব, আপনাকে দেখিয়া ভয় হইবে কেন, আপনি কে? যোগী পুরুষ সন্তুষ্ট হইয়া বালকের হাস্যময় গণ্ডযুগ, দুই হস্ত ও মস্তক আঘ্রাণ পূর্ব্বক বলিলেন, আমি তোমার পিতা। বালক উত্তর করিলেন, আমার পিতা নাই। শুনিয়াছি, আমি যখন পাঁচ বৎসরের, তখন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। সন্ন্যাসী বলিলেন, যিনি জন্ম দেন, তিনি ছাড়া এ সংসারে আরও অনেক পিতা আছেন, পরে জানিতে পারিবে। যোগী তাঁহার মুখ ও কপালের দিকে দৃষ্টি করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, বালক খণ্ডযোগী, জন্মান্তরের সুকৃতি প্রচুর, তাই নির্ভীক; ইহজন্মে তপঃসিদ্ধ হইবেন; সংসারে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবেন। ইনিই আমার তপঃসিদ্ধ মন্ত্রগ্রহণের উপযুক্ত পাত্র। বিদ্যা ও সিদ্ধমন্ত্র অর্পণ ভিন্ন কার্য্যকর হয় না। আমার বহুকষ্ট প্রসূত মন্ত্র এই বালককে প্রদান করিব। এই ভাবিয়া তিনি বালককে কহিলেন, আমি তোমাকে কোন জিনিস দিতে ইচ্ছা করি। বালক কহিলেন, কি, হাড়ের মালাটী না ত্রিশূলটী, যোগী বলিলেন, মালা তুমি পার্ব্বে। বালক বলিলেন, কৈ, দেখি কি দেবেন, ঔষধ পত্র নয় ত, তাহলে আমি নেব না। মা বারণ করেছেন, কারো কাছে কোন জিনিস খেতে নাই। সন্ন্যাসী বলিলেন, আমি তোমাকে ও সব কিছুই দিব না, মন্ত্র দিব। বালক বলিলেন, আবার মন্ত্র, পৈতার দিন থেকে কাকা তিন বেলা সন্ধ্যাগায়ত্রী পড়াস্থানে গোটাকত পাতাও দিয়েছেন, তবু আজ পর্য্যন্ত মুখস্থ হয় নাই। (ক্রমশঃ)

ভবিতব্যতা।

(সত্য ঘটনা)

লেখক—শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী কাব্যতীর্থ।

আমার বাইশ বৎসর বয়স, কিন্তু আমি ক খ পর্য্যন্ত জানি না। বামুনের ঘরে গরু বলিয়া আমি সকলের অবজ্ঞা ও উপহাসের পাত্রই ছিলাম। আমার স্ত্রীও সেজন্য আমাকে মধ্যে মধ্যে অনুযোগ করিত। বাবা মস্ত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি না কি গণনায় বুঝিতে পারেন, আমিও মস্ত পণ্ডিত হইব, উচ্চপদ পাইব। তবে আর কি, আমার বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা হইল না। ভবিতব্যতার বিরুদ্ধে মানুষের কোন হাতই নাই বুঝিয়া, তিনি আমার সম্বন্ধে হাত পা গোটো করিয়া রহিলেন।

বিবাহ হইল। সুন্দরী স্ত্রীও পাইলাম। দিনগুলি হাসিয়া আমোদ করিয়া একরূপে কাটিতেও লাগিল। বাবার পণ্ডিতী আয়ে সংসার স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত, আমার আর রোজ্‌গার করার কোন আবশ্যকই ছিল না।

হঠাৎ একদিন আমাদের অকূল-সাগরে ভাসাইয়া বাবা আমার স্বর্গারোহণ করিলেন। যাহা কিছু ছিল শ্রাদ্ধেই ব্যয় করিতে হইল। তারপর আয়ের পথ বন্ধ; আমিও মূর্খ, রোজগার করিব কি; কাজেই সংসার অচল হইল। তখন আমার ঘর-আলো-করা দুইটি সন্তান। একটি পুত্র ও একটি কন্যা লইয়া আমরা চারিজন প্রাণী।

কাল দারিদ্র্য আসিয়া আমার স্ত্রীর মুখের হাসি মুছিয়া লইল, চক্ষুর কটাক্ষ হরিয়া দিল, মুখের মধুর স্বরটুকু পর্য্যন্ত সবলে কাড়িয়া নিয়া গেল। আমার আনন্দময়ী প্রেমময়ী স্ত্রী দিন দিন বিষণ্ণ হইয়া পড়িতে লাগিল। আমার দুরদৃষ্টক্রমে তাহার সে কোমল প্রকৃতি রুক্ষ হইয়া উঠিল। অমন প্রিয়বাদিনা স্ত্রী শেষে মুখরা হইয়া পড়িল।

দিন অচল। কোন দিন অর্দ্ধাশন, কোনদিন অনশনে দিন কোনমতে কাটিতে লাগিল। স্ত্রীর সৌন্দর্য্য মলিন হইয়া গেল—তাহাতে দুঃখ ছিল না; কিন্তু তাহার ভিতরটাও ক্রমে মলিন হইতে লাগিল—ইহাই বড় দুঃখ। ছিন্নবস্ত্রে অঙ্গ ঢাকিয়া, মাথায় একরাশ চুলের গোছা লইয়া স্ত্রী সংসারের কার্য্যই করিত—তাহার কোন সুখ ছিল না। ক্রমে তাহার শরীরে রোগ

দেখা দিল। কথায় কথায় ছেলে মেয়েদের প্রহার করিত। আমার সহ্য হইত না, আমি খুব তিরস্কার করিতাম।

বিবাদে অশান্তিতে মন বড়ই তিক্ত হইয়া পড়িল। গৃহে সুখ-শান্তি নাই—কাজেই সমস্ত দিন পাড়ায় পাড়ায় তাস দাবা পাশা খেলিয়া, গান বাজনা আড্ডা ইয়ার্কি দিয়া, তামাক, বিড়ি সিগারেট খাইয়া কাটাইয়া দিতাম। আমার এই সংসারে বীতশ্রদ্ধ ভাব, রাত্রিদিন বৃথা আড্ডা ও ইয়ার্কির ঝোঁক বাড়িয়াই চলিতেছে দেখিয়া, স্ত্রীর ধৈর্য্য আর রহিল না। আমাকে দু-কথা শুনাইয়া দিত, আমি চাষার মত হাঁক্কা হোক্কা করিয়া তাহার শোধ দিতাম।

সারারাত যাত্রা শুনিয়া চক্ষু লাল করিয়া সকালে বাড়ী ফিরিলাম। আমার স্ত্রী সেদিন সপ্তমে চড়িয়া আমাকে যাহা না বলিবার তাহাই বলিল। "গাঁজাখোর, মূর্খ, বামুনের ঘরে গরু, চাষার বেহদ্দ" ইত্যাদি বলিয়া গালি দিতে আরম্ভ করিল। শেষে এমন কথাও বলিল—"লজ্জা করে না! বামুনের ঘরের ছেলে ক খ পড়িতে জান না। এর চেয়ে গলায় দড়ী দিয়ে মরাও যে ভাল।"

ইহার উত্তর দিব কি? সেদিন ঐ মর্ম্মান্তিক কথায় আমার ভিতরকার কোমল রক্ত টগ্‌বগ করিয়া ফুটিয়া উঠিল, রাগে ক্ষোভে অভিমানে আমি দিশাহারা হইয়া পড়িলাম। সেদিন কি জানি কেন শেষে কাঁদিয়া ফেলিলাম। তখন ধীরে ধীরে গামছাখানি লইয়া স্নানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। দূর হইতে শুনিলাম, "ওগো, শুনে যাও, ফিরে এস।"

আর শুনিব কি, আর ফিরিলাম না। শ্বশুর-বাড়ীতে একখানি পত্র লেখাইয়া দিয়া অনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে যাত্রা করিলাম। একখানি মাত্র কাপড় সম্বল করিয়া রিক্ত হস্তে আমি কত গ্রাম, কত মাঠ পার হইয়া চলিলাম। কোন-দিন অতিথি হইতাম, সেদিন খাওয়া মিলিত। গাছতলায় মড়ার ঘরে, হাটের চালায় শুইয়া কত রাত্রি কাটিয়া যাইত।

কোথায় আসিয়াছি; কোন্ জেলা, কোন্ গ্রাম তাহা জানি না। নদী তীরে ঘাটের চাতালে সারারাত্রি শুইয়া আছি, প্রত্যূষে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখি, একটী দয়াবতী প্রৌঢ়া রমণী আমার দিকে চাহিয়া আছেন। "বাবা, তুমি কে?" বলিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। এতদিনের পর আমাকে স্নেহ করে এমন লোক পাইয়া বড়ই স্বস্তি বোধ হইল। আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম।

মা কখন দেখি নাই, মার স্নেহ কখন পাই নাই। কাজেই তাঁহাকে মাতৃ-সম্বোধন করিয়া অনেক দিনের সাধ মিটাইলাম।

আমি সেই মায়ের সঙ্গে তাঁহার বাটী গেলাম। সেই বাড়ীতে মা আমার থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। আমি একবেলা রাঁধিবার ভার লইয়া সেখানেই রহিয়া গেলাম। সেই কর্ত্রী, কর্ত্তা, আর তাঁহাদের শেষ বয়সের দুইটি পুত্র—এই চারিজন মাত্র লোক। ছোট ছেলেটির বয়স ৮ বৎসর, বড় ছেলেটির বয়স ১০ বৎসর মাত্র। গ্রামের স্কুলে ছেলে দুটী পড়িত। মাষ্টার সকালে ও সন্ধ্যায় প্রাইভেট পড়াইয়া যাইত।

আমি সন্ধ্যার পর ছেলে দুটীর পড়িবার ঘরে বসিতাম। মা মাষ্টারকে বলিয়া দেন, ঐ সঙ্গে আমাকেও যেন পড়ান হয়। আমি 'ক খ, জানি না শুনিয়া, মাষ্টারের বড়ই দয়া জন্মিল। তিনি বড় যত্নে আমাকে পড়াইতে লাগিলেন। আমি অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনেক শিখিয়া ফেলিলাম। মাষ্টার তাঁহার সমস্ত বিদ্যা আমাকে দান করিলেন।

তার পর আমি মায়ের ইচ্ছায় স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। তিন মাস যাইতে না যাইতে উপরকার শ্রেণীতে আমাকে উন্নীত করা হইল। প্রত্যেক বৎসরে ডবল প্রমোশন পাইতে লাগিলাম। সেই মাষ্টারটি মোক্তারী পরীক্ষা দিবার জন্য চাকুরি ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার কার্য্য আমি করিতে লাগিলাম। রাঁধুনি বামুন প্রাইভেট মাষ্টার হইল।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় ২০৲ টাকা জলপানি পাইয়া উত্তীর্ণ হইলাম। মায়ের আর আনন্দ ধরে না। আমি তখন এফ্-এ পড়িবার জন্য কলেজে ভর্ত্তি হইলাম। ছেলে দুটীর প্রাইভেট মাষ্টার আমিই; তাহাদিগকে অতি যত্ন করিয়াই পড়াইতে ছিলাম। তাহারা প্রথম হইতে লাগিল। ছেলে দুটী আমাকে দাদা বলিয়া ডাকিত; দাদার মতই ভক্তি করিত। আমিও ছোট ভায়ের মত তাহাদের দেখিতাম।

জলপানি আমি যাহা কিছু পাইতাম, সমস্তই মার হাতেই দিতাম। প্রাইভেট মাষ্টার হিসাবে পাওনা বলিয়া কিছু আমি লইতাম না। মার কাছে কিছুই আমার গুপ্ত ছিল না। এমন কি, জীবনের সমস্ত ঘটনাই তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলাম। আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক হৃদয়ের গুপ্তদ্বার খুলিতাম না; মা জোর করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার খুলিয়া লইয়াছিলেন।

ক্রমে এফ্-এ পাশ করিলাম। তাহার জলপানি পাইয়া প্রথম শ্রেণীর অনারে বি-এ পরীক্ষায়ও পাশ হইলাম। বড়টি তখন প্রবেশিকা পরীক্ষা দিল।

ঘরে বসিয়া এক বৎসরের মধ্যে ইংরাজীতে এম্-এ দিলাম। প্রথম শ্রেণীতেই উত্তীর্ণ হইলাম। ডিরেক্টর মহোদয় দয়া করিয়া তিনশত টাকা মাহিনা দিয়া আমাকে ডেপুটী স্কুল ইন্‌স্পেক্টর করিয়া লইলেন।

বাবার গণনা সত্য হইল। বিদ্বান্ হইলাম, উচ্চ পদ পাইলাম—কিন্তু জীবনে আমার সুখ ছিল না। আমার ছেলে মেয়েটির জন্য মন বড়ই কেমন কেমন করিত। কিন্তু এ আমার নূতন জন্ম। পূর্ব্বজন্মের স্ত্রীপুত্র ভাবিয়া তাহাদের উপর মায়া কাটাইবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি, অন্তরের পানে তাকাইলাম, সে স্থান মরুভূমির মত ধূ ধূ করিতেছে।

মা একদিন আমার নিকট তাঁহার স্নেহের দক্ষিণা চাহিলেন। স্নেহের দক্ষিণা! মার সে স্নেহের দক্ষিণা জীবন দিলেও যে হইতে পারে না—আমি তাহা দিতে প্রতিশ্রুত হইলাম। প্রতিশ্রুতি ঠিক পালন করিব—এই ভরসা পাইয়া মা "আসিয়া বলিব" বলিয়া চলিয়া গেলেন।

আমি "মা কি দক্ষিণা চাহিবেন"—ভাবিতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম, মা একটি অবগুণ্ঠিতা রমণীর হাত ধরিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। আমার হাতে সঁপিয়া দিয়া বলিলেন,—"ইহার সব দোষ ক্ষমা করিয়া ইহাকে চরণে স্থান দিও।" মা চলিয়া গেলেন।

অবগুণ্ঠিতা রমণীটী ঘোমটা খুলিয়া আমার পা দুটী জড়াইয়া ধরিয়া অঝোরে কাঁদিতে বসিল। "বল, আমাকে ক্ষমা করিলে? পাপের অনেক সাজা পেয়েছি, আর সহ্য করিতে পারি না।" আমি সব ভুলিয়া গিয়া তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইলাম। তার চক্ষুর জলে আমার বক্ষ ভাসিয়া গেল। তার সর্ব্বাঙ্গ থর থর কাঁপিতে লাগিল। মনে হইল, আমি ধরিয়া না রাখিলে সে বুঝি মূর্চ্ছা যাইবে।

আমার কোলে মাথা রাখিয়া সে অবসন্নভাবে আমার মুখের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল। "আমি ক্ষমা করেছি, মায়ের দান বলিয়াও আমি তোমাকে ত্যাগ করিতে পারি না, আমার ভবিতব্যতাই ইহার জন্য দায়ী—আমি কাহাকেও দোষ দিই না।" শুনিলাম, আমি চলিয়া আসিবার পর কিছুদিনের মধ্যেই সেই ছেলেমেয়ে দুটী বিসূচিকারোগে

একদিনেই প্রাণত্যাগ করে। উঃ! পরে জানিলাম, ঠিকানা লইয়া আমার স্ত্রীর নিকট কিছু কিছু খরচা বলিয়া পাঠাইয়া দিতেন, আমাকে তাহা একেবারেই জানান নাই। আমার জলপানির টাকা হইতে ১০৲, শেষে ১৫৲ টাকা করিয়া পাঠাইতে লাগিলেন। "যথাসময়ে দেখা করাইয়া দিব" এই ভরসা দিয়া স্ত্রীকে শান্ত করিয়া রাখেন। কোনরূপে এখানে আসিলে বা কোন চিঠিপত্র লিখিলে কুফলই ফলিবে—ইহাও জানাইয়া দেন।

ভাঙ্গা হাট জোড়া লাগিল। আমার মরুভূর মত বক্ষের মধ্যে ফলপুষ্পময়ী সুজলা ভূমি আবার গড়িয়া উঠিল। সে স্ত্রী এখন প্রেমময়ী আনন্দময়ী। সেই এখন আমার সংসারে বন্ধন। আমি ক্ষমা করিলাম। তবে সেই ছেলেমেয়ে দুইটির করুণ স্মৃতি ক্ষতের মত আমার স্ত্রীর বক্ষ জুড়িয়া রহিল। আর আমার—সে কথায় কাজ নাই।

পাঁচফোড়ন।

লেখক,—শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল।

প্রথম লহর—পরিচয়ে।

শরীরটা তেমন ভাল বোধ না করায়, জজ্ সাহেব সেদিন কাছারীতে আসেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের কনিষ্ঠ সহোদরের আবির্ভাবে, সদরওয়ালা বাবুকে, সকালা মাত্র দুইখানি বাতাসায় পিত্ত রক্ষা করিতে হইয়াছিল; জজসাহেব অনুপস্থিত দেখিয়া, তিনিও সকাল সকাল বাড়ী ফিরিবার ব্যবস্থা করিলেন। যে সব মামলা, শোনানীর জন্য ধার্য্য ছিল, তাহার পনর আনা পনর গণ্ডা স্বতঃই মুলতুবী হইত; সবজজ গৃহিণীর প্রিয় অনুজের সম্মানরক্ষার্থ আজ বাকী পাঁচ গণ্ডাও পিছাইয়া পড়িল। বেলা ১২ টার মধ্যেই আদালতের কার্য্য বন্ধ হইল।

বাড়ীতে মক্কেল আসার সময় তখন কাটিয়া গিয়াছে। সিনিয়র উকিল বাবুরা কাজেই জুনীয়রদের সহিত পরদিনের মামলার আলাপনে উকিলী ভাষায়, "কন্‌শলটেশনে" বসিলেন। যে সব মামলা বলির পূর্ব্বে এইরূপে উৎসর্গ অধিবাসে চড়িল, তাহার কাগজ-পত্রগুলি কাহারও কাছে ছিল

না; কিন্তু সে জন্য কন্‌শলটেশন একটুও আট্‌কাইল না, সকলেই সরল হৃদয়ে, অভ্যস্থ হস্তে নিজ নিজ ডায়েরীতে একটি করিয়া "ফি" নোট করিয়া রাখিলেন। সিনিয়র ও জুনিয়রের মাঝা-মাঝি শ্রেণীর উকিলরা অর্থাৎ যাঁহাদের পশার সবেমাত্র ডাঁসাইয়াছে, তাঁহাদের এরূপ কন্‌শলটেশনের অধিকার ছিল না; কিন্তু বাড়ী ফিরিবার ইচ্ছা থাকিলেও, পাড়ার অলস জিহ্বার ভয়ে, ফিরিতে পারিলেন না; দশ ও দেশের আলোচনায় নিবিষ্ট হইয়া গেলেন। যে সব জুনীয়র বাবুরা কোনও সিনিয়র বাবুর সৌভাগ্যের সহিত জড়িত ছিলেন না, তাঁহাদের সকাল সকাল বাড়ী ফিরিবার বিশেষ কোন বাধা ছিল না, তবে মজলিসের চাঁদের আলো ছেড়ে নিরাশার আঁধারে যাইতে তাঁহাদের মন সরিল না। লাইব্রেরীটা এই রকমে জটলায় ভরিয়া গেল।

ঘরের একপার্শ্বে একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল ছিল। লাইব্রেরীর সাজ-সজ্জার মধ্যে সেইটা সব চেয়ে নূতন—যেন ক'নে বউ, কিন্তু এমন কুক্ষণে ঘর করিতে আসিয়াছিল, যে এত নূতন তাজা হইয়াও সবে ধন বেয়ারা নীলমণির যত্ন লাভ করিতে পারে নাই, অল্পদিনেই অনাদরে মলিন হইয়া পড়িয়াছিল। এই অনাদৃত টেবিলের অশ্রুসিক্ত বক্ষে, নিজের চরণযুগল বিস্তৃত করিয়া সাম্‌নের একখানি লৌহ ঠেস্-রক্ষিত কাষ্ঠের চেয়ারে আচকানে আবদ্ধ বপু হেলাইয়া, বিভূতিভূষণ বাবু নিনাদ-বিকম্পিত নাসিকায় ভাসমান সোনার ফ্রেমে বাঁধা নীল চসমার আড়াল হইতে মুদ্রিত নয়নে একখানি 'ল' রিপোর্ট হৃদয়ঙ্গম করিতেছিলেন। বিভূতি বাবু মাত্র ৩৪ বৎসর হইল প্রাক্‌টিশ আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু প্রাক্‌টিশে নবীন হইলেও বয়স ও বহুদর্শিতায় তিনি প্রবীণ; মেজাজটাও তাঁহার খুব দরাজ; শুনা যায়, দ্বাদশ প্রয়াসে "ফাইনেল" পাশ হইয়া, নূতন জামাই হইতে আত্মীয়-কুটুম্ব, পরিচিত অপরিচিত আদি প্রায় দুই হাজার লোককে তিনি প্রীতি-ভোজনে আহ্বান করেন। এ হেন দরাজ মেজাজ নিরাপদে রাখিতে হইলে আরও দরাজ আধারের প্রয়োজন; ভগবানের সুবিচারে বিভূতি বাবুকে এই অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী হইতে বঞ্চিত হইতে হয় নাই।

দুইটি কন্‌শলটেশন শেষ করিয়া, সন্নিকটস্থ একখানি চেয়ার হইতে, গৌরীপদ বাবু অনিমিষ-নয়নে এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন। তাঁহার উদার

দয়াল-হৃদয় 'ল' রিপোর্টের এই নির্য্যাতন সহিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া তিনি নিপীড়িত পুস্তকখানিকে বিভূতি বাবুর নিষ্পেষণ হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন; তারপর, অধরস্থ সিগারেটের সদ্যজাত ধূমরাশি বিভূতি বাবুর নাসারন্ধ্রে প্রক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সিগারেটটি এইরূপে ভস্মীভূত হইয়া গেল, কিন্তু গৌরী বাবুর বদন-নিক্ষিপ্ত ধূমতরঙ্গ বিভূতি বাবুর সেই উদ্দীপিত নাসিকামণ্ডলে লাগিয়া, অশনি-বিতাড়িত মেঘের ন্যায় খানখান হইয়া অদৃশ্য হইল। অন্য উপায় আকর্ষণের আশায় গৌরীবাবু তখন মস্তকের কেশমূলে বামহস্তের পঞ্চাঙ্গুলী প্রচালিত করিলেন। গণিত শিক্ষকের সাদর উৎকর্ষণে পাঠ্যাবস্থাতেই গৌরীবাবুর কুন্তল-ভিত্তি শিথিল হইয়া পড়ে, তারপর মক্কেল অন্বেষণ ক্লেশে সেই শিথিল কুন্তলের চৌদ্দ আনা ঝরিয়া যায়। কাজেই নূতন পথ আবিষ্কারের সুবিধা হইল না; গৌরী বাবু ক্রমে চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এমন সময় তাঁহার প্রিয় সখা কীর্ত্তিভূষণ বাবু আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।

ব্যাপার বুঝিতে কীর্ত্তি বাবুর দেরী হইল না। বামকর্ণে রক্ষিত সোণার সরু শিকলে বাঁধা পিন্সনেজ চসমাখানি পাড়ওয়ালা রেশমী রুমালে মুছিয়া লইয়া, তিনি নিজেকে বিভূতি বাবুর দক্ষিণ পার্শ্বে সংস্থাপন করিলেন। তারপর সন্তর্পণে পেন্‌টুলনের ভাঁজ ঠিক করিয়া, চতুর্দ্দিকে একবার দৃষ্টি প্রসারণ করিয়া লইলেন। নিকটে বিশ্বনাথ বাবু বসিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট নস্যের কৌটা চাহিয়া, কীর্ত্তি বাবু নিজের পৃষ্ঠে লম্বিত কোট্‌টি খুলিয়া সার্টের শ্লিভ দুইটি গুটাইয়া রাখিলেন। বিশ্বনাথ বাবুর জীবনের রুটিনে ত্রৈমাসিক এক শিশি করিয়া নস্য বরাদ্দ ছিল। এই রুটিনের ব্যতিক্রমের ভয়ে তিনি নস্যের ডিবাটি ছাড়িতে অনেক ইতস্ততঃ করিলেন। তাহাতে গৌরী বাবু বলিলেন, "দাদা, ইকনমিক্সটা খুব আয়ত্ত করেছ বটে।" এ আক্রমণ বিশ্বনাথ বাবু অনায়াসে এড়াইতে পারিতেন; কিন্তু তাহাতেও পুনরাক্রমণ থামিবে না জানিয়া, হৃদয়ের বেগ অধরের হাসিতে চাপিয়া, আস্তে আস্তে কৌটাটি কীর্ত্তি বাবুর হস্তে দিলেন॥ ঢাকনি খুলিয়া সমস্ত কৌটাটি কীর্ত্তি বাবু বিভূতি বাবুর নাসাগ্রে বিস্তার করিলেন। প্রলয়ের মুখে সে নস্যের গুঁড়া উড়িয়া কীর্ত্তি বাবুর সিল্কের সার্টে গিয়া আশ্রয় লইল। ডিবা ফেলিয়া কীর্ত্তি বাবু তখনই নিজের সার্ট ঝাড়িতে ব্যস্ত হইলেন। ডিবা উদ্ধারার্থ সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বনাথ বাবু অগ্রসর হইলেন।

প্রতিশোধের সুযোগ বুঝিয়া বিভূতি-পদদলনে কুপিত সেই সেক্রেটারিয়েট্ টেবিল• সুতীক্ষ্ণ শৃঙ্গ দ্বারা সজোরে বিশ্বনাথ বাবুর চাপকানটিকে আক্রমণ করিল। •ঋপুশিল্পে রক্ষিত সে চাপকান এ আক্রমণ সহিতে পারিল না. নানা স্থানে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। চাপকানটি কাল প্রিন্সেরটার তৈয়ারী—বিশ্বনাথ বাবুর উকিল-জীবনের প্রথম অনুরাগ। সেটিকে ছাড়িয়া এই একাদশ বৎসরের মধ্যে একদিনের জন্যও তিনি অন্যে আসক্ত হন নাই। সযত্নে লালিত, দীর্ঘ পরিচিত এই প্রিয় সঙ্গীর অকালমৃত্যুতে বিশ্বনাথ বাবু কাতর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার এই ব্যথায় ব্যথিত হইয়া, গৌরী বাবু ভূপতিত কৌটাটি তুলিয়া লইলেন; তার পর সেই আহত রৌপ্যাধারে পলায়মান বিধূলিত নস্যকণাগুলি সংগ্রহ করিয়া, বিশ্বনাথ বাবুকে বলিলেন, 'দাদা, দুঃখ করিও না, অনেক স্যালভেজ বাঁচিয়াছে।' এ কথায় বিশ্বনাথ বাবু শান্তিত হইলেন কি না, দেখিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়া, গৌরী বাবু আবার সেই মহাসমরে অবতীর্ণ হইলেন। বিজয় গর্ব্বে তখন বিভূতি বাবুর নাসাদেশ পূর্ব্বাপেক্ষা উল্লাসিত। সেই উৎফুল্ল নাসিকাগহ্বর মধ্যে গৌরী বাবু এবার একটা বৃহৎ নস্য-শেল প্রক্ষেপ করিলেন। অবহেলায় সমস্ত নস্যটুকু উদরে আকর্ষণ করিয়া, বিভূতি বাবু মাত্র একবার ঘাড় ফিরাইলেন, অবশিষ্ট দেহখণ্ড হিমাদ্রির মত স্থির রহিল—চক্ষু একটুও বিচলিত হইল না। ইহাতেও গৌরী বাবু পরাজয় মানিলেন না, দুইটা সিগারেট ধরাইয়া বিভূতি বাবুর দুই নাসারন্ধ্রে সংযোজিত করিলেন। এ অস্ত্র ব্যর্থ হইল না। অল্পক্ষণেই দু' চারবার নিজের বদনমণ্ডল বিস্তার করিয়া বিভূতি বাবু একটা গভীর দীর্ঘ হাঁচি হাঁচিলেন। ইহার শ্রেষ নিভিতে না নিভিতেই আবার ঐ রকমের আর একটি হাঁচি সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের বনাতের আবরণ গলিত শীরিষের আকর্ষণ উন্মোচন করিয়া লাফাইয়া উঠিল।

পার্শ্বের ছোট ঘরে রাজেন্দ্র বাবু কবিতা লিখিতেছিলেন। হাঁচির শব্দে চমকিয়া তাড়াতাড়ি লাইব্রেরীতে আসিয়া কীর্ত্তি বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় বাজ পড়্লো? বিনোদ-কম্পিত অধরে গৌরী বাবু বলিলেন, বল্‌শেভিজিমের আবির্ভাবে কবিরা কি এখন চাঁদের জোছ্‌না ছেড়ে, মেঘের বজ্রের আশ্রয় লইয়াছে? কল্পনাবিভাসিত নয়নের তারা দোলাইয়া, রাজেন্দ্র বাবু বলিলেন, না, আমি মিথ্যা বলি নাই, সত্যই

একটা বাজ পড়েছে। হাঁচির বেগ দমন করিয়া, বিভূতি বাবু এতক্ষণ নয়ন মুছিতেছিলেন, রাজেন্দ্র বাবুর কথায় বলিলেন, তোমার কবিতায় না কি? রাজেন্দ্র বাবু তাহাতে বলিলেন, "আপনারা •বিশ্বাস কর্‌বেন না তাই। নইলে বাস্তবিকই জল-প্রপাতের মত একটা ভীষণ গর্জ্জন হয়েছিল। একটা বড় নস্যের টিপে বিশ্বনাথ বাবুর চাপ্‌কান-শোক কতকটা উপশম হইয়াছিল। আহত চাপকানের ক্ষতস্থান বাঁধিয়া, তিনি বলিলেন, "জল-প্রপাত আর বাজের শব্দ কি একই রকম?" রাজেন্দ্র বাবু কবি হইলেও ছাড়িবার পাত্র ন'ন। নিজের কথা প্রতীয়মান করিবার জন্য আবার কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়, "ওদিকে দেখুন" বলিয়া কীর্ত্তি বাবু ঘরের কোণে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিলেন। সকলের দিকে পৃষ্ঠ রাখিয়া জলধর বাবু তথায় আদালতের আরদালীবৃন্দকে পূজার পার্ব্বনী বিতরণ করিতেছিলেন। অন্য উকিল বাবুদের নিকট জজ্ সাহেবের আরদালী অপর সকলের পক্ষে এই বাৎসরিক রাজস্ব আদায় করিয়া বাটোয়ারা করিয়া দিত এবং তাহাতেই সকলেই সন্তুষ্ট হইত। কিন্তু জলধর বাবু প্রত্যেক আরদালীকে নিজ হস্তে দুই তিনবার বাজাইয়া, একটি সেলামের বহর অনুসারে কাহাকেও বা দুইটি করিয়া চক্‌চকে মুদ্রা দিতেন, এবং প্রত্যেককে তাহা "ঠিক হ্যায়" কি না, জিজ্ঞাসা করিয়া লইতেন। গৌরীবাবু ও কীর্ত্তিবাবু দুইজনেই বিভূতিবাবুকে লইয়া ব্যস্ত দেখিয়া, জলধরবাবু বিনা সমালোচনায় আজ এই কার্য্য সমাধা করিবেন, ভাবিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের যুগল দৃষ্টি এই দিকে পড়ায়, তিনি তাড়াতাড়ি বাহিরে যাইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তখন "দাদা যাচ্ছেন কেন, এদিকে আসুন না" বলিয়া কীর্ত্তি বাবু তাঁহাকে ডাকিলেন। কথাটা যেন শুনিতে পান নাই, এই ভাবে জলধর বাবু চলিয়া গেলেন। কিন্তু অল্পক্ষণেই ফিরিয়া আসিয়া তিনি কীর্ত্তি বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি আমায় ডাক্‌ছিলেন?" উত্তরে কীর্ত্তি বাবু একটু মৃদু হাসিলেন। তাহাতে জলধর বাবু বলিলেন, "বাস্তবিক আমি শুনিতে পাই নাই।" প্রত্যুত্তরে কীর্ত্তিবাবু বলিলেন, "তা দাদা, গরীবের কথা শুন্‌তে পাবে কেন?" বামকরে ওষ্ঠদেশ চাপিয়া জলধরবাবু তখন বলিলেন, 'কিছু মনে করেন নি?'

কীর্ত্তি। আমাদের মনে করা করিতে আপনাদের মতন লোকের কি এসে যায়?

জলধর। না, না, বলুন, কিছু মনে করেন নি।

গৌরী। আপনি জোর ক'রে না বলালেই কি হ্যাঃ না হয়ে যাবে?

জলধর। আপনি আবার কেন বাধা দিচ্ছেন। বলুন কীর্ত্তি বাবু, কিছু মনে করেন নি?

কীর্ত্তি। মনে করার মত কি কিছু করেছেন দাদা?

জলধর। কৈ, না।

কীর্ত্তি। তবে আর ও কথায় দরকার কি?

জলধর। তা হ'লেও আপনাকে বল্‌তে হ'বে কিছু মনে করেন নি।

কীর্ত্তি বাবু কোন উত্তর দিবার আগেই "বন্দে মাতরং" এর সপ্তমে "হিপ্ হিপ্ হুরে"র পঞ্চম চড়াইয়া ঝড়ের মত বেগে রোহিণীকান্ত বাবু তথায় আসিয়া জুটিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুহুরী আসিয়া জানাইল, পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেটের ঘরে তাঁহার এক ফৌজদারী কেস আছে। "কুছপরওয়া নেহি, হোটেলে চল" বলিয়া রোহিণী বাবু মুহুরীকে বিতাড়িত করিলেন। রকম দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। রোহিণী বাবু "ট্যাক্সি লে আও" বলিয়া অদৃশ্য এক চাপরাসীকে পুনঃ পুনঃ আদেশ দিলেন। তখন গৌরী বাবু আস্তে আস্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?" উত্তরে রোহিণী বাবু দলের সকলের হাত ধরিয়া লাইব্রেরীর বাহির করিল।

কাছারীর কম্পাউণ্ডে একটা ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ড ছিল। প্রত্যেককে এক একখানি ট্যাক্সিতে চড়াইয়া রোহিণী বাবু হুকুম দিলেন, "চালাও পেলিটি" সাতখানি গাড়ী একসঙ্গে রওনা হইল। (ক্রমশঃ)

আমার মনিব।

সব চেয়ে বড় তিনি আমার মনিব,
বিরাট পুরুষ সেই যিনি সদাশিব।
চাকুরী তাঁহার কাছে—
অনেক সুবিধা আছে,
মুক্ত হয় তাঁরে সেবি এই বদ্ধজীব

তাঁর কৃপাবারি পেলে
তরে যায় অবহেলে,
যে জন কাঙ্গাল তার ফিরে গো নশিব!
প্রাণ দিয়ে তাঁর কাজে
করে যেবা বিশ্বমাঝে,
যমেরও হাত থেকে ফিরে সে সজীব।
প্রীতি উপাসনা তাঁর
যে গো করে বারবার,
দূরে যায় পাপ-তাপ নাশিবে অশিব।
পঞ্চভূত মূর্ত্তি আঁকা
সামান্য পাঁচটি টাকা
মৃত্যুর অধীনে ল'য়ে কিবা আছে লাভ!
সেথায় দু'দিন পরে
খাটুনি খাটিয়ে তোরে,
কখন কে জানে দিবে কাজেতে জবাব।
আমার মনিব কাছে
কাজে কত সুখ আছে,
উপরি উপায় কত তিনি যে অপাপ।
কিবা সে মহিমা তাঁর
খেলিতেছে চারিধার,
সৌন্দর্য্য-কিরণ-ছটা পুণ্যের প্রভাব।
প্রীতি উপাসনা জেনো
সুখের চাকুরী হেন,
কোথা গেলে পাব আর এমন সুভাব।
এ চাকুরী ছেড়ে আর
যাব না'ক কারো দ্বার
চরণেতে প'ড়ে র'ব ঘুচিবে অভাব।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অধ্যাত্মবিদ্যা।

লেখক—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ।

সকলেরই বিশ্বাস, আমি আমাকে বেশ বুঝি, দার্শনিকগণ কিন্তু জন-সাধারণের এই বিশ্বাসে গোল বাধাইয়া দেন। তাঁহারা বলেন যে, আমার কাছে আমার ন্যায় দুর্জ্ঞেয় বস্তু আর কিছুই নাই। বল দেখি, আমি কে? এই যে মাংস অস্থি শোণিত ও মজ্জা প্রভৃতিতে গঠিত দেহ, ইহাই কি আমি? তাই বা কি করিয়া হইবে? বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্যে এ দেহ ত এক নহে, আমার কিন্তু বিশ্বাস, আমি চিরদিনই এক। ছেলেবেলায় যে আমি বাবাকে দেখিয়াছি, এই বুড়োবয়সে সেই আমি তাঁহাকে স্মরণ করিতেছি, এ বিশ্বাস ত বুড়োমাত্রেরই আছে। তাই যদি হইল, তবে আমার বাল্যকালের দেহ গিয়াছে, কিন্তু আমি ত রহিয়াছি, সুতরাং আমি যে দেহ নহি, তাহা স্থির।

আচ্ছা, এই দেহ না হয় আমি না হইলাম, ইন্দ্রিয় বা মনঃ আমি না হইব কেন? এখানেও দার্শনিক গোল বাধাইতে পশ্চাৎপদ নহেন। তিনি বলেন, তাই বা কেমন করিয়া হইবে? আমার চক্ষু, আমার কর্ণ, আমার মনঃ এই প্রকার বিশ্বাস ত আমাদের দৃঢ় রহিয়াছে, তখন কেমন করিয়া বলিব যে, আমি চক্ষু, আমি কর্ণ বা আমি মনঃ। সুতরাং বুঝা গেল, আমি চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় নহি, আমি মনও নহি।

তবে আমি কে? কেহ বলেন, আমি দেহ, ইন্দ্রিয়, মন হইতে ভিন্ন আত্মা! আচ্ছা, সেই আত্মা কি পরমাণুর ন্যায় ছোট বা দেহের ন্যায় মাঝারি পরিমাণের কিম্বা আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপক?

পরমাণুর ন্যায় যদি ছোট হয়, তাহা হইলে তাহার প্রত্যক্ষ হইবে কিরূপে? দেহের ন্যায় মাঝারি পরিমাণের হইলে, তাহা ত অনিত্য হইয়া পড়ে। যদি বল হউক না অনিত্য, তাহাতে ক্ষতি কি? ক্ষতি আছে বৈ কি, অনিত্য আত্মা হইলে আমি পুণ্য সঞ্চয় করি কেন? নিত্য আত্মা এ জ্ঞান না থাকিলে পরলোকে গিয়া এই জন্মের কৃত শুভকার্য্যের ফলভোগ করিয়া সুখী হইব, এই বিশ্বাস না থাকিলে লোকের পারলৌকিক ফল লাভের জন্য যাগ, দান, তপস্যা প্রভৃতি শাস্ত্রবিহিত কার্য্যে প্রবৃত্তি হইবে

কেন? তবে বল না কেন, আত্মা আকাশের ন্যায় বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী! তাহাই বলি কিরূপে? তোমার আত্মা ও বিভু—আমার আত্মা ও বিভু, শ্যামের আত্মা ও বিভু—সবই আত্মা যদি বিভু হইল, তবে সকলের ঠেকাঠেকি হয় না কেন? অনন্ত আত্মার ঘেঁষাঘেঁষিতে সকল আত্মাই আকুল হইয়া উঠে না কেন? এইরূপ আপত্তি আর যে কত হইতে পারে তাহার ইয়ত্তা নাই।

সুতরাং যতটুকু বিচার করিয়া দেখা গেল, তাহাতে ইহাই সিদ্ধ হইল যে, আমার কাছে আমি যেরূপ দুর্জ্ঞেয়, তেমন দুর্জ্ঞেয় আর অন্য কিছুই নাই।

উপনিষদ্ কিন্তু এই বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়াছে। সে সিদ্ধান্তটী এই;—আত্মা ব্রহ্ম, ব্রহ্ম কাহাকে বলে? তাহার উত্তরে উপনিষদই উত্তর দেয়, "প্রজ্ঞান মানন্দং ব্রহ্ম" অর্থাৎ আত্মা জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ, এ জ্ঞান কিন্তু আনন্দ হইতে ভিন্ন নহে। যে জ্ঞান সেই আনন্দ, শুধু কি তাই, এই জ্ঞান ও আনন্দই একমাত্র সৎ অর্থাৎ ইহার আদি নাই, অন্ত নাই, সুতরাং মধ্যও নাই; এ আত্মাই একমাত্র সৎপদার্থ, ইহা ছাড়া এ সংসারে অন্য কোন সদ্বস্তু নাই, ছিল না ও থাকিবে না, ইহাতে স্বগত ভেদ নাই, সজাতীয় ভেদ ও বিজাতীয় ভেদ নাই। তোমরা বলিবে, এ ত বড় বিচিত্র সিদ্ধান্ত! আত্মাই যদি একমাত্র সদ্‌বস্তু হয়, তবে এই যে ঘট পট মঠ প্রভৃতি অসংখ্য বস্তু আমার নিকটে প্রতিক্ষণ সদ্বস্তু বলিয়া প্রতীত হইতেছে, এগুলার গতি তাহা হইলে কি হইবে? তাহার উত্তরে উপনিষদ্ বলে, এগুলা মিথ্যা, স্বপ্নের সময় কত বস্তুকে তোমরা সদ্ বলিয়া বিশ্বাস কর, স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে জাগরণে সেই স্বপ্নের বস্তুগুলাকে তোমরা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস কর, তেমনি সদ্‌গুরুর কৃপায় যে দিন উপনিষদের এই মহাসিদ্ধান্ত বুঝিবার পর তোমার এই সংসার-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে, তখন সেই মহা জাগরণের দিনে তুমি বুঝিবে যে, তুমিই সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, তখন তোমার এই মিথ্যাকে সত্য বলিয়া বুঝার ফল এই শোক, তাপ, জ্বালা-যন্ত্রণা, পাপ-তাপ, ব্যাধি-জরা, মরণ সবই বিলুপ্ত হইবে। তুমি মুক্ত হইবে।

ইহাই হইল বেদান্তের বা উপনিষদের অদ্বৈতবাদ। এই অদ্বৈত সিদ্ধান্তই হিন্দু সভ্যতার ভিত্তি। এই ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত আছে বলিয়া সহস্র বৎসরের বৈদেশিক আক্রমণে এখনও হিন্দুসভ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত

হয় নাই, এখনও হিন্দুসভ্যতা জাজ্বল্যমান সত্য। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কি, তাহা বুঝিতে হইলে এই অদ্বৈত সিদ্ধান্ত ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক। এই সিদ্ধান্ত না বুঝিয়া—যাঁহারা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সমালোচনা করেন ও বর্ত্তমান প্রতীচ্য সভ্যতার সহিত ইহার বৈষম্য দেখিয়া ইহার পরিবর্ত্তন করিয়া হিন্দুসভ্যতাকে নূতন করিয়া গড়িতে চান, তাঁহারা নিতান্তই ভ্রান্ত, সুতরাং শোচ্য। আজ এই পর্য্যন্ত, বারান্তরে এই বিষয়টীর বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

মুক্তার হার।

লেখিকা,—শ্রীমতী হরিরমা সিংহ।

(১)

রংপুরে একটি অনতিপ্রশস্ত রাজপথে একখানি মধ্যায়তন বাড়ী। বাড়ীর সম্মুখে একখানি অশ্বযান অপেক্ষা করিতেছিল। একজন প্রৌঢ় পুরুষ বাড়ী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী চলিয়া গেল। হেমন্তের প্রভাত, আটটার সময়ও বেলা তত অধিক বলিয়া মনে হয় না।

বাড়ীখানি পুরাতন নহে, সুগঠিত সুন্দর। কিন্তু বহুদিন অসংস্কৃত। গৃহে অনেক লোক আছে বলিয়া বোধ হয় না, বরং জনাভাবই অনুভূত হয়। নিম্নে প্রাঙ্গনে একজন বৃদ্ধা দাসী কয়েকখানি বাসন মাজিতেছে। দ্বিতলে একটি কক্ষে হর্ম্ম্যতলে একখানি মাদুরের উপর একজন যুবতী শিশু-পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছেন। পার্শ্বে তাঁহার জননী প্রৌঢ়া, আননে চিন্তার অতি নিবিড় ছায়া, নয়নে বিষাদ। যুবতীর বয়স অষ্টাদশ হইবে। দেহে রূপ যেন ধরে না, যেন ভাদ্রের নদীজল কূলে কূলে ছাপাইয়া উঠিতেছে। যুবতীর মুখে দৃঢ়তার ভাব, ওষ্ঠাধরে সে ভাব সুস্পষ্ট, নয়নের দীপ্তি প্রখর বলিলে বলা যায়, কিন্তু কোমল বলা যায় না।

যুবতীর জননী একছড়া মুক্তার হার লইয়া দেখিতেছিলেন। মুক্তাগুলি

স্থূল সুগোল মূল্যবান্। তিনি বলিলেন, "বীণা! তোর কাকার এ উপহার অপ্রত্যাশিত আশার অতিরিক্ত।"

যুবতী পুত্রের দিকে চাহিয়াছিলেন, মুখ না তুলিয়াই বলিলেন, "এত অপ্রত্যাশিত যে, আমার দুই তিনবার ইচ্ছা হইয়াছিল যে, উহা ফিরাইয়া দিই। এখনও মনে হইতেছে, ফিরাইয়া দেওয়াই ভাল। আমার ছেলেকে আমি এ অলঙ্কার পরাইতে পারিব না।"

জননী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

"এ উপহার আমার পুত্রকে নহে। আমার শ্বশুরের নিকট কাকা সহস্র প্রকারে বাধ্য। তাঁকে সন্তুষ্ট রাখিলে কাকার অনেক লাভ, রুষ্ট করিলে সহস্র ক্ষতি। তাই কাকার এ আত্মীয়তা, এত স্নেহ। এ স্নেহ আমার পুত্রের প্রতি নয়, আমার শ্বশুরের পৌত্রের প্রতি।"

"তোর সব তাতেই কেমন।"

যুবতী মার দিকে চাহিলেন, বলিলেন, "মা, তুমি যত সহজে সব ভুলিতে পার, আমি তত সহজে পারি না, ভুলিতে চাহিও না।" বলিতে বলিতে যুবতীর চক্ষু যেন জ্বলিতে লাগিল।

মা অধোবদন হইয়া রহিলেন। হায়, তিনি কিছু ভুলিতে পারিয়াছেন? কিছু ভুলিতে পারেন কি? যুবতী বলিতে লাগিলেন, "বাবা যখন পিতৃ-মাতৃহীন পিতৃব্য-পুত্রকে মানুষ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার অবস্থা খুব স্বচ্ছল নহে, অন্ততঃ আর একজনকে প্রতিপালন করিবার মত নহে। তিনি আপনি কষ্ট স্বীকার করিয়াও কাকাকে মানুষ করিয়াছিলেন। তিনি সাহায্য না করিলে কাকা আজ পথের ভিখারীরও অধম হইতেন। বাবা হইতে তাঁহার সব। বাবা যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, কাকাও ততদিন আপনার ছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর হ'তে সে আত্মীয়তা কোথায় ছিল? যখন পাঁচশত টাকা হইলে আমাদের সর্ব্বনাশ হইত না, তুমি কাঁদিয়া কাকাকে সে কথা বলিয়াছিলে, তখন তিনি কি করিয়াছিলেন? তখন তাঁহার পক্ষে পাঁচশত টাকা প্রদান করা কষ্টকর হইত না। তাই আজ তাঁহার এ স্নেহ আমার পক্ষে অসহনীয় হইয়াছে!"

দুহিতার কথায় নিরুদ্দিষ্ট পুত্রকে স্মরণ করিয়া জননীর চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল। তিনি রন্ধন করিতে যাইবার ছল করিয়া উঠিয়া অন্য কক্ষে গমন করিলেন। মুক্তার হার পড়িয়া রহিল।

(২)

বীণার পিতা নরেশচন্দ্র অল্পবয়সে পিতৃহীন হইয়াছিলেন। সংসারে তাহার জননী ব্যতীত আর কেহ ছিল না। জননীর হস্তে সামান্য কিছু টাকা ছিল। তিনি তাহা হইতে পুত্রের শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সংসারের ভাবনা ভাবিতে শিখিয়াই নরেশচন্দ্র মাতার সেই সামান্য সঞ্চয় লইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করেন। সেই সময় দারুণ বিসূচিকা রোগে এক রাত্রিতে পিতৃব্যপুত্র মাধবচন্দ্রকে পিতৃ-মাতৃহীন জগতে সম্বলশূন্য করিয়া যায়। নরেশচন্দ্র আপনার অবস্থার কথা বিবেচনা না করিয়াই তাহার ভার গ্রহণ করেন। তিনি ভ্রাতার মত স্নেহে তাহাকে মানুষ করিয়াছিলেন, তাসের পড়তা পড়িলে এক হাতেই ছক্কা হয়। ব্যবসায় যখন লাভ হইতে আরম্ভ হয়, তখন উন্নতির গতিরোধ করাই দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। নরেশচন্দ্রের তাহাই হইল। ক্রমে ব্যবসায়ও বাড়িতে লাগিল, লাভও খুব হইতে লাগিল।

নরেশচন্দ্র একখানি বাড়ী প্রস্তুত করাইলেন। এই সময় নরেশচন্দ্রের জননীর মৃত্যু হইল। নরেশচন্দ্র সমারোহে তাঁহার শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিলেন। পূর্ব্বেই তিনি ভ্রাতার বিবাহ দিয়াছিলেন, তাঁহাকে ব্যবসা শিখাইয়া মূলধন দিয়া ব্যবসায় প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন।

কয় বৎসর নরেশচন্দ্রের ব্যবসায় খুব ভাল চলিল, তাহার পর মন্দা পড়িল। শেষে দুই বৎসর বড় লোকসান হইল। পর বৎসর তিনি লোকসান পুষাইয়া লইবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি বড় ও অনিশ্চিত ব্যবসায় টাকা ঢালিলেন; অত্যান্ত লোকসান হইয়া গেল। নরেশচন্দ্র নিঃসম্বল হইয়া দেনা মিটাইলেন। পুনরায় ব্যবসায় করিবার উপযুক্ত মূলধন রহিল না, সঞ্চয় যাহা কিছু ছিল সবই শেষ হইয়া গেল। নরেশচন্দ্র সে ধাক্কা সামলাইতে পারিলেন না। পীড়িত হইলেন। পত্নী আপনার স্ত্রীধন দিয়া চিকিৎসা চালাইলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

নরেশচন্দ্রের পত্নী ষোড়শবর্ষবয়স্ক পুত্র নলিনাক্ষকে ও দ্বাদশবর্ষিয়া কন্যা বীণাকে লইয়া বিধবা হইলেন। তখন স্বামীর গৃহ ও জীবনবিমার কিছু টাকা ব্যতীত তাঁহার আর বড় কিছু নাই। বীণার বিবাহের কথা হইতেছিল, এখন সে কথা চাপা পড়িল। এ অসময়ে নরেশচন্দ্রের বিধবা

দেবর মাধবচন্দ্রকেই অবলম্বনরূপে গ্রহণ করা স্বাভাবিক বিবেচনা করিলেন। কিন্তু মাধবচন্দ্রের ব্যবহারে আত্মীয়তার শেষ চিহ্নও ক্রমে অদৃশ্য হইতে লাগিল। বিধবা আপনার অদৃষ্টের দোষ ভাবিয়া সবই নীরবে সহ্য করিলেন। না করিয়া উপায় কি? এদিকে বীণা ত্রয়োদশ অতিক্রম করিয়া চতুর্দ্দশে পড়িল। তাহার বিবাহের চিন্তায় জননী বিব্রত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তিনি কি করিবেন, কি করিতে পারেন? এই অসময়ে একান্ত অপ্রত্যাশিত বিবাহের প্রস্তাব আসিল, অক্ষয়কুমার নরেশচন্দ্রের সম-ব্যবসায়ী ছিলেন, সেই সূত্রে উভয়ে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। যেবার ব্যবসায়ে নরেশচন্দ্রের সর্ব্বনাশ হয়, সেই বারই ব্যবসায়ে অক্ষয়কুমারের প্রচুর লাভ হয়।

এখন তিনি কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ ধনী। তিনি আপনার একমাত্র পুত্রের বিবাহের জন্য পাত্রীর অনুসন্ধান করিতেছিলেন। নরেশচন্দ্রের কন্যার কথা শুনিয়া তিনি স্বয়ং তাহাকে দেখিয়া গেলেন। অনেক ধনী তাঁহার পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইয়া অর্থের প্রলোভন দেখাইলেন, তাঁহার অনেক সুহৃদ দরিদ্রের ঘরে কাজ করা অসম্মানকর বলিয়া উপদেশ দিলেন, কিন্তু অক্ষয়কুমার কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। তিনি কপর্দ্দকমাত্র না লইয়া নরেশচন্দ্রের কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে বীণার বিধবা জননীর আনন্দের সীমা রহিল না। যে কন্যাকে কত দিবেন মনে করিয়াছিলেন, কিছু না দিয়া তাহার বিবাহ দিতে পারিলেন না। আপনার অলঙ্কারের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহা বীণাকে যৌতুক দিলেন।

(৩)

শ্বশুরবাড়ী কন্যার আদর-যত্ন জননীর অজস্র দুঃখেও সুখের কারণ হইল। পুত্র ব্যতীত অক্ষয়কুমারের অন্য সন্তান ছিল না, কাজেই বীণার আদরের সীমা রহিল না। তাহাতে জননী বিশেষ সুখী হইলেন। বীণা প্রায়ই জননীকে দেখিতে আসিত। কিন্তু একবারে দীর্ঘকাল পিতৃগৃহে বাস ঘটিয়া উঠিত না।

পিত্রালয়ে যে দাসী নলিনাক্ষকে মানুষ করিয়াছিল, সে টাজার জন্য নহে স্নেহের টানে ছিল। শ্বশুরালয়ে বীণার তিন চারিজন দাসী ছিল।

কিন্তু সে যখন পিত্রালয়ে আসিত, শাশুড়ী সঙ্গে দাসী দিতেন না; প্রথম কারণ—যদি সে মনে করে, তাহার পিত্রালয়ে দাসীর অভাবে তাহার কষ্ট হইবে বলিয়া শাশুড়ী দাসী দিলেন, সে মনে কষ্ট পায়। দ্বিতীয় কারণ—কতকগুলি দাসী দিয়া তাহার জননীকে বিব্রত করা অকর্ত্তব্য। কিছু অধিক বয়সে অষ্টাদশ বর্ষে দুই মাস হইল বীণার প্রথম সন্তান পুত্র হইয়াছে। তাহার শ্বশুর শাশুড়ীর আর আনন্দ ধরে না। পুত্রকে লইয়া বীণা এই প্রথম পিত্রালয়ে আসিয়াছে।

শাশুড়ী অনেক বিবেচনা করিয়া এবার সঙ্গে কেবল ছেলের দাসীকে পাঠাইয়াছেন।

কন্যাকে লইয়া মাতার যেমন সুখ ছিল, পুত্রকে লইয়া তেমনী দুঃখের অন্ত ছিল না। উপযুক্ত অভিভাবকহীন পুত্র কুসঙ্গে মিশিতে লাগিল, ক্রমে পাঠে অমনোযোগী হইয়া পড়িল। মা'র আশঙ্কার অবধি রহিল না। তিনি কেবল কাঁদিতেন। তিনি অনাথা বিধবা, কি করিবেন? কেমন করিয়া প্রাণাধিক পুত্রকে রক্ষা করিবেন?

অক্ষয়কুমার প্রায়ই নলিনাক্ষের সংবাদ লইতেন। তখন যদি মা সেই বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন কুটুম্বকে সব কথা বলিতেন, তবে ভাল হইত। কিন্তু লজ্জায় মাতৃহৃদয়ের আশঙ্কা ব্যক্ত হইল না। তিনি কেমন করিয়া কুটুম্বের নিকট আপনার পুত্রের দোষের কথা বলিবেন? তিনি তাহা পারিলেন না। হায়, স্নেহের আতিশয্যেও কত সময় কুফল ফলে। বল্গাহীন অশ্ব যেমন প্রবল-বেগে যেদিকে ইচ্ছা ছুটিয়া যায়, যুবক নলিনাক্ষও তেমনিই অসংযতভাবে অবনতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

নলিনাক্ষর তখনও যে ভয়, যে লোকলজ্জা, উদারতা, যে ন্যায় নিষ্ঠা ছিল, তাহার কুকর্ম্মে অভ্যস্ত সঙ্গীদিগের, কাহারও তাহা ছিল না। তাহারা অনেক সময়ে নলিনাক্ষের স্কন্ধে সমস্ত দোষ চাপাইয়া নিষ্কৃতি লাভ করিত। কিন্তু কিছুতেই নলিনাক্ষের চক্ষু ফুটিল না। মা যতদিন পারিলেন পুত্রকে রক্ষা করিলেন। শেষে আর রক্ষা করা সাধ্যাতীত হইয়া পড়িল। তিনি কেবল কাঁদিতে লাগিলেন।

বীণার বিবাহের দুই বৎসর পরে কয়জন সঙ্গী আপনাদের দেনা নলিনাক্ষের স্কন্ধে চাপাইয়া দিল। সহস্র মুদ্রা ব্যতীত তাহার উদ্ধার সাধিত হয় না। মা'র হস্তে শেষ কিন্তু পাঁচ শত টাকা ছিল। তিনি সেই শেষ সম্বলও

দিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু আর পাঁচ শত? কোন উপায় না দেখিয়া তিনি স্বয়ং যাইয়া দেবর মাধবচন্দ্রকে ধরিলেন। কিন্তু তাঁহার অনুরোধ ক্রন্দন কিছুতেই কিছু হইল না। মাধবচন্দ্র বলিলেন, এরূপে টাকা দেওয়া অর্থের অপব্যয়। কতবার এরূপ করা যাইবে? আবার যখন কল্যই টাকা চাহিবে? ইত্যাদি। কিন্তু মা যখন কিছুতেই শুনিলেন না, তখন তিনি বলিলেন, "তাঁহার ব্যবসায় মন্দা পড়িয়াছে! তিনি কিছুমাত্র সাহায্য করিতে পারিবেন না।"

মা অক্ষয়কুমারকে একথা বলিতে পারিলেন না। অক্ষয়কুমার অন্যসূত্রে অবগত হইয়া যখন সহস্র মুদ্রা লইয়া দিতে আসিলেন, তখন আর সময় নাই। তখন ঘৃণায়, লজ্জায়, ভয়ে, নলিনাক্ষ নিরুদ্দেশ হইয়াছে। সেই অবধি তাহার আর সংবাদ নাই। মা'র শরীর পূর্ব্বেও ভাল ছিল না, এখন স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল, হৃদ্‌রোগ প্রকাশ পাইল।

এদিকে মাধবচন্দ্র প্রতিপালক ভ্রাতার বিধবার নিকট যে মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন, তাহাই সত্য হইল। সেবার ব্যবসায়ে মাধবচন্দ্রের সর্ব্বনাশ হইল। এখন তিনি 'নরেশচন্দ্রের' ভ্রাতা এই সম্পর্কে অক্ষয়কুমারকে অবলম্বন করিয়া আবার দাঁড়াইয়াছেন। তিনি অক্ষয়কুমারের টাকা লইয়া তাঁহারই অধীনে কার্য্য করিতেছেন।

বীণার অনেকবার ইচ্ছা হইয়াছে, শ্বশুরকে কাকার সব কথা ভাঙ্গিয়া বলে, কিন্তু সে তাহা করে নাই। কাকার উপর বিরক্ত হইবার তাহার যথেষ্ট কারণ নাই কি?

(৪)

মা উঠিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরেই বীণা পুত্রকে দাসীর নিকট দিয়া স্বয়ং পাকশালায় যাইয়া উপস্থিত হইল। মা তখন দুগ্ধের কটাহ নামাইয়া রন্ধনের আয়োজনে ব্যস্ত। তিনি কন্যাকে দেখিয়া বলিলেন, "দুধ জ্বাল হইয়াছে, খোকার দুধ লইয়া যা।"

কন্যা বলিল, "তুমি খোকাকে দুধ খাওয়াও মা! আজ আমি রন্ধন করিব।" মা কিছুতেই কন্যাকে অগ্নিতাপে আসিতে দিবেন না, কন্যাও কিছুতে সে কথা শুনিবে না। শেষে সকল সময় যাহা হইয়া থাকে, তাহাই হইল,—কন্যার কণ্ঠস্বরে অভিমানের আভাস ফুটিতে না ফুটিতে মা পরাজয় মানিলেন। কন্যা সোৎসাহে রন্ধন করিতে উদ্যতা হইল। মা বাটিতে

দুধ লইয়া দৌহিত্রকে পান করাইতে চলিলেন। মা আসিয়া দেখিলেন, দাসী খোকাকে লইয়া বসিয়া আছে, ঘরের মাদুরের উপর মুক্তার হার পড়িয়া আছে। দাসী মাকে তাহা দেখাইয়া বলিল, "দেখ মা, বৌদিদি ফেলিয়া গিয়াছেন। টাকার জিনিষ, যদি কিছু হয়, আমরা গরিব মানুষ, আমরাই বিপদে পড়িব।"

মা বলিলেন, "ওর সব তাতেই অমন।"

"মা, বৌদিদির ভাল মন, উনি কিছু মনে করেন না, কিন্তু এমন অসাবধান হইতে নাই।"

বাল্যকাল হইতে অতিরিক্ত আদরে বীণার গোছাল হইবার সুবিধা হয় নাই। তাহার পর শ্বশুরগৃহেও দ্রব্যের ও আদরের প্রাচুর্য্য। যিনি বাল্যকালে তাহাকে গোছাল হইতে দেন নাই, তিনি আজ কোথায়?

দাসী খোকাকে দুগ্ধ পান করাইতে উদ্যতা হইল। মা দাস-দাসীর হস্তে শিশুর দুগ্ধপান ভালবাসিতেন না। তাহারা কি যত্ন করিয়া দুগ্ধপান করায়? তিনি স্বয়ং তাহাকে অঙ্কে লইয়া দুগ্ধ পান করাইতে প্রবৃত্তা হইলেন। অনেক আপত্তির পর শিশু দুগ্ধ উদরস্থ করিল। তাহার মুখ মুছাইয়া মেঝের যে কয় ফোঁটা দুগ্ধ পড়িয়াছিল তাহা পরিষ্কার করিয়া মা খোকাকে দাসীর নিকট দিলেন। তাহার পর মুক্তার হার তুলিলেন।

(৫)

শিশুকে দাসীর নিকট দিয়া মা পুনরায় পাকশালায় গমন করিলেন। তিনি দুহিতাকে বলিলেন, "বীণা, তুই ওঠ। আর আগুন-তাতে থাকিস না। অসুখ কর্‌বে।" কন্যা হাসিয়া উঠিল, বলিল, "মা, তোমার কি কোন অসুখ করিতে পারে না? যত অসুখ বুঝি আমারই হইবে।"

মা বলিলেন, "তোর সঙ্গে তর্কে কে পার্‌বে? এখন যা, খোকাকে ঘুম পাড়াতে হবে।"

"ঝি ঘুম পাড়াইবে' বলিয়া বীণা রন্ধনে প্রবৃত্তা হইল।

মা অনেক আপত্তি করিলেন, কিছুতেই কাণ দিল না। তখন মা সেই পাকশালাতেই বসিলেন। মাতা ও পুত্রীতে নানাবিষয়ে নানারূপ কথা হইতে লাগিল।

কথায় কথায় মুক্তার হারের কথা মায়ের মনে পড়িল। তিনি বলিলেন, "বীণা, তুই কি কোনও কালেই গোছাল হবি না?"

কন্যা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"মুক্তার হার ফেলিয়া আসিয়াছিলি, যদি কোনরূপে হারাইত?"

বীণার ইচ্ছা হইল বলে, "তাহা হইলে খুব আনন্দিত হইতাম।" কিন্তু সে কিছু না বলিয়া তরকারীর আলু তুলিয়া কতদূর সিদ্ধ হইয়াছে, টিপিয়া তাহার পরীক্ষায় বিশেষ মনোযোগ দিল।

মা বলিলেন, "তোর শাশুড়ী কিছু বলেন না?"

বীণা হাসিয়া বলিল, "মা কি শাশুড়ী কেহ গোছাল হইতে শিখাইলে হয় ত শিখিতে পারিতাম। কিন্তু শিখাইতে হইলে আগে তাঁহাদিগকে শিখিতে হইবে।"

(৬)

সেদিন রাত্রিকালে বীণা পিত্রালয়ে রহিল, পরদিন ফিরিয়া যাইবে। রাত্রিকালে শয়ন করিয়া মাতা-পুত্রীতে নানা কথা হইতে লাগিল, কথা কহিতে কহিতে মা উঠিলেন, উঠিয়া বাক্স খুলিলেন। বীণা জিজ্ঞাসা করিল, "মা! এত রাত্রে বাক্স খুলিতেছ কেন?"

মা বলিলেন, "মুক্তার হার আমার বাক্সে রহিয়াছে, লোহার সিন্ধুকে তুলিয়া রাখিয়া আসি।"

"বাক্সেই থাকুক।"

"না! একবার আলোটা ধর্‌বি চল্।"

বীণা আলো ধরিল। উভয়ে পার্শ্বের কক্ষে আসিলেন; মা লোহার আল্‌মারী খুলিলেন। তাহাতে বিশেষ কিছু ছিল না। তাহাতে মুক্তার হার তুলিয়া রাখিয়া উভয়ে ফিরিয়া আসিলেন।

বীণা জিজ্ঞাসা করিল, "আলমারীর চাবি হারাইয়া গিয়াছিল না?" আলমারীর একটা চাবি মার কাছে থাকিত, আর একটা মা'র হাতবাক্সে থাকিত। নলিনাক্ষ অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সে বাক্সের কয়টা জিনিষ ও সে চাবিটী পাওয়া যায় নাই। বীণা তখন তাহা শুনিয়াছিল, কিন্তু সব কথা তাহার মনে ছিল না।

মাতা-পুত্রীতে আবার কথা হইতে লাগিল। নলিনাক্ষের জন্য উভয়েই একান্ত কাতর। সে কথা উঠিতে বীণার চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল; মা কাঁদিতে লাগিলেন। তখন বীণা আবার জননীকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল, "তুমি অত ভাবিও না, নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিবে।" মা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

সেই রাত্রিতে মা ঘুমাইলেন; বীণা জাগিয়া রহিল। সে নিরুদ্দিষ্ট ভ্রাতার কথা, সংসারের কথা ভাবিতে লাগিল।

(৭)

অদূরে একটা বড় ঘড়িতে দুইটা বাজিল, বীণা তখনও জাগিয়া। সে যে সোপানে পদশব্দ শুনিতে পাইল। সে উৎকর্ণ হইয়া শুনিল, পদধ্বনি অতি মৃদুসঞ্চারে উপরে উঠিল। কিছুক্ষণ কিছু শব্দ নাই। তাহার পর গৃহের সে দিকের শেষ কক্ষটির দ্বার মুক্ত করা হইল। তাহার পরই পার্শ্বের ঘরে কাহার সতর্কপদধ্বনি ধ্বনিত হইল। স্তব্ধরাত্রি, সুপ্তগৃহ, নহিলে সে শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইত না।

বীণা দেখিল, মা ঘুমাইয়াছেন। সে তাঁহাকে তুলিল না, আপনি অতি সাবধানে দ্বার মুক্ত করিয়া বারাণ্ডায় বাহির হইল। পার্শ্বের কক্ষের দ্বার মুক্ত। দ্বারের সম্মুখে একজন কে দাঁড়াইয়াছিল, সে বীণাকে দেখিতে পাইল, অতি সাবধানে কিন্তু দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। যাহারা অন্যায় কার্য্য করিতে আইসে, তাহাদের বড় অধিক সাহস থাকে না।

বীণা সাহসে ভর করিয়া অগ্রসর হইল, পার্শ্বের কক্ষের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হইল। কক্ষে একটিমাত্র আলোক—অন্ধকার লণ্ঠন। কিন্তু দিগ্‌ব্যাপ্ত অন্ধকারের মধ্যে যে স্থানে আলোক পড়িয়াছে সেস্থানে বীণা যাহা দেখিল, তাহাতে ঘৃণায়, লজ্জায়, ক্রোধে তাহার হৃদয় যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

লোহার আলমারীর দ্বার মুক্ত। আর তাহারই সম্মুখে দাঁড়াইয়া লাবণ্য-শ্রীহীন নলিনাক্ষ। সে বীণার পুত্রের উপহার সেই মুক্তার হার লইয়া দেখিতেছে, আর তদ্গতচিত্তে কি ভাবিতেছে।

বীণা কক্ষে প্রবেশ করিল। পদশব্দ শুনিয়া নলিনাক্ষ চাহিয়া দেখিল—সম্মুখে ভগিনী। তাহার মুখ রক্তশূন্য হইয়া গেল। তাহার চক্ষুর সম্মুখে যেন সব অন্ধকার।

বীণা ক্রোধ-কম্পিতকণ্ঠে তীব্র ঘৃণাব্যঞ্জক-স্বরে বলিল, "তুমি তোমার মাতার ও ভগিনীর অলঙ্কার চুরি করিতে আসিয়াছ?"

নলিনাক্ষ নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

বীণা বলিল, "আজও আমরা তোমার কথা বলিতেছিলাম। তোমার মত কুপুত্রের জন্য কাঁদিয়া মা মরিতে বসিয়াছেন? তোমার এমন অধঃপতন

হইবার পূর্ব্বে পিতার নামে কলঙ্ক না দিয়া তুমি মরিলে না কেন? তাহা হইলে আমাদের লজ্জার কারণ হইত না।"

বীণার প্রত্যেক কথা সত্য, প্রত্যেক কথা তীক্ষ্ণছুরিকার মত নলিনাক্ষের হৃদয় খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিল।

(৮)

বীণার কণ্ঠস্বরে পার্শ্বের কক্ষে মার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি ব্যস্ত হইয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাহার নয়নে ভীতি ভাব। মাকে দেখিয়া বীণার মনে পড়িল, ডাক্তার বলিয়াছিলেন, সহসা কোনরূপ উত্তেজনার কারণ ঘটিলে হৃদরোগগ্রস্ত রোগীর মৃত্যু ঘটিতে পারে। বীণা মুহূর্ত্তে আত্মসংবরণ করিয়া লইল। সে মার দিকে ফিরিল। যেন সহসা সলিল-সেচনে অগ্নিশিখা নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। বীণা বলিল, "মা, দাদা ফিরিয়া আসিয়াছেন। কাকা আমার ছেলেকে যে মুক্তার হার উপহার দিয়াছেন, তাহাই দাদাকে দেখাইতেছি। তুমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলে, তাই তোমাকে জাগাই নাই।"

দীর্ঘকাল পরে অপ্রত্যাশিতরূপে পুত্রের প্রত্যাবর্ত্তনে মার দুর্ব্বল হৃদয়ে যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল, তাহা সহজে নিবৃত্ত হইবার নহে; হৃদয় বেগে আঘাত করিতে লাগিল; পুত্রের দিকে চাহিয়া মা বসিয়া পড়িলেন। বীণা ব্যস্ত হইয়া জল আনিল, সে মাতাকে শায়িত করিয়া তাহার মস্তক অঙ্কে তুলিয়া লইল। তাঁহার মুখে চক্ষুতে জল দিল। পুত্র-কন্যার শুশ্রূষায় মা কিছুক্ষণ পরেই সুস্থ হইলেন। আনন্দের আতিশয্য দুঃখের আতিশয্যের মত উপকারী নহে বরং অনেক সময় তাহার মত উত্তেজক ঔষধ আর নাই।

\+ \+ × \+ \+

সেই দিন হইতে নলিনাক্ষের স্বভাব পরিবর্ত্তন হইল, সে সৎপথে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। সে রাত্রিতে সে যে কেন বাড়ী আসিয়াছিল, মা তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না।

সে বীণাকে বলিল, "বীণা, তোমার মুক্তার হারই আমার উদ্ধারের কারণ।"

বীণা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"আমার কাছে লোহার আলমারীর একটা চাবি ছিল, নিতান্ত দায়ে

পড়িয়া, আমি ঘৃণা লজ্জা সব ভুলিয়া, আলমারী হইতে জিনিস চুরি করিতে আসিয়াছিলাম। আলমারী হইতে হার বাহির করিয়া বুঝিলাম, এ হার মা'র নহে, নিশ্চয়ই তোমার হইবে। ভাবিলাম, এ হার আমি কেমন করিয়া লইব? হার বহুমূল্য। দেখিয়া একদিকে যেমন লোভ হইতে লাগিল, অপর দিকে তেমনিই আপনার অবস্থা মনে করিয়া আপনার প্রতি ঘৃণা জন্মিতে লাগিল। এমন সময় কক্ষে তুমি প্রবেশ করিলে।"

"নহিলে তুমি কি করিতে?"

"নহিলে তুমি আসিবার পূর্ব্বেই সামান্য যাহা কিছু পাইতাম, লইয়া পলাইয়া যাইতাম।"

শুনিয়া বীণা ভাবিতে লাগিল। তাহার পর যখন সে মুক্তার হার দেখিল, তখন ভ্রাতার উদ্ধারের কারণ বলিয়া তাহার নয়নে সে হারের সকল দোষ দূর হইয়া গেল। বীণা অকৃতজ্ঞ মাধবচন্দ্রকে তাহার উপহার ফিরাইয়া দিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিল।

সদুপদেশ।

(লেখক—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ সরস্বতী।)

গান।

কবির সুর—আড়খেম্‌টা।

সবারি চেষ্টা কর্‌তে হবে—
যা'তে কিছুদিন আমরা সবাই বাঁচি।
দেখ্‌চি চক্ষে তিরিশ হলেই
মৃত্যুটা হয় নিতান্ত কাছাকাছি!
পাও যদি তুমি রাজ্যপাট, কিম্বা চল্‌চো হতে লাট,
কিম্বা যাচ্ছ বিবাহ কর্‌তে—
অথবা যাচ্ছ যুদ্ধে মর্‌তে—
ফিরবে তখনি বিনা সন্দেহে
পড়ে যদি পথে টিক্‌টিকি কিংবা হাঁচি!

কিম্বা পল্লীগ্রামেতে গিয়া, তোমায় ধরে যদি ম্যালেরিয়া,
প্লেগ্‌টি কিম্বা রক্তামাশয়—
তা হলেই শোন ওগো মহাশয়—
তৎক্ষণাৎ বায়ু পরিবর্ত্তনে
যাবে সুন্দরবনে কি সাঁতরাগাছি।
যতগুলো দুরারোগ্য, প্রায়ই মানুষে কর্‌চে ভোগ,
রোগ যা কঠিন অতি বিষম—
একবার হলে নাই উপশম—
সেটার অগ্রে চাই চিকিৎসা
সকল রোগের সেরা রোগ ঐ ঘামাছি!
যদিও যায় এগারো বেজে, উঠ্‌বে নাকো শয্যা ত্যজে,
উঠ্‌লে পরে দশের আগে—
যে ঋতু হোক ঠাণ্ডা লাগে—
তার পরেতে মর্ণিংওয়াক্,
কর্‌বে হস্তে নিয়ে লাঠি একগাছি।
চাল-ডাল্‌টি ক'রে ওজন, সন্ধ্যাকালে কর্‌বে ভোজন,
রাত্রে পূরো টান্‌বে মশ্ব—
ফুল্‌বে শরীর সপ্ত সপ্ত—
শয়নের কালে পদ্মলাভ
হয় যেন ঠিক ড্রেনটার কাছাকাছি।
এম্‌নি ধারায় স্বাস্থ্য রক্ষে, করাই বিহিত সবার পক্ষে,
তবেই শক্ত হবে স্নায়ু—
মার্কণ্ডের মিল্‌বে আয়ু—
বাঁচ্‌বে দেড়শো বছর বেশ-ই
ওই নিয়মেই আমিও বেঁচে আছি!

নদী।

শ্রীমতী প্রকৃতিরাণী সিংহ-বিরচিত।

(তুমি) আপনার বেগে আপনার মনে
কোথায় বহিয়া যাও ?
আপনার মনে কুলুকুলু তানে
কার গান তুমি গাও ?

(তুমি) কোথা হ'তে বল এসেছ নামিয়া
কোথা যাবে বল মোরে;
চিরকাল তুমি এমনি করিয়া
আসিবে কি ফিরে ফিরে ?

(তুমি) জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য অস্ত চ'লে যাবে
আবার উঠিবে হাসিয়া,
পুষ্পময়ী সব ঝড়িয়া পড়িবে
আবার ফুটিবে জাগিয়া।

(তবে) এম্‌নি করিয়া তুমি কিগো তবে
যাইবে আসিবে ঘুরে,
চিরকাল তুমি এম্‌নি ক'রে
আবার আসিবে ফিরে ?

(তবে) প্রভাত গগনে তরুণ তপন
আবার এমনি উঠিবে,
মানুষ জন্মিবে মরিয়া যাইবে
পুন আসি জনমিবে।

(তারা) সবাই যাইবে আসিবে আবার
পুনঃ আসিবে ঘুরিয়া,

গিয়াছে যাহারা চিরদিন তরে
আর না আসিবে ফিরিয়া।

(যত) ভারত-রতন কর্ম্ম-বীরগণ
ছেড়েছ জনমস্থান,
রোগে অনশনে জননীর এ দুঃখে
রাখিবে না—কি মার মান ? *

সমালোচনা।

চাঁদে চাঁদে। (গীতিনাট্য) শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত; মূল্য ।০ আনা মাত্র। মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত। গ্রন্থকার মহাকবি স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্রের বার্দ্ধক্যের নিত্য সহচর। কৃষ্ণলীলাবিষয়ক এই ক্ষুদ্র গীতিনাট্যখানি রচনা করিয়া নাটক রচনায় তাঁহার শক্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় জনসমাজে প্রচার করিয়াছেন। ক্ষুদ্র গীতিনাট্য চিত্র অঙ্কনে ইনি যে যোগ্যতা, যে লিপিকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আশা করা যায় যে, কালে ইনি একজন প্রতিভাশালী নাট্যকার হইবেন। আমরা চাঁদে-চাঁদে গীতিনাট্যখানি পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি।

গান। দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।—সুবিখ্যাত "বঙ্গবাসী" পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক রায়সাহেব শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার বিরচিত। মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র। বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য-সংসারে গ্রন্থকারের সমকক্ষ প্রতিভাশালী সঙ্গীতরচক বোধ হয় আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। ইঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী; আনন্দোৎসবে, শোকসভায়, আগমনী বিজয়ায়, হরিসঙ্কীর্ত্তনে, শ্যামা সঙ্গীতে সম্প্রদায়িকতা-বিদ্বেষ-শূন্য। সঙ্গীতে প্রেম-ভক্তি উদ্দীপক [শব্দ-সম্পদের অমৃতধারায় প্রাচীন সাধক সঙ্গীতের সহিত তুলনায় সমালোচনা করা যাইতে পারে, এবং পদাবলীর ন্যায় রচনা অতি মধুর। অধুনা সভাসমিতির অধিবেশনে

---

* এই ক্ষুদ্র কবিতাটি একটি সপ্তমবর্ষীয়া বালিকার রচনা।

বিহারি বাবুর বিরচিত সঙ্গীতের সমাদর সর্ব্বত্র। আমরা গানের গানগুলি পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। যিনি অভিনিবেশ পূর্ব্বক এই গীতগুলি পাঠ করিবেন, তিনিই বিমুগ্ধ হইবেন, ইহাই আমাদের ধারণা। সরল প্রাণের কোমল সঙ্গীত, রামপ্রসাদ, কমলাকান্তের পর বোধ হয় এরূপ হৃদয়সঙ্গীত আর কেহ গাহেন নাই ; পাঠে পাষাণপ্রাণও বুঝি গলিয়া যায়। কাব্যামোদী সঙ্গীতরসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রকেই এই গান পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

কুললক্ষ্মী।—(উপন্যাস) শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত ও শ্রীযুক্ত মোহিতগোপাল লাহিড়ী প্রণীত। "পৃথিবীর ইতিহাস" কার্য্যালয় হইতে ধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই উৎকৃষ্ট।

গ্রন্থকার ও সম্পাদক মহাশয়—বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্গমহিলাগণের পাঠোপযোগী সুশিক্ষাপ্রদ উপন্যাসের অভাব অনুভব করিয়া "কুললক্ষ্মী" জনসমাজে সাধারণ পাঠকপাঠিকার সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন; উপন্যাসের স্বাভাবিক রসমাধুর্য্যের মধ্য দিয়া গ্রন্থকার নরনারীর চিত্তকে পবিত্র, প্রশান্ত ও উন্নত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। উপন্যাস পাঠের আনন্দ লাভের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকপাঠিকাগণ আদর্শ চরিত্রলাভ করেন, এই উদ্দেশেই "কুললক্ষ্মী" উপন্যাস বিরচিত হইয়াছে। "কুললক্ষ্মী" প্রত্যেক কুল-ললনার হস্তে নিঃসঙ্কোচে শোভা পাইবার উপযুক্ত পুস্তক। আমরা আশা করি, বঙ্গের নরনারী সকলের নিকটেই "কুললক্ষ্মী" সমাদৃত হইবে।

পুস্তকের মন্তব্যের উপসংহারে সম্পাদক মহাশয়ও ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছেন, কুললক্ষ্মীর প্রভাবে বঙ্গগৃহ কুল-লক্ষ্মীর আবাসস্থান হউক, প্রতিগৃহ কুল-লক্ষ্মীর পুণ্যপ্রভায় সুখ-শান্তিতে পূর্ণ হউক। গ্রন্থ-কারের শ্রম-যত্ন ও প্রকাশকের অর্থব্যয় সার্থক হইয়াছে।

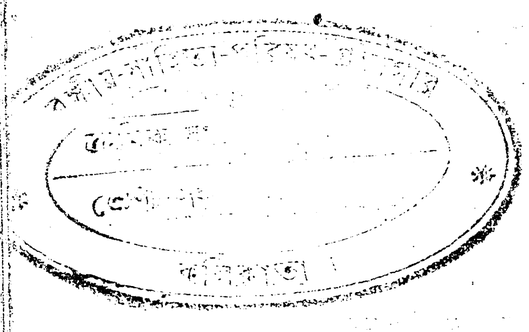

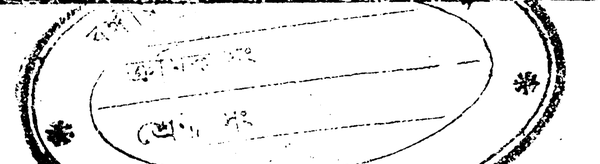

জন্মভূমি

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

সচিত্র মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

২৬শ, বর্ষ। ১৩২৭, শ্রাবণ। ৪র্থ, সংখ্যা।

সাধু-নিন্দা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত বিজয়নারায়ণ আচার্য্য।

"নহ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরু কালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥"

সাধুনিন্দা যে মহাপাপ—এ কথা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। বর্ত্তমান সময়ে অনেককেই এই অখণ্ডনীয় মহাপাতকে লিপ্ত হইতে দেখিয়া অন্তঃকরণে বড়ই তাপ উপস্থিত হইয়াছে!!

চারিদিকে এত হরিনামের উচ্চগান, এত ধর্ম্মসভা,—ধর্ম্মশাস্ত্রের সমালোচনা এত বৈষ্ণবধর্ম্ম-পত্রিকার বহুল প্রচার,—এত ন্যায়পরায়ণ গোস্বামীগণের আবির্ভাব,—তথাচ দাম্ভিকদিগের এই কু-প্রবৃত্তির নিবৃত্তি নাই। ইহা কি দুর্ব্বল জীবনের দৈবকৃত বিড়ম্বনা,—না কলি-মাহাত্ম্য ?

সজ্জনের মানমর্য্যাদার উপর নিরর্থক আঘাত করিয়া,—অথবা কোন অকিঞ্চন ভক্তের সচ্চরিত্রের উপর মিথ্যা দোষারোপ করিয়া আনন্দানুভব করা কি সজ্জনের কর্ত্তব্য ? না,—সাধু সুধীদের করণীয় কার্য্য ? তবে আর মানুষে পিশাচে প্রভেদ থাকিল কি ?

বৈষ্ণবশাস্ত্রে সাধু নিন্দাকে মহা অপরাধ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কেননা,—ভক্ত, ভক্তি, ভগবান্ ও গুরু এই চারি বস্তুই এক,—কেবল নাম মাত্র ভিন্ন। যথা,—দোঁহা ;—

"ভক্ত ভক্তি ভগবন্ত গুরু চতুর্ নাম বপু এক।
ইন্‌কে পদ বন্দন করৈ নাশৈ বিঘন অনেক॥"

বিশেষতঃ ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনা হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যৎ তে নজানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥"

অতএব সাধুনিন্দায় জীবের ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ কল্যাণ—বিনষ্ট হইয়া যায়।

পরচর্চ্চা পরগ্লানি লইয়া,—কি পরের উপর মিথ্যাপবাদ সংযোজিত করিয়া দিয়া সুখানুভব করা মানবধর্ম্ম নহে!

সাধুনিন্দা দ্বারা যে আপন সাধুত্বের অপচয় হয়,—আপন চরিত্র কলঙ্কিত হয়, আপন পরকালের পথে কাঁটা পড়ে,—কি আপন নরজন্মের সার্থকতালাভের অত্যন্ত ব্যাঘাত জন্মে,—সাধু নিন্দুকেরা বোধ হয়, ইহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

বর্ত্তমান যুগে অনেক অনভিজ্ঞ অসচ্চরিত্র দাম্ভিক লোককে, পরম পবিত্র সাধুচরিত্রের উপর অকারণ কলঙ্ক কালিমার প্রলেপ মাখাইবার প্রয়াসী দেখা যায়। মহজ্জনকে—অতিক্রম করিলে যে জীবনের সর্ব্ব প্রকার শ্রেয়ঃ বিনষ্ট হইয়া যায়,—নিন্দুকেরা এ কথাটী মোটেই অনুভবে আনিতে পারে না।

দশমস্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে একত্রিংশ শ্লোকে লিখিত আছে,—

"আয়ুঃ শ্রিয়ং যশোধর্ম্মং লোকানাশিষ এবচ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বানি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥"

অর্থাৎ মহদ্ব্যক্তিকে অতিক্রম করিলে পুরুষের আয়ু, শ্রী, যশ, ধর্ম্ম ও আশীর্ব্বাদ সম্পদ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার শ্রেয়ঃ বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব কল্যাণকামী সাধু ব্যক্তিগণ সাধু নিন্দারূপ মহাপাতক হইতে সর্ব্বদা সাবধানতার সহিত দূরে রহিবেন।

কলি-কলুষিত দুষ্টচরিত্র ব্যক্তি ভিন্ন,—কি ঈর্ষাপরতন্ত্র বিকৃতমনা ব্যক্তি ব্যতীত, কেহই সাধু-নিন্দারূপ প্রজ্বলিত পাপাগ্নিতে আত্মাহুতি দিতে সম্মত নহেন।

আপনার আত্মাকে নরকের পথে ঠেলিয়া দিয়া ক্ষণকালের জন্য যে নিন্দুকের অলীকানন্দ,—ইহা ক্ষিপ্ততারই পরিচায়ক। ভগবান্ গৌরশশী এইরূপ সাধন-ভজনবিবর্জ্জিত নিন্দুকগণের পাপপঙ্কিল হৃদয়ে, পরম পবিত্র ধর্ম্মভাবের সঞ্চার করিয়া, কতদিনে এই নিন্দুক-ভার-বহনাক্ষমা ধরণীদেবীকে স্বর্গসদৃশ সুখের স্থান করিয়া লইবেন? আমি শুধু দিবা-রাত্র ইহাই ভাবিতেছি।

দয়ার্দ্রচিত্ত সাধুগণ যদি তোমার-আমার মত দাম্ভিক জনগণের চরিত্র সংশোধন কল্পে, পুস্তক প্রবন্ধাদি প্রচার দ্বারা সস্নেহ কৃপানুশাসন করেন, তাহাতে তোমার-আমার ক্ষেপিয়া উঠা কি কর্ত্তব্য? সাধুর শাসনকে অশেষ কল্যাণকর কৃপাশীর্ব্বাদ মনে করিয়া মাথা পাতিয়া লওয়াই উচিত। ক্রোধ করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ ক্রোধ জীবের বিনাশের কারণ। গীতায় লিখিত আছে :—

"ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রমঃ।
স্মৃতি ভ্রংশাদ্ বুদ্ধি নাশো বুদ্ধি নাশাৎ প্রণশ্যতি॥"

সাধুগণ কাম, ক্রোধ, লোভকে নরকের দ্বারস্বরূপ জানিয়া পরিত্যাগ করেন। যথা—

"ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধ স্তথা লোভ স্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥" গীতা।

আপন কল্যাণ না বুঝিয়া আমরা যদি কোন কৃপাবান্ সাধুকে অসংযত ভাষায় অভদ্রোচিত গালি প্রদান করি, কি তাহার কোন অসঙ্গত অন্যায় নিন্দা-বাদ প্রচার করি,—তবে যে আমরা মানব জীবনের লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া অক্ষয় নরকের পথে গড়াইয়া চলিতে লাগিলাম,—তাহা বুঝিতে পার কি?

সাধুনিন্দা করিয়া তুমি নীচাশয় অসজ্জনের নিকট "বাহবা" পাইতে পার, কিন্তু সুবিজ্ঞ সাধুসমাজের নিকট, ভদ্রজনের নিকট তুমি একজন অসার অপদার্থ বলিয়াই নির্ণীত হইবে।

তুমি সাধুনিন্দা করিয়া নিরয়গামী হইবে, সাধুর কিন্তু কিছুই হইবে না। সাধু স্তুতি-নিন্দা, লাভালাভ, মানাপমানকে সমজ্ঞান করিয়া নিরন্তর শান্তির নিভৃত কক্ষে অবস্থান করিতেছেন। তিনি (সাধু) তোমার আমার ন্যায় ক্ষুদ্রমনা লোকের নিন্দাবাদ-শ্রবণে টলিয়া পড়িবেন কি? তুলসীদাস বলিয়াছেন,—

"বাজারমে হাতী চলে, কুত্তা ভুকে হাজার।
সাধুকে দুর্ভাব নেই, যউ নিন্দে সংসার॥"

সাধু তোমার নিন্দায় বা অযথা অন্যায় গালিতে বিক্ষুব্ধ নহেন। অথবা তোমার মার্কীয় আস্ফালনে ভীত চমকিত নহেন। সাধু চিত্ত সর্ব্বদা অবিচলিত!

নিন্দুক এ জগতে কাহাকেও ভালবাসে না, কিন্তু সাধুগণ সকলকেই এক মত ভাল বাসেন। এরূপ হইলেও নিন্দুকের প্রতি সাধুর সমধিক স্নেহ; ইহা মহাত্মা কবির দাসের কবিতায় জানা যায়। যথা,—

"নিন্দুক বেচারা মর গিয়া কবিরা বৈঠকে রোয়।
পাপ জাপা করাতা ধুবি যেয়ছা ময়লা ধোয়॥"

তুমি কথায় বার্ত্তায় একজন পরম পাণ্ডত, বেশভূষণে পরম বৈষ্ণব, তবে তোমার এমন দুর্ব্বুদ্ধি কেন? তোমার কি এমন বন্ধুবান্ধব কেহ নাই যে, তোমাকে সাধু-নিন্দারূপ মহাপাতক হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া রাখেন? কি সৎপরামর্শ প্রদান করেন? বোধ করি, তোমার সঙ্গী সহচর যাহারা, তাহারাও তোমারি মত অজ্ঞানান্ধকূপে নিমগ্ন।

হায় হায়! তোমার কি দুর্দ্দশা উপস্থিত। তুমি না একজন বৈষ্ণব? বৈষ্ণবশাস্ত্র সমূহে, বৈষ্ণব বেদ শ্রীশ্রচৈতন্য চরিতামৃতে না তোমার খুব দখল? তবে পড়িয়া শুনিয়া তোমার এমন কুবুদ্ধি কেন? "ভাগবত পড়িয়াও কাহার বুদ্ধিনাশ হয়;" "তৃণাদপি" শ্লোকটীই তো নাকি সনাতন বৈষ্ণব মেরুদণ্ড? আর তুমি বৈষ্ণব ঠাকুর "তৃণাদপির" মূর্ত্তিমন্ত অবতার,—সামান্য কারণ বায়ুতেই বিচলিত হইলে তোমার বৈষ্ণবত্ব বজায় থাকে কই? তুমি অকৃতদ্রোহী, অমৎসর,—একজন পরম ধার্ম্মিক, আপন বৈষ্ণবত্ব রক্ষার দিকে দৃষ্টি না করিয়া সাধুর যৎসামান্য কৃপানুশাসনে ক্রোধান্ধ হইয়া সর্ব্ব ধর্ম্ম-কর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে বসিলে?

সাধু নিন্দা যে তোমার কালস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে, ইহা যদি বুঝিতে না পার, তবে তুমি বুঝ কি? তুমি যে একজন দুর্ব্বলচিত্ত কাপুরুষ, সাধু-নিন্দুক সাজিয়া তাহার বিলক্ষণ সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছ।

ক্রোধ তোমার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া, তোমাকে বিড়ম্বিত করিল, তোমার বৈষ্ণবত্বের সুদৃঢ় অট্টালিকা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিল, তোমাকে স্বর্গের সোপান হইতে টানিয়া নরকের পথে ঠেলিয়া দিল, তুমি তো ক্রোধের উপর ক্রোধ করিয়া তাহার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিলে না! এখন ভাবিয়া দেখ তো তুমি বৈষ্ণবধর্ম্মের মূল হইতে উচ্ছেদ হইয়া কতদূর সরিয়া গিয়াছ!

ধর্ম্মজগতের উন্নতি-অবনতি বুঝা বড়ই সুকঠিন ব্যাপার।

বাছা! এখনও সাবধান হও, এখনও আপন নরজন্মের সাফল্যলাভের চেষ্টা কর, এখনও আপন কৃত অপরাধের জন্য ঈশ্বরের নিকট, ভগবদ্ভক্তের নিকট, গললগ্নীকৃতবাসে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া কাতরে ক্ষমা প্রার্থনা কর। বাছা! এখনও ভক্তজনের নিন্দাপরাধ জনিত মহাপাপ হইতে আত্মোদ্ধার করিতে যত্নবান হও।

যে সাধুর সঙ্গ অপার ভবসমুদ্র পারের হেতু বা সেতু, যে সাধুর ক্ষণমাত্র সঙ্গ ভবার্ণব তরিবার তরণীস্বরূপ, যে সাধুর চরণামৃত, অধরামৃত, চরণধূলি, ভজন-সাধনের মূল, তুমি কোন্ সাহসে সেই পরমারাধ্য সাধুর প্রতি বিদ্বেষ করিতেছ? তোমার গতি হইবে কি? সাধুর চরণছায়া ব্যতীত তোমার আমার মত ভবভারাক্রান্ত শ্রান্ত পথিকের দাঁড়াইবার স্থান কোথায়?

যদি ভক্তি-জগতের উচ্চমঞ্চে আরোহণ করিবার ইচ্ছা থাকে, নীচে নামিয়া আইস। যদি প্রেমরাজ্যের বিমলানন্দ উপভোগ করিয়া মানবজন্ম সার্থক করিতে চাও, যদি বৈষ্ণব ধর্ম্মের পাদমূলে থাকিয়া অকিঞ্চনা ভক্তির শীতল ছায়ায় ত্রিতাপদগ্ধ প্রাণটা জুড়াইতে চাও, যদি পরিণামের সম্বল হরিনাম করিবার ইচ্ছা থাকে, যদি শ্রীহরির প্রেমামৃতরসে পরিপ্লুত হইয়া চিন্ময়ানন্দ-কণিকার সংস্পর্শ লাভের বাসনা হয়, তবে আর সাধু নিন্দারূপ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া পড়িও না।

সাধুগণ তোমার আমার ন্যায় মোহান্ধ জীবের নিন্দায় আপন কর্ত্তব্য সাধনে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

তোমার আমার পৈশাচিক ভাবের অভিনয় দর্শনে আপন গন্তব্য পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইবেন না।

সাধুগণ আপন মহত্বতায় আপনি পূর্ণ দীপ্তিমান্। তাঁহার (সাধুর) ভজন ব্যাঘাত জন্মাইবার বা যশো-গৌরব-রবি আচ্ছাদন করিবার চেষ্টা তোমার অবিদ্যা সঞ্জাত কুবুদ্ধি।

ক্ষুদ্রায়তন মেঘ কখন মহাতেজস্বী সূর্য্যদেবকে ঢাকিতে পারে না। তবে যে মানুষ সময় সময় সূর্য্যকে মেঘাচ্ছাদিত দেখিতে পায়, তাহার কারণ এই, মানুষের দৃষ্টির আয়তন স্থানটী মেঘে আবৃত করিয়া রাখে। অতএব বলিতেছি, তোমার এই বৃথা চেষ্টা কেন? তোমার এই নিন্দারূপ জীর্ণবসনে সাধুগৌরব-মহদগ্নি ঢাকা যাইবে না। সত্যের উপর কাহারও আধিপত্য নাই। সত্য, অনন্তকাল হইতে সকলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছেন।

ছাড়, এখনও ছাড়, কু-বুদ্ধি ছাড়িয়া সাধুর চরণে শরণ লও। লইয়া শ্রীগৌর ভগবানের ভজনা কর। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত নামক বৈষ্ণব-বেদখানি ভাল করিয়া পড়, পড়িয়া তাহার মর্ম্ম গ্রহণ কর। নিন্দুক! তোমার মঙ্গল কামনায় অদ্য তোমাকে হিতোপদেশ স্বরূপ কিছু বলিলাম;—হিতে বিপরীত জ্ঞান করিও না। আর সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মকে কলঙ্কিত করিও না। এখন নির্জ্জনে বসিয়া নিরপেক্ষচিত্তে আপনকৃত অপরাধের সম্বন্ধে একটুকু ভাবনা কর। ভগবানের শরণ লও। দয়ার ঠাকুর দয়া করিয়া তোমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

কেন আমরা আপনার সর্ব্বনাশ আপনি করিতে উদ্যত হইয়াছি!! কুসঙ্গীর কুমন্ত্রণায় ভুলিয়া অমৃত ফেলিয়া প্রাণনাশক গরল পান করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

মনকে ভগবল্লীলামাধুর্য্যে না ডুবাইয়া বিদ্বেষ বহ্নিতে পুড়াইয়া কেন ছাই করিতেছি! বল বাছা! একবার প্রাণ খুলিয়া মন মজাইয়া সেই গুরুদত্ত মহামন্ত্রটী বল। বল,—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

শান্তি-গীতি।

লেখক,—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু।

নাহি সে ভীষণ কুলিশ নিস্বন,
রণ হুতাশন হয়েছে নির্ব্বাণ।
গত কাল নিশি, শান্তিপূর্ণ দিশি,
ভ্রাতৃভাবে মিশি সবে ফুল্লপ্রাণ॥
নাহি সে হুঙ্কার কামান ঝঙ্কার
অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা বাজে নাক আর,
হৃদয়-বিদার নাহি হাহাকার
মত্ত ধরা করি' শান্তি সুধাপান।

নরশির হার ত্যজিয়া মেদিনী,
ফলে ফুলে পুন হাসে বিষাদিনী,
স্তব্ধ বিহঙ্গিণী গায় আমোদিনী
শান্তি শান্তি শান্তি তুলি উচ্চতান॥
পুলকিত কৃষি হলফল ধরি
ধনধান্য ভার বহে রণতরী
অভয় বিতরি অরি গর্ব্ব হরি
উড়িছে গগণে শান্তির নিশান।
পুলকিত চিত মানবসমাজ,
পরে শান্তিবাস ত্যজিয়া রণ সাজ,
মহানন্দে আজ বন্দে রাজরাজ
ঘোর রোলে বাজে বিজয় বিষাণ॥
জয় সর্ব্বময়, সর্ব্বভয়ত্রাতা,
সর্ব্বশোকহর সর্ব্বলোক পাতা,
মঙ্গল বিধাতা দেহ শান্তিদাতা,
চিরশান্তিময় অক্ষয় কল্যাণ॥

মনীষি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

লেখক—শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী।

যে মহাপুরুষ তাঁহার স্বদেশীয় অসংখ্য সাধারণ অধিবাসীকে অজ্ঞানান্ধকার হইতে আলোকে আনয়ন করিয়াছেন,—যে মহাত্মা বিবিধ ভাবে দেশে মাতৃ ভাষার সমাদর, জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতি কল্পে প্রাণপণ পরিশ্রম করিতেছেন, এবং যে ধীশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ আজ আপন প্রতিভাবলে বঙ্গের প্রধান ধর্ম্মাধিকরণের পদে উন্নীত হইয়াছেন, তাঁহার অসীম কার্য্যাবলীর ও জীবনের জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে কাহার না অভিপ্রায় হয়?

খ্রীষ্টীয় ১৮৬৪ সালে ভবানীপুরনিবাসী ডাক্তার ৺গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নামক এক সম্ভ্রান্ত নাগরিকের ঔরসে স্যার আশুতোষ জন্মগ্রহণ করেন। আশুতোষ বাল্যাবস্থা হইতেই মেধাবী; সুতরাং কৃতিত্বের সহিত একে একে

সমস্ত পরীক্ষাতেই কৃতকার্য্যতা লাভ করেন। তাঁহার পিতা পুত্রের ক্রমোন্নতি অতি ধীরতার সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতে ছিলেন। অষ্টাদশবর্ষ বয়ক্রমকালে আশুতোষ কৃতিত্বের সহিত B. A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সকলকে বিস্মিত করেন। বিংশতিবর্ষ বয়সে আশুতোষ M. A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং গণিতশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। M. A. পাশ করিবার পূর্ব্বেই আশুতোষ ইংলণ্ডের গণিত সভার (Mathematical Society) সভ্য হইয়াছিলেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে আশুতোষ দুর্লভ প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। বিশ্ব বিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহে এইভাবে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়া আশুতোষ চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন। ভাবিলেন এখন কি করা যায়? যদি অধ্যাপকতা বৃত্তি অবলম্বন করি, তাহা হইলে আমাকে সামান্য দুই তিন শত মুদ্রায় আত্মবলিদান করিতে হইবে। অথচ প্রয়োজনানুরূপ অর্থ উপার্জ্জন করিতে না পারিলে সংসারে দান, ধর্ম্ম, পরোপকার কিছুই হয় না। অগত্যা তিনি আইন শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টের উকিল মধ্যে পরিগণিত হইলেন। ইহার ছয় বৎসর পর ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি Doctor of Law উপাধি ভূষণে ভূষিত হন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের মেম্বর পদে মনোনীত হন। এই সময় হইতে স্যার আশুতোষের মনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিবার ইচ্ছা বলবতী হয়। তাঁহার কর্ম্মশক্তির উপর সিনেটের মেম্বরগণের এতাদৃশ দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে তিনি দুই দুইবার তাঁহাদের প্রতিনিধিরূপে বেঙ্গল লেজিষলেটিভ কৌন্সিলে সভ্য মনোনীত হন। এই সময়ে তিনি নিয়মিত ভাবে হাইকোর্টে উপস্থিত হইতে ছিলেন এবং ব্যবহারাজীবগণের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভও করেন। ওকালতীতে তিনি প্রত্যহ এত অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন যে, অনেক সময় তাহা গণনা করিবারও অবকাশ পাইতেন না। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে আশুতোষ হাইকোর্টের বিচারপতির পদে নিযুক্ত হন। ইহাতে তাঁহার পদমর্য্যাদা বর্দ্ধিত হইলেও তাঁহার উপার্জ্জনের পরিমাণ যে সঙ্কুচিত হয়, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অনন্তর মহাত্মা স্বর্গীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলরের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে কর্ত্তৃপক্ষ যোগ্যতম পাত্র বোধে আশুতোষকেই সেই পদে নিয়োগ করেন। ইহা ১৯০৬ সালের কথা। তদবধি ১৯১৪ পর্য্যন্ত স্যার আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলাররূপে দেশের যে কি

প্রভূত উপকার করিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। স্যার আশুতোষ নিজেই গত ১৯১৪ সালে তাঁহার শেষ কন্‌ভোকেসন বক্তৃতায় নিজ কার্য্যের আভাস দিয়াছিলেন :—

I confess to a feeling of pride, when my thoughts dwell on what has been accomplished within the last eight years. (i) It is no slight thing to have initiated at any rate, a comprehensive scheme for the satisfactory housing and superintendence of the entire student population. (ii) It is no slight thing to have effected a total reform of legal education in Bengal and to have built up a n ble university college, where instruction in law is imparted to hundreds of students on a plan infinitely more methodical and comprehensive than any thing in the same line ever dreamt of in India. (iii) It is a great thing to have found means to open once more to the gain and benefit of our univesity, the sources of private liberality which for so many years seemed to have run dry. (iv) And it is a truly great thing to have contributed towards that great widening and raising of the functions of our university which has accomplished itself within the last three years, to have assisted at the birth of the Teaching University of Calcutta.

স্যার আশুতোষেরই ভাইস্ চ্যান্সেলারী সময়ে সিনেটের পশ্চাতে প্রকাণ্ডকায় "দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং" নির্ম্মিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ উপযুক্ত হোষ্টেলের অভাবে বড়ই ক্লেশ পাইতে ছিল; স্যার আশুতোষ সেই অভাব দূরীকরণার্থে হার্ডিঞ্জ হোষ্টেল নামে একটি বিশাল হোষ্টেল নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। ইহাতে ইউনিভার্সিটী ল কলেজ ও পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাশের ছাত্রদের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং ও তৎসংলগ্ন একাণ্ড লাইব্রেরী বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি ও স্যার আশুতোষের মহদিচ্ছার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কলিকাতায় অনেকগুলি ল কলেজ থাকা সত্ত্বেও স্যার আশুতোষ কেন ইউনিভার্সিটী ল কলেজ স্থাপন করিলেন, সে কথা তিনি নিজ কন্‌ভোকেশন সম্ভাষণেই বলিয়াছেন :—

Lastly, I cannot pass over in entire silence the unanimous resolution of the senate to establish a University Law College to serve as a model institution for the promotion of legal education This action on the part of the university was rendered essentially necessary by reason of the lamentable deficiency in the provision for scientific legal education.

স্যার আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলরী পদে নিয়োজিত হইবার পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয় বৎসরান্তে কেবল পরীক্ষার্থী ছাত্রগণের পরীক্ষা লইয়াই আপন কর্ত্তব্য শেষ করিত, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষাপ্রদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার চিন্তা সর্ব্বপ্রথমে স্যার আশুতোষেরই মস্তিষ্কে উপ্ত হয়। দেশের কতিপয় সদাশয় বদান্য, বিদ্যোৎসাহী মহানুভবের চেষ্টায় স্যার আশুতোষের কল্পনা কার্য্যে পরিণত হয়; ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে মিণ্টো চেয়ার, হার্ডিঞ্জ চেয়ার, কারমাইকেল চেয়ার প্রমুখ কয়েকটী চেয়ার ও লেক্‌চারার এবং রীডারের সৃষ্টি হয়। এতদ্ব্যতীত স্যার রাসবিহারী ঘোষ ও স্যার টি, পালিতের দানের ফলে বিজ্ঞান বিষয়ে ছয়খানি চেয়ার সৃষ্ট হইয়াছে। ভারতসম্রাট মহামান্য পঞ্চম জর্জ্জের ভারতে শুভাগমন চিরস্মরণীয় করিবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব এবং গণিত বিষয়ে দুইটী চেয়ার সৃষ্ট হইয়াছে। ভারতবিখ্যাত অধ্যাপক ভাণ্ডারকর এখন প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের চেয়ার অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। তিনি ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে যে সমস্ত নব নব তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন তজ্জন্য ভারতীয় ইতিহাসে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

স্যার আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মধ্যে কেন্দ্র স্বরূপ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি বোম্বাই, মান্দ্রাজ, এলাহাবাদ এবং অন্যান্য স্থান হইতে বিখ্যাত অধ্যাপকদের নিমন্ত্রণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করাইয়াছেন। অধ্যাপক কউচার এই সেদিন "জাভা ও শ্যামদ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় উপনিবেশ" সম্বন্ধে অতি সারবান বক্তৃতা করিয়া গিয়াছেন।

স্যার আশুতোষের সর্ব্বপ্রধান উল্লেখ যোগ্য কাজ—বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষার প্রচলন। যদিও তিনি স্বয়ং মাতৃভাষার অনুশীলন করিবার খুব অল্প সময় পান, তথাচ বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষার প্রচলন করিয়া তিনি চির-অনাদৃতা বঙ্গভাষার যে কি পরিমাণ উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন, তাহা ভাষায়

প্রকাশের ক্ষমতা আমার নাই। ইহা দ্বারা তিনি সমগ্র জগতকে স্ব স্ব মাতৃভাষার প্রতি সমাদর দেখাইতে শিক্ষা দিয়াছেন। বঙ্গভাষা সম্বন্ধে তিনি কি করিয়াছেন, ইহার বিচার করিতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীত ইতিহাসের কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী মিউটিনীর অব্যবহিত পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। তখন ছাত্রেরা সংস্কৃত অথবা বাঙ্গালা ম্যাট্রিকিউলেশন্ ও B. A. পরীক্ষা লইতে পারিত। ইহাতে এই ফল হইত যে অধিকাংশ ছাত্রই দুঃসাধ্য সংস্কৃত ভাষা ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালা ভাষা গ্রহণ করিত। ইহার প্রতিকারকল্পে পূর্ব্ববর্ত্তী ভাইস্‌চ্যান্সেলারগণ F. A. ও B. A. হইতে বাঙ্গালা ভাষাকে দূর করিয়া দেন। আবার অবাধ্যতামূলক (optional) বিষয় হওয়ায় এণ্ট্রান্স পরীক্ষার্থীরাও বাঙ্গালা ভাষাকে আদৌ আমল দিত না। বাঙ্গালা ভাষা ইহাদের দ্বারা দীনাহীনা, কাঙ্গালিনী, ভিখারিণীর ন্যায় ব্যবহার পাইত। স্যার আশুতোষ সেই চির-অনাদৃতা বঙ্গ ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিতব্য অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় বাধ্যতামূলক করিয়া মাতৃভক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে স্যার আশুতোষ উত্তরবঙ্গ সাহিত্যসম্মিলনের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিবার জন্য আহূত হন; তিনি সানন্দে সেই পদ গ্রহণ করেন। সেই সভায় স্যার আশুতোষ জলদগম্ভীর স্বরে বলেন,—"যদি আমরা সাধারণ (Mass) ব্যক্তিদিগকে উন্নত করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগকে জাতীয় সাহিত্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। সাধারণ লোকদিগকে শিক্ষিত করিবার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে হইবে। বিদেশীয় ভাষায় যাহা কিছু সুন্দর, পবিত্র ও উপকারী তাহা আমরা আমাদের জাতীয় সাহিত্যে বরণ করিয়া লইব।"

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বাঁকীপুর অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবার জন্যও স্যার আশুতোষ আহূত হন। এই সভায় তিনি প্রধানতঃ বাঙ্গালা ভাষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলেন,—"পৃথিবীর মধ্যে সমগ্র দেশের অধিবাসীরা ইংরাজের অধীন না হইলেও যেমন ইংরাজী ভাষার জ্ঞানগর্ভ পুস্তকরাজি অধ্যয়ন করিবার জন্য সকলেই ইংরাজী পড়িয়া থাকে এবং গ্রীক, লাটিন, রুষ ভাষা ও সংস্কৃত কাহারও মাতৃভাষা না হইলেও তাহা যেমন সকলে আগ্রহ সহকারে অধ্যয়ন করে; সেইরূপ বাঙ্গালা ভাষাকেও এরূপ সুন্দর সুন্দর তত্ত্ব সমূহে পরিপূর্ণ করিতে হইবে যাহাতে সমস্ত

লোকে এ ভাষা আগ্রহ সহকারে অধ্যয়ন করে।" তিনি আরও বলেন যে—যদি স্যার জগদীশচন্দ্র ও স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র মাতৃভাষায় তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক পুস্তকগুলি অনুবাদ করেন তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষার অঙ্গ সৌষ্ঠব যে বর্দ্ধিত হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করিবার উদ্দেশ্যে স্যার আশুতোষের চেষ্টায় রামতনু লাহিড়ী বৃত্তি নামক একটি বৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র ইহার সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য অধ্যাপক বলিয়া মনোনীত হন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে স্যার আশুতোষ পুনর্ব্বার বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের হাবড়া অধিবেশনে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হন। দুই দুই বার এই মহাসম্মানে সম্মানিত হওয়া কম সৌভাগ্যের কথা নহে। তিনি এই সভায় দৃঢ়স্বরে লোকদিগকে প্রাদেশিক ভাষা শিখিবার জন্য অনুরোধ করেন।" শুধু অনুরোধ করিয়াই স্যার আশুতোষ ক্ষান্ত হন নাই। তিনি M. A. পরীক্ষা বঙ্গ ভাষায় লইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দ্দু, হিন্দী, উড়িয়া, আসামী এবং অন্যান্য প্রধান ভাষা শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। অধ্যাপক ভাণ্ডারকর, ডাক্তার সরওয়ার্দ্দী, অধ্যাপক বি, সি, মজুমদার ও রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্যক্তিগণের উপর প্রাদেশিক ভাষা শিখাইবার ভার ন্যস্ত করা হইয়াছে।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে ভারতসম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবর্দ্ধনার উত্তরে বলেন :—

I have watched with sympathy the measures that from time to time have been taken by the universities of India to extend the scope and raise the standard of instruction. Much remains to be done, no university is now-a days complete unless it is equipped with teaching faculties in all the more important branches of the science and the art, and unless it provides ample opportunities for research. You have to conserve the ancient learning and simultaneously to push forward western science."

মহামান্য সম্রাটের এই মহামূল্য উপদেশ আশুতোষের শ্রবণ দিয়া মরমে প্রবেশ করিল। তিনি ভাবিলেন, যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে তাহা হইলেও এ শিক্ষা দ্বারা পরীক্ষার্থী বিশেষ কিছুই ফল পাইতেছে না। নিঃসন্দেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অর্থকরী বিদ্যায় পরিণত হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইলেও অর্থোপার্জ্জনের ক্ষেত্রগুলি এতদূর জনাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে যে পরীক্ষার্থীগণ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখে। অতএব এই জীবন সংগ্রাম হইতে দেশবাসীকে উদ্ধার করিবার জন্য নূতন কোন উপায় উদ্ঘাটন করিতেই হইবে। আইন ব্যবসায়ে আর কোন লাভ নাই। এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া স্যার আশুতোষ বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা করাই স্থির সংকল্প করিলেন। মহাত্মা তারকনাথ ইতঃপূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে সাত লক্ষ টাকা অর্পণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে স্যার আশুতোষের মহানুদ্দেশ্য সাধনের সহায়তাকল্পে পুনরায় দ্বিতীয় দানপত্রে সাত লক্ষ টাকা দান করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ দশ লক্ষ টাকা বিজ্ঞান কলেজের জন্য প্রদান করিলেন। স্যার তারকনাথ ও স্যার রাসবিহারী এতদুভয়ের দত্ত টাকা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গচ্ছিত কণ্ডের টাকা লইয়া সারকিউলার রোডে বিরাট বিজ্ঞান কলেজ (The College of Science) নির্ম্মিত হইল। স্যার পি, সি, রায় ইহার কর্ণধার নিযুক্ত হইলেন। মহাত্মা রাসবিহারী এতদ্ব্যতীত আরও এগার লক্ষ টাকা দান করিয়া বিজ্ঞান কলেজের প্রসারতাকল্পে সাহায্য করিলেন। আশা করা যায় যে, আশুতোষের এই বিজ্ঞানমন্দির হইতে জগদীশ ও প্রফুল্লচন্দ্রের ন্যায় বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক বহির্গত হইয়া আমাদের দীনা হীনা ভারত মাতার মুখ উজ্জ্বল করিবে।

স্যার আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অনেক করিয়াছেন! লর্ড কারমাইকেলের কথায় :—

„The good work which he has done for the university has been very good and it has been done with untiring energy. Sir Ashutosh became Vice Chancellor on the 31 st of March, 1906—8 years ago. During all these 8 years he has worked hard and it was with justifiable pride that he has himself referred to what he has done. Few men have the great capacity Sir Ashutosh has for working without intermission.

No one can say he has even neglected his duty as a High Court Judge—and I believe that duty is in itself arduous enough; yet, all the time, he has been doing work for the university as Vice Chancellor, which I am often told, may well be considered a man's full work."

স্যার আশুতোষের দ্বারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভূত পরিমাণে উন্নত হইয়াছে।

১৯১৪ সালে স্যার আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলরী পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার বিদায়দিনের শেষ অভিভাষণটী বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। তিনি বলেন :—

"I thus bid farewell to office and fellow-workers, not without anxiety for the future of my university but yet with a great measure of inward contentment, and let this be my last word from the depth of my soul, there arises a fervent prayer for the perennial welfare of our Alma Mater—for whom it was given to me to do much work and suffer to secure extent—and of that greater parental divinity to whom even our great university is a mere hand-maiden as it were my beloved mother land."

আশুতোষ ভাইস্ চ্যান্সেলরী পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেন নাই। পোষ্ট গ্রাজুয়েট্ সভার সভাপতিরূপে তিনি যাহা করিতেছেন, তাহাতে বঙ্গদেশ এক সময়ে ভারতের উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রস্থানীয় হইবে।

১৯১৭ সালে স্যার আশুতোষ University Commission এর সভ্য পদে নির্ব্বাচিত হন। দুই বৎসর কঠোর অনুসন্ধানের পর কমিশন তাহাদের প্রকাণ্ডকায় রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। এই রিপোর্ট অনুসারে কার্য্য হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা যুগপরিবর্ত্তন হইবে, সন্দেহ নাই।

আশুতোষের গার্হস্থ্যজীবন আদর্শস্থানীয়। তিনি দরিদ্রের বন্ধু এবং অসহায় ছাত্রের সহায়। যে কোন ছাত্র অনায়াসে তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে পারে। আশুতোষ বঙ্গের [illegible] সমাজের একজন শ্রেষ্ঠ সংস্কারক।

'রাজা বা রাজু' বলিয়া ডাকে না। এত সাধের একমাত্র পুত্রকে আর তেমন আদর করে না। প্রমথনাথ এখন এক গুলজার নাম্নী বেশ্যা লইয়াই উন্মত্ত! গুলজারই এখন তাহার সর্ব্বস্ব—সে বিশাল হৃদয়ে স্ত্রী-পুত্রের জন্যও আর একটু স্থান নাই! হায় মনুষ্য প্রকৃতি, হায় মনুষ্য ভাগ্য।

তবে সেই শিশু পুত্রের মুখ দেখিয়াই আজও রাজলক্ষ্মী প্রাণ ধরিয়া রহিয়াছে, নহিলে স্বামীর এরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তনে কি আর তাহার জীবন থাকিত? রাজলক্ষ্মী অনেক চেষ্টা করিতেছে কিন্তু কিছুতেই স্বামীকে বশীভূত করিতে পারিতেছে না। এখন মরণ ভিন্ন আর তাহার উপায় কি? কিন্তু এমন সোণার চাঁদ ছেলেটিকে কাহার হস্তে দিয়া রাজলক্ষ্মী মরিবে? সুতরাং রাজলক্ষ্মীর আর মরা হইল না। রাজলক্ষ্মী আর একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবে—স্বামী যাহা বলেন, ন্যায় অন্যায়, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, পাপ পুণ্য, কিছু বিচার না করিয়া স্বামীর সন্তোষের জন্য রাজলক্ষ্মী সবই করিবে! মনে মনে ইহাই স্থির সঙ্কল্প দৃঢ় করিয়া রাখিল।

(৩)

একদিন সন্ধ্যাবায়ু সেবনের পর, কি প্রয়োজন বশতঃ প্রমথনাথ রাজলক্ষ্মীর কক্ষে প্রবেশ করিল। রাজলক্ষ্মী যেন একেবারে স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাইল। কিন্তু হরি! হরি! এ কি! রাজলক্ষ্মীকে দেখিয়া প্রমথনাথ সে গৃহ হইতে ছুটিয়া পলাইয়া যাইতে চায়। রাজলক্ষ্মী সুষুপ্ত পুত্রটিকে তাড়াতাড়ি ক্রোড় হইতে শয্যায় শয়ন করাইয়া স্বামীর চরণে একেবারে লুটাইয়া ঢলিয়া পড়িল। তাঁহার চরণ দুইটি আপনার অজস্র অশ্রুধারায় ধৌত করিতে লাগিল। এত-দিন পরে প্রমথনাথ ধরা পড়িলেন, তাঁহার আর দৌড়িয়া পালান হইল না। প্রমথনাথ ত মানুষ।

"কি দরকার আছে শীঘ্র বল, আমার অনেক কাজ অধিকক্ষণ কিছুতেই থাকৃতে পারবো না।"—এই কথা কয়েকটি বলিয়া প্রমথনাথ ধীরে ধীরে ধুলাব-লুণ্ঠিত পত্নীকে ধরিয়া তুলিল। কিন্তু একটিও কথা রাজলক্ষ্মীর মুখ হইতে নিঃসৃত হইল না, রাজলক্ষ্মী কেবল কাঁদিয়াই আকুল হইল। এ কি! রাজলক্ষ্মীর কি বলিবার কিছুই নাই। অত বিলম্বও প্রমথনাথের সহ্য হইবে কেন? বাহিরে বন্ধু-বান্ধব অপেক্ষা করিতেছে। কি আপদ! এ সময়েও সব ঘ্যান্‌ঘ্যানানি প্যান্‌প্যানানি কান্না কি ভাল লাগে গা? প্রমথনাথ অগত্যা বাহিরে যাইতে উদ্যত হইলেন। অনেক কষ্টে রাজলক্ষ্মী তখন কহিল—"একবার বস!"

প্রমথ। কি করে বস্‌বো—আমি এলেই তুমি একেবারে কান্না আরম্ভ কর—এতে কি বসা যায়।

রাজলক্ষ্মী। তুমিই আমায় কাঁদাও, নইলে আর আমার কিসের দুঃখ?

প্রমথ। আমি তোমায় কাঁদাই! মিথ্যা কথা—কেন আমি তোমার কি করেছি?

কথাটা রাজলক্ষ্মীর মর্ম্মে মর্ম্মে উত্তপ্ত সূচীবেধের ন্যায় বিদ্ধ করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার গণ্ড বহিয়া প্রাবৃটের বারিধারার ন্যায় আবার অজস্র অশ্রুধারা বহিল। ছাই—সে চক্ষের জল কি কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ করা যায় না? অনেক কষ্টে রাজলক্ষ্মী কহিল—"আমি কি অপরাধ করেছি,—আমায় বল। আর আমার অপরাধে তোমার সোণার চাঁদ ছেলেটিকে কেন তোমার ভালবাসায় বঞ্চিত কর বল?

ছি! রাজলক্ষ্মী আবার তোমার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল কেন? অনেক কষ্টে রাজলক্ষ্মী পুনরায় কহিল,—"বল, একবার ঐ ছেলের মুখপানে চেয়ে আমায় বল।"

থাক বন্ধুবান্ধব—প্রমথনাথ বসিল—সেই সুপ্ত শিশু-পুত্রের চাঁদপানা মুখখানি দেখিয়া প্রমথনাথ বসিল। প্রমথনাথের রক্তমাংসের শরীর ত! সুযোগ পাইয়া রাজলক্ষ্মী তখন গৃহের কপাট অর্গলাবদ্ধ করিল।

(৪)

"তুমি একটা ওষুধ খেয়ে, আমার সঙ্গে আমোদ করতে পার?"

অনেক কথাবার্ত্তার পর প্রমথনাথ পত্নীর নিকট শেষে এই জঘন্য প্রস্তাব করিলেন। রাজলক্ষ্মী শিহরিয়া উঠিল! প্রমথনাথ পুনরায় আরম্ভ করিলেন—"আমোদ ভিন্ন মানুষ বাঁচতে পারে না—আমোদে মানুষের পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। তুমি একটু একটু অষুধ খেতে শেখ—বেশ আমোদ হবে। তোমার কান্না আর থাকবে না। আর আমোদ পেলে, আমিও আর কোথাও যাবো না।"

এই কয়েকটি কথা বলিয়া প্রমথনাথ গৃহস্থিত আলমারী হইতে একটি গেলাস বোতল বাহির করিলেন। তাহার পর সেই গেলাস অর্দ্ধপূর্ণ করিয়া পত্নীর সম্মুখে ধরিলেন। এ কি স্বপ্ন, না সত্য? স্বামী স্বহস্তে বিষ দিলে যে অম্লানবদনে রাজলক্ষ্মী তাহা পান করিতে পারিত। রাজলক্ষ্মীর হৃদয় তরতর করিয়া উঠিল। এদিকে স্বামী জেদ করিতে লাগিলেন,—"একটু খাও, এ কান্নারই মহৌষধ—একটু খাও। ও খেলে কেবল হাস্‌তে হয়, আর কান্না থাকে না।"

এই বলিয়া প্রমথনাথ সেই গেলাসটি রাজলক্ষ্মীর মুখের নিকট ধরিলেন। কম্পিত হৃদয়ে, কম্পিত হস্তে রাজলক্ষ্মী আপনার শুষ্ক কণ্ঠে সেই গেলাসস্থিত ঔষধের কিয়দংশ মাত্র ঢালিয়া দিল। বুক জ্বলে গেল—রাজলক্ষ্মীর প্রাণও যে ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে আরম্ভ করিল। কই—আমোদ কই?

তাহার পর প্রমথনাথ গেলাসের অবশিষ্ট ঔষধ নিজেই সমস্ত গলাধঃকরণ করিলেন। এইরূপে প্রমথনাথ পুনরায় প্রতিবার একটু একটু করিয়া পত্নীকে ঔষধ পান করান, আর অবশিষ্ট অংশ নিজেই পান করেন। যতবার গেলাস ঔষধ পূর্ণ হইল, ততবারই গেলাস ঔষধশূন্য হইয়া পড়িয়া রহিল। ক্রমে ঔষধ ধরিল রাজলক্ষ্মীর কান্নার পরিবর্ত্তে হাসি দেখা দিল।

এইরূপে সেদিন রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত কাটিয়া গেল। ইহাকে আমোদ বলিতে হয়, বলিতে পারো, কিন্তু সে আমোদ যখন সপ্তমে চড়িল, তখন উন্মত্ত প্রমথনাথ গৃহের বাহির হইয়া গেলেন, রাজলক্ষ্মী আর তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না।

প্রতিদিন এইরূপ চলিতে লাগিল। কিন্তু রাজলক্ষ্মীর মনোবাঞ্ছা আর পূর্ণ হইল না। কেবল কাঁদা-কাটাই সার হইল. অদৃষ্টক্রমে তাহার আর 'মাছ-ধরা' হইল না। তবে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় স্বামীর দর্শনলাভ হইত। স্বামী বশীভূত হইবার আশায় বুক বাঁধিয়া, রাজলক্ষ্মী একেবারে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়াছিল।

(৫)

একদিন রাত্রে রাজলক্ষ্মী প্রমথনাথকে ধরিয়া বসিল—"আজ আর তোমায় ছেড়ে দেবো না।" প্রমথনাথ উত্তর করিলেন,—"তুমি কবে আর আমায় ছেড়ে দিয়ে থাক? আমি রোজ যেমন ছাড়িয়া যাই আজও সেই রকম যাবো।"

রাজ। তুমি বাড়ী বসে যা ইচ্ছে কর। শুন্‌ছি তোমার অনেক দেনা হয়েছে। তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে অনেকে বড়-মানুষ হয়ে গেল। এতেও কি তোমার চৈতন্য হলো না? তুমি যাকে অমৃত মনে করো, সেই শেষে বিষ হয়ে দাঁড়াবে।

প্রমথ। আরে, রেখে দাও—তোমার চৈতন্যচরিতামৃত। এখন গুলজারের জন্য আমার প্রাণ কাঁদ্‌ছে। রমেশ বাবু এতক্ষণ সেখানে গিয়েছে, ছেড়ে দাও—আমি গুলজারের বাড়ী যাই।

রাজ। রমেশ বাবুইত তোমার মাথা খেয়েছে।

প্রমথ। রমেশ বাবু ছিল বলেই আমি এখনও বেঁচে আছি। এমন বন্ধু কি হয়—যখনই টাকার দরকার হয়, তখনই টাকা পাই।

রাজ। রমেশ বাবু কি তোমায় টাকা দান করেন? শেষে তোমার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তিই যে রমেশ বাবুর হবে।

প্রমথ। তা হ'ক। আমি আর ক'দিন বাঁচ্‌বো? যে ক'দিন বাঁচি, গুলজারের সঙ্গে আমোদ করে-নি।

রাজ। বাড়ীতে কি তোমার আমোদ হয় না? তোমার আমোদের জন্যইত আমি ইহকাল পরকাল নষ্ট কর্‌তে বসেছি।

প্রমথ। বাড়ীতে আমোদ হয় না চাঁদ, বাড়ীতে আমোদ হয় না। তাহ'লে মাসে মাসে মোটা পাঁচশো টাকা গুলজারকে আগাম আগাম গুণে দেবো কেন?

স্বামীর এই কথা শুনিয়া রাজলক্ষ্মী যেন একেবারে শিহরিয়া উঠিল। কি ভাবিয়া একটু রাগান্বিতভাবে কহিল,—"আমি কিছুতেই আজ আর তোমায় ছেড়ে দেবো না! আগে আমায় খুন কর তবে যাও।"

প্রমথনাথ ঈষৎ হাসিয়া ক'হল—"আমি যাবোই, লাভের মধ্যে এই বয়সে তুমি কেন প্রাণটা হারাবে চাঁদ?"

প্রমথনাথের এই কথায় রাজলক্ষ্মীর সে রাগটুকু কোথায় উড়িয়া গেল। রাজলক্ষ্মী এবার মিনতি করিয়া কহিল, "কি কর্‌লে, তুমি বাড়ী থাক, আমায় বল।"

প্রমথ। এক উপায় আছে—কিন্তু তা পার্‌বে কি?

রাজ। তোমায় পাবার জন্য আমি না পারি—এমন দুষ্কর্ম্ম বা অসৎকর্ম্ম কি আছে?

প্রমথ। গুলজারকে আমি বাড়ি এনে রাখবো—সে বিষয়ে তুমি একটিও কথা কইতে পার্‌বে না। বরং তোমায় দাসীর মতন গুলজারের সেবা কর্‌তে হবে।

হা পরমেশ্বর! এই কি রাজলক্ষ্মীর স্বামীর উক্তি! কিন্তু রাজলক্ষ্মী তখন একেবারে মোরিয়া, মনে মনে ভাবিল—"আমি ত ডুবিয়াছি—পাতাল কতদূর একবার দেখিব।" প্রকাশ্যে কহিল,—"আচ্ছা তাই হবে, এই বাড়ীতেই আমি গুলজারের দাসী হয়ে থাক্‌বো।"

(৬)

প্রমথনাথের সব গিয়াছে, এখন কেবল দেনা আছে। প্রমথনাথ এখন দেনার জ্বালায় অস্থির। নগদ টাকাকড়ি, স্ত্রীর অলঙ্কার, বিষয়সম্পত্তি প্রমথনাথের এখন আর কিছুই নাই—এমন কি ভদ্রাসন বাটীখানি পর্য্যন্ত বন্ধক পড়িয়াছে। একে একে সমস্তই প্রতিবাসী রমেশ বাবু ছলে বলে ও কৌশলে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন। প্রমথনাথের সোণার সংসার এখন শ্মশানে পরিণত হইয়া গিয়াছে। গুলজার ডাকিনী দিবারাত্র সে শ্মশানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আর রাজলক্ষ্মী প্রেতিনী এখন আত্মহারা, শ্মশানে কেবল ধেই ধেই নৃত্য করিয়া বেড়ায়। সুরায় অচেতন প্রমথনাথ এখন এই শ্মশানের শব মাত্র। এ শ্মশানে শৃগালকুক্কুরেরও অভাব ছিল না। ডাকিনী কেবল রক্ত চুসিয়া খায়, আর রমেশ প্রভৃতি বন্ধুরূপী শৃগালকুক্কুরগণ অস্থি চিবায় ও উদর পুরিয়া মাংস ভক্ষণ করে। সে সকল স্বচক্ষে দেখিয়াও প্রেতিনী রাজলক্ষ্মী এখন এই শ্মশানেই ধেই ধেই করিয়া নাচিয়া বেড়ায়! আবার খল খল শব্দে হাসিতে থাকে! আর বাকী কি? সেই কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম—প্রমথনাথের অধঃপতনের আর বাকী কি?

বাকী আছে—এখনও অনেক বাকী আছে। এই ভাবে আর কত দিন চলিতে পারে? হঠাৎ একদিন প্রত্যূষে প্রমথনাথের শ্মশান-গৃহে একটা ক্রন্দনের রোল উঠিল! শ্মশানে আর ক্রন্দনের অভাব হয় না, কিন্তু এ ক্রন্দন সাধারণ ক্রন্দন নহে—ইহাতে কিছু অসাধারণত্ব ছিল। তা সে কথা আর গোপন করিয়া লাভ কি? ক্রন্দনের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে প্রচার হইল যে, প্রমথনাথ বিষপানে আত্মহত্যা করিয়াছেন। সব ফুরাইল—প্রমথনাথের এইবার সব ফুরাইল। পাপের পরিণামও এইরূপ!

তখন সেই শবহীন শ্মশানে কি আর ডাকিনী প্রভৃতি থাকিতে পারে? ডাকিনী পালাইল—শৃগাল কুক্কুরগণও—যে যে দিকে পাইল সরিয়া পড়িল। এখন সেই প্রেতিনীর দশা কি হইল? আর সে কথা লিখিতে প্রাণ ফাটিয়া যায়—প্রমথনাথের সেই পঞ্চম বৎসরের শিশুপুত্রের দশা? হায়! সেই পঞ্চম বৎসরের পিতৃহীন অবোধ শিশু আজ পথের ভিখারী হইল! হা পরমেশ্বর!

(৭)

রাজলক্ষ্মী পুত্র সুবোধচন্দ্রের হাত ধরিয়া এখন নিকটস্থ এক খোলার গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। অনেক কষ্টে—কেবল ভিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া এখন মা ও ছেলের গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে লাগিল। কিন্তু কেবল গ্রাসাচ্ছাদন চলিলে কি হইবে? গোদের উপর যে একটা প্রকাণ্ড বিষফোড়া আছে—তাহার উপায় কি হইবে? প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় রাজলক্ষ্মী যে ঔষধ পান

করিয়া থাকে, এ অবস্থায় সে ঔষধ কোথা হইতে জুটিবে? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া রাজলক্ষ্মী তাহারও এক উপায় স্থির করিল। সে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়, একটি শিশি হস্তে সুবোধচন্দ্রকে রমেশ বাবুর গৃহে পাঠাইয়া দিত, এবং রমেশ বাবু ভিক্ষার স্বরূপ যে ঔষধ দিতেন, সেই ঔষধ পান করিয়া জীবন ধারণ করিত। এখন সে ঔষধ না হইলে, রাজলক্ষ্মীর জীবন ধারণ করা ভার!

একদিন বালক সুবোধচন্দ্র শূন্যশিশিহস্তে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া মাতাকে জানাইল—"মা, তুই আর ওষুধ খাস্-নে মা! রমেশবাবু বলেছে—তুই সেখানে না গেলে আর আমায় ওষুধ দেবে না মা। তুই আমায় মেরে ফেল। তার পর নিজে মরে যা—আর ওষুধে কাজ নাই মা!"

অভিমানী বালক নিশ্চয়ই আজ ঔষধের জন্য অপমানিত হইয়াছে, তাই তাহার ক্রন্দন আর থামিতেছে না। আর এ ওষুধ না বিষ? বালক জননীর বক্ষে মস্তক রাখিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। পুত্রকে এইরূপে কাঁদিতে দেখিয়া রাজলক্ষ্মীও কাঁদিল—অনেক দিনের পর আজ আবার রাজলক্ষ্মীর চক্ষে অশ্রু দেখা গেল। মাতা পুত্রের সে কান্নাও থামিল। কিন্তু কই—রাজলক্ষ্মীর ঔষধ কই? ঔষধ বিহনে যে রাজলক্ষ্মীর প্রাণ যায়। অনেক চেষ্টা করিল—কিন্তু রাজলক্ষ্মী সে লোভ সংবরণ করিতে পারিল না। সে কি পারা যায় গা? রাত্রি নয়টার পর রাজলক্ষ্মী পুত্রটীকে ঘুম পাড়াইয়া রমেশচন্দ্রের বৈঠকখানায় একাকিনী গিয়া উপস্থিত হইল। রাজলক্ষ্মীকে দেখিয়া সুরাপানরত সমাগত বন্ধু বান্ধবসহ রমেশচন্দ্র আনন্দে একটা বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল।

আর না—আমাদের রক্ত মাংসের শরীর—আর না। কুক্ষণে আমরা রাজলক্ষ্মীর—পরিণাম লিখিতে বসিয়াছিলাম, আর না। অধঃপতনের অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি, কিন্তু আর না। লেখনী অবশ হইয়া গেল—আর না। চক্ষের জলে কাগজ ভিজিয়া যাইতেছে, আর না।

পর দিন সকলে বিস্মিতনেত্রে দেখিল—উন্মাদিনীবেশে রাজলক্ষ্মী পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার সেই অট্ট হাসি—তাহার সেই মর্ম্মভেদী প্রলাপ—তাহার সেই ধেই ধেই নৃত্য—দূর হ' রাজলক্ষ্মী—দূর হ'—আমরা আর পারি না।

মনের কথা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত রসময় লাহা।

১

উজ্জ্বল আঁখি, গোলাপী গণ্ড
উন্নত পয়োধরা,—
পিয়ানো বাজাতে, হাসিতে কাসিতে
মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়া—
চাইনা ললনা; আমি চাই যা'র
নয়নে সলাজ দিঠি,
অল্পে চিত্ত যাহার তৃপ্ত,
সরলা,—মনটি মিঠি।

২

ইহার উপরে রেঁধে যদি দুটি
দেয় গো তপ্ত ভাত,
দিবসে গুছায় বসন, বাসন,
ঘুমায়ে কাটায় রাত;
সুস্থ সবল রাখে দেহ খানি
গৃহ কাজ করে হেসে,—
ভাবিব, করিল মোরে নারায়ণ
স্বয়ং লক্ষ্মী এসে!

৩

কিন্তু আমার, বলে রাখা ভাল
ছেড়ে যেতে পারে নাড়ি—
শাশুড়ী বলেন যদি—'হায় মোর
মেয়ের গলায় হাঁড়ি।'

সাহিত্য-পরিষৎ
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

ডাক্তার বাবু।

লেখক,—শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী।

(ক্ষুদ্র গল্প)

(১)

বর্ষাকাল। বৈকাল হইতে ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ ও মেঘের গুরুগম্ভীর গর্জ্জন, প্রাণের ভিতর একটা বিভীষিকার উদ্রেক করিতে ছিল।

এমন সময়ে আমি রমেশ বাবুর ডাক্তার খানায় বসিয়া খোসগল্পে সময় কাটাইতে ছিলাম।

রমেশ বাবু মেডিক্যাল কলেজের গ্রাজুয়েট, বয়স অল্প, আজ চারি বৎসর মাত্র নড়াইলে প্র্যাক্টীস আরম্ভ করিয়াছেন। আমার বাড়ীর পাশেই ইহাঁর বাসা বলিয়া দুইজনে বেশ বন্ধুত্ব জন্মিয়াছে—সন্ধ্যার সময়ে ডাক্তারের বাসায় খোসগল্প করাই আমার নিত্য কাজ।

"ডাক্তার বাবু বাসায় আছেন ?"

শুনিয়া নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে ভৃত্য গোবিন্দ দরজা খুলিয়া দিল। অমনি জমিদার জিতেন্দ্র বাবুর দ্বারবান আসিয়া বলিল,—"বড় বাবুর জ্বরের বেগ এ বেলা কম পড়িয়াছে বটে, কিন্তু দাস্ত না হওয়ায় বড়ই অশান্তি বোধ করিতেছেন। যদি একবার ————"

ডাক্তার দ্বারবানের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—"আমি একটি পুরিয়া দিতেছি, এই পুরিয়াটা খাইলেই সকাল বেলা দাস্ত পরিষ্কার হইয়া যাবে। আমি এই দুর্য্যোগে কোন মতেই যেতে পারব না।"

দ্বারবান পুরিয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

(২)

চা খাইতে খাইতে আমি আবার গল্পে মনোনিবেশ করিলাম। ভাবিলাম, আর হয়ত কেহ এই দুর্য্যোগে আসিয়া ডাক্তারকে জ্বালাতন করিবে না, এমন সময় বাহির হইতে আবার কে দরজায় করাঘাত করিল। গোবিন্দ দ্বার খুলিতেই একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ত্রস্তভাবে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক নিঃশ্বাসে বলিল,—"ডাক্তার বাবু, আমি বড় গরীব। আমার মেয়েটীর আজ ৫।৬ দিন জ্বর। আজ যেন একটু বাড়িয়াছে। আজ সন্ধ্যাবেলা একজন হাতুড়ে

ধ'রে বল্লে যে জ্বর বাত-শ্লেষ্মা ক্ষেত্রে গিয়েছে, ডাক্তার বাবু ঐ মেয়েটীই আমার একমাত্র সম্বল। মা নাই বাপ নাই, কোন রকমে ভিক্ষে সিক্ষে ক'রে এনে মেয়েটীকে লালন পালন করছি। দোহাই আপনার ডাক্তার বাবু——"

এই বলিয়া বৃদ্ধা দুই হাতে আমার পা জড়াইয়া ধরিল। আমি পা ছাড়াইয়া দেখাইয়া দিলাম যে, আমি ডাক্তার নই উনি ডাক্তার।

রমেশ বৃদ্ধার কান্নাকাটি দেখিয়া একেবারে বরফের মত গলিয়া গিয়াছিল। সে তৎক্ষণাৎ বলিল, "আচ্ছা আমি যাচ্ছি চল। তোমার বাড়ী কত দূরে ?"

'ঐ বাগদী পাড়ায়, এখান থেকে প্রায় আধ কোরশ।"

রমেশ আমার দিকে তাকাইয়া বলিল,—"তুমি ভাই একটু ব'স আমি চট্ করে ফিরে আসব।"

আমি কিন্তু তার এই বিচার বৈষম্য দেখিয়া আর থাকিতে পারিলাম না। কৌতূহল পরবশ হইয়া বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসিলাম, 'তোমার নাতনীর বয়স কত ?"

বৃদ্ধা উত্তর করিল, "বেশী নয় কাঁচা মেয়ে এই সেদিন ষোল বছরে প'ড়েছে।"

(৩)

রমেশ চলিয়া গেলে আমার মনে নানা সন্দেহের উদ্রেক হইল। আমি জানিতাম দয়া দাক্ষিণ্য সরলতা, ধর্ম্ম বুদ্ধি, সচ্চরিত্রতা প্রভৃতি মানব জীবনের যাহা কিছু ভূষণ তাহার কোনটীরই রমেশে অভাব নাই; কিন্তু আজ তাহার সম্বন্ধে আমার ধারণা অন্যরূপ হইল।

পাঠকগণই একবার বিবেচনা করুন। রাত্রি ৯ নয় ঘটিকার সময় যখন সূচিভেদ্য অন্ধকারে কোলের মানুষকেও চোখে দেখা যায় না, আকাশে কাল কাল ঘন কৃষ্ণ মেঘ, মুষলধারে বৃষ্টি মুহুর্মুহু গুরুগম্ভীর বজ্রনির্ঘোষ, আবার রাস্তায় আজানু জল, এরূপ অবস্থায় জমিদারের বাড়ীর ভিজিটের টাকা ফেলিয়া বিনা ভিজিটে যদি কোন ডাক্তার কাহারও ষোড়শ বর্ষীয়া কন্যার চিকিৎসার্থ ডাকিবামাত্র যায়, তবে তাহার সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা হয় ? সকলের মনে যেরূপ ধারণা হয়, আমারও সেইরূপ হইয়াছিল—আমি ত আর সৃষ্টি ছাড়া নই।

(৪)

ক্রমে ক্রমে রাত্রি দশটা, সাড়ে দশটা, এগারটা পর্য্যন্ত বাজিল। তথাপি রমেশ ফিরিয়া আসিল না। অগত্যা বাধ্য হইয়া আমি বাড়ী আসিয়া আহারান্তে নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে আশ্রয় লইলাম।

পরদিন সন্ধ্যাকালে যথারীতি রমেশের বৈঠকখানায় যাইবামাত্র রমেশ একবার সন্দিগ্ধ নয়নে আমার মুখের দিকে তাকাইল। তারপর বলিতে লাগিল, "ভাই নরেন কাল আমার ব্যবহার দেখে তোমার মনে একটু সন্দেহ হ'য়েছে, কিন্তু ভাই, ইহার কারণ শুন্‌লে বোধ হয় তোমার সন্দেহ দূর হ'বে।"

এই বলিয়া রমেশ বলিতে লাগিল—

"তুমি জান আমি শৈশবেই পিতৃহীন হই। বাড়ীখানি ছাড়া বাবা মৃত্যু-কালে আর কিছুই রাখিয়া যান নাই। ইহার উপর গলার ধড়া নামিতে না নামিতে যখন মহাজনেরা আসিয়া দেনার ফর্দ্দ বাহির করিল, তখন দেখিলাম, বাবা কম করিয়া দুই হাজার টাকা দেনা করিয়া গিয়াছেন। শেষে মহাজনেরা একদিন বাড়ীখানি ও জিনিষ পত্র ক্রোক দিয়া বলিয়া দিল পনর দিনের মধ্যেই আমাদিগকে বাড়ী ছাড়িতে হইবে—আমরা অকুল পাথারে ভাসিতে লাগিলাম। গ্রামের মধ্যে একজন বৈষ্ণবী থাকিত, সে মাকে আসিয়া বলিল, "মা এতদিন তোমাদের খাইয়া মানুষ হ'য়েছি এখন আমার ঘরে তোমরা এস—"

আমার অস্পষ্ট মনে আছে একদিন সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকারে মা প্রভাকে কোলে লইয়া আমার হাত ধরিয়া—বৈষ্ণবীর জীর্ণ কুটীরে আশ্রয় লইলেন। বাবার মৃত্যুতেও মা আমাদের সম্মুখে চোখের জল ফেলেন নাই। কিন্তু বিদায়ের সেই বিষণ্ণ সন্ধ্যায় কিছুতেই তিনি অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারেন নাই। আমি ব্যাপার কিছু কিছু বুঝিয়াছিলাম, মার কষ্ট দেখিয়া আমি কাঁদিতে ছিলাম। আমাদের কান্না দেখিয়া কিছু না বুঝিয়া প্রভাও কাঁদিতে ছিল।

সুখে দুঃখে ক্ষুদ্র কুটীরে আমাদের দিন কাটিতে লাগিল। গ্রামের মাইনর স্কুলে আমি পড়িতে লাগিলাম। তখন আমি মাইনর ফার্ষ্ট ক্লাসে পড়ি, একদিন স্কুল হইতে আসিয়া দেখিলাম, প্রভার জ্বর হইয়াছে। মার যে দুই একখানা গহনা ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া অতি কষ্টে আমাদের সংসার চলিত, কাজেই সহসা ডাক্তার ডাকা হইল না। মা দেশীয় মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রভার জ্বর হ্রাস না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

আট দিনের দিন প্রভা প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিল, চক্ষু দুইটী জবাফুলের ন্যায় লাল হইল—মা কাঁদিতে লাগিলেন।

আমি কাহারো অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া হরিপদ ডাক্তারের নিকট ছুটিয়া গেলাম। ডাক্তার তখন বৈঠকখানায় বসিয়া পাশা খেলিতেছিলেন,

আমি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম,—"ডাক্তার বাবু, আমার বোনের অবস্থা বড়ই খারাপ, আপনি যদি দয়া করিয়া একবার ————"

আমার কথা শেষ হইতে না হইতেই ডাক্তার বলিলেন,—"ভিজিটের টাকা এনেছ?"

আমি বলিলাম,—"ডাক্তার বাবু আপনি আগে চলুন, আপনি রোগী দেখিবেন, এই অবকাশে আমি মার সাকুড়ী দুটী বাঁধা দিয়ে আপনার ভিজিটের টাকা এনে দিব। ডাক্তার বাবু শীঘ্র আসুন ধিকার—ঘোর ধিকার—আমার বোনের ————"

রাগান্বিত হইয়া ডাক্তার আমায় বল্লে—"না হে বাবু তা হ'বে না কাল সকালে ভিজিটের টাকা নিয়ে এসো, আমি যাইয়া দেখিয়া আসিব।"

আমি ডাক্তারের পায়ে পর্য্যন্ত ধরিলাম—কত কাঁদিলাম, শেষে অর্দ্ধ চন্দ্র খাইয়া আমাকে ফিরিয়া আসিতে হইল।

বাড়ী পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই মায়ের কান্নার সুর শুনিতে পাইলাম, তীরবেগে বাড়ী ছুটিয়া আসিলাম দেখিলাম, প্রভার প্রাণহীন দেহ উঠানে গড়াগড়ি যাইতেছে।"

(৫)

রমেশের চক্ষু দুটি সজল হইয়া উঠিতে ছিল। আমি অনুতপ্ত হইয়া বলিলাম, "থাক ভাই, আর ও কষ্টের কথায় কাজ নাই।"

রমেশ বলিল,—"এ কষ্টের কথা যত বলি, ততই যেন মনে শান্তি পাই।"

"প্রভা চলিয়া গেল। মা আমাকে বুকে করিয়া প্রভার শোক ভুলিতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু তাহা কি ভুলা যায়?

সে আগুন যে সপ্ত সমুদ্রের জলেও নিবিবে না। মাইনর পরীক্ষায় আমি পাঁচ টাকা বৃত্তি পাইলাম। প্রতিদিন দুই ক্রোশ পথ যাওয়া আসা করিয়া আমি লোহাগড়া স্কুলে এণ্ট্রান্স পড়িতে লাগিলাম। বৃত্তি ভোগী ছাত্র বলিয়া আমায় স্কুলে বেতন দিতে হইত না, সেই পাঁচ টাকায় মা কোনরূপে কষ্টে সৃষ্টে সংসার চালাইতেন।"

"যথা সময়ে আমি এণ্ট্রান্স পাশ করিলাম। এবং এবার কুড়ি টাকা বৃত্তি পাইলাম। যেদিন মা আমার এ সংবাদ শুনিলেন, সেদিন তাঁর চক্ষু দিয়া দরবিগলিত ধারায় জল পড়িতে লাগিল—আমার শিরচুম্বন করিয়া মা বলিলেন, "আহা আজ যদি তিনি থাকৃতেন" বাবার কথা মনে পড়ায় আমার চোখে

জল আসিল। সে সময়ে আবার প্রভার কথা মনে হইল। আহা! সে যদি আজ বাঁচিয়া থাকিত, তাহা হইলে সে কত রকমে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের বিপুল আনন্দ কত রকমে প্রকাশ করিয়া বেড়াইত!

মার পদধূলি লইয়া এফ্ এ, পড়িবার জন্য কলিকাতায় রওনা হইলাম। দয়াময় পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে আমি যথাসময়ে এফ্ এ, ও পাশ করিলাম।"

"প্রভার মৃত্যু দিন হইতেই ডাক্তারী পড়িবার আমার বলবতী ইচ্ছা ছিল, এখন সেই সুযোগ পাইয়া মেডিকেল কালেজে ভর্ত্তি হইলাম। রাত্রে দুইটা টিউসনী করিতে লাগিলাম--তাহাতে পঁয়ত্রিশ টাকা পাইতে লাগিলাম। মাকে দেশ হইতে কলিকাতায় আনিয়া একখানা খোলার ঘরে দুইমায়ে পুতে কষ্টে সৃষ্টে কাল কাটাইতে লাগিলাম। বৈষ্ণব দিদিকেও আনিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে কোনমতেই আসিল না।"

সেবার আমি শেষ পরীক্ষা দিব। মার হঠাৎ অসুখ হইল, চারিদিনের জ্বরে মাও আমাকে ফেলিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। মা তাঁহার শেষ নিশ্বাস ফেলিবার আগে আমাকে সস্নেহে বুকে টানিয়া বলিলেন,—"বাবা, আমি চললাম। তুই ডাক্তার হ'য়ে আমার পোটা কতক কথা রাখিস্। কখনো গরীবের কাছে ভিজিট কিম্বা ওষুধের দাম নিস্ না। বড় লোক ডাকলে যাস্ বা না যাস্ গরীবে ডাকলে যাই বাধা থাক্, একদণ্ডও বিলম্ব করিস্ না। জানিস্ ত বাবা প্রভা আমার পয়সা অভাবে ডাক্তার না আসায় মারা গিয়েছে।"

"ভাই, আজ চারি বছর হ'ল ডাক্তারী পাশ ক'রেছি, কিন্তু মায়ের মুহূর্ত্তের কথা কয়টী এখনো ভুলতে পারি নাই। তাই গরীবের বাড়ী থেকে ডাক পাওয়া মাত্র আমি সেখানে আগে ছুটি।"

এই বলিয়া রমেশ সাশ্রু নয়নে অন্দরে চলিয়া গেলেন, আমি অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিলাম।

মেঘ।

লেখক,—পণ্ডিত শ্রীহরিদাস বিদ্যানোদ।

হে জলদ নভশ্চর! জিজ্ঞাসি তোমায়,
বল কেন নভস্তলে
কেন সদা কুতূহলে?

অবতীর্ণ ভূমি তলে
হওনা মনের ভুলে?
কিন্তু দয়া সর্ব্বকালে করিছ ধরায়!

দারুণ নিদাঘ বায়
ছুটিলে অনল প্রায়
যখন সে কিশলয়
তৃষ্ণায় কাতর হয়!
কোমল অধরে হয় কালিমা বিস্তার।

ছোট ছোট কলি গুলি
পিপাসায় মুখতুলি
নীরব ভাষায় কত
যাচে জল অবিরত
মুমূর্ষু জনের মত শুষ্কতালু হয়!

আহা সে তৃণের মুখ,
মনে হ'লে তার দুখ,
তৃষ্ণায় আকুল হয়ে
কচি মুখ' পড়ে নুয়ে!
পাণ্ডুবর্ণ, ভূমে শুয়ে মৃতপ্রায় রয়।

যখন তড়াগ কত
বিল ঝিল শত শত
পিপাসার শীর্ণকায়
জল জল করি, হায়,
কতই কাতরে চায় তব কৃপাবারি!

তখন হে কৃপাবান
রাখহ এদের প্রাণ!
তখন গগন তলে
দেখা দাও ভাগ্য বলে!
প্রহ্লাদের করতলে যেন যে কংশারি!

আসিয়া গগন তলে,
রাখ স্নিগ্ধ ছায়াতলে,
গুরু গুরু গরজনে
যেন স্নেহ পরিষণে,
কাতর সন্তানগণে রাখহে আশ্বাসে!

অতুল পীযূষ পাখা,
প্রচুর সলিল রাখা

সন্তানের গত প্রাণ,
পুনরায় যেন দান
কর, অহে দয়াবান, আসিয়া আকাশে।

দয়ালু তোমার মত
কোন স্থানে দেখি নাত!
তাই বলি ব্যোমচর,
কে তুমি কোথায় ঘর?
কি হেতু অম্বর পর করিছ বিহার?

অনুমানে বোধ হয়,
স্বর্গ বাসী সুনিশ্চয়!
তা নৈলে পাপের দেশে,
নামনা ভ্রমের বশে!
নামিলে স্পর্শে বা শেষে কলুষ ধরার!

শুনেছি স্বর্গের কথা
দ্বেষ হিংসা নাহি তথা,
পর উপকার ব্রত
উদ্‌যাপন অবিরত
স্বরগের প্রাণী যত করিছে যতনে।

তাই, পর উপকার
কর বুঝি বার বার,
নিঃস্বার্থ প্রেমের নীতি
নিঃস্বার্থ স্বর্গের গীতি
শিক্ষা দাও যথারীতি আসিয়া গগনে।

কিম্বা ওহে ব্যোমচর,
হবে বুঝি যোগীবর!
ত্যজিয়া পাপের ধরা
জন্ম মৃত্যু ব্যাধি জরা
মোক্ষপদ লাভ করা তোমার বাসনা।

তাইতে অম্বর পর
তাঁরে খোঁজ নিরন্তর
আশায় নিরাশ হৈলে
ভেসে থাক আঁখিজলে!
ধন্য তুমি নভশ্চর! ধন্য এ সাধনা।

—•—

"ব"এর বাহাদুরী।

লেখক,—শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী।

(কৌতুক)

আমি শ্রীবকাউল্লা বিশ্বাস বাহাদুর বাগবাজারে বিশ্বকোষ লেনে মহার্ণবের বাড়ীর পার্শ্বে বাস করি, তোমরা আমার কথা অবিশ্বাস করিও না। আজ আমি তোমাদিগকে আমার অপূর্ব্ব জীবন বৃত্তান্ত শুনাইব, তোমরা তাহা শ্রবণ করিয়া অবাক হইও না। বর্ত্তমানে যখন রাসভ বিনিন্দিত স্বরে বেঙ্গলীর রায়াস্তর বর্ষীয় বাড়ুয্যে সাহেব আপন সংবাদ পত্রে স্বীয় ভুবন বিজয়িনী বাগ্মী-তার বিবরণ প্রকাশ করিতেছেন, তখন বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর গিবসন্ কার-মাইকেল বাহাদুর আমাকে যে "বাহাদুর" খেতাবটা দিয়াছেন আমি তাহার বাহাদুরী বাহির করিতে বিরত হইব কেন?

আমি বকাউল্লা বিশ্বাস বঙ্গীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈশাখ মাসে বারই তারিখে মাতৃজঠর হইতে বাহির হই। আমার মুখারবিন্দ অবলোকন করিবামাত্র স্বর্গ হইতে দেবগণ পুষ্প বৃষ্টি আরম্ভ করেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত আমার বুদ্ধি, বিবেচনা, বিবেক, বিদ্যাবত্তা এতদূর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে যে বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে আমি দ্বাদশ শত রজত-ধবল মুদ্রা বিনিময়ে এক বালিকাকে বিবাহ করি। বর্ত্তমানে আমি অপূর্ব্ব বাক্‌শক্তির প্রভাবে এরূপ জগদ্বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছি যে, আমি বিহীন কোন বস্তু এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নাই।

তোমরা পৃথিবীর ইতিবৃত্তের বিষয় বিশদ ভাবে ভাবিয়া দেখ, দেখিবে এই বিশাল অবনীমণ্ডলের সর্ব্বত্রই আমার প্রভাব বিদ্যমান।

প্রথমে দেখ ভারতবর্ষে, বঙ্গদেশে, বোম্বাইয়ে, পঞ্জাবে, ব্রহ্মে আমি বিরা-জিত। আবার ভারতবর্ষের বাহিরে বেলুচিস্থানে, বেলজিয়মে, বাবেল মাণ্ডবে, বার্লিনে, বোর্ণিও, যবদ্বীপে, নিকোবারে এবং বাবিলনে আমি খোসমেজাজে বহাল তবিয়তে বিদ্যমান আছি! আমার প্রভাবে বারানসী, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, ব্রহ্মপুত্র, বৈদ্যনাথ ও ত্রিবেণী আর্য্যজাতির বংশধরগণের নিকট অতীব পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। ঐ যে বৈশালীর তীরে বোধি-দ্রুম তলে বসিয়া বুদ্ধদেব নির্ব্বানত্ব লাভ করিয়া ছিলেন, ঐ বুদ্ধগয়ায় আমি। বৃন্দাবনে কদম্ববৃক্ষমূলে দাঁড়াইয়া ব্রজবালা বৃন্দের বসন চুরি করিয়া রাধাবল্লভ বংশীধারী যেখানে বাঁশী বাজাইতেন সেখানেও আমার বিলুপ্ত স্মৃতি দাজ্জল্য-

পারে। আমারই বিজয় বার্ত্তা গাহিতে গাহিতে জাহ্নবী উচ্ছ্বসিত বারিপ্রবাহে প্লাবিত করিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। ব্রহ্মপুত্র, কাবেরী, বিতস্তা, বিপাশা আমার বলেই ভৈরবে বীচি বিক্ষোভিত বক্ষে মহার্ণব পানে প্রধাবিত হইয়াছে। আমারই বলে পবন নন্দন মৃত্যুবাণ আনিয়া রাবণের বধসাধন করিয়াছিলেন, নতুবা রাঘবের সাধ্য কি যে দেবাদিদেব মহাদেব যাহার আজ্ঞাবহ ছিলেন সেই রক্ষোবর রাবণকে বধ করেন? আমি বেদে, বেদাঙ্গে, ব্রাহ্মণে না আছি কোথায়? মহাকবি কালীদাস যে উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিত্যের সভায় সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া এত প্রতিষ্ঠাবান হইয়াছিলেন, তাহাও আমারই বলে। বরাহ, বররুচি, বিদ্যাপতি বা কবিকঙ্কণ সকলেই ত আমি দ্বারা বিরাজমান। দ্বাদশবর্ষীয় বীর বাদল যে অপূর্ব্ব বীরত্ব দেখাইয়া সবাইকে বিস্মিত করিয়াছিল তাহাও আমারই প্রভাবে জানিও। আমি সঙ্গে সঙ্গে থাকায় বলিয়া বাবর ইব্রাহিম লোদীকে পাণিপথ আহবে বিজয় করিয়া ভারতে মোগল বংশ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন। আমার বলে আকবর যবন হইলেও "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" বলিয়া বঙ্গবাসীর নিকট আজিও পূজিত, আবার ঔরঙ্গজেব অবজ্ঞার সহিত আমার নামটী শেষে ধরিয়াছিলেন বলিয়া মোগলবংশ তাহা হইতেই ধ্বংশ বিধ্বংস হইল। এইত গেল ইতিহাসের কথা, একবার ধর্ম্মজগতের দিকে অবলোকন কর, দেখিবে সেখানেও আমার প্রভাব বিরাজিত। আমি বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম্মে আছি, চৈতন্যে না থাকি তাঁহার সহধর্ম্মিণী বিষ্ণুপ্রিয়া ও তৎপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মে আছি, আমি কবীরে আছি, গুরু গোবিন্দে আছি, না আছি কোথায়? শিবাবতার শঙ্করাচার্য্যে না থাকি তাঁহার প্রবর্ত্তিত "একমেবাদ্বিতীয়ম" ও তাঁহার শেষধ্বনি "শিবোঽহং শিবোঽহং" শব্দে আছি। আমি ব্রাহ্ম সমাজে আছি। তাহাদের স্ত্রীস্বাধীনতায় আছি। নাই কোথায় বল দেখি? বৈকুণ্ঠে আমি, স্বর্গে আমি, অপবর্গে আমি, ব্রহ্মে আমি, বিষ্ণুতে আমি, শিবে আমি, দেবে আমি, দেবীতে আমি, বেদব্যাসে আমি, বাল্মীকিতে আমি, ভগবানের বরাহ অবতারে আমি, আমি নাই কোথায় বল দেখি? আমারই বলে বিজয় সিংহ সিংহল দ্বীপে বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিলেন; আবার বোনাপার্ট আমারই বলে বিশ্ববিজয়ী বীর। বক্তৃতা জগতেও কি আমি একদিন কম ছিলাম? বিসমার্ক, গাম্বেটা, বার্ক এ সমস্ত বাগ্মী বরেরা আমারই নাম সর্ব্বাগ্রে অধরে উচ্চারণ করিতেন বলিয়া বাগ্‌বিশারদ নামে বিদিত হইয়াছেন! আবার

অধুনা চেম্বারলেন, বোনার ল, বালফোর প্রভৃতি বিখ্যাত বক্তাগণ আমারই প্রভাবে এত প্রভাবান্বিত হইয়াছেন।

বন্দ্যোপাধ্যায় ও বসু হিসাবে আমি বল্লালের কৌলীন্য প্রথামতে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র বংশে বরেণ্য। বিনাপণে আমার সহিত কেহ বণিতা বিবাহ দিতে পারে না। ইহা ব্যতীত পশু বা পক্ষী জগতে যদি আমার প্রভাব দেখিতে চাও তবে আলিপুর পশুশালায় প্রবেশ কর। ঐ দেখ তথাকার বনমানুষ, বানর বানরী, ব্যাঘ্র, বাবুই, বায়স, বক, আশীবিষ দ্বীপী বুলবুল প্রভৃতিতে আমি কেমন বসিয়া আছি! আবার আধুনিক বিংশ শতাব্দীর বিষয় ভাবিয়া দেখ, দেখিবে বর্ত্তমান বিজ্ঞানে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, বক্তৃতাতে, বকাবকিতে, বকামীতে, বাজারে ও বিপণীতে আমি বিরাজিত। বিশ্বাস না কর ত একে একে দেখ। সর্ব্বাগ্রে দেখ তোমাদের বৈজ্ঞানিকবর জগদীশচন্দ্র বসুতে আমি। ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র আমাকে বর্জ্জন করিলেও তাঁহার বেঙ্গল কেমিকেল আমাকে বিস্মৃত হয় নাই। তোমাদের শ্রেষ্ঠ বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীব রাসবিহারী ঘোষ, শ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ, শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ আমারই প্রভাবে এত বড় হইয়াছেন। আবার বিদ্যাসাগর, ভূদেব, বঙ্কিম, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল প্রভৃতি আমাকে অবলম্বন করিয়াই এত ব্যক্তিত্ব দেখাইতে পারিয়াছিলেন। তোমাদের আশুতোষ আমাকে ত্যাগ করিলে বিচারপতির পদ হইতে বঞ্চিত হইবেন এই ভয়ে "সরস্বতী" উপাধি বরণ করিয়া লইয়াছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" লেখককে বহাল করিয়াছেন। "বিদ্যাভূষণ" আমারই বরে সরস্বতীর কৃপাবারি লাভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছেন! নতুবা আমা বিহীন হইলে তাঁহার সাধ্য কি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাটীতে প্রবেশ করেন? বঙ্গের শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র হিতবাদী, বঙ্গবাসী, সঞ্জীবনী, বসুমতী, অমৃতবাজার, বেঙ্গলী ও বাঙ্গালীতে আমি। আমাকেই সর্ব্বপ্রথমে স্থান দিয়া বঙ্কিম বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষের বীজ বপন করিয়াছিলেন। আমি মাইকেলে না থাকি তাঁহার বীরাঙ্গনায় আছি। আধুনিক রাজনৈতিক জগতেও কি আমার প্রভাব কম? তোমাদের নেতাবর্গে বালগঙ্গাধর, মালব্য, বিবি বেশান্ত, তেজ বাহাদুর, বিজয়রাঘব ও বিপিনচন্দ্রে আমি। আমারই বলে একদিন বিপিনচন্দ্র "কাঁপিবে বিমান পৃথ্বী বিক্রমে নবীন" বলিয়া বজ্রনির্ঘোষে বক্তৃতা করিয়া বাহবা লইয়া শেষে কি জানি কি বুঝিয়া

বিলাতে প্রস্থান করিয়া "চাচা আপন বাঁচা" কথার সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। আমার প্রভাবে বর্দ্ধমানাধিপ বিজয়চাঁদ সিবিলিয়ান বা ব্যারিষ্টার অথবা ব্যবহারাজীব না হইয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদে শিক্ষা সচিব হইয়াছেন। আমি দয়া না করিলে ভূপেন্দ্রনাথ বসু কি মণ্টেগুর দক্ষিণ বাহু হইয়া শ্বেতাঙ্গ মধ্যে "হংসো মধ্যে বকো যথা" বৎ বসিতে পারিতেন। আমার সহিত সংস্রব না রাখিয়া লর্ড সিংহ ব্যারণ হইয়াছেন, কিন্তু সত্বরই তাঁহাকে আমার স্মরণ লইতে হইবে। দেখিও শীঘ্রই তাঁহাকে নবদ্বীপের "বিবুধ বরণ" সভার দ্বারস্থ হইয়া "শাস্ত্রবাচস্পতি" অথবা "বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি" কিংবা "ভক্তিবিনোদ" উপাধি লইয়া তবে আপন পদ-গৌরব বজায় রাখিতে হইবে।

বলিয়াছি ত জীবের আদিতে আমি, আবার অন্তে আমি। তাই আমার আর এক নাম অন্তস্থ "ব"। আবার বর্গের মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমার অন্য নাম বর্গীয় "ব"।

বলিয়াছিত আমি সবতাতে আছি। ঐ যে সুবর্ণ বলয় ও বিচিত্র বসনে বিভূষিতা যুবতী বর্ষার প্রবল প্লাবনে উচ্ছসিত বেগবতী স্রোতস্বিনীর ন্যায় দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া প্রেমার্ণবে হাবুডুবু খাইতেছে, ঐ দেখ ঐ যুবতীর বিম্বাধরে, তাহার সুবিন্যস্ত কবরীতে, ইন্দীবরতুল্য বদন কমলে, আবক্ষ-লম্বিত অবগুণ্ঠনে ও তাঁহার মৃণাল বিনিন্দিত বাহুযুগলে, নবনীতকোমল কলেবরে এবং নিতম্বে আমি। আবার পতিবিয়োগবিধুরা বালবিধবা যখন বিরহবেদনায় শত বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় বিছানায় ব্যাকুলচিত্তে অবস্থান করিতে থাকে তখন তাহার সেই ব্যাকুলতা ও বিরহ বেদনাতে আমি বিদ্যমান থাকি।

আবার দেখ তোমাদের দেবদেবীর বন্দনাতেও আমি আছি। পূর্ব্বাকাশে বালভানুর স্বর্ণাভ কিরণ দেখিয়া যখন তোমরা—

"ওঁ বিবস্বতে ব্রাহ্মণ ভাস্বতে বিষ্ণু তেজসে
জগত সবিত্রে সূচয়ে সবিত্রে——"

বলিয়া সবিতৃদেবের বন্দনা কর অথবা "ওঁ সরস্বতী মহা ভাগে বিদ্যাকমল লোচনী, বিশ্বরূপাং বিশালাক্ষী বিদ্যাং দেহি মে জননী" বলিয়া বাগ্‌দেবীর বন্দনা কর তখন তাহার প্রত্যেক বর্ণে আমি থাকি।

বসন্তে তোমাদের বাড়ীর পার্শ্বে রসাল বৃক্ষে বসিয়া পিকবধূ কুহু কুহু রবে তোমাদের শ্রবণবিবরে যে সুধার সুধারা বর্ষণ করে, তাহার সেই সুমধুর কুহুরবে আমি। ভাস্বর সবিত্রিদেবে, পবনের স্বন্ স্বন্ ধ্বনিতে, স্রোতস্বিনীর

কুলু কুলু রবে, কুমুদবান্ধবের বিমল সুধাবিন্দুতে আমি বিরাজমান। আমি বণিকের বাণিজ্য-সম্ভারে, তরী, বাহকের বহিত্রীতে, মহার্ণবের বেলাভূমিতে আছি। আমিই মরুভূমিতে বালুকারূপে শত শত ব্যক্তির পদাঘাত সহ্য করি। আবার আমিই পর্ব্বতরূপে ব্যোমস্পর্শ করি। ব্যোমযানে করিয়া আমিই বহু ব্যক্তিকে বায়ুমণ্ডলে লইয়া যাই, আবার সব্‌মেরিণ রূপে আমিই বহু মানবকে অর্ণবের মধ্যে ডুবাইয়া দি।

আমারই বলে সাবিত্রী, শৈব্যা, অহল্যাবাই প্রভৃতি আর্য্যবালাগণ আজিও বঙ্গবালার বরেণ্য। আমি এত পবিত্র যে স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব বিভূতিরূপে আমাকে অঙ্গে বিলেপন করেন, আবার আমি এত অপবিত্র যে বিষ্ঠারূপে আমাকে আবর্জ্জনার মত লোকে বিদূরিত করে। ঐ যে ভারতের কটিবন্ধসম বিন্ধ্যগিরি সগৌরবে দণ্ডায়মান হইয়া অতীত গৌরব গাথা গাহিতেছে ঐ বিন্ধ্যপর্ব্বতে আমি শ্বাপদজীবরূপে বিচরণ করিতেছি। আমি বোপদেবের মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে। বিদ্যাসাগরের বোধোদয়ে, মহার্ণবের বিশ্বকোষে এবং সুবলচন্দ্রের শব্দকোষে আমি। দীনবন্ধুর সধবার একাদশীতে আমি আছি বলিয়াই তাহা এবার পুলিশের বড় সাহেবের বিচারে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে। আমারই বলে বলীয়ান্ হইয়া সেই "বিয়ে পাগলা বুড়ো" বৃদ্ধবয়সে বিয়ে করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন।

মানবের জীবন, বায়ুতে আমি, বরুণে আমি। বস্তুতঃ আমা ব্যতীত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব অসম্ভব। আমিই বৈরীরূপে মানবের জীবন ধ্বংশ করি, আবার বন্ধুরূপে আমিই উৎসবে ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে ও রাষ্ট্রবিপ্লবে পার্শ্বে দাঁড়াই। অতএব এ হেন জগদ্ধিতকারী বকাউল্লা বিশ্বাস আমি—আমি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নিকট নিবেদন করিতেছি অবিলম্বে তাঁহারা আমাকে ব্যাকরণে একাধিপত্য দান করুন। সুগ্রীব ও বালীর ন্যায় আমার একই অবয়ব আর ভাল বোধ হইতেছে না।

কৌতুক-কণা।

(সংগ্রহ)

প্রভু। (চটিয়া) দেখ লক্ষ্মা, তুই পাড়ায় পাড়ায় আমার নিন্দা করে বেড়াস কেন বল দেখি ?

ভৃত্য। আজ্ঞে, আপনি প্রভু, আপনারই খাই দাই—সবই আপনার তরে কেবল নিন্দাটা কি করবো অপরের !

"বলি, হাঁ হে ভট্টাচার্য্য তুমি বামনের ছেলে ; এই গঙ্গাজল—তাঁমাতুলসী ছুঁয়ে কি কোরে এমন মিথ্যা কথাটা বোলে এলে বল দেখি ?

মহাশয়, বলেন কি ? বামনের ছেলে, গঙ্গাজল ছোঁবনা, তাঁমাতুলসী ছোঁবনা, তবে কি নর্দ্দামার জলটা ছোঁয়ে বলতে যাবো !

নব্য সভ্য জামাইবাবু শ্বশুরালয়ে জুতা পায়ে দিয়া আহারে বসিতেছেন দেখিয়া শ্বশুর মহাশয় বলিলেন,—"বাবাজী জুতা খুলে খাও।" জামাতা চটিয়া গেলেন ! দোষ কার ?

বাবু। (গাড়োয়ানের প্রতি) তোর গাড়ীর ভাড়া কত ? গাড়োয়ান,—"প্রথম ঘণ্টা বারো আনা, দ্বিতীয় ঘণ্টা আট আনা।" বাবু (সন্তুষ্ট চিত্তে) "বেশ, তবে দ্বিতীয় ঘণ্টা থেকেই তোর গাড়িতে চোড়্‌বো।"

গোধূলি লগ্নেই বিবাহ। বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তার বাড়ী পৌঁছিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন,—"লগ্নের আর বিলম্ব কি ?" কন্যাকর্ত্তা, (অতি বিনীতভাবে যুক্ত করে) গোধূলি লগ্নেই বিবাহ। তা মহাশয়েরা যখনই পদার্পণ কোরেছেন, তখনই আমার লগ্ন হয়েছে।

স্ত্রী পিতৃ গৃহ হইতে স্বামীকে পত্র লিখিয়াছেন,—"ভাবনায় আমার মাথার চুল গুলি পর্য্যন্ত পাকিয়া উঠিল। শীঘ্রই কিছু টাকা পাঠাইবে।" স্বামী পত্র পাঠ মাত্র তাড়াতাড়ি একশিশি চুলের কলপ পাঠাইয়া দিলেন,—চুলপাকা নিবারণের পক্ষে, টাকা অপেক্ষা ইহাই অব্যর্থ মহৌষধ।

উপন্যাস ও নাটকে অনেক লোক মারা যায়, থিয়েটারেও মরে অনেক ; এত মরিতেছে দেখিয়া, রসিক পাঠকগণ অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন,—"ইহাতে ধান চাউল সস্তা হইবে কি ?"

কয়েকটি প্রশ্নোত্তর।—(১) সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী কি ?—দুঃসংবাদ। (২) সর্ব্বাপেক্ষা অশান্তি কি ? প্রিয়তমার অশ্রু। (৩) সর্ব্বাপেক্ষা সুমিষ্ট কি ?—পরান্ন। (৪) সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক বাদ্য কি ?—মলের।

রজনী বাবুর মায়ের শ্রাদ্ধ। যথা সময়ে সমস্ত ব্রাহ্মণ আসিয়া একে একে তাঁহার গৃহ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইতেছেন। বসিবার স্থান নাই, আহারের স্থানও পরিষ্কার হয় নাই দেখিয়া রজনী বাবু উচ্চৈঃস্বরে ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিলেন,—"বেটা হরে, বামুন খাবে যে রে ; শীগ্‌গীর ঝাঁটা বার কর না।"

সমালোচনা।

পল্লী-স্বাস্থ্য।—রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু I. S. O. M. B. F. C. S. প্রণীত ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রকাশ বসু M. B. কর্ত্তৃক ২৫ নং মহেন্দ্র বসুর লেন হইতে প্রকাশিত ; মূল্য চারি আনা মাত্র।

এই পুস্তকে গ্রন্থকার পল্লীগ্রামে নানা অসুবিধার মধ্যে বাস করিয়া কিরূপে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় নিয়ম সকল রক্ষা করিতে পারা যায়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া কতক গুলি প্রয়োজনীয় উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পুস্তকের ভাষা অতিশয় প্রাঞ্জল, দুরূহ বৈজ্ঞানিক শব্দ সমূহের ইংরাজী নামগুলি বঙ্গভাষার সম্পদ বাড়াইবার জন্য যে উপায় সকল অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে গ্রন্থকারের সুচিন্তা ও গবেষণার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। সহর ও পল্লীগ্রামের সামান্য বঙ্গভাষাভিজ্ঞ স্ত্রীলোকেও "পল্লী-স্বাস্থ্য" পাঠ করিয়া অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। গ্রন্থকারের প্রত্যেক যুক্তি ও উপদেশ প্রত্যেক স্বাস্থ্যকামী ব্যক্তির অনুকরণীয় ও পালনীয়।

গ্রন্থকার শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত ; রসায়ন বিজ্ঞানের আচার্য্য, আমরা আশা। পুস্তকের প্রত্যেক উপদেশ সমীচীন বলিয়া মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করি। পল্লীগ্রামে স্বাস্থ্যের বর্ত্তমান দুঃবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া গ্রন্থকার আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন ;—

"এমন একদিন ছিল, যখন বাঙ্গালায় শ্রী সৌন্দর্য্য, ধন সম্পদ, আমোদ প্রমোদ, আশা ভরসা, সুখ শান্তি, স্বাস্থ্য বল, সকলই শ্যাম তরু রাজি শোভিত,

বিস্তৃত-শস্যক্ষেত্র-পরিবৃত পল্লীগ্রামের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। তখন সহরের নাম শুনিলে লোকে ভয় পাইত; সহরে আসিয়া বাস করা দূরে থাকুক, নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে কেহ সহরে দুই চারি দিনের জন্যও আসিতে চাহিত না। সহর তখন লোকের কর্ম্মস্থলই ছিল এবং "প্রবাস" বলিয়া পরিগণিত হইত। লোকে যখনই কর্ম্মজীবনে অবকাশ পাইত, তখনই "দেশে" যাইয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিত। সহরের নানা মোহকর আকর্ষণ শান্তিসুখময় পল্লী-জীবনের সহিত তাহাদিগের বিচ্ছেদ সংঘটন করিতে পারিত না। পূজা, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সামাজিক জীবনের যাহা কিছু ক্রিয়া-কর্ম্ম সে সকলই পল্লীগ্রামে সম্পাদিত হইত। লোকে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পল্লীগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিত এবং তাহাদের জীবনের অবশিষ্টাংশ আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদিগের সহবাসে পরম-সুখে অতিবাহিত হইত।

এখন অনেকস্থলেই ঠিক ইহার বিপরীত ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এখন যাহারা সঙ্গতিপন্ন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সহরে স্থায়ী-ভাবে বাস করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। যাহারা সহরে বড় চাকরি করেন, তাঁহারা স্ত্রীপুত্র লইয়া কর্ম্মস্থলে বাস করেন এবং অকর্ম্মণ্য জ্ঞাতি-ভ্রাতা অথবা দুই একজন বিধবাকে কিঞ্চিৎ মাসহরা দিয়া তাঁহাদিগের পৈতৃক ভিটাতে নিত্য সন্ধ্যা দিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। অধিকাংশ জমীদারেরা বৎসরের অধিকাংশ সময়ই সহরে বাস করেন, পালপার্ব্বণে দয়া করিয়া দুই দশ দিনের জন্য প্রজাগণকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়া থাকেন। গৃহস্থ লোকের মধ্যেও অনেকেই দেশের বাস একরূপ উঠাইয়া সহরবাসী হইয়াছেন। দেশে থাকিবার মধ্যে ভদ্রবংশের অসহায়া বিধবা, কৃষকগণ এবং সহরে আসিয়া যাহাদের জীবিকা-উপার্জ্জনের কোন উপায় নাই, তাহারাই, কোনরূপে তথায় থাকিয়া দুঃখে কষ্টে দিন যাপন করিতেছে।"

পল্লী-স্বাস্থ্যের প্রতি পৃষ্ঠায় স্বধর্ম্মনিষ্ঠা ও স্বজাতি বাৎসল্যের আদর্শ দৃষ্টান্তের সহিত স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন লাভের উপদেশ সকল পাঠ করিয়া বস্তুতই আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

জন্মভূমি

২৬শ বর্ষ। | ১৩২৭ সাল, ভাদ্র। | ৫ম, সংখ্যা।

দার্শনিক-তত্ত্ব।

লেখক—শ্রীআদ্যনাথ কাব্যতীর্থ।

ভারতীয় দার্শনিকগণ যদিও ঈশ্বর-নিরূপণ-বিষয়ে সম্যক্ কৃতকার্য্য হন নাই, তথাপি তাঁহাদিগের দূর-প্রসারিণী গভীর চিন্তার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। দেখা যায়, পাশ্চাত্য দার্শনিকেরাও ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্র-প্রণেতাদিগের কোন না কোন ব্যক্তির মতানুসরণ করিয়াছেন। গভীর গবেষণার ফলে দার্শনিকগণ জানিতে পারিলেন যে, এই জগৎ যখন আদৌ সৃষ্ট নহে, তখন ইহার সৃষ্টিকর্ত্তারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারের কোনই আবশ্যক করে না। দ্বিতীয়তঃ, যে সমস্ত প্রমাণ-বলে ঈশ্বর নিরূপণ করা যায়, তাহার মধ্যে প্রত্যক্ষ ও অনুমানই প্রধান। অনুমানও প্রত্যক্ষজাত, সুতরাং প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-বলে যদি ঈশ্বর নিরূপণ করা না যায়, তবে প্রত্যক্ষ-জাত অনুমান প্রমাণ বলেই বা কিরূপে ঈশ্বর নিরূপণ করা যাইবে? এই জন্যই সাংখ্যদর্শনকার স্পষ্টই বলিলেন যে, "প্রমাণাভাবাৎ ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।" প্রমাণের অভাব বলিয়াই ঈশ্বর অসিদ্ধ। এই জগৎ আদৌ সৃষ্ট নহে, একথা কে বলিল? দার্শনিকেরাই বলিয়াছেন, যে স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে জগৎ দ্বিবিধ, স্থূল জগৎ ধ্বংস হইলেও সূক্ষ্ম জগৎ ধ্বংস হয় না, এই একমত। সাংখ্যকার বলিয়াছেন, আকর্ষণ ও বিক্ষেপ শক্তিশালী প্রকৃতির গর্ভে কারণ জগৎ বিলীন হয় ও বিক্ষেপ শক্তিবলে পুনরায় বিশ্বের বিকাশ হয়। ঈশ্বরকে জগৎস্রষ্টা স্বীকার করিলে, নানা দোষের আপত্তি ঘটে। প্রথমতঃ, তিনি যদি আমাদিগের মত বদ্ধ হন, তবে তাঁহার দ্বারা বিশ্ব সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব।

আর যদি মুক্ত হন, তবে মুক্ত পুরুষের সিসৃক্ষা অসম্ভব, সুতরাং ঐ দুই শ্রেণীর কোনটীর অন্তর্গত হইলে তাদৃশ ঈশ্বর হইতে বিশ্বসৃষ্টি অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, বেদান্তমতানুসারে যদি স্বীকার করা যায় যে, ব্রহ্মেরই পরিণামে এই বিশ্বের বিকাশ; ব্রহ্ম যদি নিত্য হন, তবে নিত্য হইতে উৎপন্ন বিশ্বও অবশ্যই নিত্য হইবে। আর যদি মায়া হইতে বিশ্বের বিকাশ ধরা যায়, তাহা হইলেও নিত্য বলিতে হইবে। কারণ, মায়া ঈশ্বরের শক্তি, চৈতন্য তাহাতে অণু-প্রবিষ্ট; আবার প্রলয়ে, বিশ্ব প্রকৃতিতে বা মায়াগর্ভে সুপ্ত থাকে, ইহাও বেদান্তের মত, সুতরাং বিশ্ব সৃষ্ট নহে, ইহাই প্রমাণসিদ্ধ হইতেছে। অতএব সৃষ্টিকর্ত্তারূপে ঈশ্বর স্বীকারের কোনই আবশ্যক করে না। তবে কি ঈশ্বর নাই? গীতায় দেখা যায়, "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন! তিষ্ঠতি।"

হে অর্জ্জুন! সকল প্রাণীরই হৃদয়ে ঈশ্বর বাস করেন। এই শ্লোকেও পরিচালক বা নিয়ন্তারূপে ঈশ্বর স্বীকার করা হইয়াছে সৃষ্টিকর্ত্তারূপে নহে। বেদান্ত শ্রুতি উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, "ব্রহ্মের "প্রজাসৃষ্টির জন্য আমি বহু হইব" এইরূপ ইচ্ছা হইল। প্রয়োজনাভাব বশতঃ ঐরূপ ইচ্ছা ব্রহ্মের হওয়া সম্ভবপর নহে। আর একটী মত দেখা যায়, শূন্য হইতে এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। এইটী বৌদ্ধদিগের শূন্যবাদীদিগের মত। এই মতটী নিরাকার ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি আরম্ভের তুল্য। আবির্ভাব ও তিরোভাব ব্যতীত সাংখ্যকার, বিশ্বের ধ্বংসও সৃষ্টি স্বীকার করেন না। ইহা ভিন্ন সৃষ্টি ধারা অনাদি ও অনন্ত, ইহা অনেকেই স্বীকার করেন। তাহা হইলে সৃষ্টিকর্ত্তারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারের কোনই আবশ্যক করে না। চুলোয় যাক্ এ সব কচ্‌কচি, এখন বুঝা যাউক, এই বিশ্ব-রঙ্গভূমির অন্তরালে কোন চেতন সত্তা বিদ্যমান আছে কি না? আমরা দেখিতে পাই, সকল বস্তুর ভিতর হইতেই স্ফুট বা অস্ফুটভাবে চৈতন্যের সাড়া পাওয়া যাইতেছে। নেতি নেতি অর্থাৎ ইহা নয়, উহা নয়, এইরূপ অনুসন্ধান করিতে করিতে পণ্ডিতগণ দেখিতে পাইয়াছেন যে, দেহ ইন্দ্রিয় ভিন্ন চৈতন্য স্বতন্ত্র পদার্থ। সকল বস্তু হইতেই ঐ চৈতন্যের সাড়া পাওয়া যায়। ইহা আন্দাজি কথা মাত্র নহে, প্রত্যক্ষপ্রমাণপ্রিয় বিজ্ঞানও এখন ইহা সপ্রমাণ করিতেছেন। বীজ হইতে বৃক্ষাদির উৎপত্তি, রেতঃ হইতে সন্তানোৎপত্তি, স্বেদ হইতে কৃমি কীটের জন্ম প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিলেও জীবাণুব্যাপ্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে যেন স্বতই মনে হয়, জল, স্থল, অন্তরীক্ষ বিশ্বব্যাপী অনন্ত

চৈতন্যের সত্তায় ব্যাপ্ত হইয়া আছে। বৃহি, অর্থাৎ বৃহৎ মহান্ বলিয়া তিনি ব্রহ্মপদবাচ্য। তিনি কাল, দেশ ও বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, অর্থাৎ কোনকালে বা কোন স্থানে বা কোন বস্তুতে তাঁহার অভাব ধরা যায় না। সেই বিভুর কার্য্যকরী শক্তির নামই মায়া। ঐ মায়া ত্রিগুণময়ী অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তম এই ত্রিগুণাত্মিকা। উহাই প্রকৃতি নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ গুণত্রয় হইতেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের সৃষ্টি। তাঁহারাই পৌরাণিকদিগের অবলম্বন ও প্রকৃতি, শক্তি, আদ্যাশক্তি, কালী প্রভৃতি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। পাঠক দেখিবেন, অন্যান্য জাতির ন্যায় আর্য্যেরা শক্তিরও উপাসনা করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম, প্রকৃতি বা মায়া আশ্রয় করিয়া যখন বিশ্বের স্থূলাবস্থার বিকাশ করিতে থাকেন, তখন তিনি সগুণ; নিষ্ক্রিয়াবস্থায় তিনি নির্গুণ।

মায়ার আর একটী মূর্ত্তি আছে, সেটীর নাম অবিদ্যা। ওটী কুহকিনী, উনি ইন্দ্রজালবিদ্যা-চতুরা। উঁহারই আশ্রয়ে সেই বিভু আত্মবিস্মৃত, দেহগেহে অভিমানী হইয়া অশেষ যাতনা ভোগ করেন। কৌষেয় কীট যেমন স্বীয় লালা লইতে সূত্র বিস্তার পূর্ব্বক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করে, আত্মাও সেইরূপ বাসনাকল্পিত, অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, জ্ঞানময় ও বিজ্ঞানময় পঞ্চাবরণযুক্ত দেহগেহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক একাদশ ইন্দ্রিয়ের সহিত তথায় বাস করেন; স্বয়ং স্বপ্রকাশ স্বরূপ হইয়াও বদ্ধবৎ বোধ করেন এবং বুদ্ধিতত্ত্বের লীলা নিজের বলিয়া অভিমান করেন। ইহাই আমাদিগের ঋষিদিগের মত। কেহ কেহ বলেন যে, যোগ, জ্ঞান, বা অনন্যভক্তিবলে জ্যোতিঃ বা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ও চৈতন্যস্বরূপ আত্মার সাক্ষাৎ লাভ ঘটে। নাস্তিকেরাই আস্তিক্য মতের সৃষ্টির কারণ। একটা বিরুদ্ধ মত বিদ্যমান না থাকিলে তাহার প্রতিকূল মত প্রচার হয় না। নাস্তিককে পরাজয় করিবার উদ্দেশেই আস্তিক্য দর্শনের সৃষ্টি। নাস্তিক অর্থে যিনি প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণ স্বীকার করেন না। দার্শনিক যুদ্ধে "জন্মান্তরবাদ ও ঈশ্বর" এই দুইটীই সাধারণতঃ বিবাদের কারণ। একপক্ষ বলেন, এই জগৎ আদৌ সৃষ্ট নহে, সুতরাং ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরও নাই। প্রয়োজনাভাবে প্রবৃত্তির অভাব, সুতরাং ঈশ্বর হইতে বিশ্ব সৃষ্ট হয় নাই। দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, জন্মান্তর স্বীকারের বিশিষ্ট প্রমাণ নাই, সুতরাং উহা অস্বীকার্য্য। যে ক'টা দিন বাঁচিয়া থাক, সুখে থাকিবার চেষ্টা কর, ঋণ করিয়াও ঘৃত খাইবে; ইহাই নাস্তিকদিগের অভিমত। এই পক্ষ বলেন, পঞ্চভূত তন্মাত্র প্রভৃতি

বিবিধ সংযোগে দেহে চৈতন্যশক্তি উৎপন্ন হয়—বস্তু সংযোগে মদের মাদকতা শক্তির ন্যায়। দেহের সহিত উহার উৎপত্তি ও দেহের সহিত উহার বিলয়। পাপ. পুণ্য, স্বর্গ, নরক কল্পনামাত্র। এই সাংঘাতিক মত পাশ্চাত্য জগতে প্রচার হইয়া সর্ব্বনাশ করিয়াছে। অন্ধবিশ্বাসেও যদি সমাজে শান্তি ও সুখ আনয়ন করে, সেও শ্রেয়ঃ। দেখা যাক, আস্তিক ইহার প্রতিকূলে কিরূপ সদুত্তর দেন। আস্তিকেরা বলেন, কার্য্য মাত্রেই সকর্ত্তৃক অর্থাৎ যাহা কার্য্য তাহার কর্ত্তা আছে। যেমন ঘট কার্য্য বা জন্য বলিয়া উহার কর্ত্তা আছে। নাস্তিক বলেন, তাহার শরীরী কর্ত্তা দেখা যায়, সুতরাং সকর্ত্তৃক হইতে পারে, কিন্তু বিশ্বের কোন শরীরী কর্ত্তা দেখা যায় না, সুতরাং তাহা কর্ত্তৃজন্য স্বীকার করিব কেন? আস্তিক বলেন, বেশ কথা, কর্ত্তা স্বীকার না কর, ক্ষতি নাই, কিন্তু কার্য্যের কারণ মান কি না? তাহা না মান, অকারণ কার্য্যোৎপত্তি দোষ দুর্নিবার হইবে। যদি বল, কার্য্যের প্রতি কারণ নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী সুতরাং তাহা মানি। বাস্, সব গোল চুকিয়া গেল, সেই কারণই আমার ঈশ্বর পদাভিষিক্ত। নামভেদে বিশেষ আপত্য কি? সর্ব্বকারণ কারণই আমার অভিপ্রেত বিশ্বনিয়ন্তা ঈশ্বর। নাস্তিক বলেন, সেই কারণ যে চৈতন্যস্বরূপ, তাহার প্রমাণ কি? আস্তিক বলেন, কারণে চৈতন্য সত্ত্বা বিদ্যমান না থাকিলে, কার্য্যে জীবাদিতে চৈতন্য কোথা হইতে আসিল? তুমি বলিবে, উহা শক্তি বিশেষ। তাহা হইলে বাল্যদেহজাত চৈতন্যশক্তি, যৌবনদেহে কিরূপে সংক্রমিত হইতে পারে? দেহ প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল বিধায় প্রতিক্ষণে মরিতেছে। বাসনা বা সংস্কারের সংক্রমণ অর্থাৎ এক দেহ হইতে অন্য দেহে গমন স্বীকার করিলে, জননীর যাবতীয় সংস্কার পুত্রে সংক্রমিত হওয়া উচিত। প্রকৃত পক্ষে তাহা হয় না, সুতরাং শক্তি সংক্রমণও স্বীকার করা যায় না।

ইহা ভিন্ন শক্তির প্রাগ্‌ভাব ধ্বস প্রভৃতি অনন্ত গৌরব কল্পনা করা অপেক্ষা লাঘবতঃ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা স্বীকার করাই কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় আপত্তি, জন্মান্তর স্বীকারের বিশেষ যুক্তি ও প্রমাণ নাই। আস্তিক বলেন, মনুষ্য-জগতে বিবিধ অসামঞ্জস্যের মীমাংসা জন্মান্তর স্বীকার ও প্রাক্তনকর্ম্ম স্বীকার ব্যতীত কিরূপে হইবে; নাস্তিক বলেন, পিতা মাতার শরীর ও মনের বৈচিত্র্য, শিক্ষা, সংসর্গ, কাল, দেশ, অবস্থা প্রভৃতি ব্যক্তিগত পার্থক্যের কারণ হইতে পারে, তাহার জন্য জন্মান্তর প্রয়োজন কি? আস্তিক বলেন,

একই সময়ে একই পিতা-মাতা সত্ত্বেও যমজ সন্তানের পার্থক্যের হেতু কি? দ্বিতীয় কথা এই যে, কর্ম্মমাত্রেরই ফল-জনকতা আছে। কোন ব্যক্তির যাবতীয় কর্ম্মফল শেষ হইতে না হইতে যদি তার মৃত্যু হয়, তবে তার অবশিষ্ট কর্ম্মফল কোথায় হইবে, না আর ভোগ হইবে না? যদি বল, কর্ম্মফল ভোগ হইবে, তবে বলিতে হইবে, অন্য কোনস্থান বা অবস্থা মৃত্যুর পর ঘটিয়া থাকে। আর যদি বল, বক্রী কর্ম্মের ফল আর ভোগ করিতে হইবে না, তাহা হইলে মৃত্যুই মুক্তি বলিতে হইবে। তাহা হইলে তোমার মতে প্রলয়ের পরই মুক্তি। নাস্তিক বলেন, যদি কর্ম্মফলই জীবের নিয়ামক হয়, তবে ঈশ্বর মানিবার আবশ্যক কি? আস্তিক বলেন, অস্ত্রে ধার থাকিলেও যেমন কর্ত্তা নিরপেক্ষ হইয়া ছেদ ভেদ করিতে পারে না, সেইরূপ চেতনের সহায়তা ব্যতীত কখনই কর্ম্ম ফল প্রদর্শন করিতে পারে না। অতএব জীবদেহে সংস্কারবান আত্মা বা চেতনা আছে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সেই চৈতন্যই ঈশ্বর। "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন! তিষ্ঠতি" ইত্যাদি। লৌকিক দৃষ্টান্তেও দেখা যায়, রেল, ইঞ্জিন, কল্ কব্জা উষ্ণবাষ্পযুক্ত হইয়াও চালকের অভাব হইলে চলিতে পারে না, সেইরূপ সমগ্র সামগ্রীসম্পন্ন হইলেও চেতনাবিহীন দেহ অচেতনের ন্যায় ক্রিয়াহীন। অতএব মনরাজ্যেরও পরবর্ত্তী এমন কোন অজ্ঞাত চৈতন্য জীবদেহে আছে, যাহার প্রেরণায় ইন্দ্রিয়গ্রাম বিষয়রাজ্যে বিচরণ করিতে সমর্থ ইহা অবশ্যই বলিতে পারা যায়। বিশেষতঃ বৈদান্তিক দেখাইয়াছেন, ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, দূরত্ব, সূক্ষ্মত্ব, অনুকূটত্ব, ইন্দ্রিয়াদির অপটুতা প্রভৃতি দোষে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নিশ্চিত নহে। সুতরাং প্রত্যক্ষপ্রমাণলব্ধ জ্ঞান অতি তুচ্ছ।

বৈদান্তিকের মতে বেদ ঈশ্বর প্রণীত, অপৌরুষেয়, সুতরাং বেদবাক্যই একমাত্র মুখ্য প্রমাণ। সকল দেশেই এক একখানি গ্রন্থ ঈশ্বর প্রণীত বলিয়া আদৃত হয়। ভারতেই বা তাহা না হইবে কেন?

দ্বিতীয় কথা, ইন্দ্রিয়াতীত তত্ত্বের সম্বন্ধে যিনিই যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছেন, সেটী তাঁর স্বকপোলকল্পিত মত ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? মনুষ্য যদি ভ্রান্তিদোষশূন্য না হয়, তবে কাহারও মত ঠিক নহে, ইহা স্বচ্ছন্দেই বলা যাইতে পারে। চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া যতদিন কেহ কিছু ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় দেখাইয়া দিতে না পারিবেন, ততদিন বেদবাক্যই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। যদি সে বাক্যে নির্ভর করিয়া মানব সুখ

শান্তি পায়, তবে তাহা অন্ধবিশ্বাসমূলক হইলেও সত্য নির্ণয়ের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত অবনত মস্তকে স্বীকার করা কর্ত্তব্য।

বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু।

(লেখক—শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী।)

যাঁহার যশঃ-সৌরভে আজ সমগ্র ভুবন মুখরিত—অসামান্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কারে যিনি ভারতের অন্ধকারাচ্ছন্ন মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, সেই মহাপুরুষের জীবন-কথা ও অলৌকিক কার্য্য-পরম্পরা শুনিতে কাহার না অভিলাষ হয়? কে সেই সুসন্তানের অশ্রুতপূর্ব্ব জীবন-কথা শুনিয়া হৃদয়ে বিপুল আনন্দ উপভোগ না করিবেন?

বঙ্গের মোগল রাজধানী ঢাকা নগরীর অন্তর্গত বিক্রমপুর নামক পল্লীগ্রামে জগদীশচন্দ্র এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ভগবান চন্দ্র বসু মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি শিক্ষিত পিতার যত্নের ত্রুটি ছিল না। জগদীশচন্দ্র মহাত্মা নিউটনের ন্যায় শৈশবকাল হইতেই নূতন নূতন তত্ত্ব অবগত হইবার অভিপ্রায়ে পিতাকে ব্যতিব্যস্ত করিতেন। সুশিক্ষিত পিতাও পুত্রের অনুসন্ধিৎসা বৃত্তি চরিতার্থ করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। জগদীশচন্দ্র বাল্যে উপনীত হইলে ভগবান বাবু তাঁহাকে গ্রাম্য পাঠশালায় প্রেরণ করেন। সেখানে দরিদ্র পল্লীবালকদের সহিত জগদীশচন্দ্রের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয়। জগদীশচন্দ্র এই পাঠশালার শিক্ষা সম্বন্ধে স্বয়ং লিখিয়াছেন—"যাহারা জমি চাষ করিয়া শস্য উৎপাদন করে, যাহারা দুর্ব্বিষহ শীতে হিমানী শীতল জলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া মৎস্য ধরে এবং যাহারা বন-জাত ফল-মূল বিক্রয়লব্ধ অর্থে দিনপাত করে, সেই সমস্ত নিরক্ষর পল্লীবাসীর সুকুমার সন্তানদিগের সহিত পাঠশালায় একত্রে অধ্যয়ন করিবার সময় আমি প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে পারিয়াছিলাম—স্বভাবের প্রতি আমার চিত্ত স্বতঃই আকৃষ্ট হইয়াছিল। বস্তুতঃ আমি যদি শৈশব ও বাল্যে এই সমস্ত স্বভাবমুগ্ধ পল্লীবালকের সংসর্গ লাভ না করিতাম, তাহা হইলে আমার উত্তর জীবনে স্বভাবের সৌন্দর্য্যে ও রহস্যে আমি এতটা আকৃষ্ট হইতাম কি না সন্দেহ।"

উপযুক্ত পিতার ঐকান্তিক চেষ্টায় জগদীশচন্দ্র ক্রমে ক্রমে সমস্ত পরীক্ষায় কৃতীত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে কলিকাতা সেণ্টজেভিয়ার কলেজ হইতে বি-এ পাশ করেন। বি-এ পাশ করিবার পর জগদীশচন্দ্র ইংলণ্ডে যাইয়া সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষা দিবার জন্য কৃতসংকল্প হন। পুত্রের উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিষয় সূক্ষ্মদর্শী ভগবান বাবু শৈশবাবধি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন, তিনি জগদীশচন্দ্রকে তৎক্ষণাৎ ইংলণ্ডে যাইবার অনুমতি দিলেন বটে, কিন্তু বলিলেন, "তুমি শাসন বিভাগের জন্য প্রস্তুত না হইয়া বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হইলে অধিকতর কৃতকার্য্যতা লাভ করিবে।"

ভবিষ্যৎদর্শী পিতার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া যুবক জগদীশচন্দ্র ফেনিল সাগর অতিক্রম করিয়া সুদূর ইংলণ্ডে গমন করেন। তথায় অনন্যসাধারণ প্রতিভাবলে জগদীশচন্দ্র ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কেম্ব্রিজ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাইষ্ট্ কলেজ হইতে বি-এ ও পরবর্ত্তী বৎসর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি এস্ সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পাশ্চাত্য-বিদ্যায় বিভূষিত হইয়া জগদীশচন্দ্র কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কে জানিত একদিন যে অজ্ঞাত যুবক পাশ্চাত্য খণ্ডে বিদ্যালাভ করিয়া নিতান্ত অপরিচিতের ন্যায় দেশে ফিরিয়াছিলেন, আজ তিনি নূতন নূতন মৌলিক গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বর্ত্তিকা লইয়া সেই দেশেই পুনর্ব্বার বিজ্ঞানালোক প্রচার করিতে যাইবেন?

কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জগদীশচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্থ বিদ্যার (Physics) অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে কোন Laboratory ছিল না, কাজেই ডাঃ বসুকে তাঁহার আপন ক্ষুদ্র Laboratoryতে কার্য্য করিতে হইত। জগতে বিজ্ঞানবিদ্ মাত্রেই ধৈর্য্যশীল। এই ধৈর্য্যশীলতা জগদীশচন্দ্রেও পূর্ণমাত্রায় ছিল। তিনি ধৈর্য্য-সহকারে সেই ক্ষুদ্র Laboratoryতে কার্য্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে দশ বৎসর অতীত হইলে তাঁহাকে একটী Laboratory স্থাপনের জন্য কিঞ্চিৎ সাহায্য করা হয়।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে Asiatic Society Journalএ জগদীশচন্দ্র The Polarisation of Electric Ray by a crystal' নামক একটি সন্দর্ভ লেখেন। তাহার পর Electrician নামক মাসিক পত্রে ইলেক্‌ট্রিসিটী সম্বন্ধে ঐ বৎসরই তাঁহার দুইটী মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বিলাতের বৈজ্ঞানিক মণ্ডলী এই তিনটী প্রবন্ধ পড়িয়া তাঁহার বিজ্ঞানবত্তায় অত্যন্ত আকৃষ্ট হন।

ডাঃ বসুও সাতিশয় উৎসাহিত হইয়া Determination of the Indices of Electric Refraction নামক আর একটি বৈজ্ঞানিক তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন। বিলাতের রয়াল সোসাইটী সেই প্রবন্ধটী আপন পত্রে প্রকাশিত করিয়া লেখকের গৌরব বৃদ্ধি করেন। সে সময়ে রয়াল সোসাইটীর পত্রে কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়া অসাধারণ সম্মান ও গৌরবের বিষয় ছিল। উক্ত সোসাইটী যে কেবল ডাঃ বসুর প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াই নিরস্ত হইলেন তাহা নহে, তাঁহারা ডাঃ বসুকে তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাহায্যকল্পে কিছু অর্থদানও করিলেন। রয়াল সোসাইটীর দেখা দেখি বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টও আর চুপ করিয়া থাকা সঙ্গত মনে করিলেন না, তাঁহারাও ডাঃ বসুকে অর্থ সাহায্য করিয়া তাঁহার উদীয়মানা প্রতিভার উৎসাহ বর্দ্ধন করিলেন।

ডাঃ বসু তদবধি বিজ্ঞান-জগতে ধীরতার সহিত নীরবে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। তিনি কাহারও নিকট কিছু পুরস্কার প্রার্থনা করেন নাই। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ডাঃ বসুর বিজ্ঞান-জ্ঞানে বিমুগ্ধ হইয়া লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয় তাঁহাকে Doctor of Science উপাধি প্রদান করেন।

ইহার পর বিনা তারে টেলিগ্রাফ আবিষ্কারের প্রতি ডাঃ বসুর মন আকৃষ্ট হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই সময়ে বলোগ্না বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মারকণি এবং আমেরিকার আর একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকও এই সময়ে ঐ একই বিষয়ে গবেষণা করিতেছিলেন। ডাঃ বসু ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা টাউনহলে রাজ-প্রতিনিধির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সহস্র সহস্র দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে বিনা তারে সংবাদ আদান প্রদানের প্রক্রিয়া সর্ব্বপ্রথম প্রদর্শন করেন। তখন সমগ্র সভ্য জগতের দৃষ্টি ডাঃ জগদীশচন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র প্রথমবার বিলাতের রয়াল সোসাইটীর শুক্রবার সান্ধ্য বক্তৃতায় আহুত হন—(Friday evening discourse)। তাহার চারি বৎসর কাল পরে জগদীশচন্দ্র পুনরায় রয়াল সোসাইটি কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হন। ১৯১৫ সালে ডাঃ বসু তৃতীয়বার বক্তৃতা করিতে নিমন্ত্রিত হইয়া অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে পাশ্চাত্যখণ্ড বিমোহিত করেন। তাঁহার সম্বন্ধে বিলাতের একখানি প্রসিদ্ধ পত্র লিখিয়াছিল ;—

The great honour of delivering a Friday evening discourse before the Royal Institution of Great Britain has again been offered to Dr. J. C. Bose. The subject of Dr. Bose's

discourse will be his recent Psycho-Physological research, which opening out a new line of research has created much interest in the scientific world. Proffessor Bose has also been invited to deliver a course of lectures before the University of Oxford. That this is the third time that Proffessor Bose has been invited to lecture at the Royal Institution is a very rare distinction indeed. To this may be added he has been invited by the Cambridge University too, to deliver a course of lectures. If time permits he will fulfil his engagements to lecture before some learned Societies in France and Germany, but it will not be possible perhaps, to include America in his forth comming tour.

অর্থাৎ গ্রেট্ ব্রিটেনের রয়াল ইন্‌ষ্টিটিউসনের শুক্রবার সান্ধ্য বক্তৃতার সম্মান পুনরায় ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতি অর্পণ করা হইয়াছে। ডাঃ বসু অক্সফোর্ড, ক্যাম্ব্রিজ, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী প্রভৃতি স্থানেও বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। যদি সময়ে কুলায়, তাহা হইলে তিনি আমেরিকাও যাইতে পারেন।

কি অদ্ভুত বিশ্ববিজয়ী বীর! শুনিয়া বাঙ্গালীর হৃদয় কি শ্লাঘায় পরিপূর্ণ হয় না? এরূপ অযাচিত, অপরিমেয় সম্মান এক ডাঃ বসু ভিন্ন এই বিংশ শতাব্দীতে অন্য কাহারও ভাগ্যে জুটে নাই।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে ডাঃ বসু বঙ্গের তদানীন্তন ছোট লাট স্যার জন উড্‌বর্ণ ও ভারত-গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্যারিসের বিজ্ঞান মহাসমিতিতে ভারতের প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হন। সেখানকার সমগ্র প্রতিনিধিবর্গ একবাক্যে বলেন যে, ডাঃ বসু ভারত গবর্ণমেণ্টের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, যোগ্য ব্যক্তির প্রতি যোগ্য কার্য্যের ভারার্পণ করা হইয়াছে। প্যারিস হইতে ডাঃ বসু অক্সফোর্ড, অক্সফোর্ড হইতে ক্যাম্ব্রিজ এবং ক্যাম্ব্রিজ হইতে আমেরিকায় গমন করেন এবং ইহাদের প্রত্যেক স্থানে অসংখ্য শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে বক্তৃতা করেন।

"A prophet is seldom resepcted in his country. অর্থাৎ "গেয়ে যোগী ভিক্ষে পায় না"—ইহা একটি অকাট্য প্রবচন হইলেও ডাক্তার বসুর বেলায় এ প্রবাদ-বাক্য রক্ষিত হয় নাই। ভারতবর্ষে তিনি যত

সম্মান ও সমাদর লাভ করিয়াছেন, বোধ হয় জীবদ্দশায় কোন বৈজ্ঞানিকের ভাগ্যে তত সম্মান লাভ ঘটে নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে Doctor of Science উপাধি ভূষণে ভূষিত করিয়া প্রকৃত গুণগ্রাহীতার পরিচয় দিয়াছেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ও ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে তিনটী বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করিয়া তাঁহার যথেষ্ট গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ডাঃ বসুকে তাঁহার তিনটী বক্তৃতার পারিশ্রমিক স্বরূপ ১২০০ শত টাকা দিয়াছিলেন, ডাঃ বসু তাহা ধন্যবাদের সহিত প্রত্যাহার করিয়া বলেন যে,—"এই বার শত টাকা কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ছাত্রকে (Research scholar) মাসিক এক শত টাকা হিসাবে দেওয়া হউক।" কিন্তু যাউক এ সব কথা; ডাঃ জগদীশচন্দ্র যে জন্য জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন, তাহার আলোচনা করা যাউক। ডাঃ বসুর নাম বিনা তারে টেলিগ্রাফ আবিষ্কারের জন্য এত বিখ্যাত হয় নাই, জীবদেহে ও উদ্ভিদ দেহে যে একই চেতনা-শক্তি আছে এই অজ্ঞাত তথ্য আবিষ্কার করার জন্যই ডাঃ বসু আজ বিজ্ঞান-জগতে এত উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। মানুষের ন্যায় উদ্ভিদ-দেহেও যে দয়া, মায়া, স্নেহ, ভক্তি, ভালবাসা নিহিত আছে—মানুষের ন্যায় উদ্ভিদ ও যে সুখে নৃত্য করে এবং শোকে অশ্রু বিসর্জ্জন করে এ তত্ত্ব ডাঃ বসুই আবিষ্কার করিয়া জগতে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। শুধু ইহাই নহে, উদ্ভিদেরা রাত্রি দ্বাদশ ঘটিকার সময় নিদ্রা যায় এবং সকালে ৮ ঘটিকার সময় জাগরিত হয়, এ তত্ত্ব তিনিই উদ্ঘাটন করিয়াছেন। উদ্ভিদ্‌গণ মৃত্যুকালে কিরূপ দুর্ব্বিষহ যাতনায় ছট্‌ফট্ করে, ডাঃ বসু তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন।

পাঠকগণ হয় ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, ডাঃ বসুর এই সমস্ত আবিষ্কার অতি উত্তম সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতে জগতের কি আর্থিক উপকার সাধিত হইয়াছে? ডাঃ বসুর এই আবিষ্কারের দ্বারা কি ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধা এবং পীড়িতের অশ্রু বিমোচিত হইবে? অধ্যাপক ফ্যারাডে এ কথার সমার্থ উত্তর দিয়াছেন। একদা বৈজ্ঞানিকবর অধ্যাপক ফ্যারাডে বক্তৃতা করিতেছিলেন, সেই সময় জনৈক দর্শক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, বলিতে পারেন, আপনার এই সমস্ত আবিষ্কারের ফল কি?" তাহা শুনিয়া ফ্যারাডে সেই দর্শককে বলিলেন,—"আপনি বলিতে পারেন, আপনার সদ্যজাত শিশু পুত্রটীতে কি প্রয়োজন?"

বাস্তবিকই জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারকে এখন লোকে যতটা তাচ্ছিল্যের ভাবে দেখুক না কেন, কে বলিতে পারে যে, ইহা দ্বারা ভবিষ্যতে জগতের কোন উপকার হইবে কি না? উদ্ভিদ্-জীবনী সম্বন্ধে তিনি যে তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা ভবিষ্যতে কৃষিবিদ্যার যে উৎকর্ষ সাধন করিবে না, তাহা কে বলিতে পারে? আর চৈতন্যময় মানব হইতে নিস্পন্দ উদ্ভিদের পর্য্যন্ত জীবনী-শক্তি আছে, এই যে তত্ত্ব তিনি উদ্ঘাটন করিয়াছেন, ইহা দ্বারা ভবিষ্যতে "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" বাদের উৎপত্তি হইবে কি না তাহাই বা কে বলিতে পারে? হয় ত মানব, বৃক্ষ, লতা, তৃণ, গুল্ম, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতিতে একই চৈতন্যের সত্ত্বা উপলব্ধি করিয়া জীবহত্যা ও উদ্ভিদ্ ধ্বংস হইতে নিবৃত্ত হইবে।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ডাঃ বসুর Plant response নামক পুস্তক প্রকাশিত হয় এবং ১৯০৭ সালে তাঁহার Electro-physiology নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়। সেই পুস্তক দুইখানি সম্বন্ধে Nature বলিয়াছেন—

"A biologically equipped reader will experience dozzled admiration for the logical progressive way in which the author builds up, not in words, but actually on a complete functioning plant from three simple conceptions."

"In fact the whole book abounds in interesting matter skilfully woven together and would be recommended as of great value, if it did not continually arouse our incredullty.""

দুঃখের বিষয়, ভারত গবর্ণমেণ্ট যথাসময়ে এই প্রতিভাবান্ মহাপুরুষকে চিনিতে পারেন নাই। রয়াল সোসাইটীকে জগদীশচন্দ্রের সমাদর করিতে দেখিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট আর তুষ্ণীম্ভাবে থাকা কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করিলেন না। তখন একে একে জগদীশচন্দ্রের প্রতি সম্মান-পুষ্প বর্ষিত হইতে লাগিল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে প্যারিসে বিজ্ঞান মহাসমিতিতে ভারতের প্রতিনিধি-রূপে প্রেরণ করা হইল। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে C. I. E. উপাধি দেওয়া হইল। ১৯১১ সালে দিল্লীর দরবার উপলক্ষে তাঁহাকে C. S. I. ও ১৯১৭ সালে তাঁহাকে "স্যার" উপাধি প্রদত্ত হয়। তিনি স্যার উপাধি প্রাপ্ত হইলে তাঁহার গুণমুগ্ধ ছাত্রগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য একটি বিরাট সভার অধিবেশন করেন। ডাঃ পি, সি, রায় সেই সভায় সভাপতির পদ অলঙ্কৃত

করেন। তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে ডাঃ বসুর গুণাবলী কীর্ত্তন করিতে করিতে বলেন,—"Prof. Bose must not be looked upon as a mere discoverer of Scientific truth, but as a Yuga-Pravartak, i. e. as only who has brought out a new epoch in scientific thought and methods and synthesis. If he had gone on with his electrical researches in the course of which he ably succeeded in sending wireless messages, before Marcony had done so, and if he had taken out patents for the apparatus and instruments which he had invented, he could have made millions by their sale."

অর্থাৎ ডাঃ বসুকে কেবল একজন বৈজ্ঞানিক হিসাবে দেখা উচিত নয়, তিনি একজন যুগপ্রবর্ত্তক। তিনি যে সমস্ত যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, যদি সেই সমস্ত পেটেণ্ট করিয়া বিক্রয় করিতেন, তাহা হইলে তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতে পরিতেন।

১৯১৮ সালের প্রারম্ভে আমাদের বর্ত্তমান রাজপ্রতিনিধি লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড লর্ড কারমাইকেলের সমভিব্যাহারে তাঁহার Laboratory দর্শন করেন। তাঁহারা ডাঃ বসুর নূতন আবিষ্কার সমূহ দর্শনে এতদূর প্রীত হইয়াছিলেন যে, গুরুতর রাজকার্য্যের কথা ভুলিয়া তাঁহারা তথায় পূর্ণ দুই ঘণ্টাকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

ডাঃ জগদীশচন্দ্র Bose research Institute নামে যে বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা চিরকাল তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিবে। ১৯১৬ সালে নভেম্বর মাসে ডাঃ বসুর Research Institute খোলা হয়। সেই উপলক্ষে তিনি যে মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার গভীর দেশহিতৈষিণার পরিচায়ক।

১৯১১ সালে ডাঃ বসু ময়মনসিংহে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিবার জন্য আহুত হইয়াছিলেন। সেই সভায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বঙ্গভাষা জ্ঞানের বিশিষ্ট পরিচয় দিতেছে। বস্তুতঃ পাশ্চাত্য গ্রন্থ সমুদ্রে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া তিনি যে বাঙ্গালা সাহিত্যেরও সন্ধান রাখেন, তাহার পরিচয় ময়মনসিংহে পাওয়া গিয়াছিল। সেই সভায় তিনি বলিয়াছিলেন,—"কবি ও বৈজ্ঞানিকে কোন প্রভেদ নাই। কবি ও

বৈজ্ঞানিক উভয়েই জগত-রহস্যের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। কবি কাল্পনিক রথে চড়িয়া কাল্পনিক ভাষায় সন্দিগ্ধভাবে রহস্যদ্বার উদ্ঘাটনের চেষ্টা করিতেছেন, আর বৈজ্ঞানিক বাস্তবের দ্বারা এই দুর্জ্ঞেয় রহস্য প্রকাশ করিতেছেন।"

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ডাঃ বসু পাবলিক্ সার্ভিস কমিশনের নিকট সাক্ষ্য প্রদান-কালে যেরূপ স্পষ্টবাদীতা ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছিলেন, সেরূপ নির্ভীকতা সরকারী উপাধিধারীগণের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। তিনি বলিয়াছিলেন—

Regarding the question of limitation that exist in employment of Indians in the higher service, I should like to give expression to an injustice which is very keenly felt. It is unfortunate that Indian graduates of European Universities who have distinguished themselves in a remarkable manner, do not for one reason or other find facilities for entering the higher educational service.

As teachers and workers it is an incontestable fact that Indian officers have distinguished themselves very highly, and anything which discriminates between Europeans and Indians in the way of pay and prospects, is most undesirable. A sense of injustice is ill calculated to bring about that harmony which is so necessary among all the members of an Educational Institution, Professors and Students alike.

অর্থাৎ দুঃখের বিষয়, ভারতীয় ছাত্রগণ যাঁহারা ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কৃতীত্বের সহিত পাশ করিয়া আসেন, তাঁহারা এদেশে আসিয়া শিক্ষা-বিভাগে উচ্চতর পদে নিযুক্ত হন না। শিক্ষক এবং অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ ইউরোপীয়দিগের সহিত প্রতিযোগীতায় কোন অংশে ন্যূন না হইলেও ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষায় তাঁহাদের বেতন নিতান্ত কম হওয়ায় গবর্ণমেণ্টের পক্ষে নিতান্ত অবিচারের কার্য্য করা হইতেছে।"

ভারতে যে সমস্ত দেশহিতৈষী সভাসমিতিতে বক্তৃতা করিয়া ও করতালি লাভ করিয়া "দেশভক্ত" আখ্যায় আখ্যায়িত হইয়াছেন, ডাঃ বসু সে শ্রেণীর

স্বদেশহিতৈষী নহেন। যাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যোগদান করেন, সাধারণতঃ লোকে তাঁহাদিগকেই "স্বদেশহিতৈষী" নামে অভিহিত করে। ডাঃ বসু এ শ্রেণীরও স্বদেশহিতৈষী নহেন। তিনি বিজ্ঞানবলে ভারতের কালিমা ধৌত করিয়াছেন, তিনি জগতকে দেখাইয়াছেন যে, সমগ্র জগতকে অদূর ভবিষ্যতে আবার জ্ঞানবিজ্ঞানের জন্য ভারতের পদপ্রান্তে বসিতে হইবে। নালন্দা ও তক্ষশিলার অনুকরণে Research Institute স্থাপিত করিয়া এবং বিভিন্ন দেশাগত বিদ্যার্থীগণকে বিজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট করিয়া ডাঃ বসু দেশের যে কি প্রভূত উপকার সাধন করিতেছেন, তাহা, ভাষায় বর্ণনার অতীত। মাদুরায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ডাঃ বসু যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে তাঁহার অন্তর্নিহিত দেশহিতৈষিণার জাজ্বল্যমান পরিচয় পাওয়া যায়।

"In travelling all over the world which I have done several times, I was struck by two great characteristics of different nations. One characteristic of certain nations is living for the future. All the modern nations are striving to win force and power from Nature. There is another class of men who live on the glory of the past. Now what is to be the future of our nation? Are we to live only in the glory of the past and die off from the face of the earth, or to show by our work, by our intellect and by our service that we are not a decedent nation? We have still a great and mighty future before us, a future that will justify our ancestry. In talking about ancestry do we ever realise that the only way in which we can do honour to our past is not to brag of what our ancestors have done but to carry out in the future something as great, if not greater than they?

\+ \+ \+

ইহার ভাবার্থ এই—সমগ্র জগতে ভ্রমণ করিয়া আমি ভিন্ন ভিন্ন জাতির দুইটী বিশেষত্বের পরিচয় দেখিয়া অভিভূত হইয়াছি। কোন কোন জাতি ভবিষ্যতের জন্য জীবনধারণ করিতেছে। সমগ্র আধুনিক সভ্য জাতি প্রকৃতি

হইতে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য চেষ্টা করিতেছে। আবার একপ্রকার জাতি আছে, তাহারা অতীত গৌরবের উপর নির্ভর করিয়া জীবনধারণ করিতেছে। এখন বলুন দেখি, আমাদের জাতীয় জীবনের ভবিষ্যৎ কি? আমরা কি কেবল আমাদের অতীত গৌরব স্মরণ করিয়া জীবনধারণ করিব এবং ধীরে ধীরে জগতের নিকট হইতে অপসারিত হইব? না, আমরা জগতকে দেখাইব যে, আমরা আমাদের মহিমান্বিত পূর্ব্ব-পুরুষগণের উপযুক্ত বংশধর এবং আমরা আমাদের কার্য্যের দ্বারা জগতকে দেখাইব যে, আমরা ধ্বংসোন্মুখ জাতি নহি। আমাদের ভবিষ্যতে অনন্ত ভবিষ্যৎ রহিয়াছে। আমাদিগকে শুধু আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলে চলিবে না, পরন্তু আমাদিগকে তাঁহাদের অপেক্ষা আরও মহত্তর কার্য্য করিতে হইবে।

× × ×

যোগ্য ব্যক্তির যোগ্য কথা। জগদীশচন্দ্র বৃথা হৈ চৈ না করিয়া নীরব সাধনা দ্বারা তাঁহার বাক্যের যাথার্থ্য রক্ষা করিতেছেন। তিনি দীর্ঘজীবী হউন, তাঁহার সাধনা সিদ্ধ হউক—জগতের সম্মুখে ভারতের মহিমা ঘোষিত হউক, ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে ইহাই প্রার্থনা।

কামনা।

(লেখক,—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ সরস্বতী।)

গীত।

সিন্ধু খাম্বাজ—ভরতরঙ্গ।

এমন দিন কি হবে মা কালী করালি।
মোটর-গাড়ী চ'ড়ে আমি যাব বর্দ্ধমান কি বালি।
কর্‌বো বসত চৌরঙ্গীতে, ঘির্‌বে অসৎ সব সঙ্গীতে,
রইবো ডুবে প্রেম-সঙ্গীতে, নাচ্‌বো দিয়ে তরতালি।
আহার হবে রাজার ভোগ, বাহার হবে রাজার রোগ,
আস্তাবলে ডাক্‌বে মোরগ, কোঁকোর কোঁ ডাক শুন্‌বো খালি।

দরে পোসাক্ আর না পোসাক্, নিত্য নূতন পর্‌বো পোষাক,
থাক্‌বো না আর বদন বসাক, কাপড় জামায় কেবল তালী,
ঘরে ঢালা মোহর গিনি, খেল্‌বো টাকার ছিনিমিনি,
আমার হবে দুধে চিনি, অন্য লোকের শাকে বালি।
নিত্য হবে সাহেব-ভোজন, উড়্‌বে বোতল ডজন ডজন,
সাহেব ভজন সাহেব পূজন, ভক্ষ্য সাহেব গালাগালি!
দেখে আমার অর্থ-পুষ্টি, ভাতের তরে একটি মুষ্টি,
আস্‌বে স্বজন সাতটি গুষ্টি, পোড়্‌বে পায়ে শালাশালী।
বিধি যদি ভাগ্যে লাগান, এঁড়েদহে কিন্‌বো বাগান,
মালী দেবে নিত্য যোগান—ফুল পাতা তরকারির ডালি।
পথে যখন হ'ব বাহির, ফুক্‌রে নকীব কর্‌বে জাহির,
সঙ্গী হবে এ বাদশাহীর, মো-সাহেবগণ আর আরদালি।
এই দুনিয়া বেজায় ফক্কা, যখন আমি পাব অক্কা,
বাজে যেন ঢোল আর ঢক্কা—ছকুম দিয়ে যাচ্ছি আলি।
সাজিয়ে আমায় ফুলের মালায়, নিয়ে যাবে সে নিমতলায়,
সেথা যেন ফটো তোলায়, এই ফ্যাসান হয়েছে হালি।
ম'রে আবার কোথায় যাব, কোথায় কোন্ রাজত্ব পাব,
এবারে যদি জন্মাব—হইনে যেন আর বাঙালী।

আবাহন।

(লেখক—ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-বি।)

কতদিন তুমি আসিয়াছ প্রভো
আমার গৃহের দ্বারে,
বক্ষ কবাটে হানিয়াছ কত
তোমার মঙ্গল করে।
সুখে আত্মহারা মদিরা বিলাসে
নিদ্রিত ছিলাম গভীর আলসে
ছিল না চেতনা আপনার বশে
শুভ কে নির্ণয় করে?

বিভ্রম-বিলাসে ডুবেছিনু তাই
তোমায় দেখিনি ফিরে।

কতদিন তুমি ডাকিয়াছ মোরে
বজ্র গভীর মন্দ্রে,
মায়ামন্দ্রধ্বনি পশিয়াছে শুধু
আমার কর্ণরন্ধ্রে।
বিলাস-বিভ্রম পলকে আলোড়ি
শরীর আমার উঠেছে শিহরি,
অলীক স্বপন তাহে মনে করি
ডুবিয়াছি পুনঃ তন্দ্রে।
আসক্তি আমার ছুটিয়াছে পুন
বিলাস-বিভ্রম কেন্দ্রে।

তখন তোমারে চাহি নাই আমি
দিয়েছি দুহাতে ঠেলে,
ফিরিয়া গিয়াছ বিষাদিত প্রাণে
আদর পাওনি ব'লে।
তখন বুঝিনি হৃদয় আমার
তোমা তরে হবে পিয়াসে কাতর,
অমনি আমায় পেয়ে অবসর
দলিবে চরণতলে।
প্রতিশোধ নেবে পিষিয়া আমায়
তোমার পেষণ-কলে।

দীন হীন আজি দাঁড়ায়েছি আমি
তোমার আঙ্গিনা-তলে,
ডেকে লও মোরে মধুমাখা স্বরে
তোমার চরণতলে।

তোমার করুণ মঙ্গল করে
শুভাশীষ বর্ষ অভাগার শিরে
আঘ্রাণে চুম্বনে যোগ সিদ্ধ করে
তুলে লও মোরে কোলে।
আসিয়াছি আজি চরণে তোমার
শান্তি পাইব ব'লে।

অর্থের ব্যর্থতা।

(ক্ষুদ্র গল্প।)

লেখক,—শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী বি-এ।

(১)

তখন বেলা প্রায় পাঁচটা। ভূপতির চা খাইবার সময়। সে অলস-পদ-বিক্ষেপে নিজের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, পালঙ্কের একপ্রান্তে বসিয়া পড়িল। পত্নী কমলিনী রান্নাঘরের দাওয়া হইতে স্বামীকে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া ক্ষিপ্রতার সহিত উনানে কেট্‌লীটী চড়াইয়া দিল।

চাকুরী-শীকার-ক্লান্ত ভূপতিনাথ শয্যায় বসিয়া ভাবিতে লাগিল, অদৃষ্ট কি এতই মন্দ, সামান্যমাত্র লেখা-পড়া শিখিয়া, এনট্রান্স ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়া তাহার পরিচিত কত জন সত্তর, আশী টাকার চাকুরী করিতেছে, আর সে বি-এ পর্য্যন্ত পড়িয়া ত্রিশ টাকা বেতনের বেশী পাইবার যোগ্য হইল না! পঁচিশ ত্রিশ টাকা বেতনের চাকুরী দুই একজন দিতে চাহিয়াছিল বটে, কিন্তু সে কি বিনা পয়সায় লেখা-পড়া শিখিয়াছে, তাহার বিদ্যা কি এতই সস্তা যে, যে-সে আসিয়া যে-সে মূল্যে ক্রয় করিয়া লইয়া যাইবে।

ভূপতিনাথের মুরুব্বির একান্ত অভাব। আজ-কাল নিজের লোকের জোর পরোওনা না পাইলে, কেহ দাসত্বের রাজ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় না। তবে কি ভূপতিনাথের সম্মুখে দাসত্বের রজত-মন্দিরের কপাট চিরকালই রুদ্ধ থাকিবে। শীকার কি কোন দিনই মিলিবে না! হয় ত মিলিতে পারিত, কিন্তু সিংহ ব্যাঘ্র না মিলিলেও নেহাৎ হাঁস এবং ডাউক পক্ষী শীকার করিয়া ভূপতিনাথ কখনই সন্তুষ্ট হইতে পারে না।

কমলিনী চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "হ্যাঁগা, চুপ ক'রে বসে ভাব্‌ছো কি?" ভূপতিনাথ বলিল, "ভাবছিলাম, কমলমণি এখনও চা নিয়ে এল না কেন?"

কথাটী বলিবার পর ভূপতিনাথ এমন একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, যাহার ধ্বনি বিষধর সর্প গর্জ্জন সম পতিপ্রাণা সাধ্বী কমলিনীর অন্তরে একটা শঙ্কা জাগাইয়া দিল। এরূপ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া স্ত্রীকে ব্যথিত করিবার উদ্দেশ্য তাহার আদৌ ছিল না, কিন্তু মানুষের হৃদয়টী একটী আগ্নেয় গিরির মত। ভিতরে উত্তাপ জমিলেই নিশ্বাসের বাষ্প স্বতঃই উদ্গীরিত হয়। চেষ্টা করিয়া মুখের উপর একটা নকল হাসি ফুটাইতে পারা যায়, কিন্তু এই দীর্ঘনিশ্বাসটিকে জোর করিয়া রুদ্ধ করিতে যাইলে সে আরও দীর্ঘ হইয়া পড়ে।

কমলিনী চায়ের পেয়ালাটী হাতে রাখিয়া কিছুক্ষণ ব্যথিত চিত্তে স্বামীর মুখের পানে করুণদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "চা খাও, আজ বুঝি কল্‌কাতা গিয়েছিলে?"

ভূপতি এক চুমক চা খাইয়া মাথা তুলিয়া বলিল, "কল্‌কাতা গিয়েছিলাম কেমন করে জান্‌লে?"

কমলিনী বলিল, "তা নইলে এতক্ষণ কোথায় ছিলে, সেই ত ভাত ক'টা খেয়েই বেরিয়ে গিয়েছ, নিশ্চয়ই তুমি সেই ঠিকো রোদে কল্‌কাতা গিয়েছিলে, নইলে মুখখানা অত শুকোবে কেন?"

ভূপতিনাথ আর এক চুমক চা খাইয়া বলিল, "হাঁ, গিয়েছিলাম বটে।"

কমলিনী তিরস্কারের স্বরে বলিল, "ছি! তুমি চাকরী চাকরী ক'রে পাগল হয়ে যাবে! আমাদের এখন এমন কি অভাব পড়ে গিয়েছে, যার জন্যে তোমাকে চাকরী চাকরী করে পাগলের মত ছুটে বেড়াতে হবে! কল্‌কাতা কি দুদিন পরে গেলে হতো না, এই ত মোটে চার পাঁচ দিন হলো পথ্যি করেছ! আমি কোথা তোমার শরীরের জন্যে দিন রাত ভাব্‌ছি, আর তুমি খাসা অনিয়ম ক'রে বেড়াচ্ছ! আমাকে কষ্ট দিয়ে কি তোমার সুখ হয়?"

পত্নির পতিপ্রাণতা-নিঃসৃত তিরস্কারের মাধুরিমায় ভূপতিনাথের চাকুরীর দুশ্চিন্তা মুহূর্ত্তের মধ্যে বিলুপ্ত হইল। সে চায়ের পেয়ালাটী বিছানার উপর রাখিয়া কমলিনীকে কোলের নিকট টানিয়া আনিয়া একটী গাঢ় চুম্বন করিয়া

বলিল, "আচ্ছা, আর আমি চাকরী খুঁজ্‌বো না, বাড়ী ব'সে কেবল দিন-রাত ধ'রে কমলমণির হোমডিপার্টমেণ্টে (সংসার বিভাগে) কেরাণীগিরি কর্‌বো, তা হলেই সন্তুষ্ট ত?"

কমলিনী মুখখানি ভার করিয়া বলিল, "আমি কি তোমাকে তাই বল্‌ছি, চাকরী করো, কিন্তু এত "হা চাকরী! হা চাকরী" ক'রে ছুটোছুটী কর্‌লে যে শরীর নষ্ট হয়ে যাবে, তার উপর অত মন খারাপ তোমাকে কিছুতেই কর্‌তে দেবো না। চেষ্টা কর, পাও ভালই, না পাও, এতেই আমাদের খুব চলে যাবে।"

ভূপতিনাথ হাসিয়া বলিল, "স্বয়ং কমলা যার ভাত রাধুনী, তার অভাব না হওয়াই সম্ভব, অবিশ্যি যদি ঘরে চাল থাকে।"

কমলিনী বাহ্যিক ক্রোধের সহিত অল্প হাসি মিশাইয়া বলিল, "তোমার কেবল ঐ কথা! আমাদের ভাবনা কিসের বল ত? লোকের মধ্যে তুমি, আর আমি, আর আমি আর তুমি। দুটো ছেলে-পিলে থাক্‌তো ত সে এক কথা!"

ভূপতিনাথ বলিল, "ও সর্ব্বনাশ, একটাতেই রক্ষে থাকে না, আবার দুটোর সাধ! দেখ, আর কিছুর জন্যে নয়, আমার ভারী মজা দেখ্‌তে সাধ যায়, তোমার ছেলে হইলেই ত তুমি মা হবে! তখন বোধ হয়, তুমি খুব ভারিক্কে গোছের হয়ে পড়্‌বে, নয়? সেদিনকার কমলি ছুঁড়ি যে সে দিন পর্য্যন্ত ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমিয়ে পড়্‌তো; সে আবার মা হবে! সত্যি কমল, যত ভাবছি, তত হাসি পাচ্ছে।"

কথাগুলি বলিতে বলিতে সত্যই ভূপতিনাথ হাসিয়া বিছানায় গড়াইয়া পড়িল। স্বামীর হাসির অদ্ভুত কারণ শুনিয়া কমলিনী হাসিয়া বলিল, "একি হাসির ছিড়ি! ভারী হাসির কথা ত? ছেলে হবার বুঝি বয়স হয়নি, কুসুম আমার চেয়ে তিন মাসের ছোট, সে এরই মধ্যে তিন ছেলের মা হয়ে পড়েছে।"

ভূপতিনাথ বলিল, "দেখ, তুমি যেন কুসুম টুসুমের সঙ্গে বেশী মেশামেশি করো না, কি জানি, যদি রোগটা সংক্রামকই হয়ে দাঁড়ায়!"

"যে আজ্ঞা মহাশয়, তাই হবে" বলিয়া কমলিনী উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

"আরে চটো কেন? যাও কোথা" বলিয়া ভূপতিনাথ হাত ধরিয়া কমলিনীকে বিছানায় বসাইল।

কমলিনী বলিল, "কেবল প্রেম ভক্ষণ ক'রে ত পেট ভরে না, সন্ধ্যে হয়ে এলো, সাঁজ দিয়ে রান্নার যোগাড় করিগে। তুমি না হয় ততক্ষণ বার-বাড়ীতে গিয়ে একটু হারমোনিয়ম বাজাও গে। আমি ততক্ষণ তোমার বাজনার তালে তালে ঝাঁ ক'রে কাজ-কর্ম্মগুলো সেরে নিইগে, কেমন?"

ভূপতিনাথ বলিল, "এখন বাজনা টাজনা ভাল লাগবে না।"

কমলিনী বলিল, "তবে চল, আমার কাছে ব'সে আমার রান্না দেখগে। শিখ্‌তে পার্‌লে অনেক কাজে লাগ্‌বে, ভাল রাঁধতে শিখ লে বামুনের ছেলের চাকরীর অভাব হবে না।"

তাহাই হইল। কমলিনী অদূরে একটি আসন পাতিয়া স্বামীকে কাছে বসাইয়া গল্প করিতে করিতে রন্ধন-কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিল। সেদিনকার দাম্পত্যের মস্‌লা সংযোগে আহার্য্যের আস্বাদন অপেক্ষাকৃত মধুর হইয়াছিল কি না, তাহা ভূপতিনাথ ব্যতীত অন্য কাহারও জানিবার সম্ভাবনা রহিল না।

(২)

সে আজ অনেক দিনের কথা—নিঃস্ব কিন্তু নিষ্ঠাবান বাল্যবন্ধু রামদাস বাবু যখন একদিনে ওলাউঠার অনুকম্পায় সস্ত্রীক ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, তখন হৃদয়বান শ্রীনাথবাবু দয়াপরবশ হইয়া বন্ধুপুত্র ভূপতিনাথকে নিজের বাটীতে লইয়া আসিলেন। শ্রীনাথবাবুর পুত্রমুখ-দর্শনবঞ্চিতা সহধর্ম্মিণী ভূপতিনাথকে লাভ করিয়া পুত্রের অভাব ভুলিয়া গেলেন। তখন ভূপতিনাথের বয়স মাত্র সাত বৎসর। কমলিনী তখন দুই বৎসরের শিশু।

শ্রীরামপুর ষ্টেশনের পার্শ্বে শ্রীনাথবাবুর একখানি কাপড়ের দোকান ছিল। এই দোকানের সাহায্যে তিনি স্বাচ্ছন্দ্যে সংসার নির্ব্বাহ করিয়া ভূপতিনাথের পড়াশুনা ব্যয়ভার বহন করিয়া, মৃত্যুকালে নগদ তিন হাজার টাকা এবং সামান্য ভূসম্পত্তি রাখিয়া এবং ভূপতিনাথকে জামতাপদে বরণ করিয়া যখন ইহলোক ত্যাগ করিলেন, তখন ভূপতিনাথ সবেমাত্র এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এফ্‌-এ ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়াছে।

শ্রীনাথবাবুর মৃত্যুর পরে কাপড়ের দোকান উঠাইয়া দেওয়া হইল। মজুত মাল বিক্রয় করিয়া ভূপতিনাথ কলেজের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। দোকান-ঘরখানি পঁয়তাল্লিশ টাকায় ভাড়া বিলি হইয়া গেল।

কমলিনীর দাম্পত্য-জীবন পরম সুখে কাটিতে লাগিল। সুশীল এবং চরিত্রবান স্বামীর আদর এবং যত্নে কমলিনীর নারীজীবন আনন্দে ভরপুর হইয়া

উঠিল। কন্যার সুখে বিধবা জননী কতক পরিমাণে স্বামীর শোক ভুলিতে পারিলেন।

কমলিনীর রূপের কথা বেশী করিয়া বর্ণনা করিতে গেলে তাহার গুণের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যকে যেন ম্লান করা হয়। রূপ ত ছিলই, কিন্তু অন্তরের মাধুরিমা, পতিপরায়ণতা এবং মাতৃভক্তি তাহাকে যেন স্বার্থময় কদর্য্য সংসার হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল। পূর্ব্বজন্মসঞ্চিত অপর্য্যাপ্ত পুণ্য না থাকিলে বোধ হয় এরূপ সহধর্ম্মিণী লাভ করা যায় না।

ভূপতিনাথের দাম্পত্য জীবনের আস্বাদন সাধারণ অপেক্ষা বহুল পরিমাণে বিভিন্ন। কমলিনীর শৈশবের ধাত্রী, বালিকা বয়সের খেলার সঙ্গী, লেখাপড়ার শিক্ষক এবং যৌবন প্রারম্ভের সলাজ মানস-দেবতা ভূপতিনাথের জীবন এমনভাবে ক্রম-বিকাশের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছিল যে, কমলিনী ব্যতিরেকে সে নিজের অস্তিত্বই খুঁজিয়া পাইত না।

নিরবচ্ছিন্ন সুখ কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। এমন সুখের সময়ে একদিন মৃত্যুর কঠোর ভ্রুকুটী কমলিনীর জননীর উপর আসিয়া পড়িল। মাতৃপ্রাণা সংসার-অনভিজ্ঞা যুবতী কমলিনী চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল। তখন ভূপতিনাথ বি-এ পরীক্ষা দিয়া পত্নি সকাশে অবকাশ ভোগ করিতেছিল।

যথাসময়ে সংবাদ আসিল, ভূপতিনাথ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। দুঃখের উপর দুঃখ আসিয়া দম্পতিকে আরও মুহ্যমান করিয়া দিল। সময় সকল রোগের চিকিৎসক। ক্রমশঃ দুঃখ ভুলিয়া কমলিনী সংসারের কার্য্যে এবং স্বামীর পরিচর্য্যায় মনোনিবেশ করিল এবং ভূপতিনাথ বাণীর মন্দির ত্যাগ করিয়া চাকুরীর চেষ্টায় বদ্ধপরিকর হইল; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সহায়-সম্পদহীন যুবক কোথাও সন্তোষজনক চাকুরী যোগাড় করিতে পারিল না।

দিনের পর দিন কমলিনীর ক্ষুদ্র এবং লঘু জীবন তরণীখানি স্বামীর অগাধ ভালবাসার হিল্লোলে সুখের তরঙ্গে হেলিয়া দুলিয়া অনন্তকাল সমুদ্রের দিকে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। পিতৃ-সম্পত্তির উৎপন্ন দ্রব্যে স্বাচ্ছন্দ্যে সংসার চলিয়া যাইতে লাগিল। পিতার দোকান-ঘরের ভাড়ার টাকা মাসে মাসে সঞ্চিত হইতে লাগিল এবং তাহার নামে তিন হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ বেঙ্গলব্যাঙ্কেই মজুত রহিয়া গেল। কমলিনী ভাবিত, সংসারে তাহার মত ভাগ্যবতী কে? কে তাহার মত এমন দেবদুর্ল্লভ স্বামীরত্ন লাভ করিয়াছে? কিন্তু তথাপি স্বামীর অর্থ উপার্জ্জনের ব্যর্থ ব্যাকুলতা তাহাকে মাঝে

মাঝে বিচলিত করিয়া তুলিত। স্বামীর ক্ষুণ্ণতা দেখিয়া সে মনে মনে ভগবানের নিকট ভূপতিনাথের একটী ভাল চাকরীর জন্য সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিত।

কমলিনী নিজে কখনও স্বামীর অর্থ উপার্জ্জনের অভাব বোধ করিত না। সে ভাবিত, সে চরমসুখের অধিকারিণী, অর্থ আসিয়া তাহাকে কোন্ সুখ প্রদান করিবে? তাহা ছাড়া, বুদ্ধিমতি পতিপরায়ণা সাধ্বির হৃদয়ের কোন এক অন্তরতম প্রদেশে মাঝে মাঝে একটা আশঙ্কা জাগিয়া উঠিত, হয় ত তাহার দেবতুল্য স্বামী অর্থের পঙ্কিলতায় নিজের দেবত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে না, হয় ত বৈভবের অপ্রতিহত বন্যায় তাহার একমাত্র জীবনতরীখানি অকূলে ভাসিয়া যাইবে! না, না—তবে কিসের জন্য অর্থ উপার্জ্জন? তাহার সর্ব্বনাশের জন্য! কমলিনী মনে মনে বলিত, ভগবন! আমি কিছুরই কাঙ্গালিনী নহি, ধন, মান, যশ কিছুই আমি চাহি না; চাহি কেবল তোমার দেওয়া করুণাটুকু! এইটুকু বজায় রাখিও, তাহা হইলেই আমার সর্ব্বস্ব বজায় থাকিবে। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভূপতিনাথ ত কমলিনীর মত বঙ্গরমণী নহে। অর্থ উপার্জ্জনের ব্যাকুল কামনা তাহাকে ক্রমশঃ জর্জ্জরিত করিতে লাগিল। কমলিনীর নিকট স্বামীর সে ভাব অজ্ঞাত রহিল না। স্বামীর বিষাদমাখা মুখখানি দেখিয়া তাহার কাতর চোখ দুইটী জলে ভরিয়া আসিত। কমলিনী ভাবিল, দয়াময় কেমন করিয়া আমার স্বামীকে সুখী করিতে পারি! বলিয়া দাও প্রভু, কি সেই উপায়, কোথা সেই স্থান, যেখানে হইতে অগাধ ধন রত্ন বহিয়া আনিয়া পতির চরণে অর্পণ করিয়া তাঁহাকে সুখী করিতে পারি।

কমলিনী শুনিয়াছিল, অনেকে লটারীতে টাকা দিয়া হঠাৎ বড়লোক হইয়া গিয়াছে। মোক্ষদার স্বামী না কি এই লটারীর টাকা পাইয়া শ্রীরামপুরের মধ্যে একজন গণ্য মান্য লোক। কিন্তু মোক্ষদা ত কৈ তাহার মত ভাগ্যবতী হইয়া স্বামীসুখের অধিকারিণী হইতে পারে নাই! সে ত কত দিন তাহার নিকট বেড়াইতে আসিয়া অঙ্গভরা অলঙ্কার সত্ত্বেও নিজের মন্দভাগ্যের কথাই কহিয়া যায়। কিন্তু না, এ আশঙ্কা তাহার পক্ষে নিতান্ত অলীক, তাহার স্বামীর সঙ্গে কি কাহারও তুলনা হয়, তাহার স্বামী যে দেবতা!

কিছুদিন পরে কমলিনী একদিন কুসুমদের বাড়ী বেড়াইতে গিয়া কুসুমের

অগ্রজ শরৎ বাবুকে বলিল. "দাদা, আমার ভারী বড়লোক হবার সাধ হয়েছে, বিলেতে না কোথায় একটা বড় লটারী হয় শুনেছি, আমার নামে একটা টিকিট কিনে দিও না ?"

শরৎ বাবু বলিলেন, "ডার্ব্বি লটারীর কথা বলছিস বুঝি, তা বেশ ত, একটা টিকিট কিনলেই ত হলো, বেশ সময়েই কথাটা তুলেছিস্, এই তার সময়, আর দশ পনর দিন পরেই টিকিট কেনা বন্ধ হয়ে যাবে।"

কমলিনী ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তাহলে আমি কালই টাকাটা তোমাকে পাঠিয়ে দেবো শরৎদা। ক'টাকা লাগ্‌বে ?"

শরতবাবু বলিলেন, "দশ টাকা পাঠিয়ে দিস্।"

কমলিনী বলিল, "আচ্ছা, কালই পাঠিয়ে দেবো। কিন্তু একটা কথা শরতদা, তোমার পায়ে পড়ি, ওঁরা যেন এ কথার বিন্দুবিসর্গ জান্‌তে না পারেন।"

শরতবাবু হাসিয়া বলিলেন, "কেন, ভূপতি শুন্‌লে রাগ কর্‌বে বুঝি ! তা বেশ, আমি তাকে কোন কথা বল্‌বো না, তোমার ভয় নেই।"

পরদিন সকালবেলায় কমলিনী যথাসময়ে টাকা দশটী শরতবাবুর নিকট পাঠাইয়া দিল।

(৩)

এদিকে ভূপতিনাথ আরও দুই এক জায়গায় চাকরীর চেষ্টা করিয়া ব্যর্থতার মধ্যে নিজেকে আরও ক্ষুণ্ণ করিয়া ফেলিল, আর সেই সঙ্গে তাহার দিন দিন নিষ্ফলতার কাতর কাহিনী সাধ্বি কমলিনীকে ব্যথিত করিতে লাগিল।

একদিন ভূপতিনাথ বৈকালে বাটী আসিয়া কমলিনীকে ডাকিয়া বলিল, 'কমল ! আজ গোঁসাইদের বাড়ী গিয়েছিলাম। আমি তাদের দুটী ছেলেকে যদি সকাল দুঘণ্টা আর সন্ধ্যেয় দুঘণ্টা পড়াই, তাহলে তাঁরা আমাকে পঁয়ত্রিশ টাকা ক'রে দিতে রাজী হয়েছেন।"

কমলিনী বলিল, "তা বেশ ত, তোমার পছন্দ হয়েছে ত ? তোমার পছন্দ হলেই আমার পছন্দ ! আর যদি এতে তোমার কষ্ট হবে ব'লে মনে হয়, তাহলে আমি কিছুতেই একাজ কর্‌তে দেবো না।"

ভূপতিনাথ একটু কাতরভাবে বলিল, "না, কষ্ট আর কি, কিন্তু কমল, শেষে কি একটা বড়লোকের ছেলে পড়িয়ে জীবনটা কাটাতে হবে। এ কাজের কি কিছু ইজ্জত আছে ? নেহাৎ অদৃষ্ট মন্দ, তাই কর্‌তে হচ্ছে।

স্বামীর কাতর মুখখানি দেখিয়া মেজের মধ্যস্থল হইতে ছুটিয়া গিয়া আবেগভরে কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া স্বামীর অধরে বারবার চুম্বন করিতে করিতে কমলিনী বলিল, "ছি ! লক্ষ্মীটী আমার ! অমন কথা বলো না। কিসে আমাদের অদৃষ্ট মন্দ ! আমি ত আর কিছু চাই না, তুমি চিরদিন এমনি ক'রে তোমার দাসীকে চরণে স্থান দিও, এমনি ক'রে ভালবেসো, এমনি ক'রে বুকে নিয়ে বুক জুড়িয়ে দিয়ো, তাহলেই আমার নারীজন্ম সার্থক হবে। তুমি কি জান না যে, তোমার পাশে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে কর্‌তে পেলেও আমি নিজেকে রাজরাণীর চেয়েও ভাগ্যবতী বলে মনে কর্‌বো। এমন ক'রে আর আমাকে কষ্ট দিও না, তোমার মুখখানা শুক্‌নো দেখ্‌লে যে আমার বুক ফেটে যায় ! তোমার পায়ে পড়ি, এমন কষ্ট ক'রে তুমি কিছুতেই চাকরী কর্‌তে পাবে না।"

ভূপতিনাথ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তুমি দেবী, তাই তুমি এমন কথা বল্‌তে পার্‌ছো, কিন্তু ভাব দেখি কমল, আমি কার অন্নে সাত বছর বেলা হতে মানুষ হয়েছি ? তোমার বাপ-মায়ের অগাধ স্নেহের, তোমার এই অতুলনীয় স্বামীভক্তির প্রতিদান আমি কি দিতে পেরেছি ? আমাকে স্বামী পেয়ে তোমার কি সাধ মিটেছে ? জানি না, কত জন্মের সাধনায় তোমার মত স্ত্রী পেয়েছি।"

পতি-পাগলিনী কমলিনী ব্যগ্রতার সহিত স্বামীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া ভূপতিনাথের বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, চোখের উপর কাতর চোখ দুইটী রাখিয়া, ব্যাকুলভাবে বলিল, "ছিঃ, বড় দুষ্ট তুমি ! এম্নি ক'রে যা'তা ব'লে কি আমাকে কষ্ট দিতে হয় ? আমার আবার সাধ কি ? আমার সকল সাধ যে তুমিই পূরণ করেছ। টাকায় সোণা দানা সব দিতে পারে, কিন্তু সত্যি ক'রে বল দেখি, এমন অমূল্যরত্ন, এমন বুকভরা ধন দিতে পারে কি ? আর আমার বাপ-মায়ের স্নেহের প্রতিদানই বা তুমি কি না দিয়েছ ? আমি আমার মা-বাপের কত আদরের মেয়ে ! তুমি সেই আমাকে সুখের সাগরে ভাসিয়েছ। তুমি কি জান না, তোমার পায়ে সঁপে দিয়ে, বাবা আমার কত সুখে স্বর্গ গিয়েছেন। তোমার মুখখানা দেখেই হতভাগিনী মা আমার সব কষ্ট হাসিমুখে সহ্য করেছেন ! লক্ষ্মীটী আমার, যা তা ভেবে মন খারাপ করো না।"

ভূপতিনাথ অনিমেষনেত্রে গদ্‌গদচিত্তে কমলিনীর সুন্দর মুখখানির প্রতি

চাহিয়া রহিল। এ হেন অতুলনীয় প্রণয়-ঐশ্বর্য্যের অপরিমেয় সৌন্দর্য্যের সম্মুখে তাহার অর্থোপার্জ্জন-অভাবজনিত ক্ষুণ্ণতা, লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া গেল। ভূপতিনাথ আবেগভরে কমলিনীকে বুকে চাপিয়া বলিল, "কমল, আমাকে ক্ষমা কর, আমি নেহাৎ অপদার্থ, তোমার মহত্ব বুঝ্‌তে পারি না, কেবল যা তা বলে তোমার মনে কষ্ট দিই। আচ্ছা, গোঁসাইদের বাড়ীর চাকরীটাই নেওয়া যাক্, কেমন?"

কমলিনী দৃঢ়ভাবে বলিল, "না, ও চাকরী তোমাকে নিতে দেবো না। তুমি যে চাকরীটা নিয়ে দিনরাত আমার কাছে খুঁৎ খুঁৎ কর্‌বে, তা আমি সহ্য কর্‌তে পারবো না। একটা ভাল চাকরীর সন্ধান কর্‌লেই হবে, এখন আর ওটা নিয়ে কাজ নেই।"

ভূপতিনাথ বলিল, "না কমল, আমি খুঁৎ খুঁৎ কর্‌বো না। যখন তেমন কিছু এখন জুট্‌ছে না, তখন বাড়ী বসে এ কাজ তত মন্দ হবে না।"

কমলিনী বলিল, "কৈ, তুমি আমার মাথায় হাত দিয়ে বল দেখি যে, তুমি বেশ সাদামনে কাজটি কর্‌তে পার্‌বে, কোনও দিন এর জন্যে মন খারাপ কর্‌বে না!"

তাহাই হইল। ভূপতিনাথ কমলিনীর মস্তক স্পর্শ করিয়া দাম্পত্যের কাঠ্‌গড়ায় দাঁড়াইয়া অবিকল স্ত্রীর কথামত হলপ করিল। কমলিনী গ্রীবা হেলাইয়া মুখখানি গম্ভীর করিয়া বলিল, "কিন্তু মনে থাকে যেন, যে দিন কমলমণি একটু কিছু মন খারাপের কথা টের পাবে, সেই দিনই চাকরী হতে বরখাস্ত হতে হবে।"

ভূপতিনাথ হাসিয়া বলিল, "যে আজ্ঞে মনিব মহাশয়!"

"একটু বসো, আমি চট্‌ করে কিছু খাবার আর একটু চা ক'রে নিয়ে আসি" বলিয়া কমলিনী স্বামীর নিকট হইতে উঠিয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

(৪)

যথাসময়ে ভূপতিনাথ গোস্বামী পরিবারের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইল। এই চাকরী গ্রহণের পর হইতে কমলিনীর দাম্পত্য-জীবন যেন নব-কলেবর ধারণ করিল। প্রতিদিনের বিরহ-মিলনের মাঝখানে দম্পতিযুগলের দিনগুলি আরও মধুর হইয়া উঠিল। প্রাতে স্বামীকে কর্ম্মে প্রেরণ করিয়া গৃহকার্য্যের অবসানে কমলিনী স্বামীর আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে, আর কার্য্যান্তে

ভূপতিনাথ কয়েক ঘণ্টার বিরহ-সঞ্চিত আকুলতা লইয়া কমলিনীর কাছে ছুটিয়া আসে।

এই ভাবে দিনগুলি বেশ তৃপ্তি এবং মাধুর্য্যের মধ্য দিয়া কাটিয়া যাইতে লাগিল। এমন সময়ে একদিন বেলা তখন প্রায় আটটা, কুসুমকুমারী ব্যস্তভাবে কমলিনীর বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া এদিক ওদিক অনুসন্ধান করিয়া যখন কমলিনীকে দেখিতে পাইল না, তখন 'কোথা লো কম্‌লি, কোথা গেলি' বলিয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠিয়া বলিল, "হ্যাঁলা, ওকি লা কম্‌লি, হাতে হলুদ লাগিয়ে বাটনা বাঁটছিস্ কি লা! তোর কি এখন রান্নাবান্না কর্‌বার সময় লা! হ্যালা, আমাকে তোর রাধুনী রাখবি?"

কমলিনী বলিল, "আঃ মরণ! সকাল-বেলায় কাজ-কর্ম্ম করা নেই, এখানে এলেন ঢং করতে! কি হয়েছে কি, ষাঁড়ের মতন চ্যাঁচাচ্ছিস্ কেন?"

কমলিনীর গাল দুইটী সজোরে টিপিয়া দিয়া কুসুমকুমারী বলিল, "তেজের ঘটা দ্যাখো! আমি কোথা এলাম ওঁকে একটা মস্ত খবর দিতে, আর উঁনি কি না সকাল বেলায় যা না তাই ব'লে গাল সুরু করে দিলেন! থাক্‌গে তোর ভাল খবর, আমি এই চল্লুম।"

কুসুমকুমারী চলিয়া যাইবার ভাণ করিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইল। কমলিনী ডাকিল, "ওলো কুসুম, শোন্ শোন্, যাস্‌নে, আমার মাথা খাস্।"

কুসুম ফিরিল। কমলিনী হাসিয়া বলিল, "তোর ভাল খবরটা কি তাই শুনি।"

প্রাণের সঙ্গিনীর সৌভাগ্যের আনন্দে কুসুমকুমারী কমলিনীর গলা জড়াইয়া বলিল, "কমল, দাদা খবর এনেছেন, লটারীতে তোর নামে পঞ্চাশ হাজার টাকা উঠেছে। বল্ দেখি কমল, আজ আমাদের কি আনন্দ!"

সুসংবাদের আকস্মিক আনন্দে কমলিনী অবসন্ন হইয়া পড়িল। মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, কেবল চক্ষু দিয়া 'ঝর্‌ঝর ধারায় আনন্দাশ্রু পড়িতে লাগিল। যুবতীর এ আনন্দ অর্থ সমাগমে নহে, অর্থাকাঙ্ক্ষী স্বামীর তৃপ্তি সাধনায়। এইবার সম্পদের সাজি লইয়া স্বামীর চরণে অর্থের পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সে তাহার দেবতার হৃদয়কে অপরিমেয় আনন্দ এবং তৃপ্তিতে আপ্লুত করিতে পারিবে, এই সুখকর কল্পনায় সাধ্বির হৃদয়খানি আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। কুসুমকুমারী চলিয়া যাইবার পর কমলিনী আকুল উৎকণ্ঠার সহিত স্বামীর আগমনের প্রতীক্ষায় ছট্‌ফট করিতে লাগিল।

ভূপতিনাথ যখন গৃহে ফিরিল, তখন দম্পতিযুগলের মিলনদৃশ্য যে কত মধুর হইয়া উঠিল, তাহা বর্ণনা অপেক্ষা কল্পনায় অধিকতরভাবে বোধগম্য।

সেদিন বিকাল-বেলায় কমলিনী যখন কুসুমকুমারীদের বাড়ী বেড়াইতে গেল, তখন শরৎ বাবু বলিলেন, "দেখ কমল, টাকাটা তোর নিজের নামে ব্যাঙ্কে জমা রেখে দিস্।"

কমলিনী বলিল, "না দাদা, টাকাটা ত আমার নয়, ওঁদের বড়লোক হবার সাধ হয়েছিল, তাইতে তোমাকে টিকিট কিন্‌তে বলেছিলাম। ওটাকা তাঁদেরই, আমি মেয়েমানুষ, আমি টাকা নিয়ে কি কর্‌বো শরৎ দাদা! তাঁদের টাকা, তাঁরা যা ইচ্ছে তাই করুন-গে!"

শরৎবাবু প্রশংসার দৃষ্টিতে কমলিনীর পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া স্মিতমুখে বলিলেন, "তা বেশ, তুই যা ভাল বুঝিস্ তাই করিস্।"

(৫)

ভূপতিনাথ গোস্বামী-পরিবারের শিক্ষকতার কার্য্য ত্যাগ করিল। চল্লিশ হাজার টাকা ভূপতিনাথের নামে ব্যাঙ্কে মজুত রাখা হইল। এক হাজার টাকায় দুই ছড়া কণ্ঠহার তৈয়ার করাইয়া কমলিনী একদিন বেড়াইতে গিয়া একছড়া কুসুমকুমারীর গলায় এবং অপর ছড়াটী শরৎ বাবুর পত্নী বনলতার গলায় পরাইয়া আসিল।

কমলিনীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভূপতিনাথ স্ত্রীর বসন-ভূষণে প্রায় দেড় হাজার টাকা ব্যয় করিল। তাহার উপর মধুসঞ্চারের সংবাদে ক্রমশঃ বন্ধু-বান্ধবরূপ মক্ষিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া অর্থব্যয়ের পন্থা প্রশস্ত করিয়া দিল। যাহারা ইতিপূর্ব্বে সাক্ষাতে ভূপতিনাথের কুশল জিজ্ঞাসা করিবার কষ্টটুকু পর্য্যন্ত স্বীকার করিত না, তাহারাও পরমহিতৈষীর খোলস পরিয়া প্রত্যহ দুই বেলা ভূপতিনাথের বৈঠকখানায় মজলিস সরগরম করিয়া তুলিল। দেখিতে দেখিতে পুরাণো হারমোনিয়মটী যাহা এতদিন ঘরের এককোণে অনাদৃত অবস্থায় মূকের ন্যায় পড়িয়াছিল, তাহা এক্ষণে তবলার সাহচর্য্যে সপ্তমে উঠিল। সম্পদের কোলে বসিয়া ভূপতিনাথ স্বচ্ছ জলে সফরীর মত বন্ধু-বান্ধব সমাগমের এবং নৃত্য-গীতাদির অগভীর জলে ছুটাছুটী করিতে লাগিল। দৈনন্দিন উৎসবের মধ্যে এবং বিলাসিতার ক্রম-বিকাশের মধ্যে ভূপতিনাথের দিনগুলি বেশ কাটিতে লাগিল।

এমন সময়ে নারীজীবনের একটা প্রধান আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করিয়া,

কমলিনীর গর্ভে সন্তান জন্মিল। কিন্তু হায়! এই সুখের দিনে সাধ্বির হৃদয়ের অনন্ত উৎসবের কোলাহলকে কে সহসা নিস্তব্ধ করিয়া দিল! কৈ, আর ত তাহার প্রত্যক্ষ দেবতা তেমন করিয়া তাহার কাছে ছুটিয়া আসে না! আর ত তাহার প্রিয়তম গৃহ-প্রাঙ্গনে আসিয়া একখানা সুন্দর মুখের আশায় ইতস্ততঃ ব্যাকুলদৃষ্টি নিক্ষেপ করে না! আর ত পতি-পাগলিনীর ভাগ্যে তেমন দীর্ঘকালব্যাপী স্বামীদর্শন ঘটে না! ক্রমশঃ বহির্ব্বাটীর আনন্দ কোলাহল এবং সঙ্গীত-রোল কমলিনীর পক্ষে যেন পতি-সোহাগিনী সুন্দরী সপত্নির কুটিল কলহের মত বোধ হইল।

দিন দিন ভূপতিনাথ কুসঙ্গ প্রভাবে বিলাসিতা হইতে উচ্ছৃঙ্খলতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে কলুষের পক্ষে অগ্রসর হইতে লাগিল। পত্নীর আকুল ক্রন্দন, মলিন বদন, অধঃগত স্বাস্থ্য কেহই উন্মার্গগামী মতিভ্রান্ত যুবকের গতিরোধ করিতে পারিল না। অবশেষে ভূপতিনাথ মদ্যপান করিতে আরম্ভ করিল।

পতিপ্রাণা কমলিনী ক্রমশঃ স্বামীর অধঃগতির বজ্রাঘাতে বিশুষ্ক হইতে লাগিল। স্নেহ-বিকশিত মাধবীলতা প্রেম-বারি-সিঞ্চন অভাবে শুকাইয়া গেল! স্ত্রীর অপগত সৌন্দর্য্যের অনুপাতে ভূপতিনাথের অনাদর এবং অশ্রদ্ধার মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল! রাত্রিতে স্বামীর আহার্য্য সম্মুখে রাখিয়া অভাগিনীকে স্বামীর আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতে হইত। অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত ফিরিতে না দেখিয়া, কমলিনী মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে আহার্য্যের পার্শ্বে অঞ্চল পাতিয়া ঘুমাইয়া পড়িত। হায়! নিদ্রিত অবস্থাতেও স্বামীর আহার্য্য উত্তপ্ত রাখিবার জন্যই বুঝি সতির নাসারন্ধ্র হইতে ঘন ঘন গভীর উষ্ণ-নিশ্বাস পড়িতে থাকিত!

তখন হতভাগিনী কমলিনীর নিকট এহেন মরুভূমিময় জীবনের কিছুমাত্র মূল্য রহিল না। ভগ্নহৃদয়া নারী প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যু-কামনা করিতে লাগিল। সে সর্ব্বদাই ডাকিত, মৃত্যু, কোথা তুমি? দুঃখিনীর অন্তিমের সখা, এস, তোমার কোলে আশ্রয় পাবার জন্য ব্যাকুল প্রতীক্ষায় বসে আছি। ওগো, তুমি এস। কিন্তু তখনি গর্ভের সন্তানের কথা মনে করিয়া কমলিনী শিহরিয়া উঠিত। তখন সে মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিত, "না, এখন আমার মৃত্যুকামনা কর্‌বারও অধিকার নাই।"

অধঃপতিত হৃদয়হীন ভূপতিনাথ বুঝিয়াও বুঝিতে পারিল না যে, সে তাহার

পৈশাচিক তাণ্ডব-নৃত্যে যে পুণ্য-শিশির-স্নাত কুসুমটীকে পদ-দলিত করিয়াছে, তাহার পারিজাত-সৌগন্ধ-লাভে স্বয়ং ভগবানও আপনাকে ধন্যজ্ঞান করেন। হায় ঘৃণিত সম্পদ! কবে তুমি লুপ্ত হইয়া এই কলুষিত সংসারকে স্বর্গে পরিণত হইবার অবসর দিবে!

সে দিন রাত্রি প্রায় একটা বাজিয়া গিয়াছে, ঘোর অন্ধকার; সন্ধ্যার সময় হইতে অবিশ্রান্তভাবে টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিয়া তখনও পর্য্যন্ত বন্ধ হয় নাই। এমন সময় ভূপতিনাথ বাহিরের দরজায় ধাক্কা দিয়া দেখিল, দরজা বন্ধ। তখন প্রচণ্ডবেগে ধাক্কা দিতে দিতে নেশার ঝোঁকে জড়িতস্বরে ডাকিল, 'কমল, ও, কমল, শীঘ্র দোরটা খুলে দিয়ে যাও, ভিজে মলুম।' কোনও উত্তর না পাইয়া. আরও অধিক জোরে ধাক্কা দিতে লাগিল। সহসা দ্বার খুলিয়া গেল। বারান্দায় দাঁড়াইয়া যখন ভূপতিনাথ দেখিল যে, শয়নকক্ষের অর্দ্ধোৎঘাটিত কবাটের মধ্য দিয়া গৃহমধ্যস্থ টেবিলের উপর হইতে জুয়েল ল্যাম্পের আলোকছটা বাহিরে আসিয়া বিচ্ছুরিত হইয়া আছে, তখন সে হাসিতে হাসিতে বাহির হইতে জড়িতকণ্ঠে বলিল, "বটে! জেগে থেকে দুষ্টুমি ক'রে সাড়া দেওয়া হচ্ছিল না। তাই বলি, কমল আজ এত সকাল ঘুমিয়ে পড়্লো কি করে। আজকাল কমলমণি ভারী অবাধ্য হ'য়ে পড়েছে।"

কথাগুলি বলিতে বলিতে ভূপতিনাথ হেলিয়া দুলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, একটী কুকুর আপন মনে তাহার আহার্য্য সামগ্রীগুলির সদ্ব্যবহার করিতেছে, আর কমলিনী শায়িত অবস্থায় শয্যায় পড়িয়া আছে। সে কুকুরটীকে না তাড়াইয়া কমলিনীর অঙ্গস্পর্শ করিয়া বলিল, "ওগো কমলমণি, ওঠো, আর কপট নিদ্রায় কাজ নাই, ঢের হয়েছে! দেখ দেখি, তোমার দুষ্টুমির জন্যে আমার নূতন সিল্কের পাঞ্জাবীটা জলে ভিজে একেবারে মাটী হয়ে গেল!" উত্তর না পাইয়া ভূপতিনাথ আরও অধিক জোরে তাহার অঙ্গ আন্দোলিত করিল। তথাপি নিরুত্তর।

কে উত্তর দিবে? ভগ্নহৃদয়া কমলিনীর প্রাণহীন দেহ জ্যোৎস্না আলোকোদ্ভাসিত শুভ্র মল্লিকারাশির মত পড়িয়া রহিল।

সমাপ্ত।

কর্ম্মফল।

লেখক—শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ।

"যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, মশা মারিতে গালে চড়।"—কথাটা ভুলি নাই,—ভুলি নাই বটে; কিন্তু কথাটার মর্ম্ম এবং উদ্দেশ্য ভুলিয়াছি। সামান্য একটা মশা মারিতে যে নিজের গালে নিজে চড় মারে, সে যে কত বড় মূর্খ, সে পরিচয় দিবার প্রয়োজন আছে কি? নিজের চপেটাঘাতে নিজের গাল লাল হয়ই ত, সঙ্গে সঙ্গে পরের কাছে মাথা হেঁট হয়। আমাদেরও তাই হয়েছে। নানা কারণে আমাদের সামাজিক পদ্ধতিতে অনেক গলদ প্রবেশ করিয়াছে বটে, অনেক মশক আমাদের সামাজিক গণ্ডে বসিয়া শোণিত পান করিতেছে বটে; পরন্তু রাগ করিয়া গালে চড় মারাটা কি ভাল হইয়াছে; প্রমত্তের ন্যায় চিরকালের পুরাতন সমাজের আশ্রয় ছাড়িয়া ইংরেজ-সাজাটা কি ভাল হইয়াছে? ভাল হয় নাই,—ভাল হইতে পারে না, তাই এখন গণ্ডের জ্বালায় আমরা অস্থির হইয়াছি! অস্থির যে হইয়াছি, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজিয়ানার আদর্শ ছিলেন। তিনি সম্প্রতি "কর্ম্মফল" নাম দিয়া যে অপূর্ব্ব বহিখানি ছাপাইয়াছেন, তাহা ইংরেজীয়ানার প্রতিবাদ—নিন্দাবাচক ভীষণ প্রতিবাদ। এই পুস্তকখানি সকল শিক্ষিত বাঙ্গালীরই পাঠ করা কর্ত্তব্য। একটু নমুনা দিব।

মন্মথবাবু কহিলেন,—তোমার ছেলেটিকে যে বিলাতী-পোষাক পরাতে আরম্ভ করেছ, সে আমার পছন্দ নয়।

বিধু কহিলেন—পছন্দ বুঝি একা তোমারই আছে! আজকাল ত সকলেই ছেলেদের ইংরেজি কাপড় ধরিয়েছে।

মন্মথ হাসিয়া কহিলেন—সকলের মতেই যদি চল্‌বে, তবে সকলকে ছেড়ে একমাত্র আমাকেই বিবাহ কর্‌লে কেন?

বিধু। তুমি যদি কেবল নিজের মতেই চল্‌বে, তবে একা না থেকে আমাকেই বা তোমার বিবাহ কর্‌বার কি দরকার ছিল?

মন্মথ। নিজের মত চালাবার জন্যও যে অন্য লোকের দরকার হয়!

বিধু। নিজের বোঝা বহাবার জন্য ধোবার দরকার হয় গাধাকে—কিন্তু আমি ত আর—

মন্মথ। (জিব কাটিয়া) আরে রাম রাম, তুলি আমার সংসার-মরুভূমির আরব ঘোড়া। কিন্তু সে প্রাণীবৃত্তান্তের তর্ক এখন থাক্। তোমার ছেলেটিকে সাহেব করে তুলো না।

বিধু। কেন কর্‌বো না। তাকে কি চাষা কর্‌বো?

ইহার পর আর একটু নমুনা দিব। পিতার ইচ্ছা নহে যে, ছেলে সাহেব সাজুক, মাতা সে পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছেন। আর একটু পড়ুন।

মন্মথ। ওকি ও, তোমার ছেলেটিকে কি মাখিয়েছ?

বিধু। মূর্চ্ছা যেয়ো না, ভয়ানক কিছু নয়, একটুখানি এসেন্স মাত্র। তাও বিলাতি নয়—তোমার সাধের দিশি!

মন্মথ। আমি তোমাকে বারবার বলেছি, ছেলেদের তুমি এ সমস্ত সৌখিন জিনিষ অভ্যাস করাতে পার্‌বে না।

বিধু। আচ্ছা, যদি তোমার আরাম বোধ হয় ত, কাল হতে কেরোসিন্ এবং কাষ্টর্ অয়েল মাখাব।

মন্মথ। সেও বাজে খরচ হবে। যেটা না হলেও চলে, সেটা না অভ্যাস করাই ভাল। কেরোসিন্ ক্যাষ্টর অয়েল্ গায়-মাথায় মাখা আমার মতে অনাবশ্যক।

বিধু। তোমার মতে আবশ্যক জিনিষ ক'টা আছে তা ত জানি না, গোড়াতেই আমাকে বোধ হয় বাদ দিয়ে বস্‌তে হয়!

মন্মথ। তোমাকে বাদ দিলে যে বাদ প্রতিবাদ একেবারেই বন্ধ হবে! এতকালের দৈনিক অভ্যাস হঠাৎ ছাড়লে এ বয়সে হয় ত সহ্য হবে না। যাই হোক্, এ কথা আমি তোমাকে আগে হতে বলে রাখছি, ছেলেটিকে তুমি সাহেব কর বা নবাব কর বা সাহেবি-নবাবির খিচুড়ি পাকাও, তার খরচ আমি জোগাব না। আমার মৃত্যুর পরে সে যা পাবে, তাতে তার সখের খরচ কুলাবে না।

ইহার পর ছেলে সাহেব সাজিয়া মায়ের কাছে উপদ্রব করিতেছে, তাহারও একটু নমুনা লইতে হয়। যথা—

সতীশ। মা, এমন করে ত চলে না।

বিধু। কেন, কি হয়েচে?

সতীশ। চাঁদনির কোটট্রাউজার প'রে আমার বা'র হতে লজ্জা করে! সেদিন ভাদুড়ি সাহেবের বাড়ী ইভ্‌নিং পার্টি ছিল, কয়েকজন বাবু ছাড়া আর

সকলেই ড্রেসসুট প'রে গিয়েছিল, আমি সেখানে এই কাপড় প'রে গিয়ে ভারি অপ্রস্তুতে পড়েছিলাম। বাবা কাপড়ের জন্য যে সামান্য টাকা দিতে চান, তাতে ভদ্রতা রক্ষা হয় না।

বিধু। জান ত সতীশ, তিনি যা ধরেন তা কিছুতেই ছাড়েন না! কত টাকা হলে তোমার মনের মত পোষাক হয়, শুনি?

সতীশ। একটা মর্ণিংসুট আর একটা লাউঞ্জসুটে একশো টাকার কাছা-কাছি লাগ্‌বে। একটা চলন-সই ইভনিংড্রেস দেড়শো টাকার কমে কিছুতেই হবে না।

বিধু। বল কি সতীশ! এ ত তিনশো টাকার ধাক্কা। এত টাকা—

সতীশ। মা, ঐ তোমাদের দোষ। এক ফকিরি কর্‌তে চাও সে ভাল, আর যদি ভদ্রসমাজে মিশ্‌তে হয়, তবে অমন টানাটানি ক'রে চলে না। ভদ্রতা রাখ্‌তে গেলে ত খরচ কর্‌তে হবে, তার ত কোন উপায় নেই। সুন্দর বনে পাঠিয়ে দাও না কেন, সেখানে ড্রেস কোটের দরকার হবে না।

বিধু। তা ত জানি, কিন্তু—আচ্ছা, তোমার মেসো ত তোমাকে জন্ম-দিনের উপহার দিয়ে থাকেন, এবারকার জন্য একটা নিমন্ত্রণের পোষাক তাঁর কাছ হতে জোগাড় করে নাও না? কথায় কথায় তোমার মাসীর কাছে একটু আভাস দিলেই হয়।

সতীশ। সে ত অনায়াসেই পারি, কিন্তু বাবা যদি টের পান, আমি মেসোর কাছ হতে কাপড় আদায় করেছি, তাহলে রক্ষা থাক্‌বে না।

বিধু। আচ্ছা, সে আমি সামলাতে পারবো। (সতীশের প্রস্থান) ভাদুড়ি সাহেবের মেয়ের সঙ্গে যদি সতীশের কোন মতে বিবাহের যোগাড় হয়, তাহলেও আমি সতীশের জন্য অনেকটা নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারি। ভাদুড়ি সাহেব ব্যারিষ্টার মানুষ, বেশ দু-দশ টাকা রোজগার করে। ছেলেবেলা হতেই সতীশ ত ওদের বাড়ী আনাগোনা করে, মেয়েটি ত আর পাষাণ নয়, নিশ্চয় আমার সতীশকে পছন্দ কর্‌বে। সতীশের বাপ ত এ সব কথা একবার চিন্তাও করেন না, বল্‌তে গেলে আগুন হ'য়ে ওঠেন, ছেলের ভবিষ্যতের কল্পা আমাকেই সমস্ত ভাবতে হয়।

পরিণামে যাহা হইবার তাহাই হইল। সতীশ ঋণগ্রস্ত হইলেন। মাসী ও মেসোর ছেলে হইল। তাঁহাদের চক্ষুশূল হইলেন, ভাদুড়ী সাহেবের কন্যার সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ ছিন্ন হইল; সতীশ পেটের দায়ে চাকুরী আরম্ভ করিল,

মাসী মায়ের বাক্য-যন্ত্রণায় আফিস হইতে টাকা চুরি করিয়া মাসীর ঋণ পরিশোধ করিল। সতীশ ধরা পড়িল, আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইল, শেষে মেসো এবং ভাদুড়ী সাহেবের কন্যার সাহায্যে প্রাণে প্রাণে বাঁচিল। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, মশা মারিতে গালে চড়,—ইহাকেই বলে!

রবি বাবু আমাদের সর্দ্দার পোড়ো হইয়াছে। গুরু মহাশয় বানান করিয়া নাম লেখাইতেছেন, সর্দ্দার পোড়ো 'মৃত্যুঞ্জয়' নামের বানান ভুল করিল, অমনি গুরু মহাশয়ের বেত সপাৎ করিয়া উহার পৃষ্ঠে পড়িল; তখনি কাঁদিতে কাঁদিতে পাতের কালী মুখে মাখিয়া পোড়ো মহাশয় বানান দোরস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। রবি বাবু আমাদের সর্দ্দার পোড়ো, এতকাল তিনি যাহা শিখাইয়াছেন, আমরা তাহা শিখিয়াছি; ভুল যে সকলেই করিয়াছি তাহাতে সন্দেহ নাই। পরন্তু সর্ব্বশিক্ষাদাতা সকল সামঞ্জস্যকর্ত্তা বিধাতা পুরুষের চাবুক রবিবাবুর পৃষ্ঠে পড়িতেছে, তাই তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন—"মুছে ফেল, যাহা লিখিয়াছ তাহা মুছিয়া ফেল, আবার নূতন করিয়া লেখ; জীবন দীর্ঘ নহে বটে, দিন গিয়াছে বটে, এখনও যতটুকু পার ততটুকুই ঠিক লেখ।" আমরা আবার লিখিব, আবার চেষ্টা করিব, আবার মক্স করিব। যতটুকু পারি ততটুকুই করিব। কেবল কর্ম্মদোষে গালের কালীটুকু চিরকাল রহিয়া যাইবে। এ কালী এ দেহ থাকিতে আর মুছিবে না।

কোষ্ঠীশিক্ষা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত পশুপতি সরকার।

১ম অধ্যায়।

মাস * ও তাহার ফল।

মাস বারটী যথা—বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র।

বৈশাখ মাসে জাতব্যক্তি শিক্ষিত, মধুরভাষী, গীত বাদ্যাদিতে নিপুণ ও পিতামাতার প্রিয় হয়।

* মাসজ্ঞাপক অঙ্ক যথা—বৈশাখ ১, জ্যৈষ্ঠ ২, আষাঢ় ৩, শ্রাবণ ৪, ভাদ্র ৫, আশ্বিন ৬, কার্ত্তিক ৭, অগ্রহায়ণ ৮, পৌষ ৯, মাঘ ১০, ফাল্গুন ১১, চৈত্র ১২।

জ্যৈষ্ঠমাসে জাতব্যক্তি ক্লেশসহিষ্ণু, মানী, চতুর এবং মিষ্টান্নভোজী হয়।

আষাঢ় মাসে জাতব্যক্তি চঞ্চল, মেধাবী, শৌর্য্যশালী, প্রিয়ভাষী ও লোভী হয়।

শ্রাবণ মাসে জাতব্যক্তি শাস্ত্রজ্ঞ, শোভন, ঐশ্বর্য্যাদিযুক্ত লোভী ও দাতা হয়।

ভাদ্রমাসে জাতব্যক্তি জ্ঞানী, রূপবান, গ্রাম্যধর্ম্মে রত, ভোক্তা ও দাতা হয়।

আশ্বিন মাসে জাতব্যক্তি সুখী, মনোরম, রাজমান্য, কামুক ও পুত্রবান হয়।

কার্ত্তিক মাসে জাতব্যক্তি দীপ্তিবান, জ্ঞানী, দেবদ্বিজে ভক্ত, ধনবান ও চতুর হয়।

অগ্রহায়ণ মাসে জাতব্যক্তি ক্রোধী, পরোপকারী, জ্ঞানী, ভোগী ও সজ্জনপ্রিয় হয়।

পৌষ মাসে জাতব্যক্তি শুদ্ধাচারী, বলিষ্ঠ, পিতা-মাতার প্রতিপালক ও রুগ্ন হয়।

মাঘ মাসে জাতব্যক্তি দীর্ঘাকার, জ্ঞানবান, সুন্দর, ধনবান ও ত্যাগশীল হয়।

ফাল্গুন মাসে জাতব্যক্তি সদাচারসম্পন্ন, শ্রেষ্ঠ, দেব-ব্রাহ্মণভক্ত, রমণীর জন্য উৎকণ্ঠিত হয়।

চৈত্র মাসে জাতব্যক্তি—সুন্দর, বক্তা, ধনবান, গীতজ্ঞ ও চঞ্চল হয়।

পক্ষ ও তাহার ফল।

পক্ষ দুইটী শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ। শুক্লপক্ষে জাতব্যক্তি চঞ্চলস্বভাববিশিষ্ট, দীর্ঘায়ু, চরিত্রবান, সুন্দর, সদানন্দ, নীতিজ্ঞ ও বাগ্মী হয়।

কৃষ্ণপক্ষে জাত ব্যক্তি—বিবাদপ্রিয়, প্রলাপভাষী, অতিকর্ম্মা, চঞ্চলস্বভাব ও কুলবর্দ্ধক হয়।

বার † ও তাহার ফল।

বার সাতটী যথা—রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি।

রবিবারে জাতব্যক্তি—মিষ্টান্নভোক্তা, লোভী, পিত্তাধিক্যশরীরবিশিষ্ট ও কামাতুর হয়।

† বারজ্ঞাপক অঙ্ক যথা—রবি ১, সোম ২, মঙ্গল ৩, বুধ ৪, বৃহস্পতি ৫, শুক্র ৬, শনি ৭।

সোমবারে জাতব্যক্তি—ভোগী, পণ্ডিত, মানী, জিতেন্দ্রিয়, নানাবিদ্যায় পারদর্শী ও চরিত্রবান হয়।

মঙ্গলবারে জাতব্যক্তি—মূর্খ, ধনবান, ক্রোধী, শাস্ত্রনিন্দক, নাস্তিক, খেদহীন ও ভোগবান হয়।

বুধবারে জাতব্যক্তি—বেদোক্ত ক্রীয়াশীল, দয়াবান, পণ্ডিত ও ভোগী হয়।

বৃহস্পতিবারে জাতব্যক্তি—বেদজ্ঞ, অগ্নিহোত্রী, পুত্রবান ও পূর্ণচেতা হয়।

শুক্রবারে জাতব্যক্তি—ভোগী, ঐশ্বর্য্যশালী, শৌর্য্যশালী, কৃপালু, শ্রুতজ্ঞ ও গীতবাদ্যপ্রিয় হয়।

শনিবারে জাতব্যক্তি—নীচাসক্ত, কৃতঘ্ন, কুটীল ও বান্ধবগণের পীড়াদায়ক হয়।

তিথি ‡ ও তাহার ফল।

তিথি ষোলটি যথা—প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী, একাদশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা।

প্রতিপদ তিথিতে জাতব্যক্তি—ক্রূর, ধনহীন, ব্যসনাসক্ত, বংশের মনস্তাপদায়ক হয়।

দ্বিতীয়া তিথিতে জাতব্যক্তি—পরদাররত, সত্যশৌচহীন, তস্কর ও স্নেহশূন্য হয়।

তৃতীয়া তিথিতে জাতব্যক্তি—বিকল, বীর্য্যহীন ও হিংস্রক হয়।

চতুর্থী তিথিতে জাতব্যক্তি—ভোগী, দাতা, পণ্ডিত ও ধনসম্পত্তিশালী হয়।

পঞ্চমী তিথিতে জাতব্যক্তি—জ্ঞানী, সম্পূর্ণ গাত্রবিশিষ্ট, গুণগ্রাহক, পিতামাতার রক্ষক ও শৌর্য্যশালী হয়।

ষষ্ঠী তিথিতে জাতব্যক্তি—বহুদেশগামী, কলহপ্রিয় ও উদররোগী হয়।

‡ তিথিজ্ঞাপক অঙ্ক যথা—শুক্লাপ্রতিপদ ১, দ্বিতীয়া ২, তৃতীয়া ৩, চতুর্থী ৪, পঞ্চমী ৫, ষষ্ঠী ৬, সপ্তমী ৭, অষ্টমী ৮, নবমী ৯, দশমী ১০, একাদশী ১১, দ্বাদশী ১২, ত্রয়োদশী ১৩, চতুর্দ্দশী ১৪, পূর্ণিমা ১৫, কৃষ্ণা প্রতিপদ ১৬, দ্বিতীয়া ১৭, তৃতীয়া ১৮, চতুর্থী ১৯, পঞ্চমী ২০, ষষ্ঠী ২১, সপ্তমী ২২, অষ্টমী ২৩, নবমী ২৪, দশমী ২৫, একাদশী ২৬, দ্বাদশী ২৭, ত্রয়োদশী ২৮, চতুর্দ্দশী ২৯, অমাবস্যা ৩০।

সপ্তমী তিথিতে জাতব্যক্তি—তেজস্বী, গুণবান, সুন্দর, নিপুণ ও ধনবান হয়।

অষ্টমী তিথিতে জাতব্যক্তি—ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, দাতা ও ভোক্তা হয়।

নবমী তিথিতে জাতব্যক্তি—দেবভক্ত, পুত্রবান, যশস্বী, ধার্ম্মিক ও শাস্ত্রাভ্যাসে রত হয়।

দশমী তিথিতে জাতব্যক্তি—কার্য্যনিপুণ, গুণবান, ধনশালী, বেদবেত্তা ও বন্ধুগণের প্রিয় হয়।

একাদশী তিথিতে জাতব্যক্তি—শুদ্ধাচারী, ধার্ম্মিক, বিবেকী, গুরুভক্ত ও সদ্‌গুণযুক্ত হয়।

দ্বাদশী তিথিতে জাতব্যক্তি—চঞ্চল, পরমজ্ঞানী, রূপবান ও দেশভ্রমণকারী হয়।

ত্রয়োদশী তিথিতে জাতব্যক্তি—মহাজ্ঞানী, শাস্ত্রজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয় ও পরোপকারী হয়।

চতুর্দ্দশী তিথিতে জাতব্যক্তি—নৃত্যগীতে অনুরক্ত, সুশীল, বলবান, রাজমান্য ও যশস্বী হয়। কিন্তু কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে জন্মগ্রহণ করিলে তাদৃশ শুভ ফল হয় না।

পূর্ণিমা তিথিতে জাতব্যক্তি—লক্ষ্মীযুক্ত, মাংসখাদক, ভোজনপ্রিয়, শাস্ত্রবিচারপটু ও হৃষ্ট হয়।

অমাবস্যা তিথিতে জাতব্যক্তি—হিংস্রক, খল-স্বভাববিশিষ্ট, বিদ্যাহীন, সাহসী ও চোর হয়।

করণ * ও তাহার ফল।

করণ এগারটি যথা—ববকরণ, বালবকরণ, কৌলবকরণ, তৈতিলকরণ, গরকরণ, বণিজকরণ, বিষ্টিকরণ, শকুনিকরণ, চতুষ্পাদকরণ, কিম্ভঘ্নকরণ ও নাগকরণ।

ববকরণে জাতব্যক্তি—বলবান, বিনয়ী, কর্ম্মপটু, বিচক্ষণ ও লক্ষ্মীমান হয়।

বালবকরণে জাতব্যক্তি—ক্রিয়াবান, সৈন্যাধ্যক্ষ, কুলীন, স্বজনপালক ও সবল হয়।

* করণজ্ঞাপক অঙ্ক যথা—ববকরণ ১, বালব ২, কৌলব ৩, তৈতিল ৪, গর ৫, বণিজ ৬, বিষ্টি ৭, শকুনি ৮ বা শং, চতুষ্পাদ ৯ বা চং, কিম্ভঘ্ন ১০ বা কিং, নাগ ১১ বা নাং।

কৌলবকরণে জাতব্যক্তি—বাগ্মী, বিনীত, স্বাধীনতাপ্রিয় ও তেজস্বী হয়।

তৈতিলকরণে জাতব্যক্তি—সঙ্গীতনিপুণ, সুন্দর শরীরবিশিষ্ট, বক্তা ও গুণজ্ঞ, ললনাভিলাষী ও সুশীল হয়।

গরকরণে জাতব্যক্তি—বিচারপটু, শত্রুবিজয়ী, দয়ালু, বিনয়ী ও পরোপকারী হয়।

বণিজকরণে জাতব্যক্তি—প্রাজ্ঞ, গুণবান, ব্যবসাপটু, কৃতজ্ঞ হয়।

বিষ্টিকরণে জাতব্যক্তি—দরিদ্র, ভাগ্যবান, লোভী, হীনচেতা, কুৎসিত-স্ত্রীবিশিষ্ট হয়।

শকুনিকরণে জাতব্যক্তি—প্রবঞ্চক, পরধনাপহারী, ক্রুর ক্রোধী ও পরস্ত্রীরত হয়।

চতুষ্পাদকরণে জাতব্যক্তি—সদাচার-বর্জ্জিত, ক্ষীণদেহবিশিষ্ট ও চতুষ্পদ ধনে ধনী হয়।

নাগকরণে জাতব্যক্তি—চতুর, রত্নাতিলাষী ও ছলনাপটু হয়।

কিন্তুঘ্নকরণে জাতব্যক্তি—সমদর্শী, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, নিন্দা, প্রশংসা প্রভৃতিতে তুল্য জ্ঞানী হয়।

যোগ † ও তাহার ফল।

যোগ সাতাইশটী যথা—বিষ্কুম্ভ, প্রীতি, আয়ুষ্মান, সৌভাগ্য, শোভন, অতিগণ্ড, সুকর্ম্মা, ধৃতি, শূল, গণ্ড, বৃদ্ধি, ধ্রুব, ব্যাঘাত, হর্ষণ, বজ্র, অসৃক, ব্যতিপাত, বরীয়ান, পরিঘ, শিব, সিদ্ধি, সাধ্য, শুভ, শুক্র, ব্রহ্ম, ইন্দ্র ও বৈধৃতি।

বিষ্কুম্ভযোগে জাতব্যক্তি—স্বতন্ত্রপ্রিয়, সুহৃদ-পুত্র-কলত্রে বেষ্টিত, শৌর্য্যযুক্ত ও গৃহনির্ম্মাণপটু হয়।

প্রীতিযোগে জাতব্যক্তি—রোগশূন্য, সুখী, বিনোদী, পণ্ডিতগণের আশ্রয়স্থল, প্রার্থিতের প্রার্থনাপূর্ণকারী হয়।

† যোগজ্ঞাপক অঙ্ক যথা—বিষ্কুম্ভ ১, প্রীতি ২, আয়ুষ্মান ৩, সৌভাগ্য ৪, শোভন ৫, অতিগণ্ড ৬, সুকর্ম্মা ৭, ধৃতি ৮, শূল ৯, গণ্ড ১০, বৃদ্ধি ১১, ধ্রুব ১২, ব্যাঘাত ১৩, হর্ষণ ১৪, বজ্র ১৫, অসৃক ১৬, ব্যতিপাত ১৭, বরীয়ান ১৮, পরিঘ ১৯, শিব ২০, সিদ্ধি ২১, সাধ্য ২২, শুভ ২৩, শুক্র ২৪, ব্রহ্ম ২৫, ইন্দ্র ২৬, বৈধৃতি ২৭।

আয়ুষ্মানযোগে জাতব্যক্তি—যানবাহনযুক্ত, পুষ্পোদ্যানে ক্রীড়াশীল, দাস দাসী দ্বারা পরিবৃত, গর্ব্বিত, সুগৃহবিশিষ্ট হয়।

সৌভাগ্যযোগে জাতব্যক্তি—সৌভাগ্যশালী, প্রশংসিত, ধনবান, উদারহৃদয়, বলবান, অভিমানী ও প্রিয়ভাষী হয়।

শোভনযোগে জাতব্যক্তি—সুন্দর, সদ্বক্তা, প্রবীণ, দক্ষ, সুধীর ও সকলের নিকট হইতে সম্মান প্রাপ্ত হয়।

অতিগণ্ডযোগে জাতব্যক্তি—বিবাদপ্রিয়, বেদনিন্দুক, ধূর্ত্ত, কৃতঘ্ন, গলরোগী, দীর্ঘাকার, রোমযুক্ত দেহবিশিষ্ট হয়।

সুকর্ম্মাযোগে জাতব্যক্তি—পরোপকারী, কলাকুশল, আনন্দিত, যশস্বী ও মনুষ্য মধ্যে বিখ্যাত বলিয়া গণ্য হয়।

ধৃতিযোগে জাতব্যক্তি—প্রাজ্ঞ, হৃষ্ট, বাচাল, সুশীল ও বিনয়ী হয়।

শূলযোগে জাতব্যক্তি—ভীত, দরিদ্র, রমণীপ্রিয়, বন্ধুর নিকট শূলস্বরূপ, বিদ্যা ও রোগহীন হয়। এই যোগে জাতব্যক্তির নিকট কেহ উপকৃত হয় না। কৃত হয় না।

গণ্ডযোগে জাতব্যক্তি—স্বার্থপর, ধূর্ত্ত, কুরূপবিশিষ্ট ও সুহৃদগণের কষ্টদায়ক হয়।

বৃদ্ধিযোগে জাতব্যক্তি—মানী, ভোগী, বিনয়ীও বাণিজ্যপটু হয়। (ক্রমশঃ)

সমালোচনা।

ব্রহ্মশক্তি।—(পৌরাণিক নাটক) শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। বাদুড়বাগান, বিদ্যাসাগর বাটী হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য এক টাকামাত্র।

নাটক রচনায় গ্রন্থকারের বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। নায়ক-নায়িকার চরিত্রাঙ্কণে, ভাবে, ভাষায়, অলঙ্কারে নাট্যকারের যতই পটুতা থাকুক না কেন, অভিনয় না হইলে জন-সমাজে নাটক ও নাট্যকারের মর্য্যাদা প্রচারিত হয় না। বঙ্গীয় নাট্যসাহিত্যের পাঠক অল্প, দর্শক অধিক।

কুহকী।—(গীতি-নাট্য) শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত; কলিকাতা ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত। মূল্য আট আনামাত্র।

এই ক্ষুদ্র গীতিনাট্যে গ্রন্থকার গীতিনাট্য-রচনায় তাঁহার কৃতিত্বের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন; পাত্র ও পাত্রীগণের বাক্যবিন্যাস, গীতগুলির রচনারীতি, ছন্দ, ভাব ভাষা, সমস্তই সুন্দর মনোহর। সোহাগের গীতের একটি নমুনা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া আমাদের মন্তব্যের উপসংহার করিলাম।

সোহাগের গীত।

কি জানি কেন লো প্রাণসই।
হয়েছি আপনহারা, আমি ত সে-আমি নই॥
কে যেন কি যাদু কোরে,
ভুলায়ে নিয়েছে মোরে,
ঘুরি ফিরি, বাঁধা তারি কুহক-ডোরে,—
অঘোরে জীবন যাপি,
অনিল বহিলে কাঁপি,
চমকি আপন স্বরে, চলিতে চকিত হই॥

ব্যাধি ও তাহার প্রতিষেধ।—ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাহিত্য-বিশারদ-প্রণীত। কলিকাতা ১০ নং রাজাগুরুদাস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনামাত্র।

এই পুস্তকের লেখক ২৪ পরগণা, গোবরডাঙ্গা নিবাসী বিখ্যাত ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়, মানব-দেহের নানাবিধ রোগের বীজাণু, ম্যালেরিয়া জ্বর, টাইফয়েড ও কলেরা, প্লেগ, যক্ষ্মা, ডিপ্‌থিরিয়া, জলাতঙ্ক, ধনুষ্টঙ্কার, হাম, বসন্ত প্রভৃতি ব্যাধির বীজাণুতত্ত্ব ও কতকগুলি বিশেষ বিশেষ রোগের ইতিহাস, নিদান ও প্রতিষেধ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। পরিশিষ্টে রোগী ও রোগীর পরিচর্য্যাকারিগণের অবশ্য জ্ঞাতব্য কয়েকটি বিষয়ের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

আমরা পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া স্বাস্থ্যতত্ত্বের উপদেশ লাভ করিলাম। নিত্য নূতন ব্যাধি-প্রপীড়িত বঙ্গদেশে বঙ্গভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই "ব্যাধি ও তাহার প্রতিষেধ পুস্তকখানি পাঠ করা কর্ত্তব্য।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

জন্মভূমি

২৬শ বর্ষ, | ১৩২৭ সাল, আশ্বিন। | ৬ষ্ঠ, সংখ্যা।

ব্যথিতের বন্ধু।

(লেখক,—শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু বি-এ।)

(১)

"দাদা, এই জানালার ধারে অন্ধকারে একলাটী বসে রয়েছো? বেশ যা হোক, কাল আমরা আসবো গিয়ে, আর তুমি কেবল লুকিয়ে বেড়াচ্ছো! এস, উঠে এস। দুটো কথাও কইবে না?"

স্নেহময়ী ভগিনীর এই অনুযোগে রমেন্দ্রের যোগ ভঙ্গ হইল না বটে, তবে তাহার নিরবচ্ছিন্ন ভাবনার একটানা স্রোতে বাধা পড়িল। সে ভগিনীর দিকে না তাকাইয়া অন্যমনে জিজ্ঞাসিল, "এঁ্যা, কি বলচিস আভা?"

আভা রাগের ভান দেখাইয়া ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "তবু ভাল, হুঁস হলো ঘরে মানুষ আছে। এমনই যদি পাগলের মত সর্ব্বত্যাগী হবে, তবে লোককে বাইরে মনের জোর দেখিয়ে বেড়াও কেন? দেখ দেখি, কি চেহারা হয়েছে তোমার!" আভা এই কথা বলিয়া তাহার দাদার পদতলে আসিয়া বসিল, তাহার আঁচলে বাঁধা চাবির গোছাটা মেঝের উপর ঝণাৎ করিয়া আওয়াজ করিল। রমেন্দ্র চমকিয়া উঠিল, স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় আভার মুখপানে ফ্যাল ফ্যাল তাকাইয়া বলিল, "কে, আভা? কোনও দরকার আছে কি?"

আভা কাঁদিয়া ফেলিল, ছলছল নেত্রে অভিমান মিশ্রিত কান্নার সুরে বলিল, "কত দিন এমনই ক'রে কাটাবে দাদা? সংসার কর্‌তে গেলে এমন দাগা অনেকেই পায়, তা বলে জীবনটাকে কি কেউ ভাসিয়ে দেয়? যা গেছে,

তা ত আর ফিরে পাবার নয়, তবে তাই আঁকড়ে বসে থাকলে কি ফল হবে? তার চেয়ে আবার ঘর-সংসার কর, এখনও আস্ত কাল পড়ে রয়েছে!"

রমেন্দ্র একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "ওসব কথা ত ঢের হয়েছে আভা, আর কেন?"

আভা বলিল, "না, আর কেন বললে শুনবো না। এমনই করে সারাদিন একলা থেকে, ভেবে ভেবে দেহটাকে ক্ষয় করে ফেলচো, তা ত দেখতে পারি নি। দাদা, তোমার দুটী পায়ে পড়ি, আমার কথা শোন, আবার সংসার কর, তোমার মত বয়সে কত লোকের যে বিয়েই হয় নি।"

রমেন্দ্রের শীর্ণমুখে ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, "তা হয় নি সত্য, কিন্তু আমার মত বয়সে ভগবানের মঙ্গল আশীর্ব্বাদ এমন করে পেয়ে কেউ ত হারায় নি।"

আভা কাঁদিয়া ফেলিল, "দাদা, তার গুণ কি কেউ ভুলতে পারে? সে যে সকলকে কাঁদিয়ে গেছে। কিন্তু তা বলে সে যখন শত্তুরের মত কারও অনুরোধ না শুনে এমনই করে নিষ্ঠুর পাষাণের মত চলে গেলো, তখন আমাদেরই বা তার সঙ্গে আর সম্পর্ক কি?"

রমেন্দ্র উত্তেজিত হইয়া—আজ কাল তাহাকে কেহ বড় একটা উত্তেজিত হইতে দেখিতে পাইত না—বলিল, "সম্পর্ক নেই? তা হতেই পারে না। তার সঙ্গে চির জীবনের, জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক আছে, এই আশায় জীবন-ধারণ কর্‌ছি। আভা, লক্ষ্মী বোনটী আমার, ও কথা আর তুলিস নি, তোরা আমায় নিশ্চিন্তে কেবল তার চিন্তা কর্‌তে দে, ওতেই আমার সুখ, ওতেই আমার আনন্দ।"

আভা চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া গেল।

(২)

গোয়াবাগানের রমেন্দ্র ঘোষের এ জীবনে সকল সম্পদই লাভ হইয়াছিল। স্বাস্থ্য, রূপ, বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য—এ সকলেই সে তুল্য অধিকারী হইয়াছিল। সকলের অপেক্ষা এ সংসারে যে সম্পদ দুই একজন অতি বড় ভাগ্যবানের অদৃষ্টে লাভ হইয়া থাকে—সংসারের সার সেই স্ত্রীরত্ন লাভও তাহার অদৃষ্টে ঘটিয়াছিল। এ বিষয়ে ভগবান দুই হস্ত ভরিয়া তাঁহার করুণা তাহার উপর বর্ষণ করিয়াছিলেন। মাতৃহীন রমেন্দ্রের ধনী জমিদার পিতা অনেক খুঁজিয়া পাতিয়া পুত্রের জন্য এক দরিদ্র পল্লীগৃহস্থের ঘর-

আলো-করা গৃহলক্ষ্মী আনিয়াছিলেন, তাহার রূপে তাঁহার ঘর-সংসার সদাই আলোকিত ছিল, আর তাহার সদ্‌গুণরাশির সৌগন্ধে গৃহ সদাই আমোদিত থাকিত। কিন্তু বেশীদিন তাঁহাকে এ সুখ সম্পদ ভোগ করিতে হইল না। একদিন তিনি তাঁহার সেই ক্ষুদ্র ঘরের লক্ষ্মীর হাতে পোষ্যবর্গ সমন্বিত বৃহৎ সংসারের সকল ভার সমর্পণ করিয়া চিরদিনের জন্য এ জগৎ হইতে ছুটি লইলেন। রমেন্দ্র বাল্যে মাতৃহীন হইয়াও পিতার যত্নে একদিনও মাতৃস্নেহের অভাব অনুভব করিতে পারে নাই। তাই যখন সেই পরম স্নেহের পিতা তাহাকে অকূলপাথারে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন, তখন সে চারিদিক আঁধার দেখিয়াছিল। কিন্তু তাহাকে আঁধারে আলোক দেখাইবার নিমিত্ত ভগবান এই লক্ষ্মী-স্বরূপিনী বালিকা বধূকে সংসার-পথের সাথী করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার মঙ্গল হস্তস্পর্শে রমেন্দ্রের সংসারে সকল ব্যথা বিপদ অপসারিত হইল, একটা তৃপ্তি ও শান্তির সঞ্জীবনী সুধা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

বড় সুখে রমেন্দ্রের দিন কাটিতেছিল। সংসারে যার কোনও অভাব নাই, তাহার অসুখ কিসে হইবে? রমেন্দ্র যাহা চায়, তাহা তাহার চাহিবার আগে কোথা হইতে যোগান হইয়া যায়। রমেন্দ্রের জীবনাকাশ যেন একটা নিরবচ্ছিন্ন মেঘ লেশহীন আশা ও আলোকের রামধনু রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া রহিল। এ যে অদৃষ্টের অলক্ষিত ও অপ্রত্যাশিত উপহাসের পূর্ব্ব সূচনা, মূর্খ রমেন্দ্র তাহা বুঝিতে পারে নাই। হঠাৎ আকাশের কোণে একখানি ক্ষুদ্র মেঘ উঠিল, দেখিতে দেখিতে রামধনু রঙ্গের আকাশ ছাওয়া আলোক নিবিড় আঁধারে ঢাকিয়া গেল, মাত্র সাত দিনের সান্নিপাতিক জ্বরে রমেন্দ্রের ঘর-আলো-করা উজ্জ্বল দীপটা অদৃষ্টের নিষ্ঠুর ফুৎকারে নিবিয়া গেল। রমেন্দ্রেরও জীবন আঁধার হইয়া গেল।

প্রথমে আত্মীয় স্বজন ভাবিয়াছিল, এ আঘাত রমেন্দ্র সহ্য করিতে পারিবে না। বস্তুতঃ প্রথমে রমেন্দ্র শয্যা লইল। তাহার সকল জিনিসে অবিশ্বাস হইল। এই পৃথিবীটা বিশ্রী, ভগবানটা নিষ্ঠুর কসাই, এমন কথাই মনে হইল। কিন্তু নবীন বয়ঃ ও অনিন্দ্য স্বাস্থ্য রমেন্দ্রকে বাঁচাইয়া রাখিল। বাঁচাইয়া রাখিল মাত্র, জীবন্মৃত হইয়া রহিল। তাহার মনে হইল, তাহার এ দুর্ব্বহ জীবনভার বহিতে হইবে বটে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত—জীবনের যত কিছু আশা, উৎসাহ, সুখ, শান্তি সব চিরতরে অস্তমিত হইয়া গেল।

তিনটী সুদীর্ঘ বর্ষ এইরূপে কাটিয়াছে, কত বিনিদ্র রজনী তাহার চোখের

উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। আজ যখন তাহার স্নেহময়ী দূর-সম্পর্কীয়া মাতুল কন্যা আভা বহুদিন পরে আবার নূতন সংসারের কথা পাড়িল, তখন তাহার চক্ষু দুটী জলে ভরিয়া উঠিল, দারুণ যাতনায় অন্তরের অন্তস্তল কাঁদিয়া উঠিল। আভা স্বামীকে লইয়া দাদার ঘরে এই কথা পাড়িবার জন্যই আসিয়াছিল। তাই একবার কথা পাড়িয়া ক্ষান্ত হইল না; সন্ধ্যার পরে যখন রমেন্দ্র ছাদে পাদচারণা করিয়া বেড়াইতেছিল, তখন আভা সেইখানে গিয়া বসিল, বলিল, "দাদা, নীচে যাবে না? চল না, ওঁরা সব কাপড় চোপড় পরছেন, আজ থিয়েটারে যাবেন। তুমিও যাও না দাদা?"

"না, তোরা যা; আমি বরং সীতানাথকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, একটা বক্স ঠিক করে দেবে এখন।"

"না দাদা, আমরা যাব না ত! কেন যাব? এলুম তোমার কাছে, তুমি যদি আমাদের না দেখ, কেবল পালিয়ে পালিয়ে বেড়াও, তা হলে আমরা কালই চলে যাব বলছি।" আভার স্বর চাপা, কান্না ও অভিমান বিজড়িত।

রমেন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "না, না, পাগলী, যাবি কেন? তোরা এলে আমার কত আহ্লাদ হয়, তা কি জানিস্ নি? তা আজ থাক, আর একদিন যাওয়া যাবে, কি বলিস?" রমেন্দ্র এই কথা বলিয়া আভার মুখের দিকে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল।

আভা কাতরদৃষ্টিতে দাদার মুখপানে তাকাইয়া বলিল, "দাদা, কি অভাবে তোমায় এমন করেছে? যা গেছে, তার মত কি জগতে আর কিছু পাওয়া যায় না?"

রমেন্দ্র গম্ভীর হইয়া বলিল, "না, যায় না।"

আভা বলিল, "বেশ, তাই যেন হ'লো। কিন্তু খুঁজে কি দেখেছো? আর কি কিছুতে তার অভাব পূর্ণ হতে পারে না?"

রমেন্দ্র বলিল, "আমি ত তাকে আর চাই না, কেবল তাকে আর একটীবার দেখতে চাই। এই অভাব কেউ পূরণ কর্‌তে পারে না।"

"কেন, দেখতে চাও কেন? দেখলেই কি আকাঙ্ক্ষা মিটবে?"

"হাঁ, মিটবে। আমি দেখা হলে কেবল একটী কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বো, কি দোষে সে আমায় ছেড়ে গেল!" রমেন্দ্রের বুক ভাঙ্গিয়া একটী দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল, সমস্ত অন্তরের রুদ্ধ কান্নার জমাট বাঁধ ভাঙ্গিয়া যেন নিশ্বাসটী বাহির হইল।

আভার চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইল, সে বলিল, "নিশ্চয়ই দেখা পাবে দাদা, আমার মন বলছে, তোমার এ খাণ্ডবদাহনের খাই খাই আকাঙ্ক্ষা কখনই অপূর্ণ থাকবে না"—

"এঁ্যা, সত্যি বলছিস আভা? তোরা হিঁদুর ঘরের সতী লক্ষ্মী, তোদের কথা কখনও বিফল হয় না। সত্যি বলছিস, তার দেখা পাব?"

"কে বলতে পারে, পাবে না? হয় ত এমনই চাঁদনী রাতে তোমার ক্ষুধার্ত্ত মনের জ্বলন্ত বাসনা তাকে আবার অন্ততঃ একবারের জন্য এই পৃথিবীতে ডেকে আনবে। আমি শুনেছি, আন্তরিক ডাকে মরা মানুষও কখনও কখনও ফিরে আসে।"

আভা এই কথা বলিয়া স্বামীর সহিত থিয়েটার দেখিতে চলিয়া গেল, রমেন্দ্র তদবস্থায় ছাদেই বসিয়া রহিল।

(৩)

রাত্রি অনেক হইয়াছে। পাড়ার সর্ব্বত্র নিশুতি। চারিদিক নিষ্কম্পবৃক্ষ নিভৃতদ্বিরেফযুকাণ্ডজশান্তমৃগপ্রচার বলিয়া অনুমিত হইতেছে। রমেন্দ্র তখনও একদৃষ্টে চন্দ্রতারকাখচিত নীলাকাশের দিকে তাকাইয়া বসিয়া আছে। বাটীর ভৃত্যপরিজন দুই চারিবার তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়া ফিরিয়া গিয়া যে যাহার কাজ সারিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এমন অনেক দিনই হইয়াছে, কাজেই রমেন্দ্রের এমন ভাবে অনাহারে অনিদ্রায় রাত্রি যাপন করা তাহাদের কাছে বিচিত্র বলিয়া অনুমিত হইত না।

চন্দ্রকরে আকাশ ও পৃথিবী উদ্ভাসিত, জ্যোৎস্নার দুগ্ধ স্নিগ্ধ ধবলিমায় গাছপালা, আকাশ বাতাস স্নাত প্লাবিত। রমেন্দ্র সেই স্নেহধারায় স্নাত হইয়া চন্দ্রতারকাখচিত নীলাকাশের দিকে চাহিয়া কত কি ভাবিতেছিল। জীবনে কি সুখ? এই আশা-উদ্দেশ্যহীন লক্ষ্যহীন জীবনের বোঝা বহিয়া কে বাঁচিতে চাহে? নিষ্ঠুর প্রবঞ্চক দেবতা, মানুষের সুখ দুঃখ যাহার কাছে এত তুচ্ছ! সে কিসের দেবতা? তাহার নবীন জীবন নদীস্রোত কূলে কূলে ছাপাইয়া আনন্দে বহিয়া চলিয়াছিল, দেবতার তাহা সহ্য হইল না। সে দেবতা না রাক্ষস? আনন্দময় দয়াময়, না নির্ম্মম নিষ্ঠুর ঘাতুক? কে সে, যে মানুষ তাহাকে পূজা করে? পাষাণের পূজা করিলে পাষাণও ত মানুষের সুখ দুঃখে এমনই সাড়া দেয় না, তবে পাষাণে আর "দয়াময়"

দেবতায় প্রভেদ কি?, আহা, যদি মানুষের ক্ষমতা থাকিত, এই দেবতার সহিত বুঝা পড়া করিতে।

ভাবিতে ভাবিতে রমেন্দ্রের ব্যথিত আহত হৃদয় দারুণ ক্রোধ ও হিংসায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। দেবতার এ অপরাধের ক্ষমা নাই। যদি দেবতার দেখা পাই, তাহা হইলে তাহারও হৃদয়ে একবার এইরূপ আত্মীয় বিচ্ছেদের ব্যথা জাগাইয়া দিই! এমন কি হয় না? দেবতাকে কি পাওয়া যায় না?

মাথার উপর দিয়া বিকট ডাক দিয়া কাল পেঁচা হুস্ হুস্ শব্দে উড়িয়া গেল, কিন্তু সে তন্ময় হইয়াছিল, সে দিকে তাহার লক্ষ্য হইল না। তাহার হৃদয়ে তখন অতৃপ্ত বাসনার আগুন রি রি করিয়া জ্বলিতেছিল, তাই তাহার দৃষ্টি বহির্জগতের উপর ন্যস্ত থাকিলেও কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছিল না; যাতনায় অন্ধ হইয়া একটা গভীর বিষাদের শ্বাস ত্যাগ করিয়া রমেন্দ্র বলিয়া উঠিল, "আঃ, এত লোক মরছে, আমার মৃত্যু হয় না কেন? যদি মরতে পারতুম!"

মাথার উপরে আবার পেঁচা ডাকিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে একখানা কাল মেঘে জ্যোৎস্না ঢাকিয়া গেল। এই এতক্ষণ নক্ষত্রখচিত নীল নির্ম্মল আকাশ চন্দ্রকরে ঝকমক করিতেছিল, কোথা হইতে অকস্মাৎ এই মেঘখণ্ড ভাসিয়া আসিল? মুহূর্ত্তপরে মেঘ সরিয়া গেল, আবার সুধাংশুর রজতধারায় জগৎ হাসিয়া উঠিল। সেই স্ফুট চন্দ্রালোকে রমেন্দ্র দেখিল, একটী শ্বেতবসনা রমণীমূর্ত্তি ধীরে ধীরে—যেন একখণ্ড শুভ্র স্বচ্ছ মেঘেরই মত নিঃশব্দপদসঞ্চারে হাওয়ায় ভর দিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। রমেন্দ্রের সর্ব্বশরীরে রোমাঞ্চ হইল, বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত হইল। বহুদিন পরে রমেন্দ্রের বাহ্যানুভূতিশক্তি যেন ফিরিয়া আসিল। কে এ শুক্লবসনা সুন্দরী?

হঠাৎ রমেন্দ্রের মনে পড়িল, সন্ধ্যার পর আভার সহিত সেই কথোপকথন। তবে কি আভা তাহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত অসম্ভবকে সম্ভব বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত এই অভিনয় করিতেছে? হাঃ হাঃ হাঃ! দুষ্টু মেয়ে, আজ আমিও তবে এই ভাণ অভিনয়ে যোগদান কর্‌বো। ভেবেছে, আমায় ভয় দেখাবে!

রমণী-মূর্ত্তি একবারে রমেন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘনাবগুণ্ঠনে রমণীর মুখচন্দ্রমা আচ্ছন্ন, সর্ব্বাঙ্গ অতি সূক্ষ্ম শ্বেত ওড়নার আবরণে আচ্ছাদিত। মূর্ত্তি এক হস্ত নক্ষত্রাচ্ছাদিত নীলাকাশের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখাইয়া নীরবে নিশ্চল পুত্তলের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

রমেন্দ্র যথাসম্ভব কণ্ঠস্বর গম্ভীর করিয়া প্রকৃতির গম্ভীরতার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া জিজ্ঞাসিল, "কে তুমি,—শান্তিদায়িনী প্রকৃতির সুখ শান্তির বিঘ্ন ঘটাইয়া উপস্থিত হইয়াছ কে তুমি?"

মূর্ত্তি রমেন্দ্রের সুরে সুর মিলাইয়া উত্তর দিল, "আমি তোমার বন্ধু, যে ব্যথায় ব্যথিত হইয়া তুমি ব্যথাহারীর সন্ধান করিতেছিলে, আমি তোমার সেই ব্যথার ব্যথী বন্ধু। আমি তোমার ব্যথার অবসান করিতে আসিয়াছি।"

রমেন্দ্র তন্দ্রাঘোরেও শুনিল, সে স্বর আভার নহে, সে স্বর যেন এই পৃথিবীরও নহে। রমেন্দ্রের শরীরের রক্তস্রোত স্তম্ভিত হইয়া গেল! দারুণ উত্তেজনাবশে তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর কাঁপিয়া উঠিল। তবু সে অভিনয়ের ভাণে বলিল, "তবে তুমি কি আমার ব্যথার ব্যথী মৃত্যু। এ দুর্ব্বহ জীবনভার কে স্বেচ্ছায় বহিতে চাহে? যাহাকে চাই তাহাকে ত মাথা কুটিয়া মরিলেও পাই না। তাই কি বুভুক্ষিত হৃদয়ের ক্ষুধা মিটাইতে, আকাঙ্ক্ষার তীব্র জ্বালা মিটাইয়া দিতে, ব্যথিত মর্দ্দিত হৃদয়ের ব্যথার অবসান করিতে আসিয়াছ তুমি—মৃত্যু? এস মৃত্যু, ভাই, সখা, বন্ধু, তুমি না আসিলে ত মানুষের জীবন সম্পূর্ণ হয় না। তবে মৃত্যু, তুমি আজ এই নারীর সাজে আসিয়াছ কেন?"

অবিকম্পিত স্বরে মূর্ত্তি বলিল,—"আমি কখনও নারী, কখনও পুরুষ। যখন যে বেশে আমায় তোমরা দেখিতে চাও, আমি তখনই সেই বেশেই তোমাদের দেখা দিই। আমায় যে আলিঙ্গন করিয়া আমাতেই আত্মস্থ হইয়াছে, তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী সেই নারীকে দেখিবার উৎকট আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলে, তাই নারী বেশেই দেখা দিতে আসিয়াছি।"

রমেন্দ্র ভাবিল, আভা অভিনয় করিতেছে মন্দ নয়। সে কণ্ঠস্বর পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিয়াছে। হাসিয়া বলিল, "মৃত্যু, তুমি কি আমায় লইতে আসিয়াছ? আমিও কি তোমাতে আত্মস্থ হইব? তবে অবগুণ্ঠন মোচন করিতেছ না কেন? তোমার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া আমাকে তোমাতে লীন করিয়া লও।"

"আমার গুপ্ত ব্যক্ত উভয় রূপই লোকচক্ষুর সকাশে ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন। কে আমাতে লীন হয়, সেই আমার স্বরূপ দেখিতে পায়। তুমি এখনও আত্মস্থ হও নাই, তোমার পক্ষে এই অবগুণ্ঠন অনবগুণ্ঠন তুল্য মূল্য।"

"ভাই মৃত্যু, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?"

"আমি সকল স্থান হইতেই আসিতেছি। এই গ্রহ তারা চন্দ্র সূর্য্য সমন্বিত

শত সৌরমণ্ডল যাহার অণুপরমাণু, সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এমন স্থান নাই, যেস্থান হইতে আমার শুভাগমন না হয়।"

"তবে ত তোমায় বহুস্থানে বিচরণ করিতে হয়?"

"হাঁ। আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত স্থানে বিচরণ করি। যেখানে জীব জন্তু উদ্ভিদ কীট পতঙ্গ বিচরণ করে, সেই খানেই আমি বিচরণ করি, আমি তাহাদের পদচিহ্ন ভূপৃষ্ঠ হইতে মুছাইয়া দিই। আমার গতি সর্ব্বত্র।"

"তুমি একাকী বিচরণ করিতেছ, তোমার সঙ্গী কেহ নাই?"

"না। তুমিও এ জগতে একাকী আসিয়াছ, সঙ্গী কেহ তোমার আসে নাই। তুমি নিঃসম্বল হইয়া আসিয়াছ, সম্বলও কিছু তোমার যাইবার দিনে থাকিবে না।"

"তবে যে তুমি বলিলে, তুমি আমার বন্ধু, যাইবার দিনেও আমার বন্ধু? তোমার কোন্ কথা সত্য?"

"আমার সবই সত্য, সবই সুন্দর। তবে আমার স্বরূপ দেখিতে পাওনা বলিয়া তোমরা আমায় ভয় কর। কিন্তু আমিই একমাত্র তোমাদের বন্ধু। একাকীই আসিয়াছ, একাকীই যাইবে বটে, কিন্তু আমি তোমাদের বন্ধুরূপে একটীবার মাত্র তোমাদের চুম্বন করি, সেই স্পর্শে আমাদের দুই এক হইয়া যায়।"

"আমি তোমায় ভয় করি না।"

"ইহাতে আমি বড়ই আনন্দ অনুভব করিতেছি। যে আমায় ভয় করে না, যে আমার বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ এই চুম্বনের স্পর্শ হাসিমুখে অনুভব করে, যে আমায় বন্ধুরূপে পাইয়া আত্মস্থ হইতে চাহে, সে আমায় বড় আনন্দ দান করে। কিন্তু যে আমার জন্য সকল সময়ে সকল অবস্থায় হাসিমুখে প্রস্তুত নহে, সে আমায় বড় কষ্ট দেয়।"

বন্ধুরূপে চুম্বন-স্পর্শে তুমি কি শান্তি প্রদান কর?"

"আমি আমার স্পর্শে রোগগ্রস্ত দেহ মনের রোগ দূর করি। যাহারা ব্যাধি পীড়িত হইয়া রোগের যন্ত্রণায় দারুণ কষ্ট উপভোগ করে, আমি তাহাদিগকে একটী চুম্বন স্পর্শে সকল রোগের জ্বালা হইতে মুক্ত করি। যাহারা ইহা অপেক্ষাও দারুণ যন্ত্রণাদায়ক মানসিক পীড়ায় কাতর হয়, যাহারা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা বা বাসনার তাড়নায় মনের মধ্যে অশান্তির চিন্তা জ্বালিয়া অহঃরহ পুড়িয়া মরে, যাহারা বুভুক্ষিত অন্তঃকরণের খাণ্ডবদাহের ক্ষুধা দাউ দাউ

জ্বালাইয়া রাখিয়া অন্তরে দ্বেষ হিংসা ক্রোধ ও লোভ পুষিয়া রাখে, তাহাদিগকেও আমি চুম্বনস্পর্শে রোগমুক্ত করি, শান্ত করি। যাহারা বাসনার অনুরূপ কাম্যবস্তু হস্তগত করিতে অসমর্থ হইয়া বিধাতাকেও অভিসম্পাত দেয়, আমি সেই হতভাগ্যদিগকেও তাহাদের ব্যর্থ জীবনে শান্তি আনিয়া দিই। আমি সকলের বন্ধু।"

রমেন্দ্র ভাবিল, অভিনয় ঢের হইয়াছে, এইবার আভাকে ঘরে গিয়া শয়ন করিতে বলি। রমেন্দ্র প্রকাশ্যে বলিল, "আভা, তোকে চিনেছি। বেশ অভিনয় করেছিস্। এখন রাত হয়েছে, শুগে যা।"

রমণীমূর্ত্তি আরও দুই পদ অগ্রসর হইয়া রমেন্দ্রের হস্ত স্পর্শ করিল, রমেন্দ্রের সমস্ত শরীরের ভিতর দিয়া একটা তড়িৎ প্রবাহ বহিয়া গেল। রমণী তখন অবগুণ্ঠন অপসারিত করিয়া ফেলিল। রমেন্দ্র দেখিল, অপার্থিব সৌন্দর্য্য, তাহাতে জলস্থল হাসিতেছে। মুখমণ্ডল প্রশান্ত—প্রসন্ন, দৃষ্টি দয়া কোমলতা ও স্নেহরসে ভরপুর। রমেন্দ্র চীৎকার করিয়া বলিল, "মৃত্যু! মৃত্যু! সত্যই কি তোমার এই রূপ? তবে লোকে তোমায় ভয় করে কেন?"

"সত্যই আমার এই রূপ। মিথ্যা ভয়ে লোকে আমায় ভয়ঙ্কর দেখে।"

রমেন্দ্রের সমস্ত প্রাণটা বহিয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস প্রবাহিত হইল। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে আবেগকম্পিতস্বরে বলিল, "মৃত্যু! ভাই, যদি এসেছ, তবে আমায় তোমার চুম্বন স্পর্শ দাও, আমার ব্যথা হরণ কর।"

রমণীর প্রশান্ত মুখমণ্ডল গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। রমণী বলিল, "ধীরে, রমেন্দ্র ধীরে! আমার চুম্বন-স্পর্শ-সুখ আস্বাদন করিতে চাও, কিন্তু তোমার মন এখনও সংযত করিতে পার নাই, চিত্ত শুদ্ধ করিতে পার নাই। এখনও তোমার মন দারুণ ক্রোধ ও হিংসায় পরিপূর্ণ রহিয়াছে। যে শান্ত, তাহার অন্তে তুমি বিধাতার বিধানে ক্রুদ্ধ হইয়াছ। অনন্তে আত্মস্থ হইবার বাসনা পোষণ করিতেছ, এখন এই ক্রোধ হিংসা বর্জ্জন কর। তবে ত আমার চুম্বনসুখস্পর্শ অনুভব করাইব।"

রমণী আবার বলিল, "বন্ধু, আজ এই কয়বৎসর তুমি জগতের অনন্ত সৌন্দর্য্য ক্রোধভরে চোখ মেলিয়া দেখ নাই, বিধাতার অফুরন্ত করুণার দান অভিমানভরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছ, একটী শান্ত লালসাময় শরীরীর অভাবে তোমার কর্ম্মময় জীবন ব্যর্থ করিয়াছ, বিধাতার বিধান লঙ্ঘন করিতে

গিয়াছ। দেখ, দেখ, ঐ নক্ষত্রখচিত নীলাকাশে অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কত সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে! বল বল, ভগবানের অপার দয়া, তিনি মঙ্গলময়, তিনি তোমার শোকের ও বিচ্ছেদের অগ্নিপরীক্ষায় ফেলিয়া তোমারই মঙ্গল সাধন করিয়াছেন, তোমায় মানুষের কর্ম্মময় জীবনের পথে দ্রুতগতি অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত করিয়াছেন। সেই মঙ্গলময় বিধাতার উপর অভিমান, ক্রোধ? এই ক্রোধ, এই অভিমান মনে পুষিয়া তুমি আমার চন্দন-শীতল চুম্বনস্পর্শ চাও? বল, হে মঙ্গলনিদান মঙ্গলময়! তোমারই মঙ্গল বিধানে আমার মরণে নবজীবন অঙ্কুরিত হউক।

রমেন্দ্র কোথায় কোন্ রাজ্যে বিচরণ করিতেছিল, তাহা বুঝিতে পারিল না। সেখানে সব সুন্দর, সব সত্য, সব শিব। রমেন্দ্র আবেশে বিভোর হইয়া বলিল, "জয় মঙ্গলময় বিধাতা! যাহা কর সবই মানব-মঙ্গলের জন্য। আমার কলুষিত মনে শান্তি দাও প্রভু! ক্ষুদ্র শান্ত মানুষ আমি, তোমায় ত বুঝি নাই।" রমেন্দ্রের চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল, দেহ এলাইয়া পড়িল, দরবিগলিতধারে অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

তখন কাহার সুখালিঙ্গন স্পর্শে তাহার দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, পূর্ণ শান্তির শীতলস্পর্শে শরীর জুড়াইয়া গেল। অতি কোমল অতি স্নেহার্দ্র স্বরে কে যেন তাহার কাণের কাছে বলিতে লাগিল, "রমেন্দ্র! ভাই! বন্ধু! আর অশান্তি নাই। তুমি মরণে জীবন পাইতেছ। এই দেখ, আমি তোমায় চুম্বনসুখস্পর্শ প্রদান করিতেছি। আমিই ব্যথিতের বন্ধু, আমিই ভগ্নহৃদয়ের সান্ত্বনা, আমিই পাপ তাপ শোক দুঃখের অন্তকারী, আমিই পরিশ্রান্তজীবনে মমতাহীন দুঃখীতাপীর আশা ভরসা। আমি এসেছি, তুমিও নবজীবন লাভ করিয়া কর্ম্মজীবনে প্রবেশ কর, সংসার-সংগ্রামে দ্বিগুণ তেজে অগ্রসর হও, যিনি সকলের ভাগ্যবিধাতা তাঁহাতে সকল ভার অর্পণ করিয়া কর্ম্ম করিয়া যাও। এই আমি তোমার নয়নপল্লবে শান্তিদায়িনী নিদ্রাদেবীকে প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলাম। শান্তিলাভ কর। শ্রান্তি দূর হইলে মানুষের মত জীবনসংগ্রামে অগ্রসর হও, বিধাতার দান এই অমূল্য মানবজীবন বৃথায় যাইতে দিও না।"

(৩)

"দাদা, দাদা! বেশ, একা এই খোলা ছাদে হিমে পড়ে রয়েছো?"

রমেন্দ্র চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া বসিল। তাহার চোখে দারুণ বিস্ময়ের চিহ্ন প্রকটিত।

আভা অভিমানভরে বলিল, "বাটীতে কি এমন মানুষ নেই যে, লোকটাকে বলে ঘরে গিয়ে উঠে শুতে? দাদা, এমনই ক'রে কোন দিন বেঘোরে প্রাণটা খোয়াবে।"

রমেন্দ্র বলিল, "আভা, তোরা কোথায় ছিলি? আমি কত স্বপ্ন দেখ-ছিলুম। আঃ, এমন করে স্বপ্নটা ভেঙ্গে দিতে হয়?"

"না হয় আর একবার ঘুমোও, ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখ। মাগো, থিয়েটার দেখে ফিরে এলুম, তবুও দাদা যেখানে ছিলে সেইখানেই ইজিচেয়ারে ঠেস দিয়ে ঘুমোচ্ছো। দেখ দেখি, মাথাটাও হিমে ভিজে গেছে।"

রমেন্দ্রের চক্ষুতে অপরূপ দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল, তাহার ম্লানমুখে অপার্থিব হাসি দেখা দিল, সে উৎসাহভরে বলিয়া উঠিল, "না আভা, আর ভাবিস নি। তোর দাদার তন্দ্রাঘোর কেটে গেছে, সে এখন থেকে নতুন মানুষ হয়েছে।

অমিয়া।

লেখিকা,—শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী।

(১)

বেলা অপরাহ্ণ। ১৯ বৎসর বয়স্কা একটি যুবতী কুটীরের দাওয়ায় বসিয়া বারেবারে রাস্তার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে, যেন কাহার প্রতীক্ষায় আছে। স্বামীকে দেখিয়া রমণী শশব্যস্তে উঠিয়া তাঁহাকে বসিতে কাষ্ঠাসন দিয়া বলিল,—"মুখখানা শুকিয়ে গিয়েছে! বেলা কি আর আছে, কখন্ মুখে জল দেবে, এরূপ ক'রে পিত্তি পড়ালে যে অসুখ কর্‌বে!"

স্বামী। এক গেলাস জল দাও, বড় পিপাসা পেয়েছে।

স্ত্রী।—ভাত দিয়াছি, এস। বাসী পেটে আর শুধু জল খেও না।

স্বামী হাত মুখ ধুইয়া ভোজনে বসিলেন। খাইতে খাইতে বলিলেন,—"অমিয়া! আমার মুখখানা শুকিয়ে গেছে, তাতেই অস্থির হয়েছ, কিন্তু আমার প্রাণের ভেতর কত জ্বালা, চিন্তায় বুকের রক্ত হুহু ক'রে শুকিয়ে যাচ্ছে, তা ত জান; কি ক'রে ব'সে থাক্‌বো বল?"

স্ত্রী। দেখ, তুমি রাত-দিন হা-হুতাশ করো না। ভগবানের রাজ্যে কেউ না খেয়ে মরে না, ঈশ্বরে নির্ভর কর, তিনিই একটি উপায় কর্‌বেন।

স্বামী। হা-হুতাশ কর্‌বো না বল্‌লেই কি হ'ল? জোর ক'রে কি চিন্তা ঠেলে দেওয়া যায়। চারিদিন হ'ল, দুই সের চাল এনেছি, তার পর একটি পয়সাও সংগ্রহ কর্‌তে পার্‌লাম না। সংগ্রহ কর্‌বোই বা কোথা হ'তে? সম্পত্তির মধ্যে ত এই ঘরখানি, কোন রকমে মাথা গুঁজে পড়ে থাকি, লেখাপড়া জানি না, আজ-কাল কত লেখাপড়া-জানা লোক চাকুরী পাচ্ছে না, আমি তো কোন ছার!

(২)

পরিশ্রমে ও অনশনে দীনেন্দ্রনাথ ঘুমিয়ে পড়েছেন। পার্শ্বে বসিয়া অমিয়া স্বামীর অনশনক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া অজস্রধারে অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে আস্তে আস্তে তাঁহার পায়ে হাত বুলাইতেছে। পাশ ফিরিতে সহসা দীনেন্দ্রের ঘুম্ ভাঙ্গিল। তিনি বলিলেন, "অমিয়া, এখনও শোও নাই! তিন বেলা না খেয়ে রাত জাগলে যে অসুখ কর্‌বে!" এই বলিয়াই তিনি অমিয়াকে সাদরে বুকে টানিয়া লইলেন।

অমিয়াকে হৃদয়ে লইয়া তিনি যেমন আনন্দ পাইলেন, তেমনি দুঃখও প্রবলতর হইয়া উঠিল। মনে ভাবিলেন, এমন স্ত্রী কয়টি লোকের ভাগ্যে মেলে! এত দারিদ্র্যের মধ্যেও আমায় কেবল ভুলিয়ে রাখে, আর আমি কি কঠিনহৃদয়—স্বার্থপর যে, যখন নিজের খোরাকী সংগ্রহ করিতে পারি না, তখন কেন এ রত্ন ঘরে এনেছিলাম? কত দিন কত উপোসে সোণার প্রতিমা কালী হয়ে যাচ্ছে, তিলতিল ক'রে মরণের পথে অগ্রসর হচ্ছে, আমি স্বামী হয়ে তাই দেখছি।"

অমিয়া। তোমার কি মাথা ধরেছে?

দীনেন্দ্র। না।

অমিয়া। তবে বিষণ্ণ হয়ে রয়েছ কেন? একটু বাতাস করবো?

দীনেন্দ্র। না, তুমি শুয়ে থাক।

দুই তিন মিনিট দুইজনেই নীরব। তার পর দীনেন্দ্রনাথ বলিলেন, "অমিয়া, কি নরাধমের হাতেই তুমি পড়েছ। একদিনের জন্যও তোমায় সুখী কর্‌তে পারি নাই। আর এখন দুটী ভাত না দিতে পেরে মেরে ফেল্‌ছি। কখন কি শুনেছ, স্বামী স্ত্রীকে ভাত দিতে পারে নাই? সময় সময় আমার আত্মহত্যা কর্‌বার ইচ্ছা হয়।"

স্বামীর কথা শুনিয়া অমিয়া শিহরিয়া উঠিল। বলিল, "ছি! অমন কথা

কি বল্‌তে আছে? আমি দেবতার হাতে পড়েছি। তুমি আমায় যত সুখী করেছ, কোন রমণী তত সুখিনী হয়েছে বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। স্বামীর ভালবাসার নিকট পৃথিবীর ঐশ্বর্য্যও তুচ্ছ। আমরা পরস্পরকে দেখলেই পরম সুখী। তোমার অনাবিল ভালবাসা আমাকে অমৃত সাগরে ডুবিয়ে রেখেছে।

(৩)

আজ আট দিন দীনেন্দ্রের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই, না বলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। অমিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া পাগলিনী প্রায় হইয়াছে। যত দেবতার নাম মনে আসিয়াছে, তত দেবতার কাছে মানসিক করিয়াছে, আর মাথা খুঁড়িয়াছে। কতবার আত্মহত্যা করিবার সংকল্প করিয়াছে। আবার স্বামী আসিয়া তাকে না দেখিয়া যদি মারা যায়, সেই ভয়ে মরে নাই।

অমিয়া এই অবস্থায় দারুণ মনের কষ্টে একাকিনী দিন কাটাইতেছিল। সুবর্ণ সুযোগ বুঝিয়া কত বদ্‌মায়েস সহানুভূতির ভাণ করিয়া আত্মীয়তা করিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছে। যে কয়দিন দীনেন্দ্র না আইসে, সে কয়দিন অমিয়াকে তাহাদের বাড়ীতে গিয়ে থাকিতে বলে। অমিয়া তাহাতে অস্বীকার করায় তাহারা তার খরচ দিতে চাহিল। অমিয়া তাহাও লইল না।

যখন কোনরূপেই অমিয়ার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার সুযোগ হইল না, তখন বদ্‌মায়েসের একজন অগ্রণী সন্ধ্যা-রাত্রে আস্তে আস্তে অমিয়ার ঘরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অমিয়া তখন দাওয়ায় বসিয়া কাঁদিতেছিল। অপরিচিত একজন পুরুষকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া মাথায় কাপড় দিল।

আগন্তুক বলিল, "আমায় দেখিয়া লজ্জা কর্‌তে হবে না; আমি দীনেন্দ্রের একজন বন্ধু। তার কোন সংবাদ পাওয়া গিয়াছে কি না জান্‌তে এসেছি।"

অমিয়া মনে মনে বলিল, এত কষ্টের মধ্যে কোন দিন কেহ বন্ধু বলিয়া পরিচয় দেয় নাই। এখন তাঁর অনুপস্থিতিতে কত লোকই বন্ধু হয়ে আস্‌ছে। একটু দূরে সরিয়া গিয়া বলিল, "না, তাঁর সংবাদ পাই নাই, আপনি এখান থেকে যান। আমি জানি, এ জগতে তাঁর কেহ বন্ধু নাই।" এই বলিয়াই অমিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিতেছে, এমন সময় ঐ আগন্তুক দোর ঠেলিয়া খুলিয়া ফেলিল ও বলিল, "তুমি যেতে বল্‌লেই যাব না

কি? সুন্দরি! আজ তোমার কাছে সুখের নিশি কাটাইব বলিয়াই এসেছি।"

বদমায়েসের ঐ কথা শুনিয়াই অমিয়ার হৃদপিণ্ড কাঁপিয়া উঠিল; ধমনীতে উষ্ণ শোণিত দ্রুত বহিতে লাগিল। ক্ষণেকের মধ্যে ভীতি ভাব সামলাইয়া লইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সাধ্বীর রোষাগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তখন সে বলিল, "খবরদার! নরকের কীট! একটি পা যদি অগ্রসর হবি, বঁটীর এক কোপে তোকে দুখণ্ড কর্‌বো। হারামজাদা, পাজী, যমের দূত, এখনি বাহির হ'।" লোকটী তখনও নড়িল না দেখিয়া দুয়ারের পাশ থেকে বঁটী লইয়া আবার বলিল, "শোন্ নরাধম, পচা মড়া, পায়খানার পোকা, ইংরেজের আইন তো জানিস, আর একতিল যদি দাঁড়াবি, এই বঁটি তোর গলায় বসিয়ে দেবো।"

বে-গতিক দেখিয়া বদমায়েস তখন সরিয়া পড়িল। যাইবার সময় মনে মনে ভাবিল,—বাবা! এমন ত কখন দেখি নাই! এরূপভাবে কত যুবতীর কাছে গিয়াছি, তাহারা কাঁদিয়া কাটিয়া চীৎকার করিয়াছে। এমন তেজ কুত্রাপি দেখি নাই। যুবতী যেন ভীমা ভৈরবী ভয়ঙ্করা! বাপ্‌রে! সাধ্বী যেন সাক্ষাৎ ভগবতী! প্রকৃত সতীর কাছে যমও তিষ্ঠিতে পারে না, আমি তো কোন্ ছার! বেশ বুঝিলাম, সতীর দেহে সাক্ষাৎ ভগবতীর আবেশ হয়ে থাকে।

(৪)

নয় দিনের দিন বেলা দশটার সময় অমিয়া তুলসীমূলে প্রণাম করিতে করিতে স্বামীর মঙ্গল কামনা ও সংবাদ প্রার্থনা করিতেছে, এমন সময় ডাক-পিয়ন ডাকিল, "মা, আপনার নামে টাকা আছে, আপনি লিখিতে জানেন?"

অমিয়া বলিল, "হাঁ, জানি।"

টাকা নিতে গিয়া স্বামীর হস্তাক্ষর দেখিয়া অমিয়া আনন্দে অধীরা! তাড়াতাড়ি নাম সহি করিয়া কুপনখানি পড়িল। ছোট ছোট অক্ষরে কুপনে এইরূপ লেখা ছিল:—

"অমিয়া, তোমার নামে দুইটি টাকা পাঠাইলাম। কত কষ্টে যে তোমায় না ব'লে আসিয়াছি, তাহা ভগবানই জানেন, তুমিও জান। নিজের কষ্টকে কষ্ট বলিয়া মনে করি নাই। খিদেয় তোমার ম্লান মুখখানি আমার প্রাণে আগুনের স্যাঁকা দিয়াছে। তোমায় বলিলে আমায় আসিতে দিতে না, তাই বলি নাই। এখানে একজনের বাড়ীতে রাঁধিতেছি। ৫৲ টাকা করিয়া

দিবে। পয়সা অভাবে পত্র লিখ্‌তে পারি নাই। সাবধানে থাকিবে। ইতি তোমার হতভাগ্য স্বামী।"

স্বামীর সংবাদ পাইয়া অমিয়া যেমন নিশ্চিন্ত ও আনন্দিত হইল, তাঁহাকে রাঁধিতে হইতেছে জানিয়া তেমনি দুঃখে নিমজ্জিত হইল। স্বামীর প্রেরিত টাকা দুইটি তাঁহার বুকের রক্ত মনে হইতে লাগিল।

(৫)

দীনেন্দ্র মাসে মাসে ৫৲ টাকা করিয়া পাঠাইতেন। কিন্তু অমিয়া তাহা হইতে একটী পয়সাও খরচ করিত না। স্বামী রাঁধিয়া টাকা উপায় করিতে-ছেন তাহা মনে করিয়া যম-যন্ত্রণা ভোগ করিত। অপরের কাঁথা শেলাই করিয়া, লেস্ বুনিয়া দিয়া, নানাবিধ সূচিকার্য্য ও শিল্প দ্বারা অমিয়া নিজের জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। এইরূপে সুদীর্ঘ ছয়টী মাস কাটিল।

ছয় মাসে স্বামীর প্রেরিত ৩০৲ টাকা জমিয়াছে। তখন অমিয়া তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিয়া একবার বাড়ী আসিতে লিখিল।

ভবিষ্যৎ ভাবিয়া দীনেন্দ্র বাড়ী আসিলেন না। শেষে অমিয়া অভিমান-পূর্ণ পত্র পাইয়া এবং তাহাকে অনেক দিন দেখেন নাই, দেখিবার ইচ্ছাও বল-বতী হইয়াছিল বলিয়া ১৫ দিনের ছুটি লইয়া বাড়ী আসিলেন।

(৬)

স্বামী বাড়ী আসিলে অমিয়া যেরূপ করিয়া এ কয় মাস নিজের জীবিকা-র্জ্জন করিয়াছিল সে সমস্ত কথা তাঁহাকে বলিল। তার পর তাঁহার প্রেরিত টাকা কয়টী দিয়া বলিল, "আর সেখানে তোমায় যাইতে দিব না। তুমি রৌদ্রে ঘামিলে আমার প্রাণ মুচড়াইয়া উঠে, আর আগুনের তাতে তুমি এই কয় মাস কষ্ট পাইয়াছ ভেবে আমি যে কি পর্য্যন্ত কষ্ট অনুভব করেছি, তাহা ভগবানই জানেন। এখন এই টাকা কয়টা লইয়া ব্যবসা করা যাউক।"

স্বামী বলিলেন, "এই সামান্য পুঁজি লইয়া কি ব্যবসা হইবে?" পরিশেষে দুজনে পরামর্শ করিয়া ছোট একখানি মুদীখানার দোকান খুলিল। অমিয়া মুগ, মসুরী প্রভৃতির ডাল করিয়া দিত, দীনেন্দ্র বিক্রয় করিতেন; এইরূপে দোকান চলিত। তা' ছাড়া, অমিয়া পূর্ব্ববৎ লেস বুনা প্রভৃতি কার্য্যও করিত।

শুধু তাহাই নহে। একদিন অমিয়া স্বামীকে বলিল, "দেখ, আমি শুনি-য়াছি, রোহিণী ফল থেকে তেল হয়। পাড়াগাঁয়ে বন-জঙ্গলে লক্ষ লক্ষ

মণ ফল জন্মিয়া ঝরিয়া মাটিতে পড়িয়া নষ্ট হয়; সেদিকে কাহারও লক্ষ্যই নাই। যদি আমরা তেল বাহির করিয়া সস্তায় বিক্রয় করি, তবে গরীব দুঃখীরা জ্বালাইয়া বাঁচে। তা ছাড়া, বাকসের পাতা না কি কলিকাতার বেঙ্গল কেমিক্যালে খরিদ করে। ৫।৬ টাকা মণ। আবার শুনিছি, বেণা ঘাসের মূল ১৪৲ ১৫৲ মণ দরে বিক্রি হয়। এসব জিনিস তো আমাদের পাড়া-গাঁয়ে কিন্‌তে হয় না। সামান্য মজুরী দিলেই সংগ্রহ হয়। অবসরে তুমি এই সব জিনিসের চালানী কর।"

দীনেন্দ্র। খুব ভাল পরামর্শ। আমি আগামী কাল হইতেই ঐ কাজে লাগিব। যেমন পরামর্শ, তেমনি কার্য্য। দীনেন্দ্র পরদিনই কেমিক্যালে পত্র লিখিয়া দশ মণের অর্ডার পাইলেন। লালবাজার থেকে বেণার মূলের, অন্যান্য স্থান থেকে অন্যান্য দ্রব্যের অর্ডার পাইলেন। বাব্‌লার আঠা, বাব্‌লার ছাল, কন্টিকারী প্রভৃতি দ্রব্যও চালানী দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত হইল।

দুই বৎসরের মধ্যেই দীনেন্দ্রের হাতে বেশ দু'পয়সা জমিয়া গেল। তখন তিনি বেশ বড় রকম দোকান করিয়া ২।৪ জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলেন। দীনেন্দ্রের ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট। অমিয়া সকল কর্ম্মচারীকেই নিজের সন্তান মনে করেন।

যেখানে স্বামী স্ত্রীতে বিশুদ্ধ প্রণয়, সেখানে কমলার কৃপাদৃষ্টি নিশ্চয়ই পড়িয়া থাকে।

আর ছয়মাস পরেই দীনেন্দ্র কয়েক বিঘা লাখেরাজ জমি কিনিয়া দুই হাজার নারিকেল চারা রোপণ করিলেন, আর এক হাজার শিশুগাছ প্রস্তুত কারলেন।

অনেক কর্ম্মচারী থাকা সত্ত্বেও দীনেন্দ্রনাথ প্রত্যুষে উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া নিজে দোকানের সমস্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। বেলা ১১ টার সময় গৃহে আসিতেন। আবার বেলা ৩টার সময় দোকানে বসিতেন, রাত্রি ১২টার সময় খাতাপত্র হিসাব নিকাশ শেষ করিয়া ফিরিতেন। আলস্য কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না।

দেখিতে দেখিতে আট বৎসর চলিয়া গেল। দীনেন্দ্র এখন ধনী। তাঁহার নারিকেল গাছের বার্ষিক আয় দুই হাজার টাকা। শিশুগাছগুলি পঁচিশ হাজার টাকায় বিক্রী করিলেন। যাহারা কিনিল, তাহারা ২০ বৎসর পরে গাছ লইবে কথা হইল; গাছ লইলে দীনেন্দ্রের জমি দীনেন্দ্রেরই থাকিবে।

যাহারা গাছ লইল, তাহাদেরও লাভ; কেন না, লক্ষ টাকার জিনিস ২৫০০০৲ টাকায় তাহারা প্রাপ্ত হইল।

একযোগে ২৫০০০৲ টাকা হাতে পাইয়া দীনেন্দ্র দাঁও মত বেশ একটা লাভের জমিদারী কিনিয়া ফেলিলেন। বলা বাহুল্য, দীনেন্দ্র পদ-মর্য্যাদার অনুরূপ অভ্রভেদী সৌধ হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করাইলেন।

যেখানে সেই ক্ষুদ্র কুটীরখানি ছিল, এখন সেখানে মর্ম্মরপ্রস্তর-খচিত ত্রিতল সৌধ। সেই প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকার সংলগ্ন প্রাকার-বেষ্টিত উদ্যান। একটি উদ্যানে নানাবিধ ও নানা দেশীয় সুমধুর ফলের কলমের গাছ। অপর একটি উদ্যানে নানাজাতীয় ফুল। ফুল-বাগানের মধ্যে স্বচ্ছ সলিলপূর্ণ পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর চারিদিকে চারিটি ঘাট বাঁধান। সুন্দর, সুপ্রশস্ত সোপানাবলী স্বচ্ছ সলিলের তলদেশ পর্য্যন্ত সুবিন্যস্ত। পুষ্করিণীর ধারে লৌহ-রেলিং দ্বারা বেষ্টিত। রেলিংএর পাশে গোলাপ, যুঁই, গন্ধরাজ প্রভৃতি ফুল ও অসংখ্য প্রকার ক্রোটন। জলে বড় বড় রুই কাতলা নির্ভয়ে মন্থরগতিতে বিচরণ করিতেছে।

সেই হর্ম্ম, সেই উদ্যান, সেই পুষ্করিণী একসঙ্গে মিলিয়া প্রাণে কেমন একটা মধুর ছাপ আনিয়া দেয়। দীনেন্দ্রের এই বাড়ীখানি যেন একটা স্বপ্নরাজ্য—যেন কমলার নিকেতন বলিয়া মনে হয়। অমিয়া আদর্শ সাধ্বী; অমিয়াই সাক্ষাৎ কমলা। সাধ্বীর দেহই কমলার আশ্রয়।

অমিয়ার একটু অধিক বয়সেই একটি পুত্রসন্তান হইয়াছে।

বসন্তকাল। বৈকাল বেলা। দীনেন্দ্রনাথ ও অমিয়া পুষ্করিণীর চারিধারে বেড়াইতেছেন। অমিয়ার কোলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর একটি এক বৎসরের শিশু। এমন সময় গেরুয়াবসনধারী একজন সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসীর পেছনে একজন চাকর।

চাকর বলিল, "বাবু! আমার বারণ করা সত্ত্বেও এই সন্ন্যাসী আপনারা এখানে আছেন শুনিয়া, চলিয়া আসিল। সন্ন্যাসী বলিয়া কিছু বল্‌তে পার্‌লেম না।"

দীনেন্দ্র বলিলেন, "আসিয়াছেন; তাতে দোষ হয় নি। তুমি এখন যাও।"

চাকর চলিয়া গেলে, সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া দীনেন্দ্র বলিলেন, "আপনার কি প্রয়োজন?"

সন্ন্যাসী তাঁর কথার জবাব না দিয়া অমিয়ার দিকে ফিরিয়া বলিল, "মা, এজন্মে অনেক কু-কাজ করিয়াছি। কিন্তু আপনার নিকট যেদিন পশুর মত এসেছিলাম, সেই দিন আমার চোখ ফুটিয়াছে, সেই দিন হইতে আমি জগতের স্ত্রীজাতিকে মাতৃমূর্ত্তি দেখিতেছি, আপনিই এই পশুকে মানুষ করিয়াছেন, আপনি সাধ্বীর শিরোমণি, আপনি সাক্ষাৎ ভগবতী, আমার গুরু, আমার জননী। পায়ের ধূলা দিন, এ অধম পবিত্র হউক।"

অমিয়া বলিলেন, "বৎস, তোমার সুমতি হয়েছে দেখে প্রীত হ'লেম। ভগবান তোমার কল্যাণ করুন।" সন্ন্যাসী প্রণাম করিয়া ভক্তিগদ্‌গদ সাশ্রুনয়নে চলিয়া গেল। অমিয়া উহার বৃত্তান্ত স্বামীকে বলিল। দীনেন্দ্র বলিলেন, "যার এরূপ স্ত্রী, তার মত সুখী কে?"

ভাষার-নমুনা।

(লেখক,—নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু।)

জীমূত-জাল সমাচ্ছন্ন আকাশ-পটে আসমান্-সুন্দরী বিজলীবালা জ্বলিয়া জ্বলিয়া, হেলিয়া দুলিয়া, খেলিয়া খেলিয়া দেয়্‌লা কোচ্ছিল; দূরাগত রেলগাড়ীর চক্র-ঘর্ষোণোত্থিত ঘর্ঘর বরাধর মেঘের আওয়াজ কাণে বাজ্‌ছিলো; তারকা, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, এমন কী একটী ধূমকেতুও লোক-লোচনের গণ্ডীর ভেতর ছিলোনা। পুঞ্জীকৃত অন্ধকারের একটা বিপুল বোঝা মাথায় কোরে দুনিয়াটা ঝুঁকে পোড়েছেলো কুণ্ডলীকৃতা কবরী ভারাক্রান্তা কাঁকলাশ-কাঁকালী কামিনীর ন্যায় যেন। এই যে এমন জোছ্‌না-পরিহীনা মসীময়ী নিশা, এতে বোসেছিল একখানা সুইস্ ধরণের কটেজের ভেতর একখানা নাতি-উচ্চ নাতি-নীচ্চ খাটিয়ায় এক লালা ও লালায়িন্। গৃহের এক কোণে ছেলো একটী মাটীর কলসে শুভ্রাতরঙ্গিণী গঙ্গার পানী, অপর কোণে জ্বল্‌ছেলো এক দারুদীপাধারে এক মাটীর চেরাগ্, খাটিয়ার তলে দুখানা থারি, দুটা লোটা, আর্দুয়েকটা বর্ত্তন ও দৃষ্টিপথে এ যাহা প্রোড়ছিলো এ তাহা উহাদেরি, আরেকটা যূথ-চ্যুত চুয়া ভুক্তাবশিষ্ট রুটির প্রত্যাশায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলো সেই বর্ত্তনরাশি বেষ্টন কোরে চারোতরফ। লালা যুবক, লালায়িন্ যৌবন সীমা

অনেক দিন ছেড়িয়েছেন, প্রৌঢ়ত্বের পরপারও তেনার নজরের নিকটবর্ত্তী হইছে। লালার উমের যব অষ্টম বর্ষ, তখন জনক-জননীর আদেশে অষ্টাদশ বর্ষীয়া লালাইন্ লালার গলায় ফুলের মালা ও ক্ষুধার জ্বালা জীবন যৌবনের সঙ্গে অর্পণ করেন। হোতে পারে হয় তো প্রণয় ছেলো লালার হৃদয়ে সেই বয়সে, কিন্তু তদীয় মালিকের পালিত ভঁইসযুগল ভিন্ন সে প্রেমের উদ্দাম আবেগ বুঝ্‌তে পারে নি আর্কেও। বিদ্যুৎ উঁকি মারিল, মেঘ আঞ্চান করিল, আকাশ কাঁদিল; তখন লালায়িন্ লালাকে ভুজপাশে ছাঁদিল, মলিন-বসনা নলিন-দশনা কাংস্য-কঙ্কণরাশি ভূষণা সুখিয়া লালায়িন্ লালা গয়াপর্‌সাদকে ছাঁদিল এবং দাম্পত্য-প্রেমের উচ্ছ্বাসে অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত পতিবেচারীর পাগ্‌ড়ীতে একটী উত্তপ্ত বোচা মুদ্রিত করিল। অড়হর কি ডাল রোটির সঙ্গে কম হওয়ায়, লালার অন্তর গোসায় পূর্ণ ছেলো কিন্তু প্রিয়তমার বোচার উত্তাপে সে গোসা গলিয়া গেল, চাহিল সে প্রণয়িনীর পানে, জলভার-পীড়িত বিলোলিত নেত্রে বলিল এবং গদগদনাদিত বক্ষের উপকণ্ঠস্থ কণ্ঠে—লালায়িন্! লালায়িন্! হৃদয় সর্ব্বস্বে! প্রিয়তরতমে! জান্ মেরি! কলিজা মেরি! মুই মরমু মরমু! তোর ঐ শতদল-লাঞ্ছিত কোমল কদমে মোর এই শির থুয়ে যেন এই অধমের ফৌত হয়। পেয়েছিনু যে তব বৎ কর্ব্বুর কামিনী গর্ব্ব খর্ব্বকারিণী করিণী আমি এ দুনিয়ায় খোদার কেরামতে তার জন্যি শ্রীভগবানের কদমে মুই দুশো ছেলাম ঠুক্‌ছি, বল্‌ছি, আমি মুক্তকণ্ঠে যুক্তকরে ভুক্ত উদরে দ্যাবতার কসম করে—স্মর গরল খণ্ডনৎ দংশয় মম মণ্ডনৎ দেহি পদ বল্লব বল্লভে My Honey, My love! করি জিগ্যেস্ এক্ষণে, হে হাটক বদন পাঠক ও ভো নাটিকা চাটিকা পাঠিকাবৃন্দা, যদি এমনি ছন্দে সর্ব্ববিধ গন্ধে ভালোয়-মন্দে মনের আনন্দে দূরে ফেলে ব্যাকরণ বন্ধে লিখি আমি কাব্য একখানি, তা'লে কী —

গৌড়জন মোহে আনন্দে করিবে পান।
গদ্যের এ আদ্য শ্রাদ্ধে কুশ বৃষ দান॥
মন্দঃ কবি যশঃ প্রার্থী দ্বিজ কহে মৃদুভাষে।
বাঙ্‌লা বুলিটা মুই আন্ কচ্ছি খাসে॥

ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

ভারতগৌরব মহাত্মা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। *

(লেখক,—শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।)

আজ শারদীয় রবি বাসরে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্ কাহার তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন? কে ঐ অবগুণ্ঠনাবৃত মহাপুরুষ—যাঁহার স্মৃতিকথা মনে উদিত হওয়ায় আজ নয়নের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া অবিরল অশ্রুধারা নিপতিত হইতেছে? কে ঐ পুণ্যাত্মা—যাঁহার পূত মুখচ্ছবি মনে পড়িতেই ভক্তিভরে মস্তক নত হইতেছে? ঐ নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ প্রতিকৃতি সেই মহাত্মারই যিনি দরিদ্রের পর্ণকুটীরে জন্মিয়া পরিশেষে অম্বরচুম্বী প্রাসাদবাসী হইয়াছিলেন, ঐ প্রতিকৃতি তাঁহারই—যিনি আজীবন ব্রাহ্মণোচিত আচার অনুষ্ঠান, চরিত্রগত সরলতা মনীষি-জন-সুলভ মনীষা, মহাজনোচিত বিনয় প্রভৃতির জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত আপন জীবনে দেখাইয়া সজ্ঞানে গঙ্গার পূততীরে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। যাহা যায় তাহা আসে না, আসিলেও যেমনটি ছিল তেমন আর হয় না। বিদ্যাসাগর, ভূদেব প্রভৃতি একনিষ্ঠ ব্রাহ্মণসন্তানগণের স্বর্গারোহণের পর একমাত্র গুরুদাসই প্রাচ্য-প্রতীচ্য সভ্যতার প্রবল তরঙ্গের মধ্যে আপন বর্ণগত স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পূর্ণিমার শশধরের ন্যায় বিরাজ করিতেছিলেন। কিন্তু নিষ্ঠুর কালের আহ্বানে আমরা সে পূর্ণেন্দুর সুবিমল কিরণরশ্মিতে বঞ্চিত হইয়াছি—ভারতগগন তাই বিষাদের ঘনঘটায় আজিও সমাচ্ছন্ন।

গুরুদাসের জীবন-কথা অনেক আলোচিত হইয়াছে। এই বক্ষ্যমান প্রবন্ধের লেখকও ধারাবাহিকভাবে গুরুদাসের সবিস্তৃত জীবনী হিন্দু-পত্রিকায় লিখিয়াছে। সুতরাং সে কথার আর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই। ডায়মণ্ডহারবারের নিকটবর্ত্তী বারু গ্রামে গুরুদাসের পূর্ব্ব-পুরুষগণের বাস। তাঁহার পিতামহ নারকেলডাঙ্গায় আসিয়া বাস করেন এবং পরবর্ত্তী জীবনে লক্ষ্মী সুপ্রসন্না হওয়ায় তথায় একখানি ছোটখাট বাড়ীও করেন। ১৮৪৪ খৃঃ অব্দে এই নারিকেলডাঙ্গা পল্লীতেই স্যার গুরুদাসের জন্ম হয়।

* এই প্রবন্ধটী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গুরুদাস-স্মৃতি সভায় লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

পিতা রামচন্দ্র নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, শিশু গুরুদাস পিতার ক্রোড়ে বসিয়া গীতা শ্রবণ করিতেন। কে জানিত, তাঁহার শৈশব-হৃদয়ে গীতার যে বীজ বপিত হইয়াছিল, তাহা কালক্রমে "জ্ঞান ও কর্ম্ম" নামে মহীরূপে পরিণত হইবে? গুরুদাস দুই বৎসর দশমাস বয়সেই পিতৃহারা হন, তখন মাতুলালয়ে বিধবা মাতার স্নেহে, যত্নে, শিক্ষায় ও দীক্ষায় গুরুদাস লালিত-পালিত হইতে থাকেন। নারিকেলডাঙ্গার একটি পাঠশালায় পাঠ সমাপন করিয়া গুরুদাস নয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে General Assembly's Institutionএ ভর্ত্তি হন। গুরুদাস-জননী সোণামনী পুত্রকে স্নেহ করিতেন, কিন্তু অন্ধস্নেহপ্রযুক্ত পুত্রের দোষ দেখিলে উদাসীনা থাকিতেন না। একদিন পাঠশালা হইতে বালক গুরুদাস একটি সুন্দর পেন্‌সিল চুরী করিয়া আনিয়াছিলেন, সোনামণি পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়ায় বাটীর সন্নিকটবর্ত্তী কূপে তাহাকে ডুবাইতে গিয়াছিলেন। এমনই ধারা ধর্ম্মপরায়ণা, শিক্ষিতা জননীর আদর্শে গুরুদাসের বাল্যজীবন এমনই ভাবে গড়িয়া উঠিতে লাগিল যে তিনি বিদ্যালয়ের ছুটীর পর গৃহ হইতে কোথাও বহির্গত হইতেন না কিংবা শতপ্রলোভনেও বাজারের কোন আহার্য্য বা মিষ্টান্ন স্পর্শ করিতেন না। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে গুরুদাস হেয়ারস্কুল হইতে কৃতীত্বের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে Presidency কলেজ হইতে এফ্-এ এবং ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ঐ একই কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বি-এ পাশ করিবার পরই মাসিক ১৫০৲ টাকা বেতনে ঐ Presidencyতেই গণিতের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে গুরুদাস এম-এ ও ৬৬ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া গুরুদাস বি-এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বি-এল্ পরীক্ষায় সুবর্ণপদকটী লাভ করিবার জন্য এবং সতীর্থ নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে অতিক্রম করিবার জন্য গুরুদাস অহোরাত্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন। তাঁহার মাতা তাহা জানিতে পারিয়া বলিলেন, "বাবা, প্রত্যেকবারেই ত তুমি উচু হ'য়েছ, এবার না হয় সেই ছেলেটাই সোণার চাকৃতিখানা পাক্।" গুরুদাস কিন্তু মায়ের বাণী লঙ্ঘন করিয়াছিলেন।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে গুরুদাস প্রেসিডেন্সী কলেজে গণিতের অধ্যাপক পদের প্রার্থী হইয়া, তদানীন্তন ডিরেক্টর বাহাদুরের সহিত সাক্ষাত করিলে, তিনি গুরুদাসের পরিধানে একখানি ধুতি ও গায়ে একখানি লাল বনাত দেখিয়াই

বলিলেন, "মহাশয়, আমাদের কোন পণ্ডিতের দরকার নাই।" কিন্তু যখন শুনিলেন যে, আগুতোষ পণ্ডিত নহেন, পরন্তু একজন এম্-এ, তখন তাঁহার গুণাবলী শুনিয়া তাঁহাকে ঐ পদে নিযুক্ত করিলেন। প্রেসিডেন্সীতে কার্য্য করিবার পর গুরুদাস ও নীলাম্বর দুই বন্ধু একত্রে কিছুকাল জেনারেল এসেম্ব্রিতে অধ্যাপনা করিলেন। অতঃপর গুরুদাস বহরমপুরে মাসিক ৩০০৲ টাকা বেতনের অধ্যাপকতা গ্রহণের জন্য আহুত হন। অনেক প্রকারে মাকে প্রবোধ দিয়া গুরুদাস বহরমপুরে যাইয়া অধ্যাপকতা ও ওকালতী আরম্ভ করিলেন। তখন বহরমপুরে বার লাইব্রেরী ছিল না। গুরুদাস-প্রমুখ প্রবীণ ও নবীন ব্যবহারজীবীগণ কোর্টের হেড্ক্লার্ক বৈকুণ্ঠনাথ নাগের প্রকোষ্ঠে বসিয়া নানাপ্রকার খোস্গল্প করিতেন। এই সভার নাম ছিল "নবরত্ন সভা"। গুরুদাস এই সভার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত কবিতা রচনা করিয়াছিলেন—

উঠ বঙ্গভূমি মাতঃ ঘুমায়ে থেক না আর,
অজ্ঞান তিমিরে তব সুপ্রভাত হ'ল হের।
নানাগুণে গুণমণি বিক্রমাদিত্য নৃমণি
হারায়ে ওগো জননি! ছিলে বড়ই কাতর।
সেই রাজা পুণ্যবান ভ্রমি স্বর্গ নানাস্থান
বৈকুণ্ঠেতে অধিষ্ঠান করেছেন এইবার।
লয়ে নবরত্নগণে নানাশাস্ত্র আলাপনে
নানা সমস্যাপূরণে বসেছেন পুনর্ব্বার॥

এতদ্ব্যতীত নানাপ্রকার ধাঁধা রচনা করিয়া গুরুদাস অন্ন ও অর্থ চিন্তায় চমৎকার উকিলগণের শ্রান্ত ক্লান্ত মস্তিষ্ককে আরও ধাঁধায় ফেলিতেন। একটা নমুনা দি শুনুন,—

তরুণ্যালিঙ্গিতঃ কণ্ঠে নিতম্বস্থলমাশ্রিতঃ
গুরুণাং সন্নিধানেঽপি কঃ কূজতি মুহুর্মুহুঃ।

এ ধাধাঁর উত্তর আমি উল্লেখ করিব না, নানাবিধ আধিব্যাধি, দুঃখ-দুর্দ্দশায় যে সমস্ত শ্রোতৃগণ আজ চারিদিকে গোলকধাধাঁ দেখিতেছেন, তাঁহারাই এই ধাঁধাঁর উত্তর স্থির করিবেন। বহরমপুরে অবস্থান কালে গুরুদাস পণ্ডিতপ্রবর রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট "মিতাক্ষরা" প্রভৃতি হিন্দু আইন ও শকুন্তলা, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। এই

সংস্কৃত শিক্ষা তাঁহার ওকালতী ব্যবসায়ে বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছিল। একবার একটি স্ত্রীলোক পিত্রালয়ে থাকিয়া স্বামীর সম্পত্তির অধিকারিণী হইবার মানসে আদালতে অভিযোগ করিয়াছিল, গুরুদাস প্রতিবাদী পক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া শকুন্তলা নাটকের পঞ্চম অঙ্কের নিম্নলিখিত শ্লোকটী আবৃত্তি করিয়া বিচারককে বুঝাইয়া দিলেন যে, স্ত্রীলোক সতী হইলেও কেবলমাত্র পিতৃগৃহে অবস্থান হেতু লোকে তাহাকে ব্যভিচারিণী বলিয়া সন্দেহ করে। শ্লোকটী এই—

সতীমপি জ্ঞাতিকুলৈক সংশ্রয়াং
জনোঽন্যথা ভাতৃমতীং বিশঙ্কতে।
অতঃ সমীপে পরিণেতুরিষ্যতে
প্রিয়াহ প্রিয়া বা প্রমদা স্ববন্ধুভিঃ।

বলা বাহুল্য, সেবার এ মোকদ্দমায় গুরুদাস জয়ী হইয়াছিলেন। গুরুদাস অকৃতজ্ঞ ছিলেন না, তিনি যখন কলিকাতা হাইকোর্টের ধর্ম্মাধিকরণের পদে অধিষ্ঠিত, তখন রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহাকে লেখেন যে, কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার পেনসনের পরিমাণ ত্রিশ টাকা কমাইয়া দিয়াছেন। অতএব তিনি যদি ডিরেক্টর বাহাদুরকে একটু অনুরোধ করেন, তবে তাঁহার পূর্ণ পেন্সন প্রাপ্তি হইতে পারে। গুরুদাস কাহারও তোষামোদ করিবার লোক ছিলেন না, তিনি মণি অর্ডার যোগে রামগতিকে ত্রিশটী টাকা পাঠাইয়া দিয়া লিখিলেন যে, যতদিন তিনি হাইকোর্টের বিচারপতিপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন, ততদিন প্রতি মাসে রামগতিকে ত্রিশ টাকা পাঠাইয়া দিবেন। রামগতি অবশ্য গুরুদাসের নিকট হইতে আর কোন টাকা গ্রহণ করেন নাই।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে গুরুদাস মাতার ইচ্ছানুসারে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন এবং "ঠাকুর প্রফেসর" পদে নিযুক্ত হন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে গুরুদাস—দীন দরিদ্র ভিখারী ব্রাহ্মণের সন্তান হাই-কোর্টের বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত হন। হাইকোর্টে জজ হওয়ামাত্র অনেক আহুত, অনাহুত, রবাহূত বন্ধুবান্ধব তাঁহাকে সাহেব-মহলে বাসা করিতে পরামর্শ দেন, কিন্তু গুরুদাস বলেন যে, "আমার পিতা পিতামহ যে ভিটায় দেহত্যাগ করিয়াছেন, আমি তাহা ছাড়িব কেন?"

গুরুদাস যখন হাইকোর্টের জজ তখন এক মফঃস্বলবাসীর একটি মোক-দ্দমা গুরুদাসের এজলাসে হয়। মফঃস্বলবাসীর পক্ষে উকিল ছিলেন স্বর্গীয়

সারদাচরণ মিত্র। দুর্ভাগ্যপ্রযুক্ত মফঃস্বলবাসী মোকদ্দমায় হারিয়া গিয়া তৎপরদিন সারদাবাবুর সহিত মেসে সাক্ষাত করিয়া বলে যে, আমি মোকদ্দমায় নিশ্চয়ই জিতিতাম, কিন্তু কেবল ঐ যে বেঁটে, খিট্‌খিটে রোগা পেস্কার বেটা জজের কাণে কাণে কি বলিল, কেবল সেই কারণেই মোকদ্দমায় হারিয়া গেলাম। তখন সারদাবাবু বলিলেন, "ঐ রোগা খিট্‌খিটে বেঁটে লোকটাই আপনার মোকদ্দমায় সিনিয়র জজ্‌ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। মফঃস্বলবাসী শুনিয়াই অবাক্! বস্তুতঃ গুরুদাসের আকৃতি, পোষাক পরিচ্ছদ এরূপ সামান্য ছিল যে যাঁহারা তাঁহাকে না চিনিতেন, তাঁহাদের নিকট তিনি একজন সামান্য পুরোহিত ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়া প্রতিভাত হইতেন না। একবার এক বৃদ্ধা বিধবা বাড়ীতে কোন পূজা উপলক্ষে দ্বারে দাঁড়াইয়া পুরোহিতের অপেক্ষা করিতেছিলেন। গুরুদাস সেই পথ দিয়া নগ্নপদে শুভ্র উপবীত ধারণ করিয়া গঙ্গা স্নানান্তে ফিরিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্রই বিধবা সাগ্রহে বলিলেন, "ঠাকুর, আমার পূজাটী করিয়া দিবে?" বলা বাহুল্য, গুরুদাস বিন্দুমাত্র আপত্তি না করিয়া সেই বৃদ্ধার কুটীরে যাইয়া পূজা করিয়া আতপতণ্ডুল, কলা প্রভৃতি নৈবেদ্যের সম্ভার গামছায় বাঁধিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। সুদীর্ঘ ষোল বৎসর বিশেষ প্রশংসার সহিত হাইকোর্টে জজীয়তি করিবার পর গুরুদাস ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। হাইকোর্টে জজীয়তী করিবার সময় গুরুদাস এতাদৃশ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও দায়ীত্বজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন যে, একদা তাঁহার পঞ্চদশবর্ষীয় পুত্র যতীন্দ্রচন্দ্র বিসূচিকায় আক্রান্ত হন। সকাল বেলায় চিকিৎসগণ দেখিয়া বালকের জীবনের আশা পরিত্যাগ করেন। তথাচ গুরুদাস সেই প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম সুকুমার পুত্রকে মৃত্যু-শয্যায় রাখিয়া হাইকোর্টে গমন করিয়া যথারীতি আপন কর্ত্তব্য করিতে থাকেন। কিন্তু কোনসূত্রে প্রধান বিচারপতি তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বাটী যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করায় গুরুদাস বাটীতে আসিয়া দেখেন, তাঁহার পুত্রের জীবনহীন দেহ ধূলায় পড়িয়া লুটাইতেছে, আর সেই প্রাণহীন পুত্রের নিস্পন্দ দেহ বক্ষে করিয়া আত্মীয় স্বজনেরা হৃদয়বিদারক ক্রন্দন করিতেছেন। ইহা অপেক্ষা কর্ত্তব্যনিষ্ঠার আর কি জ্বলন্ত উদাহরণ থাকিতে পারে? হাই-কোর্ট হইতে অবসর গ্রহণকালে বিচারক ও ব্যবহারজীবীগণ তাঁহাকে বিদায় অভিনন্দন করেন, তদুত্তরে গুরুদাস যে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার চরিত্র বুঝিবার অনেক সঙ্কেত আছে। স্যার্ গুরুদাস বলেন,—

"You have been pleased to say many good and kind words concerning me with much warmth of feeling and, I trust, you will excuse me if, imbibing the warmth of feeling about me. I say anything which cool reason may not strictly approve. We merit praise the most when we want it the least, and we are utterly undeserving of it if we actually seek for it. Now whilst there are many who may not stoop so low as to seek for praise as an incentive for doing their duty, it is only a few who can aspire so high as to be able honestly to say that the inward satisfaction of having done their duty perfectly well places them above all praise. And to the former, therefore, good words coming from those whose opinions they value, after their work is done, always give gratification. Much as I have striven, much as I wish to be one of the fortunate few, I feel that I am only one of the ordinary many with the common imperfections and impurities of man, and I must, therefore, gratefully acknowledge that the very kind words which you have been pleased to say about me at a time when my work in this court is over, must be a source of great satisfaction to me. But I should ill-deserve your kindness if I were to appropriate to myself the many good things you have said as being wholly my due. I must freely own that what may apparently stand to my credit for any good work done, a very large share belongs to you for the help you have always rendered me in doing that work."

Calcutta Weekly note লিখিয়াছিল—

"During his sixteen year's work of the bench, he endeared himself to every body by his unvarying kindness, consideration and unfailing courtesy and was helped by all in high regard as a Judge owing to his strong sence of justice, his

great learning and the conscientious discharge of his duties"

১৮৯০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গুরুদাস বিশ্ববিদ্যালয়ের Vice Chancellor পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতটা উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহা ভারতের বড় লাট ও রাজপ্রতিনিধি বিশ্ববিদ্যালয়ের Chancellor হিসাবে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতেই বুঝিতে পারিবেন—

"The memory of Sir Gurudass Banerjee the first Indian to be selected as your Vice Chancellor, will long be cherished among you. His image will rise to your minds as that of one who, even in extreme old age, retained a buoyancy of demeanour, an alertness of intellect, which one looks to find among men entering on the prime of life. More than that, he was a living refutation of the view that western lore is compatible with etstern simplicity and manners. He had drunk deeply at the wells of western thought and science, yet he held firmly to all that is best in the civilisation where in he born, He has left an example to us all—modest, untiring, cheering and large hearted to the end."

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে হাইকোর্ট হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর গুণগ্রাহী গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে নাইট্ উপাধি প্রদান করেন। তিনিও এই সময় হইতে দেশে শিক্ষা বিস্তার, ধর্ম্ম প্রচারের জন্য উৎসর্গীকৃত হন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, চৈতন্য লাইব্রেরী, তাঁহার উৎসাহে পরিপুষ্ট কলেবর হইয়াছে। আজ যেখানে দাঁড়াইয়া আমরা তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য প্রস্তাব করিতেছি, এই স্থান তাঁহার মন্ত্রবেদীর মত ছিল। তিনি পরিষদের সামান্য মাসিক অধিবেশনেও উপস্থিত হইয়া সভার গুরুত্ব বর্দ্ধিত করিতেন।

তৎপ্রণীত "জ্ঞান ও কর্ম্ম" নামক গ্রন্থ এবং A few thoughts on education নামক সুচিন্তিত সন্দর্ভ বঙ্গের মনীষিবৃন্দের নিকট নিত্য সমাদৃত। স্যার গুরুদাস দুই দুইবার Lord Landsdown কর্ত্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের Vice Chancellorরূপে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষভাবে দেশের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যোগ না দিলেও Bengal National Council of

Educationএর সাফল্যের জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরদিন দেশবাসীর স্মৃতিপথে জাগরুক থাকিবে। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে গুরুদাস Lord Curzon কর্ত্তৃক Indian University Commissionএ একমাত্র দেশীয় সভ্যরূপে মনোনীত হন। স্যার গুরুদাসের মাতৃভক্তি এরূপ অচলা ছিল যে, তিনি বারাণসীধামে অবস্থানকালে প্রতিদিন কলিকাতা হইতে Mother has eaten এই মর্ম্মে টেলিগ্রাম যাইত, তবে তিনি আহারে বসিতেন। হাইকোর্টে জজীয়তীর সময়ে তিনি নিতান্ত পিপাসার্ত্ত হইলে ব্রাহ্মণ দ্বারা গঙ্গা হইতে জল আনাইয়া তবে তাহা পান করিতেন। গুরুদাসের নিকট উচ্চনীচ ভেদাভেদ ছিল না, তিনি স্বীয় বাটীতে জগদ্ধাত্রী পূজার সময় পাড়ার ইতর ভদ্র সকলের বাটীতে সশরীরে নিমন্ত্রণ করিতেন, এমন কি, পাড়ার পণ্যাঙ্গনাদিগের বাটীতে তিনি উপস্থিত হইয়া বলিতেন, "মা সকল, আজ আমার বাটীতে তোমরা মায়ের দু'টি প্রসাদ পাইও।"

গুরুদাস বেদ-বেদান্তের প্রতি সমধিক শ্রদ্ধাবান ছিলেন। মাতৃশ্রাদ্ধের সময় তিনি সমাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমণ্ডলীকে বঙ্গানুবাদ সমন্বিত সামবেদ সংহিতা উপহার দিয়াছিলেন। তাহাতে নিম্নলিখিত শ্লোকটী লেখা ছিল—

"গ্রন্থোয়ং গুরুদাসেন শ্রুতিপ্রচারকাঙ্ক্ষিনা
স্বর্গকামনয়া মাতুর্দত্তো ভক্ত্যা মনীষিণে ॥"

গুরুদাস চিরদিন লোককে উৎসাহিত করিতেন। বাল্মিকী প্রতিভা নাটকে নবীন কবি রবীন্দ্রনাথকে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়া গুরুদাস নিম্নলিখিত শ্লোকটী রচনা করিয়াছিলেন ;—

উঠ বঙ্গভূমি মাতঃ ঘুমায়ে থেক না আর।
অজ্ঞান তিমিরে তব সুপ্রভাত হ'লো হের।
উঠেছে নবীন রবি, নব জগতের ছবি,
নব বাল্মিকী-প্রতিভা দেখাইতে পুনর্ব্বার ॥"

গুরুদাসের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় দিবার আমার সাধ্য নাই। আমরা তাঁহাকে দেখিয়াছি, তাঁহার পদধূলি লইয়া ধন্য হইয়াছি এবং বিভিন্ন সভা সমিতিতে তাঁহার যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতাদি শুনিয়াছি মাত্র। তবুও সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মার গুণ কীর্ত্তন করিবার কিংবা তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার আলোচনা করিবার অধিকার আমার আছে, কারণ মহাজ্ঞানী মহাজনের চরিত-কথা আলোচনা করিয়া আমরা শিখিতে পারি—

Lives of great men all teaches us
we can make our life sublime."

গুরুদাস প্রাচ্য ও প্রতীচির সংযোগস্থল ছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার্ণবে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়াও আপন ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচার, অনুষ্ঠান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। এইখানেই গুরুদাস-চরিত্রের বিশেষত্ব—এইজন্যই তিনি হিন্দু-সমাজের শিরোমণি, ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মুকুটমণি। গুরুদাসের জীবনী ছাত্রের আদর্শস্থল, গৃহীর আদর্শস্থল—কর্ম্মচারীর আদর্শস্থল। যেদিন বাঙ্গালার ঘরে ঘরে গুরুদাসের ন্যায় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মহানুভবের আবির্ভাব হইবে, সেইদিন হইতেই আমরা জানিব যে, বঙ্গের লুপ্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম আবার জীবিত হইয়াছে—যেদিন বঙ্গের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতগণ গুরুদাসকে আদর্শ করিয়া আপন আপন জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। সেই দিন জানিব যে, বঙ্গবাসীর পাশ্চাত্য ভাষা শিক্ষা সফল হইয়াছে—যেদিন দেখিব, বঙ্গের ছাত্রমণ্ডলী গুরুদাসের ন্যায় অভাবের তীব্র কষাঘাত সহ্য করিয়াও বিদ্যাধ্যয়নে বিফলপ্রযত্ন নহেন, সেই দিন—শুধু সেইদিন জানিব যে, বঙ্গের ঘরে ঘরে গুরুদাসের স্মৃতি পূজিত ও রক্ষিত হইতেছে! শুধু তৈলচিত্রেই যদি গুরুদাসের স্মৃতি রক্ষিত ও পর্য্যবেশিত হয়, বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। বাঙ্গালীর হৃদয়-মন্দিরে গুরুদাসের প্রতিমা গড়িয়া তবে তাহা চন্দনে অনুলিপ্ত করিতে হইবে, তাঁহার আদর্শে সংসার-পথে ভ্রমণ করিতে হইবে, তবেই ত গুরুদাসের প্রকৃত স্মৃতি রক্ষিত হইবে।

আগমনী।

লেখক—শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়।

(১)

বরষা ফুরায়ে গেল, শরদ যে আসিল,
কুঞ্জ আলো করি পুঞ্জ শেফালিকা ফুটিল।
ছড়ায়ে বরণ ভাতি শোভিল দোপাটী পাঁতি
অতসী সোণালী রঙ্গে অঙ্গরাগ করিল,
সরসে সরসীবালা নলিনী রূপের ডালা

অরুণ কিরণ করে লাজভয় টুটিল,
বাজায়ে ভ্রমরা শঙ্খ সে মিলন ঘোষিল।
বরষা ফুরায়ে গেল শরদ যে আসিল।

(২)

নভসে কলসভব আসি পুন উদিল
কালজলে তটিনীর কত শোভা বাড়িল।
পরিয়া বীচির মালা আঁচলে চুমকি ঢালা
সিন্ধুপানে আদরিণী সরঙ্গসে ছুটিল
সাহানায় ধরি তান আকুল করিয়া প্রাণ
বাতাবি লেবুর কলি বনবায়ু চুমিল,
সে আদরে ফুলবালা শিহরিয়া ফুটিল
বরষা ফুরায়ে গেল শরদ যে আসিল॥

(৩)

তামসী ঘোমটা খুলি যামিনী যে হাসিল
জোছনা দুকূলবাসে আদরিণী সাজিল।
কপালে তারার টিপ স্নিগ্ধশিখা স্বর্ণদীপ
শশীসনে সুহাসিনী সুখনীরে ভাসিল,
পবিত্র মধুর প্রেম হীরকে জড়িত হেম
সুধাধারে ধরাতলে ঝরিয়া সে পড়িল
মিলন-মঙ্গল-গীতি গ্রহগণে গাহিল।
বরষা ফুরায়ে গেল শরদ যে আসিল।

(৪)

প্রকৃতি ধরার বক্ষে সিংহাসন পাতিল
কুসুম কিরীট শিরে ঋতুবর শোভিল।
জলহীন জলধরে সমতলে শিরোপরে
বিথারিয়া রাজচিহ্ন শ্বেতছত্র ধরিল,
জিনিয়া চমরীপুচ্ছ সিতকায় কাশগুচ্ছ
রাজ অঙ্গে মৃদুমন্দ বীজন সে করিল
আলোক মাখিয়া পাখী স্তুতিগীতি গাহিল
বরষা ফুরায়ে গেল শরদ যে আসিল॥

(৫)

বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে শুভ শঙ্খ বাজিল,
দ্বারে দ্বারে রামরম্ভা পূর্ণকুম্ভ শোভিল।
রচিত পল্লবদল তোরণেতে ঝলমল
চিত্রপত্রলেখা মাঝে মূলঘট বসিল,
প্রহরে প্রহরে আজি উচ্চে যামতূর্য্য বাজি
মাতৃ-আগমন-বার্ত্তা ধরামাঝে ঘোষিল
পল্লীবাল মধুকণ্ঠে আগমনী ধরিল।
বয়ষা ফুরায়ে গেল শরদ যে আসিল ॥

(৬)

বোধন সঙ্গীতমন্ত্রে উঠিল মা জাগিয়া,
সন্তানে করুণাময়ী করুণা মা করিয়া।
এস কুলনারীকুল অঞ্জলী ভরিয়া ফুল
দেহ মার রাঙ্গাপদে ভক্তিভরে ঢালিয়া,
দাঁড়াইয়া সারি সারি ঝারি হ'তে ঢালি বারি
জলধারা দিয়া মাকে আন ঘরে তুলিয়া
বাজাও মঙ্গল শঙ্খ দশদিক ধ্বনিয়া।
বোধন সঙ্গীত মন্ত্রে উঠিল মা জাগিয়া।

(৭)

এস মা আনন্দময়ী সদানন্দ গেহিনী,
এস শ্যামা মনোরমা হরহৃদিবাসিনী।
সারাটী বরষ ধ'রে আছি মনে আশা ক'রে
লভিব মা পদছায়া কোকনদ-শোভিনী
আনিব ভরিয়া ডালা কত ফুল ফুলমালা
সাজাইব বরবপু বরাভয়দায়িনী
মাঙ্গিব করুণাভিক্ষা হে করুণারূপিণী।
এস মা আনন্দময়ী সদানন্দ গেহিনী ॥

(৮)

এস মা কনককান্তি স্বর্ণচাঁপাবরণী,
এস মাগো কাঙ্গালের দয়াময়ী জননী।

এস গো মা মম বাসে ডাকে দীন হীন দাসে
চাও মা নয়ন-কোণে সকরুণ নয়নী
ভবের ভরসা যত ক্রমে সব হ'ল হত
ভবসিন্ধু পারে যেতে দেহ পদতরণী
দুর্গা ব'লে যাত্রা করি কালভয়বারিণী।
এস মা কণককান্তি স্বর্ণচাঁপা বরণী ॥

(৯)

উঠগো প্রবাসী-বধূ কেন ধূলিশয়না
আসে পথে প্রিয় পতি মিছে কেন ভাবনা ?
পর চারুনীলবাস বাঁধহ কুন্তল পাশ
সীমন্তে সিন্দুররেখা পর সতী শোভনা,
হাতেতে কঙ্কণ রুলি ক্বনিত মধুর বুলি
পতিসনে মনসাধে কর মাতৃ-সাধনা
শোন বাজে চরিদিকে সুমঙ্গল বাজনা।
উঠ গো পথিকবধূ কেন ধূলি শয়না ॥

(১০)

পতিহীনা তুমি বালা ফেল দূরে বেদনা,
ফেল না নয়ন-বারি মিছে আর কেঁদ না।
স্নান করি কুতূহলে, পূজ জবা বিল্বদলে,
অম্বিকা-চরণযুগ বিধি বিষ্ণু বাসনা
গিয়া অনন্তের দেশে, জীবলীলা অবশেষে,
মিলিতে পতির সনে কর এই যাচনা
সহিতে হবে না আর বিধবার যাতনা।
পতিহীনা তুমি বালা ফেল দূরে বেদনা ॥

(১১)

এস গো কাঙ্গাল দুখী এস ত্বরা করিয়া,
অন্নদা দাঁড়ায়ে দ্বারে অন্নে থালা ভরিয়া।
তিনটী দিনের তরে, কাঙ্গালী বাঙ্গালী ঘরে,
এসেছেন অন্নপূর্ণা দেখ প্রাণ ভরিয়া
দুখনিশা প্রভাতিল, সুখ উষা সমুদিল,

ভাস গো আনন্দনীরে সব দুখ ভুলিয়া
অন্নদা-সন্তান মোরা কেন মরি ভাবিয়া।
এস গো কাঙ্গাল দুখী এস ত্বরা করিয়া ॥

(১২)

সাজ গো বালিকা বধূ সরমের কলিকা,
সুকুমারী কমকায়া কিশলয় লতিকা।
পর ক্ষৌম রক্তবাস, বাঁধ কৃষ্ণ-কেশপাশ,
চরণে নূপুরমঞ্জি কলমঞ্জু ভাষিকা
নয়নে অঞ্জন লেখা, সীমন্তে সিন্দুর রেখা,
কপালে মাণিক টিপ সুখতারা দীপিকা,
বাঁধুলি অধরে ধর স্মিত সুধা কণিকা।
সাজ গো বালিকা বধূ সরমের কলিকা ॥

(১৩)

সাজ তুমি দেববালা হাস্যমুখী বালিকা
পরণে নূতন বাস গলে ফুল-মালিকা।
পর অঙ্গে শোভাস্থলী, চন্দনের মুদ্রাবলী,
নাসায় তিলক-রেখা নব-কুন্দকলিকা,
কবরী সাজাও ফুলে, পর দুল শ্রুতিমূলে,
বকুল দীঘল মুক্তা নাসা অগ্র শোভিকা,
চরণে কিঙ্কিণী ক্ষুদ্র রুণু রুণু রণিকা।
সাজ তুমি দেববালা হাস্যমুখী বালিকা ॥

(১৪)

হে বালক দেবশিশু এস ত্বরা করিয়া
প্রফুল্লবদনে পল্লী মধুরিমা মাখিয়া।
মণ্ডপে চণ্ডিকা পূজা, মহামায়া দশভূজা,
পার্শ্বে রমা মনোরমা বাণী বীণা ধরিয়া
সঙ্গে শিশু গণপতি, সিদ্ধিদাতা মহামতি
কুমার নিন্দিত-মার শিখীপৃষ্ঠে চড়িয়া
এস সবে মার কাছে পড় পায় লুটিয়া!
হে বালক দেবশিশু এস দল বাঁধিয়া ॥

(১৫)

হে মানব, অন্ধ তুমি কর দূর ভাবনা
মানসে মায়ের মূর্ত্তি করি চিত্র দেখ না।
কর্ম্মদোষে তুমি অন্ধ, টুটিলে কর্ম্মের বন্ধ
পাবে চক্ষু পুন তুমি কর তাই সাধনা,
নাহি চাই উপচার, ভক্তি মাত্র কর সার,
সাধনার সার মন্ত্র মা বলিয়া ডাক না;
গিয়াছে তোমার চক্ষু আছে ত সে রসনা।
হে মানব, অন্ধ তুমি কর দূর ভাবনা ॥

(১৬)

পতিত মানব তুমি হে পতিতা রমণি,
ত্যজি লজ্জা ডাক মাকে মা যে বিশ্বজননী।
জ্বাল মনে অনুতাপ, আহুতি মনের পাপ,
আত্ম বলি এ সাধনা চির শুভ সাধনী,
লহ ক্ষমা ভিক্ষা দান, পাবে তুমি পরিত্রাণ,
জান না জননী মোর পতিতের পাবনী,
দুর্গা নাম এ সংসারে যোগক্ষেম বাহনী।
পতিত মানব তুমি হে পতিতা রমণি॥

(১৭)

হে ব্রাহ্মণ শুদ্ধসত্ত্ব আজি শুভ তিথিতে
এসেছেন মা আমার বরষেক অতীতে।
পড় মন্ত্র আবাহন, কর ঋক্ উচ্চারণ
শুনাও সে সামগান সমুদাত্ত স্বরিতে
স্তুতিমাখা ছন্দময়ী, পুণ্য চণ্ডী পাপজয়ী
পড় ভক্তিভরা কণ্ঠে আধি ব্যাধি নাশিতে
অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ দুর্গা পূজা কলিতে।
এসেছেন মা আমার বরষেক অতীতে॥

(১৮)

হাস রে রোহিণী তুমি শশধর ভামিনী
হাস রে লতিকা বধূ সহকার কামিনী।
হাস তুমি ফুলবালা, হাস রে তারার মালা,
হাস নিশা হাস দিশা মুক্ত ঘন-পাশিনী
হাস বিশ্ববাসী জনে ভরা সুখে হৃষ্টমনে
ঘরে তারা দুখহরা সর্ব্ব সিদ্ধিদায়িনী
হাস ধন্য পুণ্য বঙ্গ মাতৃপদসেবিনী
হাস রে রোহিণী তুমি শশধর ভামিনী॥

(১৯)

গাও রে বাঁশরী তুমি ষড়রাগ বাহিনী
রাখাল শিশুর করে আগমনী রাগিণী।

গাইতে যেমন আগে ব্রজে তুমি অনুরাগে
যমুনা উঠিত ফুলি কলকল নাদিনী
বসিয়া তমালে পাখী, শুনিত মুদিত আঁখি,
শুনিত ব্রজের বালা যত গোপকামিনী
শুনিত পলকহীনা বনবালা হরিণী।
আনন্দে নাচিত সুখে শিখী সহ শিখিনী॥

(২০)

গাও রে বিহগবধূ তুমি কলভাষিণী
গাও তুমি কলস্বনা লীলাময়ী তটিনী।
পল্লব মর্ম্মর স্বরে গাও তরু হর্ষভরে
পুণ্য আগমনী গীতি পাপতাপনাশিনী,
গাও রে কিন্নর বধূ গান্ধারে ঢালিয়া মধু
বঙ্গগৃহে মহামায়া মহাকাল তোষিণী;
শ্মশানে নন্দন শোভা প্রাণমনহারিণী।
বহ বিশ্ব মাঝে বায়ু এ আনন্দ কাহিনী॥

কোষ্ঠী শিক্ষা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ধ্রুবযোগে জাত ব্যক্তি—বিদ্বান, লেখক, বন্ধুপালক, কীর্ত্তিমান ও সুন্দর আকৃতি বিশিষ্ট হয়।

ব্যাঘাতযোগে জাত ব্যক্তি—সাধুগণের বিঘ্নকারী, কঠোর প্রকৃতি, মিথ্যাবাদী, নির্দ্দয়, কুচক্ষুবিশিষ্ট, দীর্ঘাকার কিন্তু কৃশ হয়।

হর্ষণযোগে জাত ব্যক্তি—সুন্দর পদ্মনেত্রবিশিষ্ট, শাস্ত্রজ্ঞ, অক্রোধী ও বিনয়ী হয়।

বজ্রযোগে জাত ব্যক্তি—গুণবান, তেজস্বী, রত্নবস্ত্রাদির পরীক্ষক, শত্রুরমণীগণের নিকট বজ্রতুল্য হয়।

অসৃকযোগে জাত ব্যক্তি—কুরূপ ও কুমতিবিশিষ্ট, প্রবাসী, ক্রোধী, লোভী, রক্তপাতকারী ও বলবান হয়।

ব্যতিপাতযোগে জাত ব্যক্তি—পরুষভাষী, খলস্বভাব বিশিষ্ট, পীড়িত, মাতার হিতাকাঙ্ক্ষী ও পরকার্য্যে পক্ষপাতী হয়।

বরীয়ানযোগে জাত ব্যক্তি—দাতা, দয়ালু, সুবেশধারী, সৎকর্ম্মে আনন্দিত, মধুর স্বভাব বিশিষ্ট, বলবান, ধন ও লোকবলসম্পন্ন হয়।

পরিঘযোগে জাত ব্যক্তি—বংশের কুঠার স্বরূপ, মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা, ক্ষমাশূন্য, অল্পান্নভোক্তা ও শত্রুনাশক হয়।

শিবযোগে জাত ব্যক্তি—শৈব, বেদজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, মহাত্মা ও মনোহর দেহযুক্ত হয়।

সিদ্ধিযোগে জাত ব্যক্তি—সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, মধুর প্রকৃতিবিশিষ্ট, বিনয়ী, সত্য-পরায়ণ, ভোগী ও গৌরবর্ণদেহবিশিষ্ট হয়।

সাধ্যযোগে জাত ব্যক্তি—অসাধ্য সাধনকারী, বলিষ্ঠ, ধীর, নম্র ও বুদ্ধিবলে বিবিধ উপায়ে সৎকার্য্যসাধনকারী হয়।

শুভযোগে জাত ব্যক্তি—মনুষ্যের হিতকারী, পণ্ডিতগণের ইষ্টকর, সুবেশধারী ও সুবুদ্ধিসম্পন্ন হয়।

শুক্রযোগে জাত ব্যক্তি—হাস্যবদনবিশিষ্ট, লোকহিতকারী, তেজস্বী ও জিতেন্দ্রিয় হয়।

ব্রহ্মযোগে জাত ব্যক্তি—নানাশাস্ত্রে পারদর্শী, শান্ত, ক্রিয়াবান, কীর্ত্তিপ্রিয় ও বর্ণাচার অনুযায়ী কার্য্যকারী হয়।

ইন্দ্রযোগে জাত ব্যক্তি—প্রতাপবান, শ্লেষ্মাদি ঋতুবিশিষ্ট, বলবান, গুণজ্ঞ, লক্ষ্মীমান ও ইন্দ্রতুল্য হয়।

বৈধৃতিযোগে জাত ব্যক্তি—মিত্রশূন্য, খল, মূর্খ, দরিদ্র, প্রবঞ্চক, পরস্ত্রী নিমিত্ত কুকর্ম্মকারী হয়।

নক্ষত্র * ও তাহার ফল।

নক্ষত্র সাতাইশটী যথা—অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী,

* নক্ষত্রজ্ঞাপক অঙ্ক যথা—অশ্বিনী ১, ভরণী ২, কৃত্তিকা ৩, রোহিণী ৪, মৃগশিরা ৫, আর্দ্রা ৬, পুনর্ব্বসু ৭, পুষ্যা ৮, অশ্লেষা ৯, মঘা ১০, পূর্ব্বফল্গুনী ১১, উত্তরফল্গুনী ১২, হস্তা ১৩, চিত্রা ১৪, স্বাতী ১৫, বিশাখা ১৬, অনুরাধা ১৭, জ্যেষ্ঠা ১৮, মূলা ১৯, পূর্ব্বাষাঢ়া ২০, উত্তরাষাঢ়া ২১, শ্রবণা ২২, ধনিষ্ঠা ২৩, শতভিষা ২৪, পূর্ব্বভাদ্রপদ ২৫, উত্তরভাদ্রপদ ২৬, রেবতী ২৭।

বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতী।

অশ্বিনীনক্ষত্রে জাত ব্যক্তি—অশ্ব, হস্তি ও মেষ সম্বন্ধে জ্ঞানবান, মানী, প্রচণ্ড স্বভাববিশিষ্ট, খল, চঞ্চল ও রাজপ্রিয় হয়।

ভরণীনক্ষত্রে জাত ব্যক্তি ব্যবসায়ী ক্রূর প্রবাসী, প্রশান্ত ও শত্রুজয়ী হয়।

কৃত্তিকা নক্ষত্রে জাত ব্যক্তি—সহিষ্ণু ক্রোধী, ভীরু, কর্কশ স্বভাব, স্থূল মুখ ও গণ্ডদেশবিশিষ্ট এবং শত্রু কর্ত্তৃক ব্যথিত হয়।

রোহিণী নক্ষত্রে জাত ব্যক্তি—বিশুদ্ধাচারী, দয়ালু, কার্য্যপটু বিবিধ কলাবিৎ, ব্রহ্মনিষ্ঠ, ধনবান, স্থূল কপোল ও নেত্রবিশিষ্ট ও কফবাতিক প্রকৃতিযুক্ত হয়।

মৃগশিরা নক্ষত্রে জাত ব্যক্তি—মৃগের ন্যায় নয়নবিশিষ্ট, সুন্দর গণ্ডযুক্ত, বলিষ্ঠ, রাজপ্রিয়, সাহসী, কামুক, অল্পধর্ম্ম, মিত্র ও বিভবযুক্ত হয়।

আর্দ্রানক্ষত্রে জাত ব্যক্তি—বলবান, চপল, সন্তুষ্ট ও ধনধান্যযুক্ত হয়।

পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে জাত ব্যক্তি—ধার্ম্মিক, কর্ম্মদুঃখ, পিতৃভক্ত, কামুক, স্ত্রৈণ, প্রবাসী ও ধনলোলুপ হয়।

পুষ্যা নক্ষত্রে জাত ব্যক্তি—বুদ্ধিমান, প্রীতিযুক্ত, কৃতী, প্রাজ্ঞ, দেবদ্বিজভক্ত ও কুলপাবক হয়।

অশ্লেষা নক্ষত্রে জাত ব্যক্তি—দ্বিজিহ্বাধারী, রিপুবশীভূত, চৌর, কঠোর প্রকৃতিবিশিষ্ট, পিতামাতার সন্তাপদায়ক, শঠ, মিথ্যাবাদী, মূর্খ ও বংশ ধ্বংসকারী হয়।

মঘানক্ষত্রে জাত ব্যক্তি—বিবাদপ্রিয়, পরাক্রমশালী, সুন্দর নেত্রবিশিষ্ট, স্ত্রীবিদ্বেষী, অল্প ধন ও অল্প বিদ্যাসম্পন্ন হয়।

পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে জাত ব্যক্তি—ধনী, প্রবাসী, শত্রুহীন, কামশাস্ত্রনিপুণ, লোকের আশ্রয় স্থল, হৃষ্টমনা হয়।

উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে জাত ব্যক্তি—সর্ব্বজনপ্রিয়, দাতা, ধনী ও পুত্রবান, ক্ষুধাতুর, কোপন স্বভাব বিশিষ্ট ও স্ত্রীসুখশূন্য হয়।

হস্তা নক্ষত্রে জাত ব্যক্তি—প্রতাপবান, রাজপ্রিয়, মন্দভাষী, সত্যপরায়ণ, কলাবিদ্যাবিৎ ও প্রভুত্বশালী হয়।

চিত্রানক্ষত্রে জাত ব্যক্তি—চিত্রবিদ্যানিপুণ, ধনবান ও লোকের নিকট মাননীয়, সৌভাগ্যবান, লোকপ্রিয়, সদর্থলোভী ও কীর্ত্তিমান হয়।

স্বাতিনক্ষত্রে জাত ব্যক্তি—ধনরত্নযুক্ত, ধাতুকার্য্যকারী, বহুধন, গৃহ ও ধান্যের অধিপতি ও অত্যন্ত সুখী হয়।

বিশাখানক্ষত্রে জাত ব্যক্তি—প্রবাসী, পণ্ডিতগণের প্রতিকূল, ধর্ম্মনিষ্ঠ ও সুদন্তবিশিষ্ট হয়।

অনুরাধানক্ষত্রে জাত ব্যক্তি—প্রসন্ন, পরস্ত্রীরত, চৌর ও অপরের বিত্তলোভী হয়।

জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে জাত ব্যক্তি—বলবান পদ্মের ন্যায় মুখ ও লোচনবিশিষ্ট, ক্রোধী, পরপীড়ক ও কলহপ্রিয় হয়।

মূলানক্ষত্রে জাত ব্যক্তি—বলশালী, উদ্বিগ্নচিত্ত, কলাবিদ্যানুরাগী, পিতৃ-মাতৃনাশক, স্বজনোপকারী, ও শেষ বয়সে দরিদ্র হয়।

পূর্ব্বষাঢ়ানক্ষত্রে জাত ব্যক্তি—তোষামোদপ্রিয়, দেবভক্ত, বন্ধুগণের মাননীয়, কার্য্যদক্ষ ও শত্রুনাশক হয়।

উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে জাত ব্যক্তি—কুবন্ধুযুক্ত, স্ত্রীবশীভূত, পণ্ডিত, ধূর্ত্ত, ক্ষীণকায় বিশিষ্ট ও মায়াবী হয়।

শ্রবণানক্ষত্রে জাত ব্যক্তি—স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, মানী, দেবদ্বিজ ভক্ত, তীর্থসেবী, ধন পুত্র ও সৌভাগ্যযুক্ত হয়।

ধনিষ্ঠানক্ষত্রে জাত ব্যক্তি—দীর্ঘাকার, কফপ্রকৃতিবিশিষ্ট, কামুক, বিবাদ-প্রিয়, পুত্রযুক্ত, কীর্ত্তিমান ও জ্ঞানী হয়।

শতভিষানক্ষত্রে জাত ব্যক্তি—অলস, নিশ্চেষ্ট, বচনপটু, ধূর্ত্ত, বাহনা-ভিলাষী ও বৈভবশালী হয়।

পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে জাত ব্যক্তি—দাতা, বিনয়ী, প্রিয়ভাষী, সদ্বৃত্তিসম্পন্ন, পক্ষপাতী, চঞ্চলচিত্ত, প্রবাসী ও নৃপসেবক হয়।

উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্রে জাত ব্যক্তি—ধর্ম্মপরায়ণ, বলশালী, ক্রোধী, স্থূলকায় বিশিষ্ট ও প্রভূত্বসম্পন্ন হয়।

রেবতীনক্ষত্রে জাত ব্যক্তি—মনোহর কান্তিবিশিষ্ট, ধনশালী, শত্রুর সন্তাপদায়ক, প্রবাসী, নীতিজ্ঞ ও রাজসেবী হয়।

প্রত্যেক নক্ষত্রের ভোগ্য সময়কে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাকে এক এক পাদ নামে অভিহিত করা হয়।

রাশি নির্ণয়।

জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ রাশিচক্রকে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার এক এক ভাগকে এক এক নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাহাদের নাম যথা—১ মেষ, ২ বৃষ, ৩ মিথুন, ৪ কর্কট, ৫ সিংহ, ৬ কন্যা, ৭ তুলা, ৮ বৃশ্চিক, ৯ ধনু, ১০ মকর, ১১ কুম্ভ, ১২ মীন। এই বারটী রাশিতে ২৭টী নক্ষত্রভোগ করেন। সুতরাং প্রত্যেক রাশিতে সওয়া দুই করিয়া নক্ষত্র হয়।

অশ্বিনী ভরণী ও কৃত্তিকার একপাদ মেষ রাশি; কৃত্তিকার তিন পাদ, রোহিণী ও মৃগশিরার দ্বিপাদ বৃষ, মৃগশিরার দুইপাদ আর্দ্রা ও পুনর্ব্বসুর তিন পাদ মিথুন; পুনর্ব্বসুর ১ পাদ পুষ্যা ও অশ্লেষার কর্কট রাশি। মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী ও উত্তরফল্গুনীর একপাদ সিংহ রাশি, উত্তরফল্গুনীর তিনপাদ, হস্তা ও চিত্রার দুইপাদ কন্যারাশি, চিত্রার দুইপাদ, স্বাতী ও বিশাখার তিনপাদ তুলারাশি, বিশাখার একপাদ, অনুরাধা ও জ্যেষ্ঠার বৃশ্চিক রাশি, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়ার একপাদ ধনুরাশি, উত্তরাষাঢ়ার তিনপাদ, শ্রবণা ও ধনিষ্ঠার দুইপাদ মকররাশি, ধনিষ্ঠার দুইপাদ, শতভিষা ও পূর্ব্বভাদ্রপদের তিনপাদ কুম্ভরাশি, পূর্ব্বভাদ্রপদের একপাদ, উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতীতে মীনরাশি।

জন্ম সময়ে জাতকের যে রাশিতে চন্দ্র অবস্থান করেন, সেই রাশিটী জাতকের জন্মরাশি নামে অভিহিত হয়।

রাশি ফল।

মেষরাশিতে জাত ব্যক্তি—চঞ্চলচিত্ত, সুন্দর কেশাবিশিষ্ট, অল্প ধনী, প্রলাপী, কফাধিক্য ধাতুবিশিষ্ট হয়।

বৃষরাশিতে জাত ব্যক্তি—লম্বা কপোল, বৃহৎ গোলাকার নেত্রযুক্ত, অল্প বক্তা, দুর্জ্জনবাসপ্রিয়, মেধাবী, দ্বিজ ও গুরুভক্ত, কটা ও কুটিল কেশযুক্ত, শ্লেষ্মা ও বাতযুক্ত দেহবিশিষ্ট হয়।

মিথুনরাশিতে জাত ব্যক্তি—কোমল শরীর বিশিষ্ট, অল্পভাষী, স্বজন-হিতকারী, জ্ঞানী, হাস্যযুক্ত কফাধিক্য প্রকৃতি, গীতবাদ্যানুরাগী, পিত্ত ও শ্লেষ্মামুক্ত হয়।

কর্কটরাশিতে জাত ব্যক্তি—সুন্দর, খর্ব্বাকার, স্থূলদেহবিশিষ্ট, ধনবান, দেবদ্বিজভক্ত, স্বোপার্জ্জিত ধন ভোগী, কফ বায়ুযুক্ত দেহবিশিষ্ট হয়।

সিংহরাশিতে জাত ব্যক্তি—উদরপরায়ণ, ক্রোধী, মাংসলোলুপ, অরণ্য ও পর্ব্বতগুহাতে অনাবৃত বাসপ্রিয়, সহায়হীন, কপিলবর্ণ ও বক্রনয়নবিশিষ্ট, অসম্পূর্ণ অভিলাষী, দেবভক্ত ও হিংস্রক হয়।

কন্যারাশিতে জাত ব্যক্তি—নির্ম্মলমনা, সুশীল, দৈন্যযুক্ত, কৃশ শরীরী, ধনবান, ক্ষমাশীল, বক্তা, ধার্ম্মিক, আচারবান ও গুরুজনের হিতকারী হয়।

তুলারাশিতে জাত ব্যক্তি—কোমল শরীর বিশিষ্ট, নাতি দীর্ঘ, বান্ধবগণের সন্তোষদায়ক, ভোগী, জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞ, নির্ম্মল কেশযুক্ত হয়।

বৃশ্চিকরাশিতে জাত ব্যক্তি—দাতা, স্ত্রীহস্তে সৌভাগ্য প্রদানকারী, মতিমান, রাজসেবানুরক্ত, পরস্ত্রীলোলুপ, বালবান, কঠিনহৃদয় ও উদ্যোগশীল হয়।

ধনুরাশিতে জাত ব্যক্তি—ধনুর ন্যায় গুণসম্পন্ন, কীর্ত্তিমান, মানী, বংশের শ্রেষ্ঠ, বন্ধুগণের প্রিয়, ধনী, দেবদ্বিজসেবী, বিনয়ী ও অসহিষ্ণু হয়।

মকররাশিতে জাত ব্যক্তি—পুত্র পরিবার পালনকারী, ধর্ম্মধ্বজ, নিম্নাঙ্গ কৃশ, সুচক্ষুসম্পন্ন, সৌভাগ্যযুক্ত, শীতার্ত্ত, ভ্রমণশীল, কবি, হীনজাতীয়া বৃদ্ধাঙ্গনাগামী, নির্লজ্জ, নিঘৃণ্য ও বুদ্ধিমান হয়।

কুম্ভরাশিতে জাত ব্যক্তি—ভুজঙ্গ সদৃশ সহচারী, সুন্দর, সুন্দর বদনবিশিষ্ট, অভিমানী, শুদ্ধচেতা, ভোগী, জ্ঞাতিগণের আনন্দদায়ী ও পণ্ডিতগণের হিতকারী হয়।

মীনরাশিতে জাত ব্যক্তি—বহুধনজনের অধিপতি, দৈবকার্য্যে শ্রদ্ধাবান, দীর্ঘজীবী, কুটিলদেহবিশিষ্ট, পণ্ডিত, ভোগী, বিখ্যাত ও মনোহর কান্তিযুক্ত হয়।

ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

লগ্ন নির্ণয়।

প্রথমে প্রত্যেক লগ্নের মান জানা আবশ্যক। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লগ্নের মান ভিন্ন হইলে ও সাধারণতঃ পঞ্জিকায় যে লগ্ন মানের দ্বারা সূর্য্যের উদয়াস্ত নিরূপিত হয়, এখানে তাহাই লিখিত হইল। যথা—মেষ ৪।৮।২৭, বৃষ ৪।৫৩।৩৮, মিথুন ৫।৩০।৬, কর্কট ৫।৪০।১৮, সিংহ ৫।৩২।৪৮, কন্যা ৫।২৯।৪০, তুলা ৫।৩৭।১২, বৃশ্চিক ৫।৪০।১৫, ধনু ৫।১৫।৫২, মকর ৫।৩১।৪৯, কুম্ভ ৩।৫৫।৩৩, মান ৩।৪৬।২০। (ক্রমশঃ)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

জন্মভূমি

২৬শ বর্ষ, ১৩২৭ সাল, কার্ত্তিক। ৭ম, সংখ্যা।

তারা।

(ক্ষুদ্র গল্প।)

(১)

বাবু গোপালচন্দ্র দত্ত কলিকাতার নিকট কোন গ্রামে বাস করেন। পাটের কলে চাকরী করিয়া গোপাল বাবু মাসিক ৬০৲ টাকা বেতন উপার্জ্জন করেন। গৃহে স্ত্রী তারাসুন্দরী, তাঁহার তিন কন্যা এবং কেবল একটি শিশুপুত্র, এই চারিটি প্রাণী গোপাল বাবুর উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিয়া দেহে জীবনরক্ষা করিতেছে। ইহার উপর গোপাল বাবুর দুই বিধবা ভগিনী, দুইটি ভাগিনেয় এবং তিনটি ভাগিনেয়ী—এই সাতটি জীব কুপোষ্যরূপে গোপালবাবুর আশ্রয়ে অবস্থিতি করিয়া গোপালবাবুর সংসার সুখের চরমোৎকর্ষ সাধন করিতেছে। গোপালবাবুর হাতে আনিতে পাতে কুলায় না। চাকর-চাকরাণী আছে, ডাক্তার-কবিরাজ আছে, লোক-লৌকিকতা আছে, হিন্দু-গৃহস্থের পূজাপাঠ, শ্রাদ্ধশান্তি আছে—গোপালবাবু উপার্জ্জনশীল হইয়া অতি দরিদ্র—ভিখারীর অধম; তিনি কোন দিকেই সাম্‌লাইতে পারেন না।

জ্যেষ্ঠা কন্যা সরস্বতী সবেমাত্র বারোয় পা দিয়াছে। গৃহিণী তারাসুন্দরী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন। কি হবে, মেয়ের বিয়ের কি হবে! মেয়ে যে সমর্থ হয়ে উঠ্‌লো—শেষে কি জাতকুল যাবে! তারাসুন্দরী মেয়ের চাঁদমুখটির পানে যতবার তাকাইয়া দেখেন, সেই শুভ্র স্বচ্ছ শীতল কান্তি, সেই কিশোরসুলভ লজ্জা, সেই পূর্ণিমার চন্দ্রোদয়ের প্রভার ন্যায় স্ফুটনোন্মুখ যৌবনপ্রভার বিকাশ, সরস্বতীর অধোমুখে স্থির ধীর মাতঙ্গগতি—তারাসুন্দরী,

অপরূপ রূপসী কন্যা সরস্বতীর এই রূপবিভার প্রতি যতবার তাকাইয়া দেখেন, ততবার কাঁদিয়া ফেলেন। দিনে দিনে সে চক্ষের জল আর বন্ধ হইল না। পাছে সর্ব্বনাশ হয়, সেই ভয়ে সরস্বতীর একবেলা আহার নিষেধ হইল, ঘৃত দুগ্ধ বন্ধ হইল। গোপালবাবুরও আহার-নিদ্রা বন্ধ, মেয়ের বিবাহ দিবেন বলিয়া কত স্থানে ছেলে দেখিতেছেন, কত লোকের হাতে-পায়ে ধরিতেছেন। মনের মতন ছেলে পাওয়া যায় ত, টাকায় পোষায় না; টাকার সুবিধা হয় ত ছেলে মনের মতন হয় না। গোপালবাবু উন্মত্তবৎ হইলেন।

(২)

শ্যামাচরণ ঘোষ এম-এ পাশ; এখন আইন পড়িতেছেন; এই অবসরে কলিকাতার কোন কলেজে অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। বেতন পান মাসিক ৫০৲ টাকা। শ্যামাচরণের পিতা শিবচন্দ্র ঘোষ মহাশয় পেন্সনপ্রাপ্ত সব্‌জজ। বেশ দু'পয়সা আছে। কলিকাতায় একখানি বাড়ী করিয়াছেন; আদি নিবাস বর্দ্ধমান জেলার কোন গ্রামে হইলেও শিবচন্দ্রবাবু কলিকাতায় থাকিয়া শেষ জীবনটা কাটাইবেন স্থির করিয়াছেন। শিবচন্দ্র বাবুর ছয় কন্যা এবং দুই পুত্র; শ্যামচরণ কনিষ্ঠ। ছয় কন্যার বিবাহে মোটের উপর ত্রিশ হাজার টাকা সদরালা বাবুকে ব্যয় করিতে হইয়াছে। বড় ছেলের বিবাহে তেমন কিছু আদায় করিতে পারেন নাই। এক শ্যামাচরণের বিবাহে এই অপহৃত ত্রিশ হাজার টাকা শিববাবু আদায় করিবেন কি না জানি না। তবে বাইশ বৎসর বয়স হইয়াছে, শিববাবু এখনও ছেলের বিবাহের কোন কথা তুলেন নাই। লোকে বলিত, শিব বাবু ছেলের দর চড়াইতেছেন।

শ্যামাচরণ দেখিতে সুপুরুষ; উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, চোখ-মুখ বেশ, গড়ন অতি সুন্দর, সুন্দর সুপুষ্ট দেহ। শ্যামাচরণ অতিশয় শান্ত এবং লাজুক ছেলে; বাপ-মায়ের আদরের ছেলে হইয়াও সে কখনও আব্‌দার করে নাই, উৎপাত করে নাই, বাপ-মায়ের উপর জোর-জবরদস্তি করে নাই। শ্যামাচরণ অল্প কথা কহে, অল্প লোকের সঙ্গে আলাপ করে, কেবল কেতাব পড়িতেছে ও লিখিতেছে। শ্যামাচরণের সুখ্যাতি সকলেই করে, শ্যামাচরণের গুণে সকলেই মুগ্ধ। বন্ধুবর্গের মধ্যে শ্যামকে কেহ বিবাহের কথা বলিলে, শ্যাম মুচকি হাসিয়া বলে, "বিয়েটা একটু নতুন রকমে কর্‌তে হবে, তাড়াতাড়ি কেন?" অনেকে এই কথা শুনিয়া ভাবিত, শ্যাম বুঝি ব্রাহ্মবিবাহ করিবে। শ্যামের

মা শ্যামকে বিবাহের কথা বলিলে, সে উত্তর করিত,—"মা, ওকালতীটা পাশ ক'রে তবে বিয়ে কর্‌বো।"

(৩)

বাবু রমেশচন্দ্র বসু গোপাল বাবুর শ্যালক; শ্যামাচরণের সহপাঠী এবং বন্ধু। ভাগিনেয়ী সরস্বতীর বিবাহ পক্ষে ভগিনীপতির অর্থাভাব যে প্রধান অন্তরায় রমেশ তাহা বেশ বুঝিয়াছিল। তবে নিজেদের অবস্থাও মলিন, কাজেই সে মনের দুঃখ মনেই চাপিয়া রাখিত। রমেশের মনে মনে আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, শ্যামাচরণের হস্তে সরস্বতীকে অর্পণ করিতে পারিলে, সরস্বতী সুখী হইতে পারে। পরন্তু লোকমুখে শুনিয়াছিল যে, শ্যামের বাপ বড়ই কঞ্জুস, বড়ই অর্থপিশাচ, ছেলের বিয়েতে কিছু লাভ করিবার উদ্দেশ্যে এতদিন শ্যামের বিবাহ দেয় নাই, তাই সাহসভরে শ্যামকে এতদিন কোন কথা কহিতে পারে নাই। যখন রমেশ ভগিনী ও ভগিনীপতির দুর্দ্দশার কথা শুনিল, তখন সে আর থাকিতে পারিল না। চালাকী করিয়া একদিন শ্যামকে বলিল, "শ্যাম, তোমাকে আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাইতে হইবে। যাইবে কি?"

শ্যাম। কোথায় যেতে হবে? তোমার কনে দেখ্‌তে হবে না কি?

র।—না—আমার নহে, আর কারুর। আমার একটি ভাগিনেয়ী আছে, দেখ্‌তে অতি সুন্দরী, বয়স বারো বছর। তাকে আজ দেখ্‌তে আস্‌বে। সেই জন্যে আমাদের সেখানে থাক্‌তে হ'বে, যাবে কি?

শ্যাম। বেশ্‌, তাই হবে। কখন যেতে হবে?

র। রবিবার সকালে। কি বল?

শ্যাম।—যো হুকুম।

নির্দ্দিষ্ট রবিবার সকালে রমেশ শ্যামকে তাহার ভগিনীপতি গোপাল বাবুর বাটীতে লইয়া গেল। গোপাল বাবুর বাটীতেই শ্যামের আহারের বন্দোবস্ত হইল। আহারান্তে বিশ্রামের পর শ্যাম রমেশকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কৈ হে, যাহারা মেয়ে দেখ্‌তে আস্‌বে, তাহারা কৈ?"

র।—এই এল বলে। আচ্ছা শ্যাম, মেয়েটি কেমন সাজান হয়েছে, একবার তুমি দেখ্‌বে?

শ্যাম।—তা ভাল, আমরা একবার দেখে রাখি। তোমার ভাগিনেয়ীকে ডেকে আন।

রমেশ একটু মুচ্‌কি হাসিয়া বাড়ীর ভিতর গেল; ক্ষণেক পরে সরস্বতীকে সঙ্গে করিয়া বাহিরে আসিল। সরস্বতী এখন তের বছরের মেয়ে, প্রথম কিশোরী। অত রূপ, অমন লাবণ্য এখন যেন একটু শুক্‌নো শুকনো বলিয়া মনে হইল। সরস্বতীর মা সরস্বতীকে দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে দেন না।

শ্যাম সরস্বতীকে অনেকক্ষণ স্থিরনেত্রে দেখিল। পাঁচ সাত মিনিট পরে ছোট একটী নিশ্বাস ফেলিয়া শ্যাম বলিল—"বেশ সাজান হয়েছে, এখন বাড়ী নিয়ে যাও।"

রমেশ আবার একটু হাসিয়া সরস্বতীকে অন্দরে দিয়া আসিল। বাহিরে ফিরিয়া আসিয়া রমেশ শ্যামের দিকে সার্থক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল—"কি হে, কেমন দেখ্‌লে? মেয়েটি পছন্দ হয়? এমন মেয়েরও ভাই বর খুঁজতে হয়!"

শ্যাম। বাঙ্গালী-ঘরে আমি এমন মেয়ে দেখিনি।

র। শ্যাম, একটা কথা শুন্‌বে? মেয়েটিকে তুমি গ্রহণ কর না?

শ্যাম।—বাবা থাক্‌তে আমি কি বলিতে পারি? বাবাকে ও মাকে খবর দাও না; তাঁহারা যা বলিবেন তাই হবে।

র।—আসল কথা কি জান? তোমার বাবা অনেক টাকা চান। তত টাকা আমরা দিতে পারবো না।

শ্যাম। কথা কহিয়াই একবার দেখ না।

(৪)

গোপালবাবু রমেশকে সঙ্গে লইয় শিবু ঘোষের বাসাবাড়ীতে আসিলেন। সাধারণ আদর আপ্যায়নের পর, কুশলমঙ্গল জিজ্ঞাসা এবং অন্য শিষ্টাচারের পর গোপালবাবু করযোড়ে বিনীতভাবে বলিলেন,—

"ঘোষ মহাশয়, আমার একটি মেয়ে আছে; মেয়েটি অপরূপ সুন্দরী। আপনি আমার এই কন্যাটিকে গ্রহণ করুন—আমার জাতিকুল-মান রক্ষা করুন।"

শিব। হাঁ, শুনেছি তোমার মেয়েটি সুন্দরী। আমার শ্যাম দেখে এসেছে। গিন্নী বল্‌ছিলেন, শ্যামের মেয়ে পছন্দ হয়েছে। তা ভাল; আমার সঙ্গে কুটুম্বিতা করে উঠ্‌তে পার্‌বেন কি?

গোপাল। আপনি দয়া ক'রে কন্যাটি গ্রহণ করুন। আমি আপনার

যোগ্য নহি। আপনার বড়ছেলে হরিচরণ এখন মুনসেফ, পরে সবজজ্‌ হবে। তার বিয়ে এমন কি সমান ঘরে দিয়েছেন?

শিব। তাকে যে কুল কর্ত্তে হয়েছে! তা থাক্‌, মেয়েটি যখন ভাল, গিন্নীর যখন মত, তখন আমারও মত। আপনি নগদ তিন হাজার টাকা দিবেন। আমি আর কিছু চাই না। আমার শ্যামের সঙ্গে বিয়ে দেবে ব'লে লোকে পনের হাজার পর্য্যন্ত দিতে রাজী হয়েছে। যদি তিন হাজার টাকা দিতে না পার ত আমার কাছে আর এস না।

রমেশ ও গোপালবাবু দুইজনেই একসঙ্গে দুইটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কতক্ষণ পরে গোপাল বাবু বলিলেন,—"যে আজ্ঞা; আপনি যাহা অনুমতি করিতেছেন, তাহাই হইবে। আমি যথাসর্ব্বস্ব বেচিয়া তিন হাজার টাকা সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিব। যদি পারি ত আবার দেখা করিব।"

(৫)

গোপালবাবু গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গৃহিণী তারাসুন্দরীকে সকল কথা কহিলেন। সে কথা বলিতে বলিতে গোপালবাবুর দুই চোখের জলে বুক ভাসিয়া গেল। অনেক কষ্টে চক্ষের জল সাম্‌লাইয়া গোপালবাবু বাষ্পগদ্‌গদ্‌ স্বরে বলিলেন—"কি হবে গিন্নি! তিন হাজার টাকার কমে কোন পাত্রই পাওয়া যাচ্ছে না। শ্যামাচরণ সে হিসাবে সকল ছেলের চেয়ে ভাল ছেলে। তিন হাজার টাকাই যদি ব্যয় করিতে হয় ত শ্যামকেই কন্যাদান করিব। কিন্তু এত টাকা কোথা থেকে পাব! কি হবে!"

তারা।—অমন অস্থির হলে কি চলে! একটু স্থির হও। আমাকে একটু ভাব্‌তে দাও। দেখি, গোবিন্দজীর মনে কি আছে! বাড়ী বয়ে এসে যখন কনে দেখে গিয়েছে, তখন অমন রূপে গুণে কুলে শীলে পাত্র ত ছাড়া যায় না।

তারাসুন্দরী হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, সর্ব্বস্ব বেচিলে তিন হাজার টাকা হয়। যথাসর্ব্বস্ব বেচিয়া কন্যার বিবাহ শ্যামেরই সহিত দিবেন স্থির করিলেন। পরন্তু সর্ব্বস্বান্ত হইবার পূর্ব্বে তিনি এক চাল চালিয়া দেখিলেন। তারাসুন্দরী রমেশের মারফতে শ্যামাচরণকে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। পত্রের মর্ম্ম এই,—

"বাবা! তোমাকে যখন কন্যা দিব পণ করিয়াছি, তখন তোমাকে

ছেলের মত আদর করিয়া আমি পত্র লিখিতে পারি। এ কারণ তুমি লজ্জিত হইবে না। তোমার পিতাঠাকুর আমাদের কাছ থেকে তিন হাজার টাকা চাহিয়াছেন। তিন হাজার টাকা জোগাড় করিতে আমাদের সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। অথচ আমার কন্যা এবং তুমি, তোমরা উভয়ে উভয়কে চোখের দেখা দেখিয়াছ। সরস্বতী শুনিয়াছে যে, তোমার সহিত তাহার বিবাহের সম্ভাবনা আছে। মেয়েটি আমার নিতান্ত ছেলেমানুষ নয়। এখন বাবা আমাদের ইহকাল পরকাল তোমার হাতে; তুমি যাহা ভাল বুঝিবে করিবে, ইতি।

তোমার ও সরস্বতীর মা
তারাসুন্দরী।

শ্যামাচরণ এই পত্র পাঠ করিয়া দণ্ডেক কাল স্তম্ভিত হইয়া রহিল। পরে চিঠিখানি লইয়া নিজের জননীর কক্ষে গেল। শ্যামাচরণের চোখে জল আসিয়াছে, কণ্ঠরোধ হইয়া গিয়াছে, সে নির্ব্বাক নিস্পন্দভাবে মায়ের হাতে চিঠিখানি দিল। মাতাঠাকুরাণী ধীরে ধীরে চিঠিখানি খুলিয়া পাঠ করিলেন,—একবার, দুইবার, তিনবার চিঠিখানি পড়িয়া তাঁহার চোখেও একটু জল আসিল। পুত্রের মুখের পানে তাকাইয়া দেখিলেন—দেখেন, ছেলের চোখেও জল। এইবার সতী সামলাইয়া একটু মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন—"খ্যাপা ছেলে, এই চিঠিখানার উত্তর দিতে পাচ্ছ না! বুঝেছি বাবা, তুমি কি চাও! আমার চাঁদ আমার, আমি থাকৃতে তোমার মনে কষ্ট হবে! আমার দুই রত্তি নিয়ে ঘর সংসার—আমিও মেয়ের মা; আমি কি পরের নিশ্বাস সহ্য কর্ত্তে পারি! কাগজ কলম দাও, আমি এ চিঠির উত্তর দিচ্ছি।"

কাগজ কলম লইয়া শ্যামের মা চিঠি লিখিতে বসিলেন।—

বেহান্ ঠাকুরাণী! এইটুকু পড়ে বোধ হয় তুমি একটু সুখের হাসি হাস্‌বে। আমিও মেয়ের মা—তোমার জ্বালা বুঝি। শ্যাম, তোমার মেয়েকে পছন্দ করেছে। কর্ত্তা তিন হাজার টাকা চেয়েছেন। একটা উপায় বলি শুন, তোমার গহনা পত্র বাড়ী সব আমার কাছে বাঁধা দাও, আমি কর্ত্তার বাক্স থেকে তোমাকে তিন হাজার টাকা ধার দিব। তুমি তিন বছরে সে ঋণ শোধ করিও। টাকাটা শ্যাম তোমার কাছে দিয়ে আস্‌বে। তুমি গহনাপত্র ও বাড়ীর কাগজপত্র আমাকে দিও। আমার নিজের কিছু নাই। নহিলে

মুখের কথায় তোমাকে টাকা ধার দিতে পার্ত্তেম্। শ্যামের মা হতে চেয়েছ, শ্যামের বাপটিকে কেমন ক'রে পোষ মানিয়ে রাখ্‌তে হয়, সেটুকু আমার কাছে শিখ্‌তে হবে। ইতি—

তোমার বেহান্
শ্যামের মা।

(৬)

তারাসুন্দরী দুই হাজার টাকার মূল্যের গহনা এবং বাড়ী বাঁধা রাখিয়া তিন হাজার টাকা পাইলেন। সরস্বতীর সহিত শ্যামের বিবাহ হইয়া গেল। শ্যাম ঈপ্‌সীত সামগ্রী লাভ করিয়া পরম সুখী হইল। পরন্তু সে ফুল-শয্যার পরদিন পিতার নামে একখানি পত্র লিখিয়া বিদেশে চলিয়া গেল। সুদূর পশ্চিমে কোন এক স্বাধীন রাজার প্রতিষ্ঠিত কলেজে সে মাসিক আড়াইশত টাকা বেতনে অধ্যাপকের চাকুরী গ্রহণ করিল। পূর্ব্ব হইতেই এখানে তাহার জোগাড় করা ছিল, যাইতেই চাকুরী হইল। পিতা শিবু ঘোষকে সে যে পত্র লিখিয়াছিল, তাহার অনুলিপি নিম্নে প্রকাশিত করিলাম।

"শ্রীচরণেষু! যে উপায়ে আমি বিবাহ করিয়াছি, এবং যে উপায়ে গোপাল বাবু আপনার হুকুম মত রোখ্ তিন হাজার টাকা দিতে পারিয়াছেন, মাতাঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে উপায়ের পরিচয় আপনি পাইবেন। আমি গোপাল বাবুর ঋণ নিজে উপার্জ্জন করিয়া পরিশোধ করিব। যতদিন ঋণ পরিশোধ না হয়, ততদিন এদেশে থাকিব। আমার প্রণাম জানিবেন। নিবেদন ইতি।

সেবক—
শ্রীশ্যামাচরণ।

শিবুঘোষ পত্র পাইয়া চক্ষু কপালে তুলিলেন। গৃহিণীকে ডাকাইয়া সকল তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। গৃহিণীর মুখে সে সব কাহিনী শুনিয়া বলিলেন,—"আমাকে বল্লেই ত আমি তিন হাজার টাকা ছেড়ে দিতে পাত্তেম্! অমন চাঁদপানা বৌ-মা, সরস্বতী—সাক্ষাৎ মা সরস্বতী; অমন মেয়ে ঘরে আন্‌তে কি টাকা নিতে হয়?"

গিন্নী।—মোচড় না দিলে কবে তুমি কোন কাজ করেছ? যখন বয়স ছিল, তখন বাপের বাড়ী চলে যেতুম, আর তুমি পোষ মান্‌তে। এখন ত

বৌমাকে দেখে মা সরস্বতী—মা সতী ব'লে আদর করা হচ্চে। ছেলের বিয়ের পূর্ব্বে নিজে দেখে আস্‌তে পারনি কেন? যাক্ সে সব কথা, এখন আমার ছেলে এনে দাও! আজ থেকে এই আমি কাঁদতে বস্‌লুম। দুই ভাই যদি বিদেশে থাকবে ত আমি বেঁচে থাকবো কাদের নিয়ে? আমার ছেলে এনে দাও।" এই বলিয়া গৃহিনী মুখে কাপড় দিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। কর্ত্তা ঘোষ মহাশয়কে প্রমাদ গণিতে হইল। গত্যন্তর না দেখিয়া কর্ত্তা বলিলেন—"আমি আজি ডাক-গাড়ীতে বেরিয়ে যাই, তোমার ছেলে তোমাকে দিয়ে তবে অন্নজল স্পর্শ করিব।"

যথাকালে শ্যাম বাড়ী আসিলেন। শ্বশুরের বন্ধকী সামগ্রী ফেরৎ হইল, আর সেই তিন হাজার টাকা সরস্বতীর নামে কাগজ লিখিয়া দেওয়া হইল।

মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

(সংক্ষিপ্ত জীবনী)

লেখক—শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ।

(শ্রাদ্ধবাসরে লিখিত)

"একে একে শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী।"

মেঘনাদবধ কাব্য।

কবিবর মাইকেল মধুসূদনের এই বাক্যটী এখন বাঙ্গালাদেশের পক্ষে নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিগত এক বৎসরের মধ্যে বাণীর বরপুত্র আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর, প্রথিতযশাঃ দেবেন্দ্রবিজয়, রায়বাহাদুর রাজেন্দ্রচন্দ্রের শোক বিস্মৃত হইতে না হইতেই যে আমাদিগকে সতীশচন্দ্রের বিয়োগ-বেদনা সহ্য করিতে হইবে, ইহা কল্পনাও করি নাই। বিগত ১২ই বৈশাখ (ইংরাজী ২৮শে এপ্রেল ১৯২০) বঙ্গসাহিত্যাকাশের অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র সর্ব্বজনপ্রিয় মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম-এ, পি, এইচ, ডি মহোদয় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। বাণীর মন্দিরের ঘৃত-প্রদীপ অকালে নিভিয়া গিয়াছে, দেশবাসীর মনে শোকের অন্ধকার, সাহিত্যের তপোবনে বিষাদের ছায়া, বাঙ্গালার তথা বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য। তাঁহার অকালমৃত্যু দেশবাসীর পক্ষে যে কি প্রকার ক্ষতিকর

তিরোধানে সমগ্র বঙ্গীয় শাকদ্বীপ ব্রাহ্মণ-সমাজের যে কি বিষম অনিষ্ট হইল, তাহা সমগ্র সমাজ-হৃদয়ের স্তরে স্তরে বুঝিতে পারিতেছেন। তাঁহার দ্বারা সমাজ যে কত প্রকারে সাহায্য, কত প্রকারে উপকার পাইতেছিল এবং ভবিষ্যতে কতরূপ উপকারের আশা করিতেছিল, তাহা বর্ণনাতীত। তাই আজ সমগ্র সমাজ তদীয় বিয়োগ-বেদনায় হাহাকার করিতেছে।

জন্মস্থান ও বংশপরিচয়।

ফরিদপুর জেলার অন্তঃপাতী বাঁধুলি খালকুলাগ্রাম বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জন্মস্থান। বাঙ্গালা ১২৭৭ সালের ১৫ই শ্রাবণ শনিবার (ইংরাজী ১৮৭০. জুলাই) খালকুলাগ্রামে সরযূপারী গ্রহবিপ্রকুলে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ। মাতার নাম স্বর্ণময়ী দেবী। এই ভাগ্যবতী রমণী বৃদ্ধাবস্থায় কৃতী পুত্রচতুষ্টয়, পুত্রবধূ, পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রী-গণ লইয়া পরমসুখে কালযাপন করিলা মরজগতের কার্য্য সমাপনান্তে চিন্ময়-ধামে গমন করিয়াছেন।

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পূর্ব্ব-পুরুষেরা বঙ্গের রাজধানী নবদ্বীপের অধিবাসী ছিলেন। এই বংশের আদিপুরুষ কমলাকর জ্যোতিষী একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার লিখিত জ্যোতিষশাস্ত্রের কয়েকখানি টীকা গ্রন্থ আছে। কমলাকরের পুত্র সুধাকর, সুধাকরের পুত্র হৃষীকেশ। হৃষীকেশের পুত্র গোপীনাথ। ইঁহারা সকলেই বংশপরম্পরায় জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। গোপীনাথের পুত্র রাজীবলোচন বিদ্যাসাগর। রাজীবের পুত্র প্রাণবল্লভ। প্রাণবল্লভের পুত্র কেশব বিশারদ। কেশবের দুই পুত্র—১ম, কমললোচন বিদ্যাবিনোদ; ২য়, ভৃগুরাম বাচস্পতি। ভৃগুরামের পুত্র শতানন্দ সিদ্ধান্ত-বাগীশ। ইঁহারা সকলেই নবদ্বীপের অধিবাসী।

অনুমান দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় প্রবীণ বয়সে কোন আত্মীয়ের অনুরোধে বর্ত্তমান নদীয়া ও ফরিদপুর জেলার সন্ধিস্থলে ফরিদ-পুরের অন্তর্গত ধর্ম্মহাটীতে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার অন্যান্য সহোদর-গণ নবদ্বীপেই অবস্থিতি করেন।

সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের পাঁচ পুত্র। তন্মধ্যে উমাকান্ত বিদ্যানিধি সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ। তিনি কিছুকাল ধর্ম্মহাটীতে বাস করিয়া, পরে চন্দনা নাম্নী স্রোত-স্বতী তীরে খালকুলাগ্রামে আসিয়া ভ্রাতৃগণ সহ বাস করেন। উমাকান্তের

ও ত্রৈমাসিক পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অধ্যাপক সদস্য ও সাহিত্য সভার সভ্য ছিলেন। এতদ্ভিন্ন বহু সভা-সমিতিতে যোগদান করিয়া বক্তৃতাদি করিতেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ ইঁহার পাণ্ডিত্যে পরিতুষ্ট হইয়া ইঁহাকে প্রথমে ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় বাঙ্গালার পরীক্ষক ও পরে "আই-এ'র পরীক্ষক নিযুক্ত করেন।

শাস্ত্রী মহাশয় যেমন সুপণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, তেমনি বিনয়ী, পরোপকারী, সদালাপী প্রভৃতি বিবিধগুণে বিভূষিত ছিলেন। এ অধম লেখককে তিনি কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় স্নেহ করিতেন এবং সর্ব্বদা আমার হিত কামনা করিতেন।

বর্ত্তমানে ইঁহার সন্তানের মধ্যে দুইটী পুত্র ও একটী কন্যামাত্র। জ্যেষ্ঠপুত্র

শ্রীমান্ ধীরেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন শাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, পি, আর, এস, লেক্‌চারার কলিকাতা ইউনিভার্সিটী।

পূর্ব্বোক্ত পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র—আমাদের সর্ব্বজনপ্রিয় মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম-এ, পি এইচ্ ডি।

বাল্যপ্রতিভা ও ছাত্রজীবন।—বিদ্যাভূষণ মহাশয় খালকুলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া তথায় বাল্যজীবন অতিবাহিত করেন। তিনি পঞ্চম বৎসর বয়সে তথাকার মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, নিজের মেধা ও প্রতিভাবলে প্রতি বৎসর বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া, ক্রমে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন। তৎপরে বিদ্যালয় হইতে মধ্য-ইংরাজী পরীক্ষা দিয়া, প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া, সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন এবং মাসিক ৫৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন।

ইহার পর, তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতাদিগের সহিত নবদ্বীপে আসিতে বাধ্য হন। নবদ্বীপে আসিয়া নবদ্বীপ হিন্দুস্কুলে ভর্ত্তি হইয়া অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। পরে নবদ্বীপ হিন্দুস্কুল হইতে উচ্চ-ইংরাজী পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ১৫৲ টাকা হিসাবে বৃত্তি পান। তৎপরে কলিকাতাস্থ সিটি কলেজে ভর্ত্তি হন। এখান হইতে আই-এ পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন।

বিবাহ ও শ্বশুরের পরিচয়।—আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর বিদ্যাভূষণ মহাশয় মেদিনীপুর কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল কৃষ্ণনগর

নেদিয়ারপাড়া নিবাসী গঙ্গাধর আচার্য্য মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যার পাণিগ্রহণ করেন; এবং কৃষ্ণনগর কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া বি-এ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। তৎপরে কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষা দিয়া বিশেষ প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হন। তিনি বি-এ পরীক্ষায় সংস্কৃত অনার্সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ২য় এবং সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সুবর্ণপদক প্রাপ্ত হন।

এস্থলে আমরা পণ্ডিত বিদ্যাভূষণের শ্বশুর গঙ্গাধর বাবুর কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব।

১৭৫১ শকাব্দের আশ্বিন মাসে গঙ্গাধর আচার্য্য মহাশয় কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কালাচাঁদ আচার্য্য। গঙ্গাধর বাবুর শৈশবেই মাতৃ-পিতৃ বিয়োগ হয়। ইনি স্বীয় প্রতিভাবলে ও অসাধারণ অধ্যবসায় দারিদ্র্যের কঠোর আক্রমণ অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে জুনিয়র ও সিনিয়র স্কলারসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ইংরাজি সাহিত্যে অনন্যসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

গঙ্গাধর বাবু প্রথমতঃ সহায় অভাবে ভাল চাকুরি না পাওয়ায় গোবরডাঙ্গা মধ্য-ইংরাজি স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদলাভ করেন। তৎপরে তথা হইতে মেট্রপলিটন স্কুলে, তদনন্তর কোননগর হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক হন।

ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি যেরূপ চিরদিন গোপন থাকে না, তদ্রূপ গঙ্গাধর বাবুর ইংরাজী জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য দর্শন করিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বালেশ্বর জেলাস্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। তথায় কিছুদিন দক্ষতার সহিত কার্য্য করার পর শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর ইঁহাকে বিভাগের হেড কোয়ার্টর মেদিনীপুর গবর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ প্রদান করেন।

গঙ্গাধর বাবু মেদিনীপুরে যাইয়া তাঁহার সমস্ত অধ্যবসায় ও কার্য্য-নৈপুণ্য বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে নিয়োগ করেন। যখন বিদ্যালয় হইতে বৎসর বৎসর আশাতীত সংখ্যক ছাত্র উত্তীর্ণ হইতে লাগিল, তখন তিনি তাঁহার কার্য্যনৈপুণ্যের পক্ষপাতী ডিষ্ট্রিক্ট জজের সহিত পরামর্শ করিয়া এক সভা আহ্বান করেন এবং মেদিনীপুরে একটী দ্বিতীয়শ্রেণীর কলেজ খুলিবার প্রস্তাব করেন। অনেক লেখালেখির পর সদাশয় গভর্ণমেণ্ট নিকট হইতে মেদিনীপুরে কলেজ প্রতিষ্ঠার আদেশ প্রাপ্ত হন; এবং গঙ্গাধর বাবু কলেজের অধ্যক্ষ (Principal) নিযুক্ত হন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতাগুণে

ও ত্রৈমাসিক পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অধ্যাপক সদস্য ও সাহিত্য সভার সভ্য ছিলেন। এতদ্ভিন্ন বহু সভা-সমিতিতে যোগদান করিয়া বক্তৃতাদি করিতেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ ইঁহার পাণ্ডিত্যে পরিতুষ্ট হইয়া ইঁহাকে প্রথমে ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় বাঙ্গালার পরীক্ষক ও পরে "আই-এ'র পরীক্ষক নিযুক্ত করেন।

শাস্ত্রী মহাশয় যেমন সুপণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, তেমনি বিনয়ী, পরোপকারী, সদালাপী প্রভৃতি বিবিধগুণে বিভূষিত ছিলেন। এ অধম লেখককে তিনি কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় স্নেহ করিতেন এবং সর্ব্বদা আমার হিত কামনা করিতেন।

বর্ত্তমানে ইঁহার সন্তানের মধ্যে দুইটী পুত্র ও একটী কন্যামাত্র। জ্যেষ্ঠপুত্র

শ্রীমান্ ধীরেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন শাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, পি, আর, এস, লেক্‌চারার কলিকাতা ইউনিভার্সিটী।

পূর্ব্বোক্ত পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র—আমাদের সর্ব্বজনপ্রিয় মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম-এ, পি এইচ্ ডি।

বাল্যপ্রতিভা ও ছাত্রজীবন।—বিদ্যাভূষণ মহাশয় খালকুলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া তথায় বাল্যজীবন অতিবাহিত করেন। তিনি পঞ্চম বৎসর বয়সে তথাকার মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, নিজের মেধা ও প্রতিভাবলে প্রতি বৎসর বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া, ক্রমে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন। তৎপরে বিদ্যালয় হইতে মধ্য-ইংরাজী পরীক্ষা দিয়া, প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া, সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন এবং মাসিক ৫৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন।

ইহার পর তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতাদিগের সহিত নবদ্বীপে আসিতে বাধ্য হন। নবদ্বীপে আসিয়া নবদ্বীপ হিন্দুস্কুলে ভর্ত্তি হইয়া অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। পরে নবদ্বীপ হিন্দুস্কুল হইতে উচ্চ-ইংরাজী পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ১৫৲ টাকা হিসাবে বৃত্তি পান। তৎপরে কলিকাতাস্থ সিটি কলেজে ভর্ত্তি হন। এখান হইতে আই-এ পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন।

বিবাহ ও শ্বশুরের পরিচয়।—আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর বিদ্যাভূষণ মহাশয় মেদিনীপুর কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল কৃষ্ণনগর

নেদিয়ারপাড়া নিবাসী গঙ্গাধর আচার্য্য মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যার পাণিগ্রহণ করেন; এবং কৃষ্ণনগর কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া বি-এ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। তৎপরে কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষা দিয়া বিশেষ প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হন। তিনি বি-এ পরীক্ষায় সংস্কৃত অনার্সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ২য় এবং সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সুবর্ণপদক প্রাপ্ত হন।

এস্থলে আমরা পণ্ডিত বিদ্যাভূষণের শ্বশুর গঙ্গাধর বাবুর কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব।

১৭৫১ শকাব্দের আশ্বিন মাসে গঙ্গাধর আচার্য্য মহাশয় কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কালাচাঁদ আচার্য্য। গঙ্গাধর বাবুর শৈশবেই মাতৃ-পিতৃ বিয়োগ হয়। ইনি স্বীয় প্রতিভাবলে ও অসাধারণ অধ্যবসায় দারিদ্র্যের কঠোর আক্রমণ অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে জুনিয়র ও সিনিয়র স্কলারসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ইংরাজি সাহিত্যে অনন্যসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

গঙ্গাধর বাবু প্রথমতঃ সহায় অভাবে ভাল চাকুরি না পাওয়ায় গোবরডাঙ্গা মধ্য-ইংরাজি স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদলাভ করেন। তৎপরে তথা হইতে মেট্রপলিটন স্কুলে, তদনন্তর কোননগর হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক হন।

ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি যেরূপ চিরদিন গোপন থাকে না, তদ্রূপ গঙ্গাধর বাবুর ইংরাজী জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য দর্শন করিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বালেশ্বর জেলাস্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। তথায় কিছুদিন দক্ষতার সহিত কার্য্য করার পর শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর ইঁহাকে বিভাগের হেড কোয়ার্টর মেদিনীপুর গবর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ প্রদান করেন।

গঙ্গাধর বাবু মেদিনীপুরে যাইয়া তাঁহার সমস্ত অধ্যবসায় ও কার্য্য-নৈপুণ্য বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে নিয়োগ করেন। যখন বিদ্যালয় হইতে বৎসর বৎসর আশাতীত সংখ্যক ছাত্র উত্তীর্ণ হইতে লাগিল, তখন তিনি তাঁহার কার্য্যনৈপুণ্যের পক্ষপাতী ডিষ্ট্রিক্ট জজের সহিত পরামর্শ করিয়া এক সভা আহ্বান করেন এবং মেদিনীপুরে একটী দ্বিতীয়শ্রেণীর কলেজ খুলিবার প্রস্তাব করেন। অনেক লেখালেখির পর সদাশয় গভর্ণমেণ্ট নিকট হইতে মেদিনীপুরে কলেজ প্রতিষ্ঠার আদেশ প্রাপ্ত হন; এবং গঙ্গাধর বাবু কলেজের অধ্যক্ষ (Principal) নিযুক্ত হন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতাগুণে

কিছুদিনের মধ্যেই মেদিনীপুর কলেজে বি-এ ক্লাশ খুলিয়া প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত করেন।

সুদীর্ঘ ১২ বৎসরকাল মেদিনীপুরের শিক্ষা ও সুনীতির উন্নতিকল্পে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া গঙ্গাধর বাবুর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় এবং ঐ সময় তাঁহার পত্নীবিয়োগ ঘটে। তিনি কিছুদিনের অবকাশ গ্রহণ করিয়া স্বাস্থ্যলাভ জন্য কলিকাতা আগমন করেন। কলিকাতায় আসিয়া অল্পদিন মধ্যে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। মৃত্যুকালে তাঁহার দুইটী কন্যা ও একটী পুত্র বিদ্যমান ছিল। কিন্তু কিছুদিন পরে পুত্রটীও পিতার অনুবর্ত্তী হয়।

তিনি প্রথমতঃ ত্রিশ টাকা বেতনে কার্য্যারম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে নিজ পাণ্ডিত্য ও কার্য্যদক্ষতা গুণে কর্ত্তৃপক্ষের প্রশংসাভাজন হইয়া মেদিনীপুর কলেজে মাসিক ৬০০৲ শত টাকা বেতন পাইতেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাধর বাবু লোকান্তরগমন করেন।

গঙ্গাধর বাবু মৃত্যুকালে স্বোপার্জ্জিত অর্থের অর্দ্ধাংশ প্রায় পনর হাজার টাকা দরিদ্র শিক্ষার্থী ও অনাথা বিধবা প্রভৃতির নিয়মিত দানের জন্য একখানি দানপত্র Will লিখিয়া কয়েকজন ট্রষ্টির হস্তে ন্যস্ত করিয়া যান। এই অর্থের ট্রষ্টি তৎকালে তাঁহার অন্যতম সহাধ্যায়ী কৃষ্ণনগর কলেজের সুবিখ্যাত অধ্যাপক উমেশচন্দ্র দত্ত-প্রমুখ তিনজন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া যান। ঐ টাকার সুদ হইতে এখন তাঁহার দানপত্রানুসারে কার্য্য চলিতেছে। তদানিন্তন বিদ্যাভূষণ মহাশয়, গঙ্গাধর বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র মনমোহন বাবু ও যোগেশবাবু ঐ অর্থের ট্রষ্টি ছিলেন।

কার্য্যক্ষেত্র, প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি ও সংস্কৃত এবং পালিভাষায় এম-এ পরীক্ষা দান।

কৃষ্ণনগর কলেজ হইঁতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সতীশবাবু কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজে এম-এ পরীক্ষা দিবার জন্য অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। ঐ সময়ে মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই মহোদয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।

সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নকালে পণ্ডিত বিদ্যাভূষণ মহাশয় মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই, মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, মহামহোপাধ্যায় মধুসূদন স্মৃতিরত্ন ও মহামহোপাধ্যায় গোবিন্দ শাস্ত্রী প্রমুখ

পণ্ডিতবর্গের নিকট যথাক্রমে দর্শন, স্মৃতি, কাব্য ও বেদাদি শাস্ত্র সমূহ অধ্যয়ন করেন।

এতদ্ভিন্ন বিদ্যাভূষণ মহাশয় নবদ্বীপের প্রধান কবি পণ্ডিতপ্রবর (পরে মহামহোপাধ্যায়) অজিতনাথ ন্যায়রত্ন ও প্রধান নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় মদনাথ সার্ব্বভৌমের নিকট কাব্য ও ন্যায়শাস্ত্র বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

সংস্কৃত এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ইনি "নবদ্বীপ বিদগ্ধ জননী সভা" হইতে সংস্কৃত পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া "বিদ্যাভূষণ" উপাধি লাভ করেন। ইংরাজী ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাভূষণ মহাশয় এম-এ পরীক্ষা দিয়া ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

সংস্কৃত এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর বিদ্যাভূষণ মহাশয় কৃষ্ণনগর কলেজে প্রধান সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হইয়া তথায় চারি বৎসর কার্য্য করেন। এই সময়ে তিনি বৌদ্ধশাস্ত্রের বহু গ্রন্থ আলোচনা ও সম্পাদন করেন।

তিনি ২৯ বৎসর বয়সে "বুদ্ধিষ্ট-টেক্সট্‌বুক সোসাইটির" কার্য্যে মনোনীত হন। ইউরোপের সুধী-সমাজে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পুস্তকগুলি বিশেষ সমাদৃত ও প্রশংসিত হয়।

ইংরাজী ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সহকারী তিব্বতীয় অনুবাদকের পদে নিযুক্ত করিয়া রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই, মহাশয়ের সহিত তিব্বতীয় ও বৌদ্ধ সংস্কৃত অভিধান প্রণয়ন কার্য্যের ভার প্রদান করেন। এই প্রসঙ্গে গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে দার্জ্জিলিঙে প্রেরণ করিয়া সেক্রেটরিয়েট প্রেসের অংশবিশেষের অধ্যক্ষতা-কার্য্যে নিযুক্ত করেন।

দার্জ্জিলিঙে অবস্থানকালে সতীশবাবু তিব্বতীয় ভাষা বিশেষরূপে অনুশীলন করেন। তিব্বত দেশের রাজধানী লাসানগরীর সুশিক্ষিত ও সুবিখ্যাত লামা ফুন্‌ছো-গওয়াংডান তখন দার্জ্জিলিঙে অবস্থিতি করিতেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় ইঁহাকে মাসিক ১৫৲ টাকা বেতন দিয়া ক্রমান্বয়ে দেড় বৎসর কাল তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত নীতি ও তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তন্মধ্যে 'কাব্যবদুনদেন' এবং 'সেরাবডঙ্গু' সমধিক উল্লেখযোগ্য।

দার্জ্জিলিঙ হইতে বিদ্যাভূষণ মহাশয় ১৯০০ অব্দের ডিসেম্বর মাসে

সংস্কৃত কলেজের লেক্‌চারার (Lecturer) নিযুক্ত হইয়া কলিকাতা আগমন করেন এবং কলেজের কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। সংস্কৃত কলেজ হইতে পরে প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত হন।

তিনি কলিকাতায় অবস্থানকালে সিংহল ও ব্রহ্মদেশীয় শ্রমণগণের নিকট পালিভাষা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। সিংহলের সুবিখ্যাত সুমঙ্গল সদাখোরা ও শীলস্কন্ধ স্থবিরের সহিত তাঁহার বহু বিষয় সম্বন্ধে লেখালেখি হয়।

পালিভাষায় রীতিমত ব্যুৎপত্তিলাভের পর ১৯০১ অব্দের নবেম্বর মাসে বিদ্যাভূষণ মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পালিভাষায় এম-এ পরীক্ষা প্রদান করেন। ইতঃপূর্ব্বে ভারতবর্ষ, সিংহল বা ব্রহ্মদেশ হইতে আর কেহ কখন পালিভাষায় এম্-এ পরীক্ষা দেন নাই। পরীক্ষার জন্য ভারতবর্ষে পরীক্ষক না পাওয়ায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি ও বৌদ্ধ শাস্ত্রের অধ্যাপক্ষ ডাক্তার রীজ ডেভিড্‌স্‌কে পরীক্ষক নিযুক্ত করেন।

পরীক্ষা প্রদানের পর ডাক্তার রীজ ডেভিডস্ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রশ্নোত্তর পরীক্ষায় বিশেষ পরিতুষ্ট হন এবং ইঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের নিকট স্বীয় মন্তব্য লিখিয়া পাঠান। এবারও ইনি পালিভাষায় এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সুবর্ণপদক ও একশত টাকার পুস্তক্ পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে বহু অমূল্যগ্রন্থ জার্ম্মাণ ভাষায় বিদ্যমান আছে, ইহা দেখিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয় ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাস হইতে জার্ম্মাণ ভাষার অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হন। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিয়ান ম্যাকফারসন্ সাহেব তাঁহাকে সমুৎসাহিত করিয়া এই ভাষার শিক্ষায় প্রবৃত্ত করেন। প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক বহু গ্রন্থ অনুশীলনের পর তিনি প্রত্নতাত্ত্বিক বলিয়াও সুপরিচিত হন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিব্বত দেশের তাসিলামা বৌদ্ধতীর্থ সমুহ সন্দর্শনের অভিপ্রায়ে ভারতবর্ষে আগমন করেন। এই সময়ে ভারত-গবর্ণমেণ্টের আদেশে বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া বুদ্ধগয়া, বারাণসী, সারনাথ, আগ্রা, তক্ষশিলা প্রভৃতি অতিপ্রাচীন বৌদ্ধতীর্থসমূহের ইতিবৃত্ত ও তত্রত্য অনুষ্ঠানাদির বিবরণ তিব্বতীয় ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন এবং বরাবর তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া দোভাষীর (Interpreter) কার্য্য করেন।

ইহাতে তাসি লামা পণ্ডিত বিদ্যাভূষণের উপর এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহার হৃদয়ের পরিতোষ ভারত-গভর্ণমেণ্টকে বিশেষভাবে জ্ঞাপন না করিয়া থাকিতে পারেন নাই; এবং স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তনকালীন বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে বহু বহু ধন্যবাদ প্রদান করিয়া মহাসম্মানের উপহার 'খাতাগ' (রেশমের এক প্রকার অতি মূল্যবান উত্তরীয়) প্রদান করিয়া যান।

'মহামহোপাধ্যায়' ও পি, এইচ, ডি প্রভৃতি উপাধিলাভ।

পণ্ডিত বিদ্যাভূষণের অধ্যাপনা, বিদ্যাচর্চ্চা, পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রণয়ন ও পুস্তক রচনায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য দর্শন করিয়া, শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর সাহেব ইঁহাকে "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি প্রদানের জন্য ভারত-গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। তদনুসারে গুণগ্রাহী সদাশয় গভর্ণমেণ্ট বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি তারিখে 'মহামহোপাধ্যায়" উপাধি দানে সম্মানিত করেন।

১৯০৭ অব্দে বিদ্যাভূষণ মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য নির্ব্বাচিত হন; এবং এই বৎসরেই বঙ্গীয় এসিয়াটিক্ সোসাইটির কাউন্সিলের মেম্বর হইতে জয়েণ্ট ফায়লো-লজিকেল সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হন।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দেই পণ্ডিত বিদ্যাভূষণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "বৌদ্ধ ও জৈন ন্যায়" সম্বন্ধে একটি প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করিয়া প্রদান করেন। তৎপরে ১৯০৮ অব্দের মার্চ্চমাসে উহার ফল বাহির হইলে Ph. D, (Doctor of phylosophy) উপাধি লাভ করেন। ইউনিভার্সিটির নূতন বিধি অনুসারে ইনিই প্রথমে এই পরীক্ষা দিয়া এই উপাধি লাভ করেন; এবং এই সময়ে গ্রিফিথস্ প্রাইজও প্রাপ্ত হন।

সিংহল গমন।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাভূষণ মহাশয় বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিশেষভাবে পালিভাষা ও বৌদ্ধ দর্শন শিক্ষার জন্য সিংহলে এবং বেদ ও হিন্দু-দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়নার্থ বারাণসীধামে ও ভাষা তত্ত্বানুশীলনের জন্য জনৈক ভাষাতত্ত্ববিদের নিকট ডেপুটেশনে যাইতে আদিষ্ট হন। তদনুসারে তিনি উক্ত বৎসরের জুন মাসে সিংহল গমন পূর্ব্বক তত্রত্য বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অধিনায়ক সুমঙ্গল মহাস্থবিরের (সুমঙ্গল মহা থেরোর) নিকট পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্র সকল

অধ্যয়ন করেন। সিংহলে অবস্থান কালে তত্রত্য অনুরাধাপুর, কাণ্ডি, গল, কলম্বো প্রভৃতি বহুস্থানে প্রধান প্রধান ব্যক্তি কর্ত্তৃক আহূত হইয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয় ইংরাজী ভাষায় যে সকল বক্তৃতা করেন, তাহাতে সকলেই বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। সিংহল হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে সুবিখ্যাত ভারতী মাসিক পত্রে তাঁহার "কবি কালিদাসের চিতাভূমি ও তাঁহার শেষ কবিতা" * নামক সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধ পাঠে জানা যায় যে, "মহাকবি বহুদিন লঙ্কায় অবস্থান করিয়া ৫২৪ খৃষ্টাব্দে 'মাতর' নগরে কালিন্দী নদী ও ভারত মহাসাগরের সঙ্গম স্থলে দেহ-ত্যাগ করেন। লঙ্কাধিপতি মহারাজ কুমার দাস আন্তরিক শ্রদ্ধাভরে কালিদাসের চিতাভূমিতে আত্ম-বিসর্জ্জন করেন।" মহাকবি কালিদাস উক্ত রাজার সাদর আহ্বানে লঙ্কায় গমন করিয়াছিলেন।

বারাণসী গমন।

সিংহল হইতে প্রত্যাগত হইয়া মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ মহাশয় ভারতের পুণ্যতীর্থ বারাণসী-ধামে গমন করেন; এবং তত্রত্য কুইন্স কলেজের অধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে ছয় মাস কাল বারাণসীতে অবস্থিতি করেন।

বারাণসীতে অবস্থানকালে মহামহোপাধ্যায় সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর নিকট শ্রুতি ও শঙ্করের অদ্বৈতবাদ, মহামহোপাধ্যায় ভাগবতাচার্য্যের নিকট রামানুজ দর্শনের মত, পণ্ডিত জীবনী ঝা ও পণ্ডিত রামাচরণ ন্যায়াচার্য্যের নিকট ন্যায়দর্শনের আলোচনা করেন। এতদ্ভিন্ন মহামহোপাধ্যায় শিবকুমার শাস্ত্রীর নিকট সকল বিষয়ের দুরুহ প্রশ্ন সমূহের মীমাংসা করিয়া লইতেন।

কাশীধাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয় থিবো সাহেবের নিকট জার্ম্মাণ ভাষা ও ইউরোপীয় দর্শনের আলোচনা করেন।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, সংস্কৃত পরীক্ষা বোর্ডের সম্পাদক, সিণ্ডিকেটের মেম্বর হওন প্রভৃতি।

ইংরাজি ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর হইতে পণ্ডিত বিদ্যাভূষণ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ (Principal) ও সংস্কৃত পরীক্ষা বোর্ডের সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এই দুই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

* ভারতী বৈশাখ ১৩১৭, ৩৪শ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা।

সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হওয়ার পর বিদ্যাভূষণ মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি ও সংস্কৃতের লেক্‌চারার এবং তিব্বতীয় ভাষার (Instructor) পদে মনোনীত হন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে পণ্ডিত বিদ্যাভূষণ ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের নব প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে তিব্বতীয় ভাষায় পরীক্ষা প্রদান করিয়া প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হন, এবং ৫০০৲ শত টাকা পুরস্কার লাভ করেন। এই বৎসরই তিনি ঢাকা ইউনিভার্সিটীর অন্যতম মেম্বর নিযুক্ত হইয়া উহার নিয়মাবলী প্রণয়নে প্রবৃত্ত হন।

১৯১২ খৃঃ ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের মেম্বর নিযুক্ত হন।

ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের নব প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে বঙ্গদেশের কলেজ সমূহের পরিদর্শন জন্য পরিদর্শক পদের সৃষ্টি হইলে বিদ্যাভূষণ মহাশয় অন্যতম পরিদর্শক নিযুক্ত হন। এজন্য তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে কলেজ সকল পরিদর্শন নিমিত্ত মফঃস্বলে যাইতে হইত। এতদ্ব্যতীত তাঁহাকে বঙ্গদেশের চতুষ্পাঠি সকলও পরিদর্শন করিতে হইত।

পূর্ব্বে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ হইতে যাঁহারা এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেন, তাঁহারা সংস্কৃত কলেজে সুদীর্ঘকাল অধ্যয়ন করিয়া অবশেষে তথা হইতে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে শাস্ত্রী প্রভৃতি উপাধি লাভ করিতেন, নচেৎ কেবল সংস্কৃত কলেজ হইতে এম-এ পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইলে উপাধিলাভে বঞ্চিত হইতেন। অধ্যক্ষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আমলে নিয়ম হয়, যাঁহারা সংস্কৃত কলেজে একাদিক্রমে ছয় বৎসর কাল পাঠ করিয়া এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহারা গ্রেড অনুসারে শাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন প্রভৃতি উপাধি লাভ করিবেন।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের টোল বিভাগে বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপনা হয়। ইতিপূর্ব্বে কোন কায়স্থ ছাত্রকে উক্ত বিভাগে বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য গ্রহণ করা হইত না, মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহৃদয়তায় জনৈক কায়স্থ সন্তান টোল বিভাগে বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়নের অধিকার প্রাপ্ত হন। (১৩২৩ সাল, শ্রাবণ)

অধ্যক্ষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আমলে সুদূর মাদ্রাজ, বোম্বাই ও রাজপুতানা রাজ্যে সংস্কৃত আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষা দানের জন্য কেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ও ঐ পরীক্ষা দানের অধিকার প্রাপ্ত হন।

নানা সভাসমিতির সভাপতি, সভ্য নির্ব্বাচিত হওন ও গ্রন্থ পরিচয় এবং "সিদ্ধান্ত মহোদধি" উপাধি লাভ।

ইংরাজী ১৯১৩ অব্দের ডিসেম্বর মাসে বিদ্যাভূষণ মহাশয় অল্ ইণ্ডিয়া দিগম্বর জৈন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সুপবিত্র বারাণসী ধামে সমাহূত বিরাট সভায় সভাপতিপদে বৃত হন এবং তথায় "সিদ্ধান্ত মহোদধি" উপাধি প্রাপ্ত হন।

ইহার পর বৎসর ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে অল্ ইণ্ডিয়া শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়" কর্ত্তৃক সুদূর রাজপুতনার মধ্যস্থিত যোধপুর নগরে আহূত বিরাট সভায়ও বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতির কার্য্য করেন।

কলিকাতা মহানগরীতে যেখানে যত সভা সমিতি হইয়াছে, তিনি সকল স্থানেই নিমন্ত্রিত হইয়া যথাসময়ে সভায় উপস্থিত হইয়া সভার কার্য্যে যোগদান করিতেন। এই সকল সভা সমিতিতে কোথাও সভাপতি, কোথাও প্রবন্ধ পাঠক, কোথাও বা বক্তারূপে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা সকলকে পরিতুষ্ট করিতেন। এইজন্য সময়ে সময়ে তাঁহাকে মফঃস্বলেও নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতে হইত।

পণ্ডিত বিদ্যাভূষণ অষ্টাদশ বর্ষাধিক কাল "বুদ্ধিষ্টটেক্সট-বুক সোসাইটীর সহযোগী সম্পাদক ও মহাবোধি সোসাইটীর কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সদস্য ছিলেন। এই উভয় সভার পত্রিকায় তাঁহার বহু উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। সময়ে সময়ে তাঁহাকে পত্রিকা সম্পাদকদিগের অনুরোধ রক্ষার্থ বিবিধ পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে হইত।

বাঙ্গালা ১৩০১ সালে কলিকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহিত উহার সম্বন্ধ ছিল। তিনি পরিষদের কার্য্যকরী সমিতির প্রধান সদস্য ছিলেন। তিনি ১৩১৯ বঙ্গাব্দ হইতে ১৩২৩ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। উক্ত পত্রিকায় তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ বহু দার্শনিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে।

বাঙ্গালা ১৩২৩ বঙ্গাব্দের ৮ই ও ৯ই বৈশাখ যশোহর নগরে সমাহূত "বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মেলনের" নবম বার্ষিক অধিবেশন হয়। তাহাতে মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় সাধারণ সভাপতির ও

সাহিত্যশাখার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে সভাপতি বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে বিশেষ গবেষণা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ সুদীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহা অতিশয় মূল্যবান, প্রত্যেক সাহিত্য-সেবীর অবশ্য পাঠ্য। অভিভাষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছিল ;—

যশোহরের অবস্থা—বঙ্গের জাতীয় সাহিত্য কি ?—সংস্কৃত সাহিত্য—সংস্কৃত সাহিত্যের দিগ্‌বিজয় ;— সংস্কৃতের প্রতিদ্বন্দ্বী,—প্রাদেশিক ভাষা সমূহের উৎপত্তি—বাঙ্গালা সাহিত্যের অভ্যুদয়—প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য—নব্য বাঙ্গলা সাহিত্য—নব্য বাঙ্গলা সাহিত্যের লেখকগণ—জাতীয় সাহিত্য—সাহিত্যের আদর্শ।

অভিভাষণ মুদ্রিত হইয়া সভাস্থলে বিতরিত হইয়াছিল। ৮ পেজি ডিমাই আকারে ৩২ পৃষ্ঠায় পুস্তকখানি সম্পূর্ণ। বিষয় বিবেচনায়, অলোচনা অতি সংক্ষিপ্ত সার হইলেও যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যপূর্ণ—একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তকেও ভাষা প্রাঞ্জলতার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। অভিভাষণে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পূর্ণ দীনতার পরিচয় পাওয়া যায় ;—

"আমি পূজার উপযোগী কোন গন্ধপুষ্প আহরণ করিতে পারি নাই। বাণীর চরণে আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিবার জন্যই আমি আপনাদের আহ্বানে উপস্থিত হইয়াছি।"

বাস্তবিক এই সময়টী যে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পক্ষে কিরূপ শোক-তাপের সময়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অধিবেশনের কয়েক দিন (চৈত্র সংক্রান্তি ১৩২২) পূর্ব্বেই তাঁহার মধ্যমাগ্রজ সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় হঠাৎ সন্ন্যাসরোগে প্রাণত্যাগ করেন। দারুণ ভ্রাতৃবিয়োগ-শোক হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁহাকে যশোহর সাহিত্য সম্মেলনে যোগদান করিতে হয়। সুতরাং এরূপ দারুণ শোকসঙ্কুল অবস্থায় তাঁহার পক্ষে 'গন্ধপুষ্প আহরণ" বাস্তবিকই কষ্টকর।

(নানা ভাষায় লিখিত ও সম্পাদিত পুস্তকাবলী।

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের রচিত ও সম্পাদিত বাঙ্গলা সংস্কৃত পালি ইংরাজী ও তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত বহু গ্রন্থ সুধীসমাজে সুপরিচিত ও প্রশংসিত—

বাঙ্গালা গ্রন্থ ;—

১। আত্মতত্ত্ব প্রকাশ, ২। ভবভূতি ও তাঁহার কাব্য, ৩। বুদ্ধদেব।

তিনি রোগের দুইবার আক্রমণেই সুবিখ্যাত প্রবীণ ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রাণ-কৃষ্ণ আচার্য্য এম-এ, এম-বি মহাশয়ের চিকিৎসাধীন থাকিয়া দুইবারই রক্ষা পাইয়াছিলেন। কিন্তু শরীরকে সম্পূর্ণ নীরোগ করিবার জন্য কবিরাজী চিকিৎসাধীনে থাকিয়া ঔষধ ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন। শুনা যায়, "মৃত্যু দিবসে যথারীতি আহারান্তে রশুনের বড়ি সেবন করেন। কিন্তু বড়ি সেবন করিবামাত্র ন্যক্কার হয় ও হিক্কা উঠে। অপরাহ্ণে ডাক্তার আসিয়া বুঝিলেন, বমির প্রতিক্রিয়ায় মস্তিষ্কের রক্তবহা শিরা ছিঁড়িয়া গিয়াছে।*

বমি করিতে করিতে বিদ্যাভূষণ মহাশয় অজ্ঞান হইয়া পড়েন, আর চৈতন্য হয় নাই। ঐ অবস্থায় দিবাভাগ কাটিয়া যায়।

দেখিতে দেখিতে কাল নিশা উপস্থিত হইল। কখন কি হয়, এই চিন্তায় আত্মীয় স্বজন সকলেই মুহ্যমান। এই অবস্থায় রাত্রি প্রায় ৯টার সময় সব ফুরাইল। বাঙ্গালার বাণীর সুসন্তান সতীশচন্দ্র চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। কাল আকাশের একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র অকস্মাৎ খসিয়া পড়িল। অভাগা বঙ্গ-জননী সতীশচন্দ্রের ন্যায় পুত্রধনে বঞ্চিত হইলেন। ধরণীর রাজধানী ক্ষিতীর প্রদীপ নবদ্বীপের উজ্জ্বল রত্ন সতীশচন্দ্রের দিব্যজ্যোতি জন্মের মত নির্ব্বাপিত হইল। এমন একটী মানুষের মত মানুষ ৫০ বৎসর পূর্ণ না হইতেই কালগ্রাসে পতিত হইলেন, ইহা গভীর শোকের-বিষয়!

অনাথ।

(লেখক,—শ্রীরসময় লাহা)

(১)

আমার নাইক ঢাকাঢাকি
বল্‌ছি আমি সোজা কথা,
এবার পূজায় বেঁচে থেকে
দেখ্‌বো ঠাকুর যথা তথা।

* সঞ্জিবনী—১৬ই বৈশাখ ১৩২৭ সাল।

(২)

যদিও আমি নই বিলাসী
হইনি বড় সুখের কোলে,
তবু আমি বাঁচ্‌তে যে চাই
নূতন কাপড় পান ব'লে।

(৩)

নূতন নূতন পোষাক প'রে
সাজ্‌বে যত ছেলে মেয়ে,
এই ছেঁড়া টেনাকে ঘুচায়ে,
দীনের পানে দেখ্‌বে চেয়ে।

(৪)

অনাথ আমি তবু মায়ের
পূজায় মেতে পাই যে সুখ,
আমার আশা নূতন কাপড়
প'রে দেখ্‌বো মায়ের মুখ।

(৫)

একটা বছর কেটে গেল
বেঁচে আছি এক রকমে,
বার মাসের মিট্‌বে আশা,
মায়ের শুভ সমাগমে।

(৬)

তোমরা মায়ের আশিস্‌-বলে
থাক্‌বে সুখে নিরবধি,—
দীনের আশা সফল ক'রে
সুখ বিলাতে পার যদি।

(৭)

আমার কাছে সোজা কথা
নাইক আমার ঢাকাঢাকি;
পরের দুখে যে নয় দুখী
সুখ তাহারে দেয় যে ফাঁকি।

বিজয়া।

(লেখক—শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় বি-এ)

(১)

পোহাল নবমী নিশি দশমী যে আসিল,
আঁধার করিয়ে ঘর ঘরে যে মা চলিল।
আঁখি নাহি পাল্‌টীতে মা বলিয়া না ডাকিতে,
তিনটী সুখের দিন কোথা হ'তে কাটিল,
আদরিণী ভবরাণী ভবপাশে মিলিল।
মাতৃহারা আজি বঙ্গ আঁখি-নীরে ভাসিল।

(২)

অধিবাস-দীপ-শিখা এখনও ত' নেভেনি,
এখনও মালার ফুল ঝরিয়া ত পড়েনি।
এখনও আমের পাতা, রয়েছে দ্বারেতে গাঁথা,
এখনও তোরণ-তরু, কেউ তারে ফেলেনি
এখনও রচনা দোলে কেউ তারে খোলেনি ;
কেন মাগো চলে গেলি যেতে কেউ বলেনি।

(৩)

এখনও ধূপের গন্ধ মিলায় নি বাতাসে
এখনও গাহিছে পাখী আগমনী-বিভাসে,
সুগন্ধ ফুলের রাশি, এখনও হয়নি বাসি,
এরি মধ্যে চলে গেলি, গেলি ওমা কৈলাসে,
সন্তানে ফেলিয়া তোর ঘোর দুখ নৈরাশে ;
এখনও ফুলের গন্ধ বয়ে যায় বাতাসে।

(৪)

জগতে যে জাগরণ জেগেছিল সহসা
সুপ্তহৃদে জেগেছিল যে বিলুপ্ত ভরসা,
অন্ধকারে যে আলোক, দেখেছিল সব লোক,
নিভে গেল, কে আনিল অমানিশা তমসা !
নয়নে সৃজিল আজি এ শরতে বরষা ;
মা বিনে কে আছে আর সন্তানের ভরসা।

(৫)

মা নামে অমিয়-মাখা মা যে মৃতজীবনী
সন্তানে আনন্দময়ী প্রতিমা যে জননী।
মা বলে ডাকিলে পরে প্রাণের বেদনা হরে
জুড়াবার হেন স্থান আছে কি এ ধরণী ?
ব্যথাহরা ভব-দারা চলে গেলে এখনি
পায় ঠেলে, না পোহাতে নবমীর রজনী।

(৬)

দেখ চেয়ে ঘরে ঘরে কি দশা যে হ'য়েছে
অধরে জ্যোছনা-রাশি, হাসি কেবা ঢেকেছে।
চলে না চরণ আর, বুকে চাপা গুরুভার
মুখে নাহি সরে বাণী,—বাণী কেবা হরেছে
আঁখিগুলি ছল ছল,—কেবা জলে ভরেছে ;
দেখ চেয়ে ঘরে ঘরে কি দশা যে হ'য়েছে।

(৭)

ঐ যে প্রবাসীপতি চলে পুন প্রবাসে
ফেলে বধূ, আদরিণী বিষাদিনী আবাসে,
কবরী গিয়াছে খুলে এলোথেলো কাল চুলে,
ঢেকেছে বদনখানি ভাষাহীন নিরাশে
কাজল গিয়াছে ধুয়ে কাঁপিতেছে তরাসে
অশ্রুময়ী, লতা যথা ঝটিকার বাতাসে।

(৮)

অই বালা পতিহীনা ছিল ধূলি-শয়না
উঠেছিল তিন দিন পাশরিয়া যাতনা ;
আবার পড়িল ভূমে নয়ন না মুদে ঘুমে
বারমাস সাথী তার বিজয়ার বেদনা
যে তারে বাসিত ভাল—সে করিল ছলনা ;
দুঃখহরা তুমি কেন ভাবিলে না ভাবনা।

(৯)

আঁখি-পাশে বিন্দুবারি অই বধূ বালিকা
সুনীল নলিন-দলে নিহারের কণিকা,

বালকে খুলেছে সাজ, যুবকে ভুলেছে কাজ
যুবতী হাসে না আর নিভে গেছে দীপিকা,
অন্ধকার ঘাট বাট তরুলতা বীথিকা
ছিলে আলো তুমি মাগো শশধর-ভালিকা।

(১০)

দেখ না কাঙ্গাল দুঃখী কাঁদে মা মা বলিয়া
কে আর জোগাবে অন্ন মুখপানে চাহিয়া,
অন্নপূর্ণা ছিলে ঘরে, দিলে অন্ন অকাতরে,
নিবারি ক্ষুধার জ্বালা বেড়াত যে হাসিয়া
পড়িত সকাল সন্ধ্যা পায় আসি লুটিয়া,
মা বিনে কে অন্ন আর মুখে দিবে তুলিয়া ?

(১১)

অই যে পতিত নর মা বলিয়া কাঁদিছে,
অই যে পতিতা নারী, অশ্রুনীরে ভাসিছে,
ক'টী দিন মহামায়া দিয়েছিলে পদছায়া
ল'ভেছিল শান্তি তারা, পুনঃ এবে জ্বলিছে,
বাসনা-অনল তার কই মাগো নিভিছে ;
কই গো করুণাময়ি ক্ষমা তার মিলিছে ?

(১২)

শুনি মাগো দশমী যে পুণ্যতিথি বিজয়া,
রাবণে বধিয়া রামে দিলে জয় অভয়া।
ধরিয়া বরষ সারা, কাঁদিয়া হইনু সারা,
দয়া কই দয়াময়ি তুমি যে মা নিদয়া,
কই জয় আজি সেই দশমী যে বিজয়া,
দয়াময়ী নাম তোর শুধু শ্রুতি-বিষয়া।

(১৩)

গিরিপুরে পুরবাসী আকুল যে কাঁদিয়া
মার প্রাণে এত দুঃখ দিলে মা কি ভাবিয়া,
আলু-থালু কেশপাশ, সঘনে বহিছে শ্বাস,
কহিছে মেনকা রাণী গিরিরাজে কাঁদিয়া

উমারে বিদায় দিয়ে বাঁচিব কি করিয়া,
উমা হারা হয়ে প্রাণে কিবা ফল বাঁচিয়া ?

(১৪)

দিয়াছ ভিখারী বরে স্বর্ণলতা সঁপিয়া
ভিখারিণী মেয়ে মোর ফাটে বুক স্মরিয়া
শ্মশানে মশানে বাস, করে উমা বারমাস
চাঁচর চিকুরে তার গেছে জটা বাঁধিয়া—
নবনী কোমল অঙ্গে—গেছে কালী পড়িয়া—
সোনার কমল মোর দেখ গেছে শুখিয়া।

(১৫)

জামাতারে বল গিরি বল করে ধরিয়া
বাঁচিবে না উমা মোর এত দুঃখ সহিয়া।
তিনটী দিনের তরে, পেয়েছি বাছারে ঘরে,
এখনও যে ভাল ক'রে দেখিনি গো চাহিয়া,
এখনও দিই নি তার মুখে কিছু তুলিয়া,—
প্রাণের উমাকে মোর দিব নাক ছাড়িয়া।

(১৬)

মায়ের প্রাণের ব্যথা ভাবিলে না ভবানি—
সহোদর স্নেহনীরে গলিলে না পাষাণি।
জনকের স্নেহমায়া— বুঝিলে না মহামায়া
কি দিয়া বেঁধেছ হিয়া—বল মাগো না জানি
সখীরা আদরে ডাকে শুনিলে না সে বাণী—
পাষাণের মেয়ে তুমি যথার্থই পাষাণী।

(১৭)

উঠ মা মেনকারাণী ফেল আঁখি মুছিয়া—
দাঁড়ারে কুমারী পাশে কর কোলে আসিয়া,
আঁচলে বাতাস করি, মুখখানি হৃদয়ে ধরি,
কর মা জীবন ধন্য চাঁদমুখে চুমিয়া,
আসিবে আবার উমা ডাকিবে মা বলিয়া—
আবার উঠিবে পুরী আনন্দেতে জাগিয়া।

(১৮)

ভেব না মা গিরিরাণী ভিখারিণী তনয়া
অন্নদা বরদা উমা অন্নপূর্ণা অভয়া।
বিধি বিষ্ণু সুর-নরে যে পদ বন্দনা করে,
চরণে ধরণী ধন্যা সপ্তসিন্ধু-বলয়া,
শ্মশান বাসিনী নহে ভক্ত-হৃদি নিলয়া,
ভেবনা মা গিরিরাণী ভিখারিণী তনয়া।

(১৯)

উঠ বঙ্গগৃহে যত বঙ্গকুল অঙ্গনা
মঙ্গলার হেম অঙ্গে কর সজ্জা সাধনা,
বেঁধে দেহ কেশপাশ, পড়াও সুনীল বাস
অঞ্জনে খঞ্জন আঁখি, কর চিত্র রঞ্জনা,
কপালে কল্যাণী টিপ সন্ধ্যা তারা গঞ্জনা
অলক্ত সুরক্ত পদে কর ভক্তি-বন্দনা।

(২০)

বরণ করিতে মাকে এস বধূ-বরণী
মাথায় বরণ-ডালা সাথে লয়ে বাছনি,
এস সবে কুলনারী হাতে লয়ে স্বর্ণঝারি
প্রদক্ষিণ করি মাকে দেহ মুখে নবনী,
হাতেতে তাম্বুল-মালা, সুনিপুণ গাঁথনি
আঁচল ভরিয়া লহ পদধূলি পাবনী।

(২১)

বাজাও মঙ্গল শঙ্খ যত কুলকামিনী,
চলে ঘর-আলো-করা শিব-মনোমোহিনী—
বল মার ধ'রে করে, আসিও বছর পরে,
ভুলিয়া থেকনা যেন ওগো দুখ-হারিণী,
তুমি গেলে হাসিমুখে—মোরা দুখভাগিনী
এস মা বছর পরে ওগো গিরি-নন্দিনী—

(২২)

মিটেছে ভবের আশা ওগো ভব-রমণি
বৈতরণী পারে যেতে দিও পদতরণী

কালের করাল-ছায়া ধরিয়া বিকট কায়া,
দেখায় আমারে ভয় কিবা দিবা রজনী
আমি যে মা ছেলে তোর তুমি দৈত্য-দলনী,
সন্তানের অপরাধ ক্ষম গো মা জননি।

(২৩)

কি আর বলিব নাহি বলিবার শকতি
কি ক'রে পূজিব নাহি হৃদয়েতে ভকতি,
দাও মাথা নত ক'রে তোমার চরণ'পরে
ধূলি হয়ে মিশে পদে করি যেন বসতি
ক'র না চরণ ছাড়া সন্তানের মিনতি;
দেহ মা শকতি দেহে হৃদয়েতে ভকতি।

(২৪)

যাও মা গিরিশ-জায়া যাও ঘরে ফিরিয়া,
বস গে হরের বামে ঘর আলো করিয়া
ক্রমে তনু বলহীন, দিন দিন আয়ু ক্ষীণ
নয়নে যে ছিল দৃষ্টি গেছে সব কমিয়া
দেখিতে অভয়-পদ রয়েছি যে বাঁচিয়া;
দেখিব আবার যদি রাখ দয়া করিয়া॥

হিতে বিপরীত।

(লেখক,—শ্রীরসময় লাহা)

(১)

প'ড়ে প'ড়ে চোক গেছে ক্ষ'রে
মধু দেখে, টেবিল উপরে
এক গাছি মালা সুচিকণ
ফুলগুলি, বিবিধ বরণ।
সযতনে তাজা রবে ব'লে
রাখে মালা ভিজাইয়া জলে।

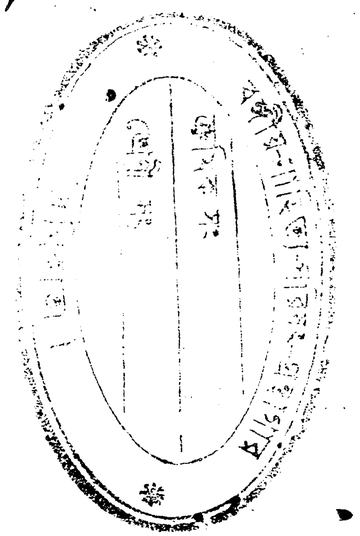

অতঃপর চসমা আঁটিয়া
পড়িতেছে বই মন দিয়া।

(২)

বধূ আসি শুধাল তাঁহায়,—
"মালা মোর রাখিলে কোথায় ?"

আন্‌মনে মধু তারে বলে,
"যতনে রেখেছি ওই জলে।"

"হা কপাল—কাগজের ফুল
চোখেও দেখনি ? এত ভুল !
সখের মালাটি দিলে জলে ?"

"নকল !—তা বুঝিনি আসলে।"

কোষ্ঠীশিক্ষা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এখন পূর্ব্ব অঙ্কিত ১২টী কোষ্ঠযুক্ত একটী চিত্র অঙ্কিত করিয়া যে সালে যে মাসে যে তারিখে বালকের জন্ম, সেই তারিখের পঞ্জিকার বামদিকে লিখিত গ্রহস্ফুট দেখিয়া মেষাদি দ্বাদশ রাশিতে গ্রহ সন্নিবেশ করিতে হইবে। পরে সেই মাসের সঞ্চার দেখিয়া কোন গ্রহ কোন নক্ষত্রে আছেন তাহাও ঠিক করিতে হইবে। দিবসে জন্ম হইলে পঞ্জিকাতে রাশির উদয় দেখিয়া এবং রাত্রিতে জন্ম হইলে রাশির অস্ত দেখিয়া লগ্ন নিরূপণ করা যায়।

পূর্ব্বোক্ত বালক ১৩০৩ সালের ৩০শে আশ্বিন তারিখে বেলা ১০ দণ্ড ৩০ পল গতে জন্মগ্রহণ করিয়া এক্ষণে তাহার কোন লগ্নে জন্ম তাহা নিরূপণ করা যাউক।

১৩০৩ সাল ৩০শে আশ্বিনের পঞ্জিকা দেখিয়া অবগত হইলাম যে, জাতকের জন্ম দিবসে, কন্যা ৫ দণ্ড ২৩ পল ৯ বিপল গতে উদয়। অর্থাৎ ৩০শে আশ্বিন সূর্য্য কন্যা লগ্নের ৫।২৩।৯ গতে উদয় হইয়াছেন। তাহা হইলে ১০।৩০ পল বেলার সময় যে বালকের জন্ম হইয়াছে, তাহার লগ্ন কোন রাশিতে ?

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, কন্যার লগ্নমান ৫ দণ্ড ২৯ পল ৫৮ বিপল, এখন পঞ্জিকায় দেখিলাম, কন্যা ৫ দণ্ড ২৩ পল ৯ বিপল গতে উদয় হইয়াছে, সুতরাং কন্যার ৬ পল ৩১ বিপল অবশিষ্ট রহিয়াছে এবং তুলার পরিমাণ ৫ দণ্ড ৩৭ পল ১২ বিপল, বৃশ্চিকের পরিমাণ ৫ দণ্ড ৪০ পল ১৫ বিপল, ইহাদের সমষ্টি ১১ দণ্ড ২৩ পল ৫৮ বিপল ; কিন্তু বালকের জন্ম ১০ দণ্ড ৩০ পল মধ্যে, অতএব উক্ত সমষ্টি হইতে ১০ দণ্ড ৩০ পল বাদ দিলে বৃশ্চিকের ৫৩ পল ৫৮ বিপল অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং বৃশ্চিক লগ্নের ৫৩ পল ৫৮ বিপল অবশিষ্ট থাকিতে অর্থাৎ উহার ৪ দণ্ড ৪৬ পল ১৭ বিপলের সময় জন্ম হইয়াছে। অতএব বৃশ্চিক রাশিই বালকের জন্ম লগ্ন। আবার প্রত্যেক লগ্ন ৩০ অংশে বিভক্ত। এখন দেখিতে হইবে যে, ৪ দণ্ড ৪৬ পল ১৭ বিপল বৃশ্চিকের কত অংশ। প্রত্যেক লগ্নের পরিমাণকে ৩০ অংশ দিয়া ভাগ করিলে এক এক অংশের পরিমাণ বাহির হইবে। সুতরাং বৃশ্চিক লগ্নের প্রত্যেক অংশের পরিমাণ ১১ পল ২০ বিপল ৩০ অনুপল। এখন ৪ দণ্ড ৪৬ পল ১৭ বিপলকে ১১ পল ২০ বিপল ৩০ অনুপল দিয়া ভাগ করিলে দেখা যায় যে, বৃশ্চিকের ২৫ অংশ ১৬ কলা গত হইয়া বালকের জন্ম হইয়াছে। এইরূপে প্রত্যেকেরই লগ্ন নিরূপণ করা যাইতে পারে।

লগ্নফল।

মেষলগ্নে জাতব্যক্তি—ক্রোধী, মানী, পণ্ডিত, মঙ্গলযুক্ত, ক্রূর, আত্মীয়-ঘাতক, ক্ষমতাশালী ও পরপ্রিয় হয়।

বৃষলগ্নে জাতব্যক্তি—গুরুজনভক্ত, প্রিয়ভাষী, গুণবান, জ্ঞানী, ধনবান, লোভী ও সকলের প্রিয় হয়।

মিথুনলগ্নে জাতব্যক্তি—স্বজনপালক, ভোগী, ধনবান, কামুক, দীর্ঘসূত্রী ও শত্রুঘাতক হয়।

কর্কটলগ্নে জাতব্যক্তি—ভোগবান, সন্তাপহীন, মিষ্টান্নভোজী, সুন্দর, ধনাদিযুক্ত ও স্বজনপ্রিয় হয়।

সিংহলগ্নে জাতব্যক্তি—ক্ষীণ উদরযুক্ত, অল্পপুত্রবান, উৎসাহান্বিত, বিক্রমসম্পন্ন ও প্রতাপশালী হয়।

কন্যালগ্নে জাতব্যক্তি—শাস্ত্রজ্ঞ, সৌভাগ্যশালী, গুণী, সুন্দর, সুরতপ্রিয় হয়।

তুলালগ্নে জাতব্যক্তি—দাতা, বুদ্ধিমান, সৎকর্ম্মান্বিত, বিদ্বান, সর্ব্বকলাবিৎ, ধনবান ও সকলের মাননীয় হয়।

বৃশ্চিকলগ্নে জাতব্যক্তি—শৌর্য্যশালী, স্থূল শরীরবিশিষ্ট, বিজ্ঞান শাস্ত্রে পারদর্শী, সুখাভিলাষী, যোদ্ধা ও পণ্ডিত হয়।

ধনুলগ্নে জাতব্যক্তি—নীতিজ্ঞ, ধার্ম্মিক, সুন্দর শরীরবিশিষ্ট, কুলশ্রেষ্ঠ, পণ্ডিত ও সকলের পোষণকর্ত্তা হয়।

মকরলগ্নে জাতব্যক্তি—নীচাশয়, বহুসন্তানযুক্ত, দরিদ্র ও স্বীয় কার্য্যে তৎপর হয়।

কুম্ভলগ্নে জাতব্যক্তি—সজ্জনের প্রতি শ্রদ্ধাহীন, পরদারাসক্ত ও অল্প কার্য্যে সুখান্বিত হয়।

মীনলগ্নে জাত ব্যক্তি—স্বর্ণরত্নাদিযুক্ত, অল্পকামী, অল্পভাষী ও দীর্ঘচিন্তাযুক্ত হয়।

ক্ষেত্র নির্ণয়।

রাশিচক্রে বারটী রাশি আছে। ঐ রাশিগুলিকে গ্রহগণের ক্ষেত্র বলা যায়। একটি বা দুইটি রাশি কোন না কোন গ্রহের ক্ষেত্র। যে রাশি বা যে দুইটি রাশি যে গ্রহের ক্ষেত্র, সেই গ্রহকে সেই রাশির বা সেই দুই রাশির অধিপতি এবং সেই রাশিটি বা রাশি দুইটিকে ঐ গ্রহের স্বক্ষেত্র বলা যায়।

মেষ ও বৃশ্চিকের অধিপতি মঙ্গল গ্রহ অর্থাৎ মেষ ও বৃশ্চিক রাশি মঙ্গলের স্বক্ষেত্র। এইরূপ বৃষ ও তুলার অধিপতি শুক্র, অর্থাৎ বৃষ ও তুলা রাশি শুক্রের স্বক্ষেত্র। কর্কট রাশির অধিপতি চন্দ্র, সিংহ রাশির অধিপতি রবি; কন্যা ও মিথুনের অধিপতি বুধ; ধনু ও মীনের অধিপতি বৃহস্পতি; মকর ও কুম্ভের অধিপতি শনি।

ক্ষেত্রফল।

মঙ্গলের ক্ষেত্রে জাতব্যক্তি—ক্রোধী, কুকর্ম্মে চেষ্টান্বিত, মিথ্যাবাদী, প্রলাপী ও ভূম্যধিকারী হয়।

শুক্রের ক্ষেত্রে জাতব্যক্তি—উত্তমাপত্নী, বিভবসম্পন্ন, শূর, রাজমন্ত্রী, ধীর ও পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সম্মানিত হয়।

বুধের ক্ষেত্রে জাতব্যক্তি—উৎসাহী, হৃষ্টপুষ্ট, বলবান, গুণবান, দাতা, ভোক্তা ও ধীর প্রকৃতিবিশিষ্ট হয়।

চন্দ্রের ক্ষেত্রে জাতব্যক্তি—নানাবিভবসম্পন্ন, সুখী, উত্তম যান ও ছত্রযুক্ত এবং সর্ব্বদা বান্ধবগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়।

রবির ক্ষেত্রে জাতব্যক্তি—কর্ম্মকুশল, ত্যাগী, শুচী, শূর মেধাবী, অকার্য্যে ঘৃণাকারী, রূপবান, গুণবান ও নানাশাস্ত্রে পারদর্শী হয়।

বৃহস্পতির ক্ষেত্রে জাতব্যক্তি—বাকপটু, খ্যাতিমান, লোকের আনন্দদায়ক, পণ্ডিত, নিত্যধনযুক্ত ও আনন্দিত হয়।

শনির ক্ষেত্রে জাতব্যক্তি—বলশালী, ক্রূরকর্ম্মে চেষ্টান্বিত, মনোজ্ঞ, মদোদ্ধত, কুটিল ও কুনখযুক্ত হয়।

হোরানির্ণয়।

লগ্নের দুইভাগের এক ভাগের নাম হোরা। প্রত্যেক হোরার পরিমাণ ১৫ অংশ। মেষ হইতে মীন পর্য্যন্ত বারটি রাশিকে অযুগ্ম ও যুগ্মরূপে গণনা পূর্ব্বক অযুগ্ম ও যুগ্ম নির্ণয় করিতে হয়। যথা—

মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু ও কুম্ভরাশি অযুগ্ম এবং বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর ও মীন রাশি যুগ্ম। অযুগ্ম লগ্নে জন্ম হইলে ঐ বিভক্ত লগ্নের প্রথম পনর অংশ রবির হোরা; এবং দ্বিতীয় অংশ চন্দ্রের হোরা নামে অভিহিত হয়। আর যুগ্ম লগ্নে জন্ম হইলে প্রথম পনর অংশ চন্দ্রের এবং দ্বিতীয় পনর অংশ সূর্য্যের হোরা নামে অভিহিত হয়।

পূর্ব্বোক্ত জাতক যুগ্ম লগ্নের দ্বিতীয় অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া উহার রবিই হোরাধিপতি।

হোরাফল।

রবির হোরায় জাতব্যক্তি—কুবৃত্তিপরায়ণ, ধূর্ত্ত, কুমূর্ত্তিবিশিষ্ট, খল, পাপাত্মা, মলীন, দরিদ্র, পুত্রহীন, ক্রূর, নির্গুণ, বেগশীল, কামুক, পরদারারত, দেবতা ও ব্রাহ্মণের নিন্দাকারী ও মুখর হয়।

চন্দ্রের হোরায় জাতব্যক্তি—শান্ত, সর্ব্বগুণযুক্ত, স্থিরমতিবিশিষ্ট, বন্ধুগণ কর্ত্তৃক সম্মানিত, নানারত্ন উত্তমা স্ত্রী ও সুসন্তানযুক্ত ও ধনবান, পবিত্র, দেব ও ব্রাহ্মণভক্ত এবং সুশ্রী হয়।

দ্রেক্কান নির্ণয়।

লগ্নের তিন ভাগের এক ভাগের নাম দ্রেক্কান। প্রত্যেক দ্রেক্কানের পরিমাণ ১০ অংশ। যে লগ্নে জন্ম হয়, সেই লগ্নের অধিপতি প্রথম দ্রেক্কানের অধিপতি। লগ্ন হইতে পঞ্চম স্থানের অধিপতি দ্বিতীয় দ্রেক্কানের অধিপতি এবং লগ্ন হইতে নবম স্থানের অধিপতি তৃতীয় দ্রেক্কানের অধিপতি।

পূর্ব্বোক্ত জাতকের বৃশ্চিক লগ্নের ২৫ অংশ ১৬ কলা গতে জন্ম হইয়াছে, সুতরাং উহার তৃতীয় দ্রেক্কানে জন্ম লগ্ন হইতে নবম স্থান কর্কট এবং চন্দ্র উহার অধিপতি। অতএব চন্দ্রগ্রহই জাত বালকের দ্রেক্কানাধিপতি।

দ্রেক্কান ফল।

রবির দ্রেক্কানে জাতব্যক্তি—মলিন, শূর, অঙ্গনাবল্লভ, ক্রূর, সাহসী, কুকর্ম্মপটু, মূর্খ, কুরূপবিশিষ্ট, খল, অল্পপ্রজ, ক্রীড়াসক্ত, পাপাত্মা ও দরিদ্র হয়।

চন্দ্রের দ্রেক্কানে জাতব্যক্তি—সুন্দর, ধনবান, সচ্চরিত্র, বাচাল, কীর্ত্তিমান, দয়ালু, শাস্ত্রজ্ঞ, কুলভূষণ, দেবতা ব্রাহ্মণ ও বন্ধুগণের প্রতি শ্রদ্ধাবান, ধার্ম্মিক ও দাতা হয়।

মঙ্গলের দ্রেক্কানে জাতব্যক্তি—স্ত্রীহীন, ক্রূর, পাপাত্মা, খল, ধন ও সুখহীন, নিষ্ঠুর, দুশ্চরিত্র, বহুভাষী, ক্ষত শরীরবিশিষ্ট, স্বার্থপর, ক্রোধী, রোগী ও পরসেবক হয়।

বুধের দ্রেক্কানে জাতব্যক্তি—বুদ্ধিমান, রাজপ্রিয়, দীর্ঘজীবী, বলবান, কুলতিলক, বহুসন্তানযুক্ত, যশস্বী পবিত্র, ধার্ম্মিক, শাস্ত্রজ্ঞ, সুশ্রী ও ধনবান হয়।

বৃহস্পতির দ্রেক্কানে জাতব্যক্তি—গুণবান, দীর্ঘজীবী, ধনবান, বুদ্ধিমান, প্রিয়ভাষী, ধার্ম্মিক, মোক্ষজ্ঞানতৎপর, শান্ত, যশস্বী, পবিত্রাচারী ও দয়ালু হয়।

শুক্রের দ্রেক্কানে জাতব্যক্তি—সুশ্রী, সর্ব্বজ্ঞ, কার্য্যপটু, দাতা, উত্তমাশ্রীযুক্ত, পুত্রবান, সজ্জনপ্রতিপালক, শুচি, শান্ত, সরলহৃদয়বিশিষ্ট ও ধর্ম্মানুরক্ত হয়।

শনির দ্রেক্কানে জাতব্যক্তি—মলিন, ক্রূর, চৌর, কৃপণ, ক্রোধী, নির্দ্দয়, রোগী, বাচাল, স্ত্রীপুত্রহীন, পাপাত্মা, হিংস্রক, কামুক ও সুখহীন হয়।

নবাংশ নির্ণয়।

জন্মলগ্নের নয় ভাগের এক ভাগের নাম নবাংশ। প্রত্যেক নবাংশের পরিমাণ ৩ অংশ ২০ কলা। মেষ, সিংহ ও ধনুলগ্নে জন্ম হইলে নবাংশের প্রথম তিন অংশ নবাংশের অধিপতি; মেষাধিপতি মঙ্গল। দ্বিতীয় অংশের অধিপতি বৃষাধিপতি শুক্র। তৃতীয় অংশের অধিপতি মিথুনাধিপতি বুধ। চতুর্থ অংশের অধিপতি কর্কটাধিপতি চন্দ্র। পঞ্চম অংশের অধিপতি সিংহাধিপতি রবি। ষষ্ঠ অংশের অধিপতি কন্যাধিপতি বুধ। সপ্তম অংশের অধিপতি তুলাধিপতি শুক্র। অষ্টম অংশের অধিপতি বৃশ্চিকাধিপতি মঙ্গল। নবম নবাংশের অধিপতি, ধনুর অধিপতি বৃহস্পতি। বৃষ, কন্যা ও মকর লগ্নে জন্ম হইলে নবাংশের প্রথম তিন অংশ কুড়ি কলার অধিপতি মকরাধিপতি শনি পরে ক্রমান্বয়ে পরপর রাশির অধিপতি গ্রহ পর পর নবাংশের অধিপতি হইবেন। মিথুন, তুলা ও কুম্ভলগ্নে জন্ম হইলে নবাংশের প্রথম তিন অংশ কুড়ি কলার অধিপতি তুলাধিপতি শুক্র। পরে উক্ত প্রকারে ক্রমান্বয়ে পর পর রাশির অধিপতি গ্রহ পর পর নবাংশের অধিপতি হইবেন। কর্কট, বৃশ্চিক ও মীনলগ্নে জন্ম হইলে নবাংশের প্রথম তিন অংশ কুড়ি কলার অধিপতি কর্কটাধিপতি চন্দ্র। পরে উক্তপ্রকারে পর পর রাশির অধিপতি গ্রহ পর পর নবাংশের অধিপতি হইবেন। পূর্ব্বোক্ত জাতকের বৃশ্চিকলগ্নের ২৫ অংশ ১৬ কলা গতে জন্ম হইয়াছে। সুতরাং ইহার নবাংশাধিপতি কোন্ গ্রহ দেখা যাউক। বৃশ্চিকলগ্নে জন্ম, সুতরাং কর্কটাধিপতি চন্দ্র ইহার প্রথম ৩ অংশ ২০ কলার অধিপতি। সিংহাধিপতি রবি দ্বিতীয় নবাংশের অর্থাৎ ৬ অংশ ২৪ কলার অধিপতি। তৃতীয় নবাংশের অর্থাৎ ১০ অংশের অধিপতি কন্যাধিপতি বুধ। (ক্রমশঃ)

কৌতুককণা।

(সংগ্রহ)

লেখক ও সম্পাদক।—সম্পাদক মহাশয়! আপনাকে যে কবিতাটি দিয়াছি, তাহাতে আমার হৃদয়ের অতি গুপ্তভাব ব্যক্ত আছে।

সম্পাদক।—তা বেশ, আপনি আমায় অবিশ্বাস কর্‌বেন না, আমি সে কবিতা কিছুতেই প্রকাশ কর্‌বো না।

মা ও মেয়ে।—ট্রেণে যাইতে যাইতে বালিকা মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, ঐ বেঞ্চে যে একটি স্ত্রীলোক ও একটি পুরুষমানুষ বসে আছে, ওরা কথা বলে না কেন মা? ওরা কি বোবা?"

মাতা।—ওর তুই কি বুঝ্‌বি মা! ওরা যে স্বামী স্ত্রী।

ডাক্তার ও কর্ত্তা।—কর্ত্তা সদর-দরজায় দাঁড়াইয়া তামাক খাইতেছিলেন, ডাক্তার বাবু গিন্নিকে দেখিয়া বাড়ীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিবামাত্র কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কেমন দেখলেন?"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "দেখলাম ভাল বটে, কিন্তু মুখের জোর নেই বোলেই বোধ হলো—তা একটা ওষুধ লিখে দেব কি?"

কর্ত্তা বলিলেন, "না মহাশয়! রক্ষা করুন, আর মুখের জোরের প্রয়োজন নাই; এই মুখের জোরে ঝি, চাকর তিনদিন থাকে না; আমিও রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত আপনার ডিস্পেন্সারীতে বাস করি, মুখের জোরের আবশ্যক নাই।"

কন্যাকর্ত্তা।—আমার কন্যাকে আপনার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিতে ইচ্ছা করি। শুনেছি, মেশে যত ছেলে থাকে, তার মধ্যে না কি আপনার ছেলেটি ভাল।

বরকর্ত্তা।—আপনার কৃপায় এবার আমি ঋণদায় থেকে মুক্ত হয়ে কলিকাতায় বাড়ী কোর্‌তে পার্‌বো ত?

দুই বন্ধু।—১ম। আচ্ছা, তুমি যখন শুন্‌লে যে, আমি পীড়িত, তখন আমার টাকা কয়টি কেন পাঠালে না ভাই?

২য়। আঃ, সে কথা আর কি বল্‌বো ভাই! আমি শুনেছিলাম যে, তোমার জীবনের আশা নাই, তুমি মৃতপ্রায়।

হাকিম।—তুমি ওয়ারেণ্টে হাজির হয়েছ, শমনে হাজির না হইবার কারণ দর্শাও।

আসামী।—হুজুর! ওয়ারেণ্টে বে-খরচায় আসিতে পারিয়াছি। বিশেষতঃ, আগে পাছে হুজুরই শরীররক্ষক পাঠিয়েছিলেন, কোন বিপদেরও আশঙ্কা ছিল না। এমন সুবিধা থাকিতে, শমনে আসিব কেন?

"ভাই হরিদাস, তোমার স্ত্রীর বয়স কত?"

হরিদাস। পাঁচ বৎসর ছয় মাস দশ দিন।

"তোমার বিবাহ তো পাঁচ বৎসর হয়েছে।"

হরিদাস। বিবাহের পর হতে তো সে আমার স্ত্রী হয়েছে।

শিক্ষক। যে সকল প্রাণী চর্ব্বণ করিয়া না খায় (গিলিয়া খায়) তাহারা অণ্ড প্রসব করে।

ছাত্র।—আচ্ছা গুরুমহাশয়! আমার দাদা মহাশয়ের দাঁত নাই, তিনি গিলিয়া খান। কৈ, ডিম পাড়িতে দেখিনি তো।

শ্বশুর।—শুনিলাম, তুমি নাকি গাঁজা খাও?

জামাতা।—আজ্ঞে, নেশার জন্য নয়। আধ্যাত্মিক যোগ শিক্ষা কর্‌ছি।

উপেনবাবু যোগেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হে যোগেন! তোমার স্ত্রী যে পর্য্যন্ত তোমাদের বাড়ীতে এসেছেন, সে পর্য্যন্ত তোমাদের বাড়ীতে এত কলহ শুনিতে পাই কেন?"

যোগেনবাবু।—কি জান ভাই! আমার স্ত্রী বড় বুদ্ধিমতী, পাছে বাড়ীতে চোর-ডাকাত আসে, তাই রাত্রি দিন সজাগ থাকে।

গুরু শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা! কায়স্থ বড় না বৈদ্য বড়?"

শিষ্য। আজ্ঞে, কায়স্থও নয়, বৈদ্যও নয়। তিলি ও সুবর্ণ বণিক বড়। কারণ মূলই টাকা।

রোগী। ডাক্তারবাবু! আর কেন? আমি এখন বেশ সুস্থ আছি।

ডাক্তার। আপনার রোগ এখনও সারে নাই। আপনার স্মৃতিশক্তি লোপ পাইয়াছে।

রোগী। কিসে বুঝা গেল?

ডাক্তার। আমার পাওনার বিলখানি এখনও পরিশোধ করেন নাই, স্মরণ আছে কি?

সমালোচনা।

সরল-জ্যোতিষ।—(প্রথম খণ্ড) স্বর্গগত শ্রীযুক্ত দগ্ধচন্দ্র রায় কর্ম্মকার প্রণীত; ৩নং কুমারটুলি ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ রায় কর্ম্মকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ জ্যোতির্ভূষণ কর্ত্তৃক সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত; মূল্য এক টাকামাত্র।

এই পুস্তকের গ্রন্থকার মহাশয় চন্দ্রদগ্ধায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার ঐরূপ নাম-করণ হইয়াছিল। দগ্ধচন্দ্র বাল্যে বা যৌবনে কোনও রূপ উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই; কিন্তু পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিতে যাবতীয় শিক্ষার সারবস্তু ভগবৎ কৃপালাভ করিয়াছিলেন। তিনি বহুশাস্ত্রজ্ঞ না হইলেও বহু শাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ, সুবোদ্ধা ছিলেন, বিশেষতঃ জ্যোতিষ শাস্ত্রে সবিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন; তাঁহার কোষ্ঠীবিচার প্রভৃতি যেরূপ অভ্রান্ত হইত, গ্রামবাসী তদ্দর্শনে মুগ্ধ হইতেন, বহুব্যক্তি তাঁহার নিকট জ্যোতিষ শিক্ষার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন, এই প্রকার বহু সম্ভ্রান্ত লোকের অনুরোধে অনুরুদ্ধ হইয়া যাহাতে আবালবৃদ্ধবনিতা সর্ব্বসাধারণে জ্যোতিষ শাস্ত্রের জটিল বিষয় সমূহ অনায়াসে বুঝিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে সরল বঙ্গভাষায় ফলিত জ্যোতিষের অবশ্য জ্ঞাতব্য সূক্ষ্মতত্ত্ব সমূহ বিবৃত করিয়া তিনি এই "সরল জ্যোতিষ" গ্রন্থখানি রচনা করেন।

হিন্দুগণ চিরদিন ঘোর অদৃষ্টবাদী, এই বিশ্বসংসারে মানবগণের শুভাশুভ ও জরা মরণ নির্ণয় করিতে জ্যোতিষ শাস্ত্রই একমাত্র সক্ষম; জ্যোতিষ শাস্ত্র দ্বারাই মানবের জন্ম-মৃত্যু জরাব্যাধি সুখ দুঃখ প্রভৃতি নির্ণীত হইয়া থাকে। আমরা "সরল-জ্যোতিষ" পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম।

প্রেম-নির্ঝরণী।—কে, এম, ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত; মূল্য ছয় আনা। একখানি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক। কবিতাগুলি শ্রীমতির প্রেমরসে অভিষিক্ত; প্রত্যেক কবিতা আত্মমহিমায় আপনি উদ্ভাষিত। পুস্তকের রচয়িত্রির নাম প্রকাশ না করিবার কারণ কি, বুঝিলাম না।

আমোদ।—শ্রীযুক্ত রসময় লাহা বিরচিত; মূল্য ৵০ বারো আনা মাত্র। স্বর্গীয় কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় বিয়োগের পর বঙ্গসাহিত্যে কবিবর রসময় লাহা মহাশয় সুরুচিসম্মত অনাবিল হাস্যরস রসিকতায় গৌরব প্রচার করিতেছেন। আমোদের প্রত্যেক কবিতাই কবির প্রাণের ভাষায় লিখিত বলিয়া পাঠক পাঠিকার মর্ম্মস্থল স্পর্শ করে; প্রেমের সরস সুমধুর উজ্জ্বল ভাবের অভাব এই পুস্তকে নাই। আমরা আমোদ পাঠ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার

জন্মভূমি

২৬শ বর্ষ, ১৩২৭ সাল, অগ্রহায়ণ। ৮ম, সংখ্যা।

ভগবান্ ভরসা।

লেখিকা,—শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী।

(১)

শাশুড়ী তেল লইয়া ভাঁড়ার ঘর হইতে বাহির হইতেছেন, দেখিয়া বড়-বৌ অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিল,—"তুমি ভাঁড়ার ঘরে গিয়েছিলে কেন?"

শাশুড়ী। তেল ফুরিয়ে গিয়েছে, তাই আর একটু নিয়ে এলাম।

বৌ। কেন, তেল তো দিয়েছি?

শাশুড়ী। অতটুকু তেলে তো একটা তরকারী রাঁধা হয় না! তা আর সবই রেঁধেছি মা, কিন্তু ভাজাটা তো আর আধ পলা তেলে হয় না।

বৌ। যার শিল যার নোড়া, তারই ভাঙ্‌বে দাঁতের গোড়া! আমারই খাবেন, আর আমারই ঘরে চুরি কর্‌বেন। এতই স্পর্দ্ধা! দেখ, তুমি আমার ভাঁড়ারে যেও না।

শাশুড়ী। সে কি বৌমা! আমি মা হয়ে ছেলের জিনিস চুরি কর্‌বো! আর ছেলে না হয়ে যদি অপর কেহই হইত, তাই বা কেন চুরি কর্‌বো? আমি এত ছোটলোকের মেয়ে নই যে, চুরি কর্‌বো। আমার বাপ গরীব ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর বংশে কাহারও প্রকৃতি নীচ ছিল না।

বৌ। কি! তুমি ছোটলোকের মেয়ে নও, আমি ছোটলোকের মেয়ে! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! আবার ছেলে ফলাতে এসেছেন! এখন নিজের মা ভাত পায় না, তাতে আবার সত্‌-মা!

বড়-বৌ চীৎকার করিয়া পাড়া মুখরিত করিয়া শাশুড়ী বেচারীর উদ্দেশে অকথ্য ভাষার লহরী ছুটাইয়া দিল। পাড়ার পাঁচজন আসিয়া জুটিল। বড়-বৌর মুখে ব্যাপার শুনিয়া তাহারা শাশুড়ীকেই দোষী সাব্যস্ত করিয়া তার নিন্দা করিতে করিতে চলিয়া গেল।

(২)

বড় ছেলে—শৈলেন। শৈলেন বাড়ী আসিতেই বড়-বৌ নাইবার তেল দিতে গিয়ে ঝগ্‌ড়ার বৃত্তান্তটা স্বামীকে বলিল। বলিবার সময় কল্পনাপ্রসূত বিস্তর মিথ্যার আবরণে ঘটনাটীকে জম্‌কাল করিয়া তুলিল। তার কথা থেকে শৈলেন বে-মালুম বুঝিয়া নিল যে, তার মা ঘরের চাল্‌ ডাল্‌ নুন্‌ তেল প্রভৃতি জিনিস চুরি করিয়া বেচিতেছেন।

তখন শৈলেন মাকে ডাকিয়া বলিল,—"তোমার নিজের পথ দেখ; আমি তোমাকে আর খেতে দিতে পার্ব্ব না।"

মা। বাবা! তুমি না দিলে কে দিবে? আর আমার জন্যও ভাবি না, তোমার বোনের কি হবে? তুমি উপযুক্ত ছেলে থাক্‌তে কোথায় যাব? তোমরা ছাড়া আমার আর ত কেহই নাই বাবা!

শৈলেন।—নেই তা আমি কি কর্‌বো! চোরের দায়ে ধরা পড়িনে যে, তুমি গাল-মন্দ দেবে, আর নিজে না খেয়েও তোমাদিগকে খাওয়াতে হবে। সে সব পার্ব্ব না, কাল থেকে নিজের ভাবনা নিজে ভাবিও।

(৩)

ছোট ছেলে—অতীন্দ্র। সে রেলে চাক্‌রী করে। বিবাহের পরই বৌকে বাসায় লইয়া গিয়াছে। বাপ জীবিত থাকিতে মাসে মাসে কিছু টাকা পাঠাইত। দেড় মাস হইল বাপ মারা গিয়াছেন; এই দেড় মাস কিছুই দেয় নাই।

শৈলেন মুখে যা বলিল কাজেও তাই করিল। মাকে খাইতে দিল না। মা নিরুপায় হইয়া অতীন্দ্রকে লিখিল। দুটো পেটের ভাতের জন্য কিছু কিছু সাহায্য চাহিলেন।

পত্রের জবাবে অতীন্দ্র লিখিল,—

"আমার এখন আয় কম হইয়াছে, খরচপত্র বেশী, বাবার শ্রাদ্ধাদি কাজে অনেক টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে। এ সময় আমি কিছুই দিতে পার্ব্ব না।"

পত্র পাইয়া কনকলতা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁর নিজের জন্য চিন্তা নহে; কিন্তু দশ বৎসরের মেয়েটীকে কি খাওয়াইবেন, সেই-ই

ভাবনা। তিনি পৃথিবী অন্ধকার দেখিলেন, মাথা ঘুরিতে লাগিল। হায়! তাঁর মেয়েটী যে বড় আদরের। ঘি, দুধ, মাছ ব্যতীত কখনও ভাত খায়নি, এখন যে তাকে শাক-ভাত খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখবারও উপায় নাই। এ কুটীল সংসারে সদ্‌গুণের—বড়-প্রাণের কেহ আদর করে না। শৈলেনের দুর্ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া বাপ যখন স্ত্রীর নামে উইল করিতে যাইতেছিলেন, তখন এই কনকলতাই তাঁকে বাধা দিয়াছিলেন। এঁরই বড়-প্রাণের জন্য আজ ছেলেরা বিষয়ের মালিক। ধন্য কাল-মাহাত্ম্য। এখন কি না ইহারাই মাকে খাইতে না দিয়া তাড়াইতে উদ্যত।

(৪)

পুত্ররত্নের কেহই যখন হতভাগিনী কনকলতাকে খাইতে দিল না, তখন তিনি পেটের জ্বালায় মান-অপমান ভুলিয়া গ্রামের দেবালয়ে ঠাকুরের ভোগ-রান্না করিবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন; তাহাতে একবেলা করিয়া খাইতে পাইতেন। নিজের ভাতগুলি বাড়ীতে আনিয়া তাহা হইতে মেয়ের রাত্রের জন্য দুটী ভাত রাখিতেন, অবশিষ্ট হইতে মেয়েটীকে খাওয়াইয়া যা চারিটী বাঁচিত তাহাই নিজে খাইতেন।

কনকলতার আজ আট দিন জ্বর। শোকে দুঃখে পরিশ্রমে কাতরা; তারপর প্রায় এক বৎসর এই প্রকার অনশন। শরীরে আর কত সয়! শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। জ্বর অবস্থায় রাঁধিতে পারিলেন না, ঠাকুরবাড়ী থেকে মেয়েটীকে ভাত দিয়েছিল, আজ দুদিন দেয় নাই। মেয়েটী আজ দুদিন খায় নাই!

আশালতা দুদিন খায় নাই। মুখ শুকিয়ে গিয়েছে, মা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। উঠিবার শক্তি নাই, কিন্তু জ্ঞান ত আছে। তাই মেয়ের কষ্ট প্রাণে বাজিতে লাগিল। ভাবিলেন, একপোয়া পথ দূরে বকুল-ফুলের বাড়ী; বকুলফুল বাড়ী এসেছে, সেখানে গিয়ে আশাকে দুটো ভাত খাইয়ে আনি।

আশাকে সঙ্গে লইয়া অতিকষ্টে মা পথে বাহির হইলেন। যাইতে যাইতে চলিতে না পারায় একটী গাছতলায় বসিলেন। আশার মুখ ক্ষুধায় এতটুকু হয়ে গিয়েছে, দেখে তাকে কোলে নিয়ে অজস্রধারে কাঁদিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, ভগবন, আমার অদৃষ্টে এতও ছিল। খিদেই সন্তান কোলের উপর মারা যাইতেছে, মা হইয়া এ দারুণ দৃশ্যও আমাকে দেখিতে হইল!

(৫)

মা ও মেয়ে যখন এইরূপ অবস্থায় গাছতলায় পড়িয়া আছে, ঠিক তখন একটী যুবক তাঁদের কাছ দিয়া অশ্বারোহণে যাইতেছিল। তাঁদের দিকে চোখ পড়ায় যুবক দাঁড়াইল। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া বলিল,—"মা, আপনি কাঁদ্‌ছেন কেন?" দুঃখের সময় সহানুভূতির যোগ হইলে দুঃখ দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠে; তাই কনকলতার কথা সরিল না। তিনি আরও কাঁদিয়া উঠিলেন।

যুবক তখন আশাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"ইনি কি তোমার মা?" আশা বলিল,—"হ্যাঁ।"

"তোমাদের আর কে আছে?"

"আমাদের কেহই নাই।"

যুবক আশাকে প্রশ্ন করিয়া একটী একটী করিয়া সমস্ত ব্যাপার শুনিল। শুনিয়া প্রাণে নিদারুণ আঘাত বোধ করিল। "আমাদের কেহই নাই" আশার মুখের এই কথা কয়টী শেলের মত তার প্রাণে বিঁধিয়াছিল।

তখন যুবক উহাদিগের বাড়ীতে লইয়া গেল। তারপর দোকান হইতে চাল, ডাল, ঘী, ময়দা, ডালিম, বেদানা, সাগু প্রভৃতি লইয়া আসিল।

যুবকের এই মহাপ্রাণতা দেখিয়া কনকলতা মনে মনে ভাবিতেছিলেন,—"আহা! ছেলেটী দয়ার অবতার। এইরূপ সুপাত্রে যদি আমি আশাকে ন্যস্ত করিয়া যাইতে পারিতাম, তবে আমার মত ভাগ্যবতী কে? বিধাতা কি সে আশা পূর্ণ করিবেন? ছেলেটীর নাম জানিতে পারিলেই বিবাহ হইতে পারে কি না বুঝিতে পারিব। দেখি, করুণাসিন্ধু দীনবন্ধু কি করেন।"

যুবক আসিয়া বলিল,—"মা, আপনার অসুখ। আপনার মেয়েও আজ দুদিন খায়নি। আমি আশার জন্য দুটী রেঁধে দিচ্ছি, কোথায় রাঁধ্‌তে হবে বলুন? আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, আপনি আশঙ্কা করিবেন না।"

কনকলতা বলিলেন,—"না—না, বাবা, আমিই রাধ্‌ছি। তুমি একটু ব'স বাবা! তুমি সবই এনেছ, দুখানা লুচি ভেজে দিই, তুমিও খাও।"

যুবক বলিল,—"আমি কিছুই খাব না। আপনাদের খাওয়া দেখিলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি।"

কনকলতা বলিলেন,—"বাবা, তোমার নামটী কি? তোমার মত দেব-চরিত্র ছেলে দেখা যায় না।"

যুবক বলিল,—"আমার নাম সুবোধকুমার চট্টোপাধ্যায়।"

"তোমার বিবাহ হইয়াছে?"

"না।"

"তোমার আর কে আছেন?"

"মা আছেন, আর একটী ছোট ভাই।"

"তুমি কি কর?"

"কলিকাতায় কলেজে পড়ি।"

"তুমি কার সন্তান?"

"আমি অবসথী রবিকরের সন্তান।"

"বাবা, তুমি কি স্বভাব, না ভঙ্গ?"

"আমি তিন পুরুষ ভঙ্গ।"

"তোমরা কোন্ মেল?"

"সর্ব্বানন্দী।"

কনকলতা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—বিধাতা কুলে শীলে সকল দিকেই উপযুক্ত পাত্র মিলাইয়াছেন, কিন্তু দরিদ্র ঘরের মেয়ে বিবাহ করিবে কি? ছেলেটীর দয়ার উপর কোন্ মুখে এতটা সুবিধা লইবার সাহস করি?

"মা, ভাব্‌ছেন কি? আশার মুখ শুকিয়েছে, আমিই দুটো রাঁধি।"

"না বাবা, তোমার জন্য আজ আশা মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইল। বাবা, তোমার এই হতভাগিনী মাকে একটী ভিক্ষা দিবে?"

যুবক বলিল,—"সে কি মা! ভিক্ষা বল্‌ছেন কেন? আপনি যা বল্‌বেন, সাধ্য হইলে অবনত মস্তকে পালন কর্ব্বো।"

কনকলতা এই সব ব্যাপারের মধ্যে ভগবানের করুণা দেখিতে পাইয়া গদগদস্বরে বলিলেন,—"বাবা, এই অনাথিনী অনূঢ়া আশাকে পায়ে স্থান দাও।"

যুবক বলিল,—"মা, সম্মত হইলাম।"

কনকলতার বুক থেকে যেন পাথর সরিয়া গেল। আনন্দে তিনি কথা বলিতে পারিলেন না। অনাবিলভাবে আনন্দের অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

(৬)

যুবক কাঁদির জমিদারের পুত্র। সম্প্রতি বাপ মারা যাওয়ায় নিজেই জমিদারির ভার হাতে লইয়াছিল।

যথাসময়ে ব্যয়ভূষণ করিয়া সুবোধ আশাকে বিবাহ করিল। বিবাহের পর শাশুড়ীকে নিজের বাড়ীতে লইয়া যাইতে চাহিলে তিনি বলিলেন,—"বাবা, যে দুদিন বাঁচি, স্বামীর ভিটেয় থাকিতে ইচ্ছা করি।"

সুবোধকুমার মাসে মাসে শাশুড়ীর জন্য কুড়ি টাকা করিয়া খরচ পাঠাইতে লাগিল। দু-তিন মাস অন্তর আশাকে মায়ের কাছে আনিয়া দেখা শুনা করাইত।

আশা যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনই সুশ্রী। জমিদারের উপযুক্ত পত্নী। ভগবান পূর্ব্ব হইতেই তাকে কোমলতায়, তেজস্বিতায়, বুদ্ধিতে, সৌন্দর্য্যে বড়-ঘরের বৌএর মত করিয়াছিলেন। আশা এখন দাম্পত্য-সুখে, ঐশ্বর্য্যে ও পদগৌরবে ষোল আনা সুখিনী। কনকলতা মেয়ের সুখে ও জামাতার সদ্‌ব্যবহারে অত্যন্ত সুখে ছিলেন। কিন্তু স্বামীশোকে সে সুখ ফুটিতে পারিল না। পরন্তু সেই শোক তাঁহাকে কালী করিয়া ফেলিল।

(৭)

বড় ছেলে শৈলেন এ বৎসর ধানখন্দ এক চিটাও পায় নাই। স্ত্রীর অসুখের চিকিৎসায় অনেক দেনা হইয়াছে। ভয়ানক কষ্ট, দু-বেলা অন্ন-সংস্থানের উপায় নাই।

ছোট ছেলে অতীন রেলে চুরি করিয়া ধরা পড়ায় স্ত্রীর গহনাপত্র বিক্রয় করিয়া ঘুস দিয়া নিস্তার পাইয়াছে। চাকুরী গিয়াছে, জেল হইতে হইতে হয় নাই। সে মনের কষ্টে শয্যাগত; সাগু বার্লি কিনিতে পারে এমন সঙ্গতিও নাই!

উহাদের সেই উপেক্ষিতা মা কনকলতাই এখন উহাদের প্রধান সহায়। তিনি জামাতার নিকট হইতে মাসিক যে কুড়ি টাকা পাইতেন, তাহার ছয় টাকা মাত্র নিজব্যয় করিয়া বাকী চৌদ্দ টাকা দুই ছেলেকে সাত টাকা করিয়া দিতেন। তাহাতেই উহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। বিপন্নের ভগবানই একমাত্র ভরসা।

বাল্য-প্রণয়।

(লেখক,—শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।)

(গল্প)

ছোট্ট দু'টি বালক-বালিকা তা'রা। দেখ্‌তে তা'দের ঠিক্ ফুট্‌ফুটে তাজা অপরাজিতারই মত। প্রতিদিন বিকালবেলায় যখন শ্রান্ত তপনের কিরণ-রশ্মি নিষ্প্রভ হইয়া আসে, তখন তা'রা দু'টিতে মিলিয়া নদীর ধারে ঠিক্ একটা বিদ্যুতের মত উপস্থিত হয়। সরল প্রাণ বালক-বালিকা তা'রা, সরল মনে কখনো তা'রা সেই বালুকা-সৈকতে বালুর ঘর তৈয়ার করে, কখনো বা নদীর স্ফটিকস্বচ্ছ জলে নামিয়া সাঁতার খেলে। এমনভাবে খেলা-ধূলায় আমোদ-প্রমোদে তা'দের দিন যায়। রাত্রে পৃথক্ পৃথক্ বাটিতে যার যার মায়ের কাছে তা'রা শয়ন করে বটে কিন্তু পূর্ব্বাকাশে বালভানু উঁকি মারিতে না মারিতেই তা'রা দু'টিতে আবার একত্র হয়, এমনি তা'দের প্রাণের টান!

কাল-চক্রের আবর্ত্তনে এখন আর তা'রা মুকুলিত কুসুম নহে। তা'দের একটির দেহে কৈশোরের লাবণ্যচ্ছটা, মুখে সলজ্জভাব, চলনে কি এক সরম আসিয়াছে। আর একটির দেহে বাল্যের বিকাশ, মুখে উন্মেষোন্মুখ যৌবনের ছটা, হাসিতে যৌবনোচিত চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইয়াছে। এখন আর উভয়ের প্রতি উভয়ে সেরূপ সরল দৃষ্টিতে চাহিতে পারে না, উভয়ের অন্তরের মধ্যে এক অদৃশ্য প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়া উভয়কে পৃথক করিয়া দিয়াছে। তবুও কেহ কাহাকেও দিবসের মধ্যে একটীবার না দেখিতে পাইলে, যেন শত বৃশ্চিকদংশনের জ্বালা অনুভব করে। একটি না একটি কাজের ছুতা ধরিয়া কিশোরী কিশোরের বাটীতে আসে, আবার কিশোরও একটি না একটি ছুতা ধরিয়া কিশোরীর বাটীতে যায়। প্রভাতে নীলাম্বরী পরিয়া, ফুলের সাজী হাতে করিয়া, মলয়াহিল্লোলে কেশপাশ দোলাইয়া দিয়া, কিশোরী যখন কিশোরের বাটীতে যাইয়া পুষ্পোদ্যানে ফুল-চয়ন করিতে থাকে, তখন ভাবমুগ্ধ কিশোর বাতায়ন খুলিয়া একদৃষ্টে তাহার দিকে তাকাইয়া থাকে, তারপর ধীরে ধীরে কিশোরীর কাছে আসিতেই সে বিদ্যুল্লতার ন্যায় ছুটিয়া পলায়, অপমানিত কিশোর ব্যথিত হৃদয়ে সরোবর সোপানে বসিয়া থাকে।

আবার অপরাহ্ণে যখন কিশোর কিশোরীর বাটীতে যাইয়া অঙ্গণে "ফুটবল" খেলিতে থাকে, তখন বাটীর অভ্যন্তর হইতে দু'টি মৃগ-নয়ন একদৃষ্টে তাহার দিকে তাকাইয়া থাকে, যেই কিশোরের দৃষ্টি সেদিকে পড়ে, অমনি তাহা অদৃশ্য হয়, কিশোর তখন নিজের আহাম্মুখীর শত শত নিন্দাবাদ করিতে করিতে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বাটীতে ফিরিয়া যায়।

এইভাবে ধরি-ধরি-করি, ধরিতে-না-পারি ভাবের মধ্যে এইরূপ আলেয়ার পিছু পিছু ছুটাছুটির মধ্যে কিশোর আর একটি বৎসর কাটাইল, শেষে পরীক্ষা পাশের এক দম্‌কা বাতাস আসিয়া কিশোরকে নিভৃত পল্লীভবন হইতে একেবারে কর্ম্ম-কোলাহলময় কলিকাতায় আনিয়া ফেলিল। এতদিন কাছাকাছি থাকায় কিশোর বিরহ যাতনার যে অসহনীয় যাতনা বুঝিতে পারে নাই, আজ দূরে—অতি দূরে আসিয়া তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, ফিরিয়া বাটীতে যাই, পড়া-শুনায় আর কাজ নাই; কিন্তু কি বলিয়া মা-বাপকে জবাব্ দিবে, এই ভাবনায় কিশোরের সে ইচ্ছা লোপ হইল। কোনরূপে পুত্তলিকার ন্যায় নিতান্ত উদ্দেশ্যহীন ভাবে প্রেসিডেন্সীতে ভর্ত্তি হইয়া আসিয়া কিশোর অমলচন্দ্র হোষ্টেলের কক্ষে শুইয়া পড়িল। সমস্ত জগতটা যেন শ্রীকৃষ্ণের চক্রের মত তাহার সম্মুখে ঘুরিতে লাগিল। ঠাকুর আসিয়া "বাবু" "বাবু" করিয়া ডাকিল, কোন সাড়া পাইল না। ঝি আসিয়া ডাকাডাকি করিল, অমলচন্দ্র '-ক্ষুধা নাই" বলিয়া আবার তন্দ্রাভিভূত হইল। ক্রমে দুই তিন ঘণ্টা গেল, কলেজের ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া চারিটা বাজিল, অমলচন্দ্র নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বে এক পেয়ালা চা ও খানকয়েক বিস্কুট গলাধঃকরণ করিয়া ধীরে ধীরে হেদোর দিকে বাহির হইল। এই তাহার নূতন কলিকাতা আসা নহে, ইহার পূর্ব্বেও সে তিন-চারিবার কলিকাতা আসিয়াছে, রাস্তা-ঘাট চিনিতে তাহার আর বাকী নাই। হেদোর মধ্যে একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া উদাস মন অমলচন্দ্র ভাবিতে লাগিল, "কেন মিছে আমি ভাবিয়া মরি! আমি যাহার জন্য আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছি, সে কি একবারও আমার ভাবনা ভাবিতেছে? সে যদি আমারই হইত, তবে কেন আমাকে দেখিলে ছুটিয়া পালাইত, আমার পাশের সংবাদে যখন সমস্ত গ্রামে আমার প্রশংসা ছড়াইতে লাগিল, তখন ত তাহার মুখে একটুও আনন্দের রেখা দেখি নাই, আমি আসিবার দিন একটিবার ত তাহাকে দেখিতেও পাইলাম না"—

ভাবিতে ভাবিতে অমলচন্দ্রের দু'চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। অমল আবার ভাবিল, "আর তা'কে ভাবিয়াই বা কি হইবে, সে হইল মধ্যবিত্ত ঘরের সামান্য গৃহস্থ কন্যা, আর আমি বন্দীপুরের একজন শ্রেষ্ঠ জমিদারের পুত্র, তা'তে আবার ফুলে মেলের নিকশ কুলিন, আমাকে কি আমার পিতা তাহার সহিত বিবাহ দিবেন? বাল্যকালে না হয় একসঙ্গে খেলা ধুলা করিয়াছি, কিন্তু তাই বলিয়া কি পিতা আমায় অমিয়ার সহিত বিবাহ দিবেন?" ভাবিতে ভাবিতে অমলচন্দ্রের চোখ দিয়া শ্রাবণের ধারার মত জল পড়িতে লাগিল, কোন্ সময়ে যে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহা সে জানিতেই পারে নাই।

(২)

সুদীর্ঘ ছয় মাস পরে পূজার বন্ধে কলেজের ছাত্র, উদ্ভিন্ন যৌবন অমলচন্দ্র যখন বাটী আসিল, তখন তাহার অনুসন্ধিৎসু চক্ষু দু'টি কেবল একটি আরাধ্য প্রতিমার অনুসরণ করিতে লাগিল। কিন্তু এখন আর সে কোমলমতি বালক নহে যে বিনা সঙ্কোচে কাহাকেও অমিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করিবে। তাই কোনরূপে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া অমলচন্দ্র সান্ধ্যভ্রমণে বহির্গত হইল; ঠিক যে পথ দিয়া অমিয়ারা নদীর জল লইতে আসে, অমলচন্দ্র সেই পথ ধরিয়া আনমনে যাইতে লাগিল, কিন্তু হায়! কোথাও তাহার আরাধ্য দেবীর সন্ধান মিলিল না। সন্ধ্যার পর ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে কলেজের নব্য বাবু অমলচন্দ্র অমিয়াদের বাড়ীর প্রাঙ্গণ দিয়া আসিল, তবুও অমিয়ার সাড়া-শব্দ পাইল না। রাত্রিতে কোনরূপে দু'খানি লুচি গলাধঃকরণ করিয়া অমলচন্দ্র নিদ্রাদেবীর আশ্রয় গ্রহণ করিল, কিন্তু নিদ্রা আসিল না। অগত্যা উঠিয়া বসিয়া গুন্ গুন্ স্বরে গান ধরিল,—

"কেন মিছে আশা, মিছে ভালবাসা,
কেন মিছে তারে ভাবনা।
সে যে আকাশেরই চাঁদ, নয়নেরি মণি,
সে ত কভু মোর হ'বে না॥"

অমলচন্দ্র কতক্ষণ যে এরূপভাবে গান করিতেছিল তাহা সে জানে না। যখন পুষ্পোদ্যানে বসিয়া কোকিল "কুহু" "কুহু" তান ধরিল, তখন তাহার চমক ভাঙ্গিল, চাহিয়া দেখিল, চারিদিক বেশ ফর্সা হইয়াছে। অমল একদৃষ্টিতে প্রকোষ্ঠের বাতায়ন খুলিয়া পুষ্পোদ্যানের দিকে তাকাইয়া থাকিল;

ভাবিল, যদি অমিয়া ফুলের সাজি লইয়া ফুল তুলিতে আসে! ক্রমে বেলা বাড়িল, শারদীয় শিশিরবিন্দু পড়িয়া প্রস্ফুটিত ফুলের উপর যাহা মুক্তাবিন্দুর ন্যায় টল্ মল্ করিতেছিল তাহা শুকাইয়া গেল, তবুও অমিয়া আসিল না। পঞ্চমী গেল, ষষ্ঠী আসিল, পাড়ার কত বালক-বালিকা, কিশোর কিশোরী অমলের বাটি পূজা দেখিবার জন্য দলে দলে ছুটিয়া আসিতে লাগিল, অমল উৎসুকনেত্রে তাহাদের দিকে তাকাইতে লাগিল, কিন্তু কৈ, অমিয়া ত আসিল না। বিজয়ার দিন পালে পালে গ্রামের বালক-বালিকা পুরনারিগণ নদীর তীরে নানাবর্ণের পরিচ্ছদে সজ্জিতা হইয়া দাঁড়াইল, অমলের চঞ্চল-চক্ষু পাঁতি পাঁতি করিয়া তাহার মধ্যে তাহার মানস-প্রতিমার সন্ধান করিল, কিন্তু দেখা পাইল না। তখন অগত্যা প্রেমোন্মাদ অমল বিজয়ার প্রণাম করিবার ছলে অমিয়াদের বাটীতে গেল, দুরু দুরু করিয়া তাহার বুক কাঁপিতে লাগিল, একবার এদিকে, একবার ওদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অমল "ঠাকুর-মা" "ঠাকুর-মা" করিয়া অন্দরে প্রবেশ করিল। ভগ্ন অন্ধকারময় জীর্ণ দালানের প্রকোষ্ঠ হইতে একটি রমণীমূর্ত্তি উত্তর করিল, "এস বাবা, অমল না কি?"

তক্তপোষের উপর একটি কঙ্কালাবশিষ্টা রমণীমূর্ত্তি নিদ্রা যাইতেছিল, অমলের কণ্ঠ শুনিবামাত্র যেন তাহার শরীরের মধ্য দিয়া শোণিত প্রবাহিত হইল। সে অতিকষ্টে পাশ ফিরিয়া কোঠরগত চক্ষু দুইটী দরজার দিকে রাখিয়া মৃতের ন্যায় পড়িয়া রহিল। আজ দীর্ঘ ছয় মাস যাবৎ শয়নে স্বপনে যাহার চিন্তা করিয়াছি, যাহার বিরহে আজ আমার দেহ শীর্ণ, শরীর জীর্ণ, চক্ষু কোঠরগত, আমি মরণপথের পথিক, এমনই সেই চিন্তনীয় ধন আমার আসিয়া উপস্থিত হইবে, এ চিন্তা করিতেও অমিয়ার আনন্দে সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্মের ধারা বহিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে অমল প্রকোষ্ঠের মধ্যে প্রবেশ করিল। দীর্ঘকাল কারাগারে আবদ্ধ কয়েদী যেমন হঠাৎ মুক্তির সংবাদ পাইলে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়, অমলকে প্রকোষ্ঠের মধ্যে সহসা আগত দেখিয়া অমিয়ারও তাহাই হইল। একবার ভাবিল, উঠিয়া অমল দা'কে একটা বিজয়ার প্রণাম করি, আর বলি, নিষ্ঠুর, এমনভাবে যদি কাঁদাইবি, তবে আমায় মজিয়েছিলি কেন?" অমনি লজ্জা আসিয়া তাহার সংকল্পে বাধা দিল।

অমল ঘরে ঢুকিয়াই ঠাকুর-মাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তক্তপোষে শুয়ে কে ঠাকুর-মা?"

ঠাকুর-মা আধা ক্রন্দনস্বরে বলিলেন,—"আর কে? তোমার খেলার

সাথী অমিয়া। তুমিও যেদিন কল্‌কাতায় গিয়েছ, সেই দিন হ'তে মেয়ে আমার বিছানা নিয়েছে। তা যাক্, সব ভাল ত? কল্‌কাতা হ'তে কবে এসেছ?'

"আজ পাঁচ দিন হ'লো এসেছি ঠাকুর-মা!"

অমিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল,—"নিষ্ঠুর পাষাণ, আজ পাঁচ দিন হ'লো এসেছ, একবার ভুলেও এদিকে আস্‌তে নাই?"

ঠাকুর-মা বলিলেন, "আজ পাঁচ দিন হ'লো এসেছ, একবার বুঝি এদিকে আস্‌তে নেই। আমরা যে একবার তোমার খোঁজ নেব এমন ফুর্‌সতটুকু নাই। দেখ্‌ছ ত অমির চেহারা, সোণার মেয়ে আমার যেন পোড়া কাঠ হয়েছে।"

অমল এবার লজ্জার মাথা খাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি অসুখ ঠাকুর-মা?"

"ভগবান জানেন, কত ডাক্তার কবিরেজ দেখালেম, কেউ এ ব্যারাম চিন্‌তে পাল্লে না, ওষুধ গিলে গিলে মেয়ে আমার যেন কালী হয়ে গেছে। এখন স্থির ক'রেছি, পূজোর ক'টা দিন গেলে অমিকে নিয়ে দেওঘরে হাওয়া বদ্‌লাতে যাব।"

(৩)

ঠাকুরমাকে বিজয়ার প্রণাম করিয়া আসিবার পর অমলচন্দ্র আপন প্রকোষ্ঠের দ্বার বন্ধ করিয়া ভাবিতে লাগিল, "সত্যই কি তবে অমিয়া আমাকে এত ভালবাসে! শুনিলাম, অমিয়ার কোন অসুখ নাই, কোন ব্যাধি নাই, তবে কি সে আমারই ভাবনায় এত কৃশ হইয়া গিয়াছে? আমি কি নিষ্ঠুর, অমিয়ার হৃদয়ে এত ব্যাথা দিয়াও এখনও আমি নিশ্চিন্ত রহিয়াছি।" ভাবিতে অমলচন্দ্রের দুই গণ্ড দিয়া শ্রাবণের ধারার ন্যায় অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। অমল যেদিকে চায়, কেবল অমিয়ারই কাষ্ঠসার দেহ দেখিতে পাইল। পরদিন অমিয়ার পিতা-মাতাকে প্রণাম করিবার ছলে অমল আবার অমিয়াদের বাটীতে গেল। অমিয়া তখন একখানি লাঠিতে ভর দিয়া বাহিরের বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিল। অমলকে দেখিতেই অমিয়া কোনরূপে "ছুটিয়া পলাইল। অমল মুহূর্ত্তের জন্য অমিয়ার দিকে চাহিতেই বুঝিতে পারিল, অমিয়ার ব্যাধি কেবল তাহারই বিরহ। অমিয়ার পিতা-মাতাকে প্রণাম করিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই তাহার মাতা বলিলেন, "এসেছ বাবা যদি পথ ভুলে এদিকে, তবে একবার গরীবের বাড়ীতে একটু মিষ্ট মুখ কর।"

অমিয়ার বাবা অমিয়াকে ডাকিয়া বলিলেন,—"অমি, মা, এদিকে এসো, তোমার অমলদা'কে প্রণাম কর।"

অমিয়া নিতান্ত সলজ্জভাবে আসিয়া ঢিপ করিয়া অমলকে প্রণাম করিল এবং নিতান্ত সঙ্কুচিতভাবে পায়ের ধূলি লইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

অমল জলযোগ করিলে অমিয়ার মাতা বলিলেন, "বাবা, অমি ত যেঠের কোলে চৌদ্দতে পড়্‌লো, আর ত ওকে রাখা যায় না, শুন্‌ছি না কি, কলকেতায় পাশ করা ছেলেরা সব পণ নেবে না ব'লে পিরতিজ্ঞে ক'রেছে, তুমি যদি বাবা একটু চেষ্টা কর, আমরা কন্যাদায় হ'তে উদ্ধার হতে পারি।"

অমল নিতান্ত ঘৃণার সহিত বলিল, "বাঙ্গালীর প্রতিজ্ঞার কথা ছেড়ে দিন, এদের প্রতিজ্ঞার কি কোন মূল্য আছে?"

"তবে কি আমার অমি আইবুড় থাক্‌বে বাবা? তোমরা দশজন থাক্‌তে এর কি একটা চেষ্টা হ'বে না?"

"দেখা যাক্, প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ যার সহিত আছে, তার সহিত নিশ্চয়ই হ'বে" বলিয়া অমল ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

(৪)

"চাটুজ্যে মহাশয় বাড়ীতে আছেন" বলিয়া গ্রামের জমিদার-হরকান্তবাবু বিশাল দোদুল্যমান ভুঁড়ীটি নাচাইতে নাচাইতে ঠিক্ কোজাগর লক্ষ্মী পূর্ণিমার দিন অমিয়াদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অমিয়ার শরীর কি জানি কেন পূর্ব্বাপেক্ষা একটু ভাল হইয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি অন্দরে গিয়া তাহার বাপ-মায়ের কাছে এই সংবাদ দিল। লক্ষপতি জমিদার হরকান্ত বাবুকে সশরীরে উপস্থিত দেখিয়া অমিয়ার পিতা বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে সাদরে বসাইলেন। উভয়ে বিজয়ার কোলকুলী হইল। মায়ের ইঙ্গিতে অমিয়া আসিয়া হরকান্তবাবুকে প্রণাম করিতেই তিনি পকেট হইতে কয়েকটি ধান দূর্ব্বা লইয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া এক শত টাকার একখানি নোট তাহার হাতে দিলেন এবং অমিয়ার ঠাকুর-মার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "একবার শঙ্খটায় একটা ফুঁ দেও না কেন? আজ লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিন মা লক্ষ্মীকে ঘরে নিয়ে যাই।" অন্দর হইতে শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। কোথা হইতে হঠাৎ পুরোহিত ঠাকুর উপস্থিত হইলেন এবং আটজন বাহক বহু মিষ্টান্ন লইয়া উপস্থিত হইল।

হরকান্তবাবু অমিয়াকে কোলে করিয়া বসিয়া বলিলেন,—"কেমন, এই বুড়ার পান-তামাক সাজ্‌তে পার্ব্বেত মা?"

অমিয়া লজ্জায় মুখ নত করিয়া বসিয়া রহিল।

শুভদিনে শুভক্ষণে অমল ও অমিয়ার দু'হাত এক হইল।

কোষ্ঠীশিক্ষা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

চতুর্থ নবাংশের অর্থাৎ ১৩ অংশ ২০ কলার অধিপতি তুলাধিপতি শুক্র। পঞ্চম নবাংশের অর্থাৎ ১৬ অংশ ৪০ কলার অধিপতি বৃশ্চিকাধিপতি মঙ্গল। ষষ্ঠ নবাংশের অর্থাৎ ২০ অংশের অধিপতি ধনুর অধিপতি বৃহস্পতি। সপ্তম নবাংশের অর্থাৎ ২৩ অংশ ২০ কলার অধিপতি মকরাধিপতি শনি। অষ্টম অংশের অর্থাৎ ২৬ অংশ ২৪ কলার অধিপতি কুম্ভাধিপতি শনি। অতএব শনি গ্রহই জাতবালকের নবাংশাধিপতি।

নবাংশ ফল।

রবির নবাংশে জাতব্যক্তি—লম্বা কোঁকড়ান চুলবিশিষ্ট, খর্ব্বকায়, গৌরবর্ণ, অত্যন্ত আশাযুক্ত, তেজস্বী, সুরতোপযোগী, দ্রব্যসংগ্রহে যত্নবান, পাপী, ক্রোধী, সাহসী, চঞ্চল, ক্রুর, শত্রুপীড়ক ও অল্প সন্তানযুক্ত হয়।

চন্দ্রের নবাংশে জাতব্যক্তি—সুন্দর কান্তিযুক্ত, দীর্ঘ অল্প লোমাবলী দেহবিশিষ্ট, ধার্ম্মিক, বহুপরিবারক, গুণজ্ঞ ও বিষয়ভোগে সুখী হয়।

মঙ্গলের নবাংশে জাতব্যক্তি—বৃহৎ শরীর ও কপিলবর্ণ কেশবিশিষ্ট, গৌরবর্ণ, কু-নখী, কামুক, খল, অহঙ্কারী, ধূর্ত্ত, নিপুণ, উৎসাহী, শত্রুপীড়ক ও কৃপণ হয়।

বুধের নবাংশে জাতব্যক্তি—মধ্যমাকার দেহ ও চঞ্চলনয়নবিশিষ্ট, দীর্ঘবক্ষঃস্থল এবং কোঁকড়ান ও সুশোভিত কেশযুক্ত, শিল্পী, ব্যবসানিপুণ, ধীর, ধনবান, উত্তম স্ত্রী, বস্ত্র ও মাল্যযুক্ত হয়।

বৃহস্পতির নবাংশে জাতব্যক্তি—পদ্মের ন্যায় বদন এবং নীলোৎপলের

ন্যায় নয়ন ও সুন্দর কেশযুক্ত, অতিথিপ্রিয়, গুণবান, রমণীবল্লভ, বলবান ও হস্তদ্বয়ে সুন্দর রেখাবিশিষ্ট হয়।

শুক্রের নবাংশে জাতব্যক্তি—প্রাকৃদ্বয় রক্তাভযুক্ত, উৎফুল্ল আঁখি ও উত্তম কেশযুক্ত, শঙ্খের ন্যায় গ্রীবা ও উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ শরীরবিশিষ্ট, বলবান, ক্ষমতাশীল, কবি, দাতা এবং বস্ত্র অলঙ্কার ও উত্তমপুষ্পে সন্তুষ্ট।

শনির নবাংশে জাতব্যক্তি—অল্পলোম, বক্রকেশ ও ক্ষীণ শরীরবিশিষ্ট, সুন্দরমূর্ত্তিযুক্ত, শ্যামবর্ণ, স্বাধীন, গুণী, পাপী ও পরিমিত ধনলোভী হয়।

দ্বাদশাংশ নির্ণয়।

জন্মলগ্নের বার ভাগের এক ভাগের নাম দ্বাদশাংশ। প্রত্যেক ভাগের পরিমাণ ২ অংশ ৩০ কলা। জন্মলগ্নপতি দ্বাদশাংশের প্রথমাংশের অধিপতি, দ্বিতীয়াধিপতি দ্বিতীয় অংশের অধিপতি, তৃতীয়াধিপতি তৃতীয়াংশের অধিপতি, এইরূপে ক্রমান্বয়ে পর পর অধিপতি দ্বাদশাংশের পর পর অংশের অধিপতি হইবে।

পূর্ব্বোক্ত জাতকের বৃশ্চিক লগ্নের ২৫ অংশ ১৬ কলা গতে জন্ম হইয়াছে। সুতরাং ইহার লগ্নের ২৫ অংশে দ্বাদশাংশের দশম অংশ গত হইয়াছে, অতএব দ্বাদশাংশের একাদশ অংশেই ইহার জন্ম। বৃশ্চিকের একাদশ রাশি কন্যা ইহার অধিপতি বুধ। সুতরাং এই বালকের দ্বাদশাংশাধিপতি বুধ।

দ্বাদশাংশ ফল।

রবির দ্বাদশাংশে জাতব্যক্তি—মলিন, ক্রুর, অল্পায়ু, চপল, দুর্ব্বল, অলস, কামুক ও অল্পধার্ম্মিক হয়।

চন্দ্রের দ্বাদশাংশে জাতব্যক্তি—বান্ধবগণের আশ্রয়, প্রাজ্ঞ, ধনী, প্রিয়দর্শন, শিল্পী ও ধার্ম্মিক হয়।

মঙ্গলের দ্বাদশাংশে জাতব্যক্তি—হিংস্রক, মলিন, মূর্খ, পাপাত্মা, রমণপ্রিয় ও অল্পধার্ম্মিক হয়।

বুধের দ্বাদশাংশে জাতব্যক্তি—ধনবান, মেহরোগী, উত্তমা স্ত্রীতে আসক্ত, ধার্ম্মিক ও ভাগ্যবান হয়।

বৃহস্পতির দ্বাদশাংশে জাতব্যক্তি—শুদ্ধাচারী, শাস্ত্রজ্ঞ, বক্তা, সুখী ও দীর্ঘজীবী হয়।

শুক্রের দ্বাদশাংশে জাতব্যক্তি—ধনবান, বলবান, নৃত্যগীতপ্রিয়, শুদ্ধাচারী ও ক্ষমাবান হয়।

শনির দ্বাদশাংশে জাতব্যক্তি—হিংস্রক, চঞ্চল, ধূর্ত্ত, অন্যের ধন গ্রহণে অভিলাষী, মলিন ও অধার্ম্মিক হয়।

ত্রিংশাংশ নির্ণয়।

জন্মলগ্নের ত্রিংশভাগের এক এক ভাগকে ত্রিংশাংশ বলে। প্রত্যেক ভাগের পরিমাণ ১ অংশ, পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে রাশি সকল অযুগ্ম ও যুগ্ম দুই ভাগে বিভক্ত। মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু ও কুম্ভ এই ছয়টি অযুগ্ম। বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর ও মীন, এই ছয়টী যুগ্ম। অযুগ্ম লগ্নের প্রথম পাঁচ অংশের অধিপতি মঙ্গল। দ্বিতীয় ৫ অংশের অধিপতি শনি, তৃতীয় আট অংশের অধিপতি বৃহস্পতি, চতুর্থের ৭ অংশের অধিপতি বুধ, এবং ৫ম বা শেষ পাঁচ অংশের অধিপতি শুক্র। যুগ্মলগ্নে জন্ম হইলে পূর্ব্বোক্ত মত প্রথম পাঁচ অংশের অধিপতি শুক্র, দ্বিতীয় সাত অংশের অধিপতি বুধ, তৃতীয় আট অংশের অধিপতি বৃহস্পতি, চতুর্থ পাঁচ অংশের অধিপতি শনি, এবং ত্রিংশাংশের পঞ্চম বা শেষ পাঁচ অংশের অধিপতি মঙ্গল।

পূর্ব্বোক্ত জাতকের বৃশ্চিক লগ্নের ২৫ অংশ ১৬ কলা গতে জন্ম হইয়াছে। বৃশ্চিক লগ্ন যুগ্ম। সুতরাং শুক্র লগ্নের প্রথম পাঁচ অংশের অধিপতি, দ্বিতীয় ৭ অংশ অর্থাৎ লগ্নের ১২ অংশের অধিপতি বুধ, তৃতীয় ৮ অংশ অর্থাৎ লগ্নের ২০ অংশের অধিপতি বৃহস্পতি, চতুর্থ পাঁচ অংশের অর্থাৎ লগ্নের ২৫ অংশের অধিপতি শনি এবং পঞ্চম বা শেষ ৫ অংশের অধিপতি মঙ্গল, অতএব জাতকের মঙ্গলের ত্রিংশাংশে জন্ম হইয়াছে।

ত্রিংশাংশ ফল।

মঙ্গলের ত্রিংশাংশে জাতব্যক্তি—মূর্খ, কুকার্য্যে রত, মলিন, কুমূর্ত্তিবিশিষ্ট, ক্রুর, খল, পরদারাসক্ত, পাপী, রূপ ও বুদ্ধিহীন হয়।

শনির ত্রিংশাংশে জাতব্যক্তি—মূর্খ, পরের ধনাভিলাষী, পরাধীন, কুকর্ম্মরত, মলিন ও কৃতঘ্ন হয়।

বৃহস্পতির ত্রিংশাংশে জাতব্যক্তি—আচারপরায়ণ, সত্যবাদী, বিবেচক, তেজস্বী, কৃতবিদ্য, সুখী, ধনী, দাতা, দীর্ঘায়ুঃযুক্ত, সন্তানবান ও গুণবান হয়।

বুধের ত্রিংশাংশে জাতব্যক্তি—ধার্ম্মিক, উত্তমা কামিনী, অলঙ্কার ও পুষ্প-প্রিয় এবং ধনবান হয়।

শুক্রের ত্রিংশাংশে জাতব্যক্তি—সুন্দর, মনোহর নেত্রবিশিষ্ট, যুবতীর আনন্দবর্দ্ধক, দেব ব্রাহ্মণ ভক্ত, দাতা ও দয়ালু হয়।

যামার্দ্ধাধিপ নির্ণয়।

দিবাতে জন্ম হইলে দিনমানকে ৮ ভাগ ও রাত্রিতে জন্ম হইলে রাত্রি-মানকে ৮ ভাগ করিয়া যামার্দ্ধাধিপ নির্ণয় করিতে হয়। দিবসে যে বারে জন্ম হয় সেই বারই প্রথম যামার্দ্ধের অধিপতি, ঐ বার হইতে গণনায় ৬ষ্ঠ বার দ্বিতীয় যামার্দ্ধের অধিপতি, দিবাতে এইরূপ গণনা করিয়া যামার্দ্ধাধিপ নির্ণয় করিতে হয়। রাত্রিতে ও যে বারে জন্ম হয় সেই বারেই প্রথম যামার্দ্ধাধিপ। ঐবার হইতে গণনায় ৫ম বার দ্বিতীয় যামার্দ্ধের অধিপতি। রাত্রিতে এইরূপ গণনা করিয়া যামার্দ্ধাধিপ নির্ণয় করিতে হয়।

পূর্ব্বোক্ত বালকের দিবসে বৃহস্পতিবারে জন্ম। সুতরাং বৃহস্পতিবারই প্রথম যামার্দ্ধের অধিপতি। বৃহস্পতি হইতে ৬ষ্ঠ বার মঙ্গল দ্বিতীয় যামার্দ্ধের অধিপতি। মঙ্গল হইতে ৬ষ্ঠ বার রবি, তৃতীয় যামার্দ্ধের অধিপতি। অতএব উহার রবিই যামার্দ্ধাধিপতি।

দণ্ডাধিপ নির্ণয়।

যামার্দ্ধকে ৪ ভাগ করিয়া দণ্ড নির্ণয় করিতে হয়। রাত্রিতে যামার্দ্ধাধিপ প্রথম দণ্ডের অধিপতি, পরে ছয় ছয় গণনাতে যে গ্রহ হয়, সেই গ্রহ অপর তিন দণ্ডের অধিপতি হইয়া থাকে। দিবাতে দণ্ডাধিপ নির্ণয় করিতে হইলে গ্রহগণের অঙ্ক জানা উচিত। তজ্জন্য নিম্নে গ্রহগণের অঙ্ক দেওয়া হইল।

রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, এই ৮টী। দণ্ডাধিপে কেতু গ্রহকে ধরিতে হয় না। দিবাতে ও যামার্দ্ধাধিপ প্রথম দণ্ডের অধিপতি। পরে যামার্দ্ধাধিপের যে অঙ্ক তাহার অর্দ্ধাঙ্কে যে গ্রহ সেই গ্রহই দ্বিতীয় দণ্ডের, দ্বিতীয় দণ্ডাধিপের যে অঙ্ক তাহার অর্দ্ধাঙ্কে যে গ্রহ সেই গ্রহই তৃতীয় দণ্ডের অধিপতি হইবেন। গ্রহাঙ্কের অঙ্ক যদি ভগ্নাঙ্ক হয়, তবে তাহা পরিত্যাগ করিবেন। এক অঙ্কের অর্দ্ধাঙ্ক নাই, সেখানে শূন্য ধরিয়া রাহুর দণ্ড হইবে।

পূর্ব্বোক্ত জাতকের রবি যামার্দ্ধাধিপের তৃতীয় দণ্ডে জন্ম। অতএব রবিই প্রথম দণ্ডাধিপ। রবির অঙ্ক ১, ইহার অর্দ্ধাঙ্কে রাহু দ্বিতীয় দণ্ডাধিপ, রাহুর অঙ্ক ৮, ইহার অর্দ্ধাঙ্ক ৪, ৪ অঙ্কে বুধ, অতএব তৃতীয় দণ্ডাধিপ। সুতরাং বুধগ্রহ জাতকের দণ্ডাধিপ।

দণ্ডাধিপ ফল।

রবির দণ্ডে জাতব্যক্তি—বংশক্ষয় ও পিতৃধননষ্টকারী হয়।

চন্দ্রের দণ্ডে জাতব্যক্তি—দীর্ঘায়ুঃ শ্লেষ্মাধিক ধাতুবিশিষ্ট, সুধী, সুমতিযুক্ত কীর্ত্তিমান, সত্যপ্রিয়, ধার্ম্মিক ও ধনবান হয়।

মঙ্গলের দণ্ডে জাতব্যক্তি—ব্রণ ও অতিসার পীড়ায় পীড়িত এবং সতত কষ্টান্বিত হয়।

বুধের দণ্ডে জাতব্যক্তি—দীর্ঘায়ুঃ, সুকবি, ধনী ও সুখী হয়।

বৃহস্পতির দণ্ডে জাতব্যক্তি—মেধাবী, দাম্ভিক, বহুপুত্রবান, প্রিয়ালাপি ও নৃত্যগীত প্রিয় হয়।

শুক্রের দণ্ডে জাতব্যক্তি—বুদ্ধিমান, পিতৃভক্ত, পুত্রবান, রাজকর্ম্মচারী, যাজ্ঞিক ও কুলের আনন্দবর্দ্ধক হয়।

শনির দণ্ডে জাতব্যক্তি—অল্পায়ুঃ, পিতৃদ্বেষী ও সর্ব্বদা দুঃখভাগী হয়।

রাহুর দণ্ডে জাতব্যক্তি—চৌর, পিতৃবিত্তাপহারী ও বংশনাশের কারণ হয়।

গণনির্ণয়।

হস্তা, স্বাতী, মৃগশিরা, অশ্বিনী, শ্রবণা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, রেবতী ও অনুরাধা নক্ষত্রে জন্ম হইলে জাতকের দেবগণ হয়। আর্দ্রা, রোহিণী, পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, ভরণী, পূর্ব্বষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে জন্ম হইলে জাতকের নরগণ হয়। কৃত্তিকা, অশ্লেষা, মঘা, চিত্রা, মূলা, জ্যেষ্ঠা, বিশাখা, ধনিষ্ঠা ও শতভিষা নক্ষত্রে জন্ম হইলে জাতকের রাক্ষসগণ হয়।

পূর্ব্বোক্ত জাতক শ্রবণা নক্ষত্রে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং দেবগণে ইহার জন্ম।

গণফল।

দেবগণে জাতব্যক্তি—মহাত্মা, দাতা, বুদ্ধিমান, বলবান, ভোগী ও পণ্ডিত হয়।

নরগণে জাতব্যক্তি—মানী, ধার্ম্মিক, বিস্তৃত বদনযুক্ত, গৌরবর্ণ এবং পুরজনের আনন্দদায়ক হয়।

রাক্ষসগণে জাতব্যক্তি—উন্মাদ, ভয়ঙ্কর, আকৃতিবিশিষ্ট, হস্তীপ্রিয় এবং সাহসশীল হয়।

বর্ণ নির্ণয়।

কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন রাশিতে জাতব্যক্তি—বিপ্রবর্ণ। তুলা ও ধনু রাশিতে জাতব্যক্তি ক্ষত্রিয়বর্ণ। মেষ, মিথুন ও কুম্ভরাশিতে জাতব্যক্তি বৈশ্যবর্ণ। বৃষ, কন্যা ও মকররাশিতে জাতব্যক্তি শূদ্রবর্ণ হয়।

রাশি নামের আদ্যক্ষর নির্ণয়।

অ, ল, মেষ। উ, ব, বৃষ। ক, ছ, মিথুন। ম, ট, সিং। প, ঠ, কন্যা। র, ত, তুলা। ধ, ভ, ধনু। খ, জ, মকর। গ, স, কুম্ভ। ড, হ, কর্কট। ন, স, বৃশ্চিক। দ, চ, মীন।

নক্ষত্রের প্রতিপাদের আদ্যক্ষর অনুসারে জাতকের নামের আদ্যক্ষর নির্ণয়।

চু, চে, চো, ল ১। লি, লু, লে, লো ২। অ, ই, উ, এ, ৩। ও, ব, বি, বু, ৪। বে, বো, ক, কি, ৫। কু, ঘ, ঙ, ছ, ৬। কে, কো, হ, হি, ৭। হু, হে, হো, ড, ৮। ডি, ডু, ডে, ডো, ৯। ম, মি, মু, মে, ১০। মো, ট, টি, টু, ১১। টে, টো, প, পি, ১২। পু, ষ, ন, ঠ, ১৩। পে, পো, র, রি, ১৪। রু, রে, রো, ত, ১৫। তি, তু, তে, তো, ১৬। ন, নি, নু, নে, ১৭। নো, য, যি, যু, ১৮। যে, যো, ভ, ভি, ১৯। ভূ, ধ, ফ, ঢ ২০। ভে, ভো, জ, জি ২১। জু, জে, জো, খ ২২। খি, খ, খে, খো, ২২। গ, গি, গু, গে ২৩। গো, শ, শি, শু ২৪। শে, শো, দ, দি ২৫। দু, ঝ, ঞ, ঞ ২৬। দে, দো, চ, চি ২৭।

পূর্ব্বোক্ত জাতক মকররাশিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। খ অক্ষর তাহার রাশি নামের আদ্য অক্ষর এবং শ্রবণা নক্ষত্রের দ্বিতীয় পাদে জন্ম বলিয়া খ এই অক্ষরে নাম হইবে।

ক্রমশঃ।

দেবতার সঙ্কেত।

(লেখক,—শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।)

(১)

"ধর, ধর, দুষ্টু!"—ছেলের মা ছেলের পাছু পাছু ছুটেছেন। দেবতাদের ছেলের মত সুকুমার সুন্দর শিশুটী, ফুটন্ত ফুলের মত তার মুখখানি, গোলাপ পাপড়ীর মত দুটী কচি ঠোঁটের মধ্য দিয়ে তার কুঁদফুলের মত সাদা ধব্‌ধবে সাজান দাঁতগুলি কি সুন্দর দেখাচ্ছিল! মাথার উপর টোপরের মত এক-রাশ চুল—কাল কোঁকড়ান—সে নাচাতে নাচাতে ছুটে চলেছিল। তার হা হা হা হা উচ্চহাসির রোলে বাড়ীটা ভরে গিয়েছিল, আর পায়ের মলের ঝুম্ ঝুম্ আওয়াজে সেই তরল হাসির আওয়াজ মিশে স্থানটাকে সজীব ক'রে তুলেছিল।

সন্তান-জননী বড় বিব্রত হয়ে পড়েছেন। দুরন্ত ছেলে তাঁর রাঁধ্‌বার খুন্তি নিয়ে ছুটে পালাচ্ছে, তিনিও তাকে ধর্‌তে ছুটেছেন। তাঁর কুন্তল আলুলায়িত হয়ে পড়েছে, মাথা থেকে বসন খ'সে পড়েছে, মুখে চোখে ভাগ রাগ দেখাতে গিয়ে তাঁর মুখ হেসে ফেল্‌ছে, চোখ হেসে ফেল্‌ছে। মরি! মরি! সন্তান-জননীর এই চিত্রের সহিত কি স্বর্গের কোনও চিত্রের তুলনা হ'তে পারে?

নবীনা জননী ঘুমন্ত সন্তানের ঘুমন্ত চোখে যে হাসি দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঘুমিয়ে পড়েন, আবার স্বপ্নে সন্তানের যে হাসির রব শুন্‌তে শুন্‌তে জেগে উঠেন,—সেই হাসি ত' অহঃরহই তাঁর কাণে বাজ্‌ছে। আজ তাই রাঁধ্‌তে রাঁধ্‌তে যখন তিনি তন্ময় হয়ে ঘুমন্ত শিশুর হাসি হাসি মুখখানি ভাবছিলেন, তখন হঠাৎ জাগ্রত শিশুর বাস্তব হাসি আর মলের আওয়াজ শুনে তিনি চম্‌কে উঠ্‌লেন। এই মাত্র রান্নাঘরের মেঝের উপর মাদুর পেতে ছেলেকে শুইয়েছেন, এর মধ্যে দুষ্টু ছেলে কখন উঠে খুন্তি নিয়ে পালিয়েছে, তা তা' তিনি জান্‌তে পারেন নি!

সুধাংশুকুমার একবারে বহিরাঙ্গণের কাছাকাছি এসে পড়েছে, এমনই সময়ে তার স্নেহময়ী জননীর দুটী মৃণালকোমল বাহুলতা তাকে জাপ্‌টে

ধরে ফেল্‌লে, "সেই স্নেহের বন্ধনে যেন স্বর্গের সমস্ত সৌন্দর্য্য জড়ান মাখান রইলো। স্নিগ্ধরসে সন্তান-জননীর চোখ দুটী ভরে এল, তা পৃথিবীর জীব আমরা কি বুঝ্‌বো!

সুধাংশুর মা ভূতলে নতজানু হয়ে স্নেহের পুতলী সুধাংশুকে বাহুপাশে জড়িয়ে ধরেছিলেন। যেমন ফলভারে অবনত বৃক্ষ মাটীতে নু'য়ে পড়ে, অথচ ফলের গৌরবে আপনাকে ধন্যজ্ঞান করে, যেমন ফলবান বৃক্ষ বরং ফলের ভারে ভেঙ্গে পড়্‌বে তবু কখনও ফলহীন হতে চাইবে না, তেমনই ক'রে সন্তান-বৎসলা সুধাংশু-জননী তাঁর সর্ব্বস্ব রত্নকে বুকে নিয়ে মাটীতে নু'য়ে পড়্‌লেন। আর সেই হাসি হাসি কচিমুখে শত সহস্র চুম্বনের ধারা বর্ষণ করলেন। ক্ষুদ্র শিশুও অমনই দুইখানি কচি হাতে মায়ের গলা জড়িয়ে ধ'রে কচিমুখে মায়ের চুম্বনের প্রতিদান দিলে।

যে ভালবাসার সজল স্নেহরসে স্নাত হয়ে সুধাংশুর জননী সুধাংশুকে বুকে জড়িয়ে ধর্‌লেন, আর সুধাংশু যে ভালবাসার অমিয় দৃষ্টিতে মায়ের সুন্দর মুখখানিকে স্নিগ্ধোজ্জ্বল করে তুল্‌লে, সেই ভালবাসার অভিব্যক্তি যে দেখেছে, সেই ধন্য হয়েছে। তাই যখন সুধাংশুর পিতা স্নানের ঘাট থেকে আর্দ্রবস্ত্রে ফিরে এসে অঙ্গনের দ্বারের সম্মুখে দাঁড়িয়ে মায়ে-পোয়ের এই স্বর্গের খেলা দেখ্‌লেন, তখন আর তাঁর পা সর্‌লো না, সেইখানেই থম্‌কে দাঁড়ালেন। তাঁর সমস্ত শরীরটার ভিতর দিয়ে একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দের তড়িৎ ধারা বয়ে গেল, সুখে চোখ নিমীলিত হয়ে এল, ভগবানের অপার দয়ার কথা মনে প'ড়ে হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে জয়গান উত্থিত হ'ল।

(২)

এ সংসারে সুখী কে? তুমি বল্‌বে, ঐ যে জমিদার বাবু মোটর লেণ্ডো হাঁকিয়ে বেড়াচ্ছে, পোলাও কালিয়া খাচ্ছে, বাগান-পার্টি দিচ্ছে, খেম্‌টা বাইজীর মুজ্‌রো দিচ্ছে, ইয়ার-বক্সী নিয়ে থিয়েটারে বায়স্কোপের বক্সে বস্‌ছে, ঐ-ই সুখী। আমি বল্‌বো, না, এই সুধাংশুর বাপ,—এই যে পূজারী বামুন চালাঘরে বাস করে, নৈবেদ্যের কলাটা চালটা খায়, দুবেলা ফাটা পায়ে মাঠ ভেঙ্গে বাড়ী বাড়ী পূজো কর্‌তে ছোটে, সারাদিন টোলে ছেলে পড়িয়ে মুখ তেঁতো করে ফেলে,—এই গরীব ভিখারী পূজারী বামুনটাই সুখী। তুমি তামাসা কর্‌বে আমায়, বল্‌বে, "Sour Grapes" (আঙ্গুর টক), অর্থাৎ আমার এ কাঠামে ভোগ কর্‌বার সামর্থ্য হ'ল না ব'লে

ভোগীর হিংসেয় আমিই ঐ কথা বলি। আমি বল্‌বো, ভোগটাই যে সুখ, তাই যখন মান্‌ছি না, মনের সন্তোষেই সুখ, এই যখন আমার ধারণা, তখন তোমার কথায় সায় দেবো কি ক'রে? তুমি বল্‌বে, ভোগের ইচ্ছেটা সম্পূর্ণ আছে, অথচ ক্ষমতার অভাব, তাই অক্ষম অকর্ম্মণ্য লোকে যা ব'লে অসন্তুষ্ট মনকে প্রবোধ দেয়, তাই আমি বল্‌ছি। তা হলেই হ'ল, এ তর্ক চল্‌লো, এর আর মীমাংসা হয়ে কাজ নাই।

তর্ক যাই হ'ক, এটা কিন্তু ঠিক যে, সুধাংশুর বাবার মত যথার্থ সুখী লোক নলকোড়া গ্রামে কেহ ছিল না; কেবল নলকোড়া গ্রামে কেন, আশে পাশে পাঁচ সাতখানি গ্রামে কেহ ছিল কি না সন্দেহ; অন্ততঃ লোকে এই কথা বল্‌তো। কৃষ্ণকুমার শিরোমণির গোলপাতার কুঁড়ে, এ কথা ঠিক; কিন্তু সেই কুঁড়ের আঙ্গিনায় এক ফোঁটা সিঁদুর পড়লে তুলে নেওয়া যায়। শিরোমণি শাকান্নে পেট ভরাতেন, এ কথাও সত্য; কিন্তু টোলের ছেলেরা প্রত্যহ কাণাঘুষা কর্‌তো যে, তাদের মা আজ যা রেঁধেছেন, তার এক তোলার দাম একশ' টাকা, আবার কেউ কেউ বল্‌তো, দাম দিয়ে অমন অমৃত পাওয়া যায় না। শিরোমণির ব্রাহ্মণীর হাতে দুগাছি রুলি শোভা পায় বটে, কিন্তু যে অসাধারণ রূপে গুণে তাঁহার দেহ মন মোড়া ছিল, তার কাছে লক্ষ হীরে জহরত সাজান অঙ্গও দাঁড়াতে পারে না। আবার ব্রাহ্মণীর সতীত্বের তেজে শিরোমণির ঘর এমনই আলো ক'রে থাকে যে, বিজুলি-বাতির কুর্‌কুটে আলোও তার কাছে ঝক্ মেরে যায়। ব্রাহ্মণীর অমূল্য প্রণয়ের চরম দান এই দেবকুমারের মত শিশুটীর সঙ্গে কি কুবেরের ভাণ্ডারের সর্ব্বস্ব দানের তুলনা হতে পারে? তারপর ব্রাহ্মণের পুঁথি আর ছাত্র, তাতে যে আনন্দ, তার তুলনা জগতে নাই বল্‌লেই হয়। কাজেই যারা ব্রাহ্মণকে সুখী বলে, তারা যে বিশেষ ভুল করে, তা নয়।

বড় আদরে—বড় যত্নে সুধাংশু মানুষ হচ্ছিল। সুধাংশুর পাঁচটা দাস দাসী নাই বটে, কিন্তু তার স্নিগ্ধ শীতল মায়ের কোল ছিল। ভাড়া-করা সোহাগে আদরে সে বঞ্চিত ছিল বটে, কিন্তু সর্ব্বব্যথাহারী মায়ের স্নেহ তার সকল ব্যথা, সকল কষ্ট, সকল আপদ বালাই ধুইয়ে পুঁছিয়ে দিত। তার বাপ যখন টোলঘরে পড়িয়ে বা বাইরে ঘুরে সারাদিন পরিশ্রমের পর ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরতেন, তখন সে ছুটে গিয়ে, বাপের কোলে উঠে, কচি হাতে বাপের গলাটী জড়িয়ে, আধ আধ কথায় কত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর্‌তো, খুদে

খুদে দাঁতগুলি বার ক'রে হাসির লহর তুলে মুখে চুমো খেত। তখন তার বাপের ক্লান্তি কোথায় উড়ে যেত, শরীরে একটা নূতন স্ফূর্ত্তি, নূতন উৎসাহ দেখা দিত। আবার যখন সাঁজের শাঁক বেজে উঠতো, সুধাংশুর মা তুলসী-তলায় সাঁঝের আলো দেখাতে যেতেন, তখন সুধাংশুও মায়ের সঙ্গে নতজানু হয়ে চোখ বুঁজিয়ে হাত জোড় ক'রে দেবতাকে প্রণাম করতো। এমনই অভ্যাস যে, সাঁজের শাঁক বাজ্‌লেই সুধাংশুর হাত দুটী আপনিই জুড়ে আসতো, মাথাটী নুয়ে পড়তো, চোখ দুটী বুজে আসতো, এমনই ক'রে কেটে যেত।

(৩)

তারপর ক্রমে সুধাংশু বড় হলো। সেও অন্য ছেলেদের মত পাততাড়ি বগলে ক'রে, পিঠে দোলাই বেঁধে, গলায় দোয়াত ঝুলিয়ে, পাঠশালে যেতে লাগ্‌লো। বড় আকাল পড়েছিল। দুতিন বছর উপরি উপরি এমনই আকাল প'ড়ে দিন চলা ভার হয়েছিল। বহু চেষ্টা ক'রেও কারও সাহায্য না পেয়ে শেষে শিরোমণি মশাইকে টোল তুলে দিতে হয়েছিল। তাই তিনি স্থির করেছিলেন যে, সুধাংশুকে প্রথমে পাঠশালে পড়িয়ে নিজেই ঘরে সংস্কৃত পড়াবেন।

সুধাংশু আরও বড় হলো, তার পাঠশালের পড়া শেষ হ'ল। শিরোমণি মশাইয়ের কাজও এত বাড়লো যে, তাঁর আর পড়াবার অবকাশ হয়ে উঠা ভার হলো; কিন্তু তিনি তার ভিতরেও সময় কোরে নিয়ে ছেলেকে সংস্কৃত পড়াতে লাগ্‌লেন।

কিন্তু এই সময়ে একটা অভাবনীয় কাণ্ড ঘট্‌লো। একদিন শিরোমণি মশায়ের শ্যালীপতি হঠাৎ এসে তাঁর কুঁড়েঘরে উপস্থিত। তিনি স্কুলের ইন্‌স্পেক্টর, এই মহকুমায় সম্প্রতি বদলী হয়ে তদারকে বেরিয়ে এই গ্রামের স্কুল দেখ্‌তে এসেছেন। এসেই প্রথমে কুটুম্ব-বাড়ী উঠ্‌লেন। সুধাংশুকে দেখে তিনি মহা সন্তুষ্ট; শেষে এত ভালবেসে ফেল্‌লেন যে তাকে ইংরেজী স্কুলে দেবার জন্যে শিরোমণিকে মহা পীড়াপীড়ি আরম্ভ কর্‌লেন, বল্‌লেন,—"ভায়া, ওরে স্কুলে দাও।" শিরোমণি জিজ্ঞাসিলেন, "কেন?" শ্যালী-পতি বল্‌লেন, "পুরুতগিরি ক'রে কখনও কষ্ট ঘোচে না। আজ কাল কে না ছেলেকে ইংরাজী পড়তে দিচ্ছে? ইংরেজ রাজা, তার বিদ্যে না শিখ্‌লে মানুষ হবার যোটী নাই। এই দেখ না, দুর্গা ল' পাশ করে

জেলাকোর্টে বেরিয়ে, মাসে শতখানেক টাকা এরই মধ্যে ঘরে আন্‌ছে। আর বামুন পণ্ডিতরাও ত' আজ কাল ছেলেদের ইংরেজী শেখাচ্ছে, তা কেউ বা জানিয়ে, আর কেউ বা নল্‌চে আড়াল দিয়ে।"

শিরোমণি গম্ভীরভাবে বল্‌লেন, "যে শেখায়, সে শেখাক গে, আমি শেখাবো না।"

দুর্গানাথের পিতা ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে বল্‌লেন, "কেন, শেখালে জাত যায় না কি? বিদ্যে শিখ্‌লে জাত যায়, কোন্ শাস্ত্রে বলে? তা যদি হ'ত, তা হলে যুধিষ্ঠির ম্লেচ্ছভাষা বুঝ্‌তে পার্‌তেন না"

"জাত যাবার কথা হচ্ছে না। বামুনের ছেলের আদর্শ শাস্ত্রচর্চ্চা, ব্রহ্ম-জ্ঞানলাভের চেষ্টা। এতে ত্যাগ স্বীকার চাই। দরিদ্র ঋষিরাও ছিলেন, তবে জ্ঞানে নয়। আমার পুত্র দরিদ্র থেকে শাস্ত্রচর্চ্চা করে এই আমার ইচ্ছা।"

"বটে! তবে তুমি পূজোরিগিরি কর্‌ছো কেন? ওটা ত' পরের দাসত্ব, ব্রাহ্মণের আদর্শ নয়।"

"যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ব্রাহ্মণের বৃত্তি, শাস্ত্রমতে পূজারীর বৃত্তিতে দোষ নাই। আর যদিই আমার আদর্শ অবস্থাক্রমে মলিন হয়ে থাকে, পুত্রের আদর্শ মলিন কর্‌বো কেন?"

"দেখ ভায়া, শাস্ত্রের তর্ক অত জানিনি। তবে সহজ-বুদ্ধিতে তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেসা করি। আচ্ছা, এই যে তোমার বুকের রক্তের মত টোল, এই টোল পূজুরিগিরি ক'রে রাখ্‌তে পার্‌লে? কেন পার্‌লে না? অর্থাভাবেই ত'? দেশের লোকে তোমায় কি সাহায্য কর্‌লে? অর্থের অভাবে, গুণগ্রাহিতার অভাবে ছাত্রদের বিদ্যাদান করা—শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া তুলে দিলে, কত যথার্থ জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থী ছাত্র তোমার কাছে পড়্‌তে না পেয়ে অজ্ঞান অন্ধকারে রইলো। অথচ আজ যদি তোমার সামর্থ্য থাক্‌তো, অথবা দেশে গুণগ্রাহী সমর্থ লোক থাক্‌তো, তা হলে এই মনো-কষ্ট পেতে না। একেই ত দেশের লোকের শাস্ত্র-চর্চ্চার প্রবৃত্তি ক্রমে হ্রাস হচ্ছে, তার উপর যদি তোমার মত শাস্ত্রজ্ঞানী লোকে ক্ষমতার অভাবে শাস্ত্রশিক্ষাদান তুলে দিতে বাধ্য হয়, তা হলে সেটা দেশের পক্ষে মঙ্গল কি অমঙ্গল? তার চেয়ে এখনকার কালের উপযোগী হয়ে চল্‌লে ভাল হয় না কি?"

এই কথাবার্ত্তার পর শিরোমণি মহাশয়ের মনটা বিচলিত হয়ে উঠ্‌লো। তাঁর শ্যালীপতি চলে গেলে পর অনেক দিন তিনি এই কথাটা মনে তোলা-পাড়া কর্‌লেন। একটা ধারণা তিনি মন থেকে কিছুতেই দূর কর্‌তে পার্‌লেন না। ইংরেজী শিক্ষা যে বিকৃত শিক্ষা, এই ধারণা বাল্যকাল থেকে তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়েছিল। ইংরেজী শিক্ষাতে কেউ ত্যাগ স্বীকারে অভ্যস্ত হতে পারে না, অথবা সংযম অভ্যাস কর্‌তে পারে না, এইটাই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। ইংরেজী শিখ্‌লেই লোকে আরাম চায়, বাবুয়ানা চায়, ভোগে থাক্‌তে চায়,—এটা তিনি নিত্য প্রত্যক্ষ কর্‌ছেন। অথচ ত্যাগই যে ব্রাহ্মণের আদর্শ, এটা শাস্ত্রের ইঙ্গিত। কি করি, কি করি,—ব্রাহ্মণের মন বিষম সংশয়দোলায় দুল্‌তে লাগ্‌লো।

এমনই সময়ে এই অঞ্চলে সর্ব্বনেশে কলেরা রোগ দেখা দিলে। ঘরে ঘরে হাহাকার উঠ্‌লো। গরীব, দুঃখী, ভিখিরি, অতিথি পথে পড়ে মর্‌তে লাগলো। একদিন সকালে শিরোমণি ভিন্নগ্রাম থেকে পূজো সেরে ঘরে ফিরছেন, এমন সময়ে দেখলেন, পথের একটা গাছতলায় একটা বুড়ী পড়ে রয়েছে, আর তার পাশে মাটীতে হাটু গেড়ে ব'সে সাহেবী-পোষাক-পরা একটী বাঙ্গালী বাবু; নিকটেই পিঠে জিন পরান ঘোড়া দাঁড়িয়ে রয়েছে। বুড়ী জীর্ণা শীর্ণা, তার কোমরে কানি, গায় খড়ি উঠ্‌ছে, চোখে মুখে শ্লেষ্মার মল ঝরছে, টুপি ক'রে পাশের নয়াঞ্জুলী থেকে জল এনে বাবু তার চোখ মুখ ধুইয়ে পুঁছিয়ে দিচ্ছে। ঠিক সেই সময়ে শিরোমণির গ্রামের দিক থেকে তর্কালঙ্কার মহাশয় আসছিলেন। তাঁর পায়ের সাড়া পেয়ে বাবুটী মুখ তুলে চাইলে, পরে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "ঠাকুর, বল্‌তে পারেন, এটা কোন গাঁ, এখান থেকে সদরের হাসপাতাল কত দূর?"

তর্কালঙ্কার মহাশয় যথাযথ জবাব দিলে পর, বাবু বল্‌লে, "আমি জালাল-পুরে একটা ডাকে যাচ্ছিলুম, আমি ডাক্তার। পথে এই অনাথা বৃদ্ধাকে মড়ার মত পড়ে থাক্‌তে দেখে নামলুম। দেখছি, এর কলেরা হয়েছে, অসাড়ে মলত্যাগ করছে। একে হাসপাতালে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর্‌তে হবে। কাউকে দেখতে পাচ্ছিলুম না। আপনি বড্ড সময়ে এসে পড়েছেন। ধরুন দেখি, দুজনে তুলে ওকে ঘোড়ায় চাপিয়ে দিই, তার পর আমিও উঠে ওকে নিয়ে হাসপাতালে যাই।"

তর্কালঙ্কার দুই হাত পিছিয়ে গেলেন, তাঁর নাসিকা কুঞ্চিত হ'লো,

বল্‌লেন, "কি বলছো হে বাপু! তুমি ডাক্তার মানুষ, গু-মুত ঘাঁট্‌তে পার, মুচি মুর্দ্দফরাস বাচতে না পার; আমি অস্পৃশ্যকে ছোঁব! শুন্‌ছো হে শিরোমণি, বলে কি না, আমায় ঐ কাওরা মাগীকে ছুঁতে!"

ডাক্তার বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে তাঁর দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "অস্পৃশ্য! ওঃ হো, তাও বটে, আপনি যে বামুন পণ্ডিত! যাক্, মিছে সময় নষ্ট হচ্ছে, দেখি একাই চেষ্টা করে।"

তর্কালঙ্কার ডাক্তার বাবুর শেষ কথাটা শুনেছিলেন কি না সন্দেহ, তিনি পথের আর এক পাশ দিয়ে ডিঙ্গি মেরে মেরে, নাকে নামাবলী গুঁজে নিজের কাজে চলে গেলেন; এদিকে ডাক্তার বাবু বৃদ্ধার মল-মূত্র ধুইয়ে মুছিয়ে দিয়ে তাকে পাঁজাকোলা ক'রে তুল্‌তে গেলেন। হঠাৎ তাঁর পিছন থেকে ভারি গলায় আওয়াজ হ'ল, "বাবু, আমায় দিন, আমি একদিক ধর্‌ছি।" বলা বাহুল্য, আওয়াজ শিরোমণি মহাশয়ের।

ডাক্তার বাবু থম্‌কে দাঁড়ালেন, বিস্মিত হয়ে বল্‌লেন, "সে কি, আপনিও বামুন পণ্ডিত না? আপনি ছোঁবেন?"

শিরোমণি বল্‌লেন, "হাঁ বাবু, আমি ছোঁব। আমি বামুন বটে, তবে পণ্ডিত না।"

ডাক্তার বাবু হেসে বল্‌লেন, "আপনিই পণ্ডিত। আসুন ধরুন।" ডাক্তার বাবু বুড়ীকে নিয়ে চলে গেলেন।

(৪)

সুধাংশু স্কুলে ভর্ত্তি হয়েছে। ডাক্তার বাবুর সঙ্গে সাক্ষাতের পরদিনেই শিরোমণি মহাশয় সুধাংশুকে স্কুলে দিয়েছেন। গাঁয়ের লোকে আশ্চর্য্য হয়ে গেলো; কত কাণাঘুষো, কত চোখ ঠারাঠারি চল্‌লো। তর্কালঙ্কার মহাশয় একদিন সকলের সাক্ষাতেই বলে ফেল্‌লেন, "আরে, ওর কথা ছেড়ে দাও। পুজুরি আবার বামুন! তোমরাও যেমন, ছেলেকে উকীল মোক্তার করবে, গাড়ী জুড়ি চড়াবে। লোভ কি সামান্য বস্তু!" সম্প্রতি তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মধ্যমা কন্যার একটী ডিষ্ট্রিক্ট এন্‌জিনিয়ারের সঙ্গে বিবাহের কথা পাকাপাকি হয়ে গিয়েছিল, আর প্রথমা কন্যাটীও একটী নেকটাই-কলার আঁটা, ষ্টকিং-সু-পরা ডেলিপ্যাসেঞ্জার কেরাণী বাবুর হস্তে ন্যস্তা হয়েছিলেন। কন্যা দুটীর বিবাহের সম্পর্কে পাত্রদ্বয়ের ইংরেজী লেখাপড়া সম্বন্ধে কন্যাপক্ষ হ'তে বিশেষ রকম খোঁজ লওয়া হয়েছিল ব'লেই শুনা যায়।

সুধাংশু স্কুলে পড়্‌তে লাগ্‌লো। সুধাংশুর পিঠ থেকে দোলাই নেমে সার্ট উঠ্‌লো, খালি পায়ে সু চড়্‌লো। ক্রমে সুধাংশুর খাঁটী স্বদেশী বুলির মাঝে দুটো একটা ইংরেজী বুক্‌নি দেখা দিতে লাগ্‌লো। সুধাংশু ইতিহাস পড়ে ক্রমে বুঝ্‌তে শিখ্‌লে, এদেশটা গোড়ার দিকে একটু সভ্য ভব্য থাক্‌লেও মাঝে একবারে জাহান্নামে নেমেছিলো, এখন একটু সভ্য হবার চেষ্টা কর্‌ছে। সুধাংশু স্কুলে গিয়ে আরও শিখ্‌লে, খালি গায়ে খালি পায়ে থাকাটা দারুণ অসভ্যতা; আর শিখ্‌লে, ইংরেজী লেখাপড়াটাই লেখাপড়া, দেশী লেখাপড়া কিছুই নয়, মূর্খ পাড়াগেঁয়ে লোকেই ঐটে নিয়ে থাকে।

সুধাংশুর মনের অবস্থা যখন এই রকম, তখন সে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ ক'রে ফেল্‌লে। তখনকার কালে রাজধানী কলিকাতায় না গেলে পরীক্ষা দেওয়া হ'ত না, কাজেই এই পরীক্ষা উপলক্ষে শিরোমণি সুধাংশুকে কলিকাতায় এক নিকটাত্মীয়ের বাসায় পাঠাতে বাধ্য হয়েছিলেন। তারপর পাশের খবর বেরুলে সুধাংশুকে কলিকাতায় কালেজে পড়বার জন্য পাঠানো হ'ল। ওঃ, যাবার সময় সুধাংশুর যে কান্না। সে একদিনও মাকে ছেড়ে থাকে নি। পাছে তার মন উৎসাহহীন হয়, এই ভয়ে তার গর্ভধারিণী অতি কষ্টে সপ্তসমুদ্রের জল চোখের ভিতর চেপে রেখে শির চুম্বন ক'রে বিদায় দিলেন, কিন্তু সুধাংশু কান্না চেপে রাখ্‌তে পার্‌লে না। পিতামাতার মঙ্গলাশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ ক'রে সুধাংশু কলিকাতায় রওনা হ'ল।

শিরোমণির আত্মীয়টীর বাসা নেবুতলায়। সেখানে এক পুরুতের আড্ডা ছিল; আশে পাশে পূজা আচ্ছায় দরকার হলে এই ডিপো হতে পুরুত নিয়ে যেত। সুধাংশু সেইখানে থেকে কালেজে পড়তে লাগ্‌লো। পুরুতের আড্ডাতেও দেশের মত আলো-চালের ভাত আর ডাঁটা চচ্চড়ি। কিন্তু দেশে মায়ের হাতের সেই ডাঁটাচচ্চড়ি, আমের ঝোল বা ঘণ্ট দালনা অমৃতের মতলাগ্‌তো, এখানে সেই ডাঁটাচচ্চড়ি খেয়ে তার অরুচি ধর্‌লো। বিশেষতঃ, যখন সে সতীর্থদের নানাপ্রকার রসনা-তৃপ্তিকর দোকানের খাবার খেতে দেখ্‌তো, তখন সত্যই তার চিরাভ্যস্ত সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হতো। একটী ছেলের সঙ্গে তার বড় মিশামিশি হয়েছিল, সেও তার মত পাড়াগাঁর ছেলে, তবে বড়মানুষ। তার বাপ হরিনিবাস গ্রামের জমিদার। কলিকাতায় তাঁর মস্ত একটা বাড়ী ছিল। ছেলে সেখানে থেকে পড়তো। ছেলের জন্য তিনি বিস্তর দাস-দাসী রেখেছিলেন।

এই ছেলেটীর নাম প্রমোদকুমার। প্রমোদকুমারের গাড়ী চড়ে প্রমোদকুমারের বাসায় সুধাংশু প্রায় ছুটির পর যেত। সেখানে প্রথম প্রথম যেতে সে বড় নারাজ ছিল, কেন না, তার বড় লজ্জা করতো; কিন্তু প্রমোদ তার কোনও ওজর শুনতো না। ক্রমে সুধাংশু সেখানে গিয়ে চা খেতে অভ্যস্ত হ'ল; দোকানের মিষ্টান্ন হতে ক্রমে অন্যান্য খাদ্য তরকারি খেতেও তার আর বাধা রইল না। তবে তখনও সে মৎস্য মাংসে আজন্ম আস্থাহীন বলে শিগ্‌গীর আমিষাশী হতে পারলো না; অথবা প্রমোদের বাসায় অন্নাহারেও অভ্যস্ত হল না। কিন্তু প্রমোদের দেখাদেখি কেশবেশাদি প্রসাধনে সে ক্রমশঃ পরম যত্নবান হয়ে উঠ্‌তে লাগলো, সঙ্গীতচর্চ্চাতেও তার মন ঝুঁকে পড়লো। দুই একদিন প্রমোদের সঙ্গে থিয়েটার দেখ্‌তে যাওয়া বা জুগার্ডেনে বা বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াতে যাওয়া অথবা ইডেনগার্ডেনে ব্যাণ্ড শুন্‌তে বা গড়ের মাঠে ম্যাচ দেখ্‌তে যাওয়াটা ক্রমেই তার চরিত্রগত অভ্যাসে এসে পৌঁছিল।

এমনই সময়ে ৺ পূজার ছুটিতে সুধাংশু বাড়ী এল। বহুদিন বিচ্ছেদের পরে স্নেহময়ী জননীকে দেখ্‌বার জন্যে তার বড় মন টেনেছিল, তাই সে উধাও হয়ে বাড়ীমুখো ছুট্‌ছিল। প্রথম দুচার দিন তার বড় আনন্দে কাট্‌লো, সেই আনন্দে সে তার নবসংগৃহীত আরামপ্রিয়াসী জীবনের অভাব ও আকাঙ্ক্ষাজনিত বেদনা অনুভব করিতে পার্‌লো না! এবাড়ী ওবাড়ী বেড়িয়ে, এ পাড়া ওপাড়া টহল দিয়ে, মায়ের সঙ্গে গল্পগুজব করে, মাছ ধরে, নদীতে বাচ খেলে, সে সহরের সুখ-বিলাস ও আরামের কথা কতকটা ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগলো, ততই তার ভুক্ত সুখের স্মৃতিজনিত বর্ত্তমান অভাব আকাঙ্ক্ষা মনে জেগে উঠতে লাগলো। সকালে উঠে চা নাই, প্রাণটা তৃষ্ণায় টাহা টাহা করে; দুপুরে যা হোক তবু মার হাতের রান্নায় অমৃতের মত আস্বাদ পায় বটে, কিন্তু প্রাতে বা অপরাহ্নে কেবল মুড়ি আর নারিকেল লাড়ু; সে কচুরি সিঙ্গাড়াও নাই, সে হালুয়া সন্দেশ, বাদামতক্তি বা পেস্তার বরফিও নাই, সে আইসক্রিমও নাই, সে লিমনেড আইস নাই। আবার এখানে কেবল সেই একঘেয়ে রাঙ্গচিতার বেড়া ঘেরা ফুল ফলের বাগান বা ধানের ঢেউখেলানো মাঠ অথবা সেই আঁকা বাঁকা সূতার মত ষ্টীমার জাহাজহীন ক্ষুদ্র নদী। এখানে না আছে ইডেন গার্ডেন, না আছে থিয়েটার, না আছে পশুশালা; এখানে

আছে কেবল সেই একঘেয়ে মনসার ভাসান, আর আছে পাড়াগেঁয়ে অসভ্য ছেলেগুলোর ছেলকপাটী খেলা। দূর, দূর, ঝেঁটা মার, এখানে মানুষ থাকে! শুধু তাই, পুকুর পাড়ে জোঁক, ঘরে মশা, সকাল সন্ধ্যা বেঙের কটোর কটোর বা শিয়ালের হুক্কা হুয়া ডাক। আর আছে মামলা মোকদ্দমা, দলাদলি কিচকিচি আর পিলে জ্বরে কোঁকোঁ কাঁপুনি। এমন পাড়াগাঁর মুখে আগুন!

একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে সুধাংশু মহকুমার সদরবাজার থেকে এক টিন চা কিনে এনে হাজির। এনেই মাকে হুকুম, "মা, একটু জল গরম করে দাও দেখি চট করে।"

মা উৎকণ্ঠিত হয়ে বল্‌লেন, "কেন বাবা, গরম জল কেন, অসুখ বিসুখ কিছু করে নি ত'?"

সুধাংশু বিরক্ত হয়ে জবাব দিলে, "না না, অসুখ হতে যাবে কেন? তোমরা কিছুই জান না, সাধে কি বলে পাড়া গাঁয়ে! যাও, চট্ করে গরম জল এনে দাও, কেমন একটা মজার জিনিষ করবো দেখ এখন, খেলে শরীর জুড়িয়ে যাবে।"

চা প্রস্তুত হ'ল, সুধাংশু মহান তৃপ্তির সঙ্গে পান করলে, সুধাংশুর মা বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে তা দেখলেন, কিন্তু পুত্রের বার বার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সত্বেও তা স্পর্শ করলেন না।

শিরোমণি মহাশয় বাড়ী এসে সব শুনে ক্ষুণ্ণ হলেন, কিন্তু কিছু বল্‌লেন না। ব্রাহ্মণী যখন বল্‌লেন যে, সুধাংশু তাঁর নিষেধ বাক্য কাণে না তুলে বলেছে, "গাছের পাতা সিদ্ধ করে খেলে খৃষ্টান হয় কোন্ শাস্ত্রে বলেছে?" তখন শিরোমণি কেবল একটী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বল্‌লেন, "ভগবানের মনে যা আছে তাই হবে।"

আর একদিন সুধা মাকে বল্‌লে, "মা, মুড়ি আর ভাল লাগে না। কেবল মুড়ি আর মুড়ি," কেন, এক আধ দিন একটু হালুয়া কি দুখানা ফুলকো লুচি করে দাও না? ওঃ, পেমার বাড়ী রোজ হয়!"

মা জিজ্ঞাসিলেন, "পেমা কে সুধা? প্রায় তোর মুখে ঐ নামটা শুনতে পাই।"

ছেলে বলিল, "আঃ, পেমা কে, বলিনি? সে আমাদের সঙ্গে পড়ে। জান মা, মস্ত জমিদারের ছেলে, গাড়ী, জুড়ি, সরকার, দরোয়ান, কত কি!

এবার আমায় পূজোর সময় ওদের দেশে নিয়ে যাবার জন্যে বড় জেদাজিদি করেছিল, কেবল তোমার জন্যে বড্ড মন কেমন করতে লাগলো বলে গেলুম না।"

মাতার চক্ষু দুটী অশ্রুপূর্ণ হলো, তিনি পুত্রের সকল ত্রুটি বিচ্যুতির কথা ভুলে গেলেন, সস্নেহে পুত্রকে বুকের উপর টেনে নিয়ে শিরচুম্বন করলেন। কিন্তু পরে পুত্রের ঐ কথাটা বারবার তাঁর মনে উদয় হতে লাগলো আর তাঁর প্রাণটা একটা অনিশ্চিত আতঙ্কে কেঁপে উঠতে লাগলো। বড় লোকের ছেলের সঙ্গে দরিদ্র পূজারীর ছেলের মিলামিশা কেন? এতে কি মঙ্গল হবে?

স্বামীগতপ্রাণা রাত্রে সর্ব্বভয়নিবারণ স্বামীকে সকল ভয়ের কথা নিবেদন কর্‌লেন। শিরোমণি ক্ষণেক স্তম্ভিত হয়ে রইলেন, পরে বল্‌লেন, "যা সঙ্কল্প করে আরম্ভ করেছি, তা অসম্পূর্ণ রাখবো না। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য।"

(৫)

সুধাংশু কলকাতায় ফিরে এসেছে। এবার কলকাতায় রওনা হবার সময় তার মনটা বিশেষ কাঁদে নি। এবার তার দেশের এক মা ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে নি। সব জিনিষই যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা, সব তাতেই যেন অশান্তি, সব তাতেই যেন অসন্তোষ। কেবল মার কাছ ছাড়া হতে মনটা একটু চঞ্চল হয়েছিল মাত্র। কিন্তু সহরে পৌঁছে, ট্রামগাড়ীতে চড়ে, বাজারের বিকিকিনি দেখে, গাড়ীর গমগমানি শুনে, অবিরাম জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে থেকে তার মনের কোণে যা একটুখানি কষ্টের মেঘ ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছিল তাও কেটে গেল। এখন সুধাংশু কেবল আহারের সময়টা টোলে থাকে, বাকি সময়টা পড়তে যাবার ছুতো করে প্রমোদকুমারের বাসায় গিয়ে অথবা তার সঙ্গে ঘুরে ফিরে কাটিয়ে দেয়। এবার সুধাংশুর উন্নতিটা কিছু দ্রুত রকমের হতে লাগলো। সুধাংশুর আহার বিহারের বাছবিচারটা ক্রমেই আল্‌গা হয়ে আসতে লাগলো।

দেখতে দেখতে গ্রীষ্মের অবকাশ এলো। সুধাংশুর মা তার আশায় পথপানে চেয়ে কুটীরের দোরে প্রত্যহ অপেক্ষা কর্‌তে লাগলেন। ছুটির দু-তিন দিন পরে মেদিনীপুর জেলার এক গ্রামের ডাক-ঘরের ছাপ নিয়ে সুধাংশুর একখান চিঠি এলো। চিঠিতে সুধা লিখেছে যে, হঠাৎ ছুটির দিনে প্রমোদ তাকে জোর করে তাদের দেশে নিয়ে গেছে। অনেক দিন থেকেই

প্রমোদ তাকে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করছিল, পাছে বাড়ীতে খবর দিলে তাকে যেতে না দেওয়া হয়, এই জন্যে প্রমোদ তাকে বাড়ীতে আগে চিঠি লিখতেও দেয় নি। প্রমোদের দেশে এসে সে মহা আনন্দে আছে। ওঃ, কত বড় বাড়ী, কত বড় বাগান, কত বড় পুকুর, কেমন পাহাড়, কত লোক-লস্কর, কত হাতী ঘোড়া! রোজ পোলাও কালিয়া, রোজ হাতী চড়ে বেড়াতে যাওয়া, রোজ ঘোড়ায় চাপতে শেখা, রোজ তাস পাশা খেলা,—সে এক ঢালোয়া আমোদের ব্যাপার! যখন ছুটির পর তারা কলকাতা ফিরে এল, তখনও সে আরামের নেশায় সুধাংশু বিভোর হয়ে রইলো।

এর পর প্রমোদকুমার একটু বাড়াবাড়ি আরম্ভ করে দিলে। তার মাথার উপর কেউ ছিল না, অথচ চারপাশে মধুর লোভে মধুকরের মত মেলা মো-সাহেব ভন্ ভন্ করতো। তাদের পাল্লায় পড়ে আড্ডায় আড্ডায় গান শোনাও আরম্ভ হ'ল। প্রথম প্রথম সুধাংশুর এটা বড় বিশ্রী লাগ্‌লো, কিন্তু ক্রমে দুই একদিন যেতে যেতে আর ইয়ার বক্সীরা এটাকে নির্দ্দোষ আমোদ ব'লে বোঝাতে সেও এতে অভ্যস্ত হয়ে এলো। পরে এমনই দাঁড়াল যে, মাঝে মাঝে এমন করে গান শুনতে না পেলে তার প্রাণ হাঁপাত। আবার এমন ধারা গান শুনতে শুনতে যে-দোষ এসে থাকে, সে দোষও ধীরে ধীরে তাকে জড়িয়ে ধরতে লাগলো।

বেশ দিন কাটছিল। আমোদের নেশার মদিরায় যখন সুধাংশু এমনই বিভোর, যখন বাল্যের সেই স্নেহময়ী জননীর কোলে সংযমের শিক্ষা ও অভ্যাস স্বপ্নে দেখা গল্পের কথার মত মনের মাঝে কখনও কখনও ভেসে উঠতো মাত্র, ঠিক এমনই সময়ে একটা অভাবনীয় দৈবের ঘা খেয়ে সুধাংশুর স্বহস্ত-পোষিত আরামের চারাগাছটী মাটীতে শুয়ে পড়বার উপক্রম করলে। হঠাৎ সাত দিনের টাইফয়েড জ্বরে ভুগে প্রমোদকুমার মারা গেল। বড় লোকের ছেলে, চিকিৎসা বা সেবার ত্রুটি হ'ল না। দেশ থেকে প্রমোদের আত্মীয় স্বজন এলেন, তাঁরা বুক ফাটিয়ে ঠাকুর দেবতার নাম করে কত কাঁদলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না, মৃত্যু কারও কথা শুনলে না।

এইবার সুধাংশুর বড় কষ্ট আরম্ভ হ'ল। প্রথম দুই একদিন বন্ধুর শোকে সে নিজের আরামের অভাবের কথা ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগলো, যতই তার নিত্য আরামের অভাব বাড়তে লাগলো, ততই সে শোকের কথা ভুলে যেতে লাগলো, আর অর্থের অভাব অনুভব করতে

লাগলো। প্রমোদকুমার থাকিতেই সে ইতঃপূর্ব্বে নেবুতলার পূজারীর বাসা ছেড়ে প্রমোদের বাসায় এসে উঠেছিলো। এখন প্রমোদকুমারের মৃত্যুর পর সে বাসা ঘুচে গেল, অথচ নেবুতল'য় ফির্‌বার পথ রইলো না। সেখানকার ভটচাজ্জি ম্লেচ্ছভাবাপন্ন সুধাংশুর সংস্পর্শে থাকতে রাজী হলেন না। এটা যে কতকটা অভিমানে, তাতে আর সন্দেহ নাই, কেন না, যখন তিনি সুধার পিতাকে সুধার কথা খুলে লিখেছিলেন, তখন সুধার বাপ তাতে কোনও মতামত দেন নাই। এটা ভট্‌চাজ্জি ঠাকুরের বড় বেজেছিল। এখন সুধা একটা মেসে বা হোষ্টেলে থাকবার কথা লিখে পাঠালো, শিরোমণি মহাশয় তাকে টাকা পাঠিয়ে দিলেন, সুধাংশু মালপত্র নিয়ে একটা মেস বাড়ীতে উঠলো। সেখানে উৎকলদেশীয় ব্রাহ্মণ নামধারী জীব পাক করে এবং "ঝি" রূপ কলিকাতার একান্ত আবশ্যক পদার্থ জল তুলে, পান সাজে, মসলা পিষে; সুতরাং সুধাংশুর আর কোন ভাবনা চিন্তা রইল না।

(৬)

কিন্তু মেসে থাকাও দায়, খরচে কুলায় না। কোথা হতে কি প্রকারে বাপের নিকট হতে টাকা আসে, তা দেখবার বা বুঝবার সুধাংশুর আবশ্যক ছিল না, সে কেবল দেখতো, টাকা আসে কি না। তার নিজের ন্যায্য খরচ না হয় চল্‌তে পারে, কিন্তু আমোদের খরচ, আরামের খরচ, ইয়ার বক্সীর খরচ, মৌজের খরচ? এ সকল খরচের যোগান আসে কোথা হতে, না আস্‌লেও মান থাকে না। তবে কি দেশে পালান উচিত?

যখন সুধা অপরাহ্ণে মেসের ঘরে বসে এই সব কথা মনের মাঝে তোলা-পাড়া করছে, তখন ইয়ারেরা এসে হল্লা করে ঘরে ঢুক্‌লো এবং একজন তাকে দেখে বললে, "কি রে সুধা, গোমড়া মুখে বসে আছিস যে, বায়াস্কোপে যাবিনি?"

সুধা বিমর্ষবদনে বললে, "না ভাই, যাব না, তোমরা যাও।"

"বাঃ, তা কখনও হয়, কাল থেকে ঠিক রয়েছে। আর আজ ত তোর নিয়ে যাবার কথা। বা রে, তাই বুঝি ফাঁকি দেবার চেষ্টা হচ্ছে। তা হবে না, চলো বলছি।"

সুধাংশুর মুখ শুকাইল। বন্ধুলোকের এই টানাটানি, অথচ হাতে একটী কপর্দ্দকও নাই, এক্ষেত্রে মান থাকে কিরূপে! ইয়ার মহলে আর সব অপমান সহ্য করা যায়, কিন্তু অভাবের হেতু টিট্‌কারি বড় লাগে। সুধাংশু

কাতর নয়নে চারিদিকে তাকাইল, কিন্তু কাহারও মুখে সহানুভূতির চিহ্ন-মাত্র দেখিতে পাইল না। তবুও সে আমতা আমতা করে বল্‌লে, "ভাই, আজ আমায় রেহাই দে, মনটা আজ বড় খারাপ। কাল নিশ্চয় তোদের নিয়ে যাব।"

একজন ইয়ার নাছোড়বান্দা। সে বল্‌লে, "তা হবে না, আজই যেতে হবে। তোর হাতে রেস্ত না থাকে আজ আমি দিচ্ছি, কাল না হয় তুই শোধ করিস।"

যুবকের দল ছাড়্‌লো না, তাকে জোর কয়ে নিয়ে গেল। সেদিন বায়স্কোপ দেখ্‌তে, চা চুরুটে ও ট্রামে যাতায়াতে পাঁচ সাত টাকা খরচ হয়ে গেল। সুধাংশু রাত্রি ৯টার সময় বাসায় ফিরে এসে যখন নিজের তোরঙ্গ খুলে দেখলে, তখন সে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো। কি হবে, একটী পয়সাও যে তাতে নেই! কালই ইয়ার মহলের দেনা শোধ করতে হবে। শুধু তাই নয়, গেল মাসের মেসের দেনাও ঘাড়ে চেপেছে, অথচ বাড়ীর পাঠান টাকাও ফুরিয়েছে। টাকা! টাকা! কে টাকা দেবে! সুধাংশু কাল মুখ দেখাবে কি করে! সুধাংশুর যা আছে সব বিক্রি করলেও কি টাকা হবে না? সে সময়ে সুধাংশু পাঁচ সাতটা টাকার জন্যে যে করে হন্যে হয়ে ঘরের মাঝে ছুটোছুটি করছিলো, বোধ হয় কবি সেক্সপিয়ারের তৃতীয় রিচার্ড A horse, a horse, my Kingdom for a horse ব'লে তেমন করে ছুটোছুটি করে নি।

হঠাৎ সুধাংশুর মগজে একটা বুদ্ধি গজিয়ে উঠলো। কেন, অবনী ত' বলে, মাঝে মাঝে হকারকে বই বিক্রি করে সে টাকা যোগাড় করে। সেই রকম করলে হয় না? ডিক্সনারীখানা আর দুই একখানা সাহিত্য ও ইতিহাসের বই বিক্রি করলে দশ পনরো টাকা হবে এখন। সুধাংশু সেই রাত্রেই বই বগলে করে কলেজষ্ট্রীটে দৌড়োয় আর কি! মনে পড়লো, এত রাত্রে বইয়ের দোকান বন্ধ, সকালে যাওয়াই ঠিক। সুধাংশু সঙ্কল্প এঁটে সে রাত্রির মত শুয়ে পড়লো।

পরদিন প্রাতে সুধাংশু বই বগলে পুরাণ কেতাবওয়ালাদের দোকানে ঘুরে ঘুরে ৫৲ টাকার বেশী সংগ্রহ কর্‌তে পার্‌লে না। সে ক্ষুণ্নমনে ইয়ারের ঋণ পরিশোধ করে যেমন বাসায় পা দিয়েছে, অমনই মতিবাবু (মেনেজার) মুখ বিকৃত করে বলে উঠলেন, "কি হে বাবু, এ রকম লুকোচুরি ভাঁড়াভাড়ি

কতদিন চল্‌বে? গেল মাসের আবার পাওনা এখনও কিছু বাকি রয়েছে। আবার গেল মাসের পুরোটাই পড়ে রয়েছে। হয় টাকা দাও, না হয় অন্য মেস দেখগে। কাল টাকা না পেলে, তোমার তোরঙ্গ বিছানা বেচে নেবো; এটা জেনে রেখো।" মতিবাবু এই কথা বলেই রাগে গন্ গন্ কর্‌তে কর্‌তে আফিষ চলে গেলেন।

সুধাংশু এসে বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো, তার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়্‌তে লাগলো, বুকখানাও মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌তে লাগলো। তখন বাসার সকলে আফিষ চলে গেছে, কেবল স্কুলের ছুটি বলে আরও দুটী ছেলে পাশের ঘরে রয়েছে। সুধাংশুকে মেসের ঝি খেতে ডাক্‌লে, সুধাংশু বললে, খাবো না, মাথা ধরেছে। ঝি বামুন মুখে গজ্‌ গজ্‌ কর্‌তে কর্‌তে কিন্তু প্রাণে এক গাল হেসে অন্নব্যঞ্জনের ঝোড়াটা আরও ভারি করে আপনাদের বাসায় চলে গেলো।

সুধাংশু বিছানায় শুয়ে প'ড়ে আকাশ পাতাল ভাব্‌তে লাগলো। সে যদি গরীবের ঘরে না জন্মাতো, তা হলে এ অপমান সইতে হ'ত না। গরীবেরা বিয়ে করে কেন? ইংরাজী কেতাবে আছে, গরীবের বিয়ে করা পাপ। তার বাপ পুজুরী বামুন, সে বিয়ে করে কোন সাহসে? তার জন্ম তা না হলে ত হ'ত না। এ পাপ তার বাপ-মা কর্‌লে কেন? যদি ছেলেকে সুখেই না রাখ্‌তে পারবি, তা' হলে ছেলের বাপ মা হয়েছিস কেন? সুশীল, সন্তোষ, ধীরেন, এরা কেমন সুখে আছে, কোনও অভাব এদের নাই। আমারই বা কেন হয়, আমিও ওদের মত বাপ-মার ছেলে। যত দোষ গরীব বাপ মার। পড়্‌তে পাঠাবি সহরে, অথচ সহরের খরচ যোগাবি নি, এ কেমন কথা!

ভাবিতে ভাবিতে সুধাংশুর মনে বাপ-মায়ের প্রতি বিজাতীয় ক্রোধ হইল। সে মনে স্থির করিল, বাপ-মায়ের পাপে যার জন্ম, সে পাপাচরণ কর্‌লে তার দোষ হবে না। তার দরকারের জন্য টাকার আবশ্যক হলে সে কেন চুরি-চামারী, জাল-জুয়োচুরি কর্‌বে না? তাদের দলের অনেক ছেলেই ত করে। অবনী বলছিল, সে সুযোগ পেলেই বাপের পকেট হাত-ড়ায়, মায়ের বাক্সে পরচাবী লাগায়। তবে সেই বা কি অপরাধ কর্‌লে? না, আর দু-মনা হওয়া হবে না। যেমন করে হ'ক, সক্ মেটাবার টাকা জোগাড় কর্‌তেই হবে।

অপরাহ্ণে সুধাংশু গোলদিঘীতে বেড়াতে গেলো। কত স্কুল-কলেজের ছেলে হাসিমুখে সেখানে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। তাদের কতই সুখ! সবাই হেসে হেসে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছে। একা সুধাংশুই দুঃখী। সুধাংশু তিষ্ঠিতে পারলো না, একটা উৎকট সঙ্কল্প ক'রে গোলদিঘী থেকে বেরিয়ে পড়লো। আচ্ছা, পেমাদের বাড়ী গেলে হয় না? সেখানকার লোকজন সবাই আমায় চেনে। পেমার ছোট ভায়েরা এখানে থেকে পড়ছে, তাদের পড়াবার ছুতা ক'রে গেলে কেউ সন্দেহ করবে না, বুড়ো সরকার মশাই ত নয়ই। পড়্বার ঘরে সেক্রেটেরিয়েটের টানায় দশ বিশ টাকা অমন ছড়ানই থাকে। তার ডুপ্লিকেট চাবীও আমার কাছে আছে, পেমা আমায় দিয়েছিল। দেখি না ভাগ্য-পরীক্ষা করে।

সুধাংশু দ্রুতগতি চল্তে লাগলো। কিন্তু প্রমোদকুমারদের বাটীর কাছে এসে তার পা কেমন অবশ হয়ে আস্তে লাগলো, যেন চলে না। এ কি! এমন হয় কেন? মনটা কেমন করছে! দূর হ'ক, ওসব দুর্ব্বলতা। সুধাংশু সাহসে ভর ক'রে বাড়ী ঢুকলো। দরোয়ান চাকর সরকার মশাই সবাই খুব খাতির করে ছেলেদের কাছে নিয়ে গেলো।

তখন সন্ধ্যার আঁধার সবে নেমে আসছে। ছেলেরা গাড়ী করে গড়ের মাঠে বেড়াতে গেছে, এখনই ফিরে আসবে, সুধাংশুবাবু একটু অপেক্ষা করবেন কি? সুধাংশু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে, কথা মুখ দিয়ে বেরুলো না, কি জানি কেন কণ্ঠ তার বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এসেছিল, শরীরটা কাঁপছিল। সে একখানা চৌকিতে বসে পড়লো।

সরকার মশাই তাঁকে বসিয়ে নিচে গেলেন। সুধাংশুর শরীরের কাঁপুনি আরও বাড়লো। কিন্তু সে অল্পক্ষণ। ছি, ছি, ছি! কি দুর্ব্বলতা! সে না মানুষ, সে না একটা সঙ্কল্প করে এসেছে! যাই উপযুক্ত অবসর এসেছে, অমনই মিথ্যা আশঙ্কায় সে অবসন্ন হয়ে পড়্ছে, ধিক তাকে!

সুধাংশু চৌকি ছেড়ে উঠলো। তার পা কাঁপছিলো, কিন্তু সে ধীরে ধীরে এক পা, এক পা গুটি গুটি এগিয়ে, সেক্রেটেরিয়েট টেবিলের সান্নিধ্যে উপস্থিত হলো, কম্পিত হস্তে চাবী বার করলে, চাবী লাগিয়ে কলে পাক দিলে, টানা খুলে ফেল্লে। এ সব সে যেন ঘুম-ঘোরে স্বপ্নে করে যাচ্ছিল, হঠাৎ চক্‌চকে টাকা দেখে ঘোর কেটে গেল। টাকা দেখে তার মাথা ঘুরে গেল। সে সমস্ত ভুলে গিয়ে সাগ্রহে মুঠো করে টাকা বার করে নিলে।

সেই মুহূর্ত্তে সাঁজের শাঁখ বেজে উঠলো। কাছেই রাধাগোবিন্দের ঠাকুরবাড়ী, সেইখানে একটী শাঁখ বেজে উঠতেই পাড়ার সর্ব্বত্রই হিন্দু-গৃহস্থের ঘরে অসংখ্য শঙ্খধ্বনিত হয়ে উঠলো।

অমনই ঝন্‌ঝন্ করে সুধাংশুর হাত থেকে টাকা কটা পড়ে গেলো, সুধাংশু কি জানি কোন অন্তর্নিহিত শক্তির বলে ভূতলে নতজানু হয়ে বসে পড়লো, আপনা আপনি তার হাত দুটী জুড়ে এলো, সে নতমস্তকে জোড়হস্তে সন্ধ্যা-দেবতাকে প্রণাম করলে, তার চোখ দিয়ে জলধারা গড়িয়ে পড়লো। মুহূর্ত্ত পরে সে চোখ মেলেই দেখ্লে সম্মুখে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ সরকার মহাশয়। তাঁকে দেখেই সে ডুক্‌রে কেঁদে উঠে বল্লে, "না না, সরকার মশাই, আমি চুরি করি নি, চুরি করতে গিয়ে আমি তুলসীতলায় সাঁজের আলো হাতে মাকে দেখেছি, আমায় মার কাছে নিয়ে চলো।"

সুধাংশু মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলো। সকলে ধরাধরি করে তাকে তুলে শুইয়ে দিলে।

(৭)

তারপর যখন সুধাংশুর চৈতন্য হ'ল তখন সে প্রথম চোখ মেলেই দেখ্লে, পৃথিবীর সমস্ত করুণা আর স্নেহমাখা তার মায়ের চোখ দুটী তার মুখের উপর স্থিরদৃষ্টি হয়ে রয়েছে, তার মা তাকে দশভুজার মত কোলে করে বসে আছেন! আর জানালার ফাঁক দিয়ে সে দেখ্তে পেলে, খালের ওপারে রাঙ্গা উষার রাঙ্গা আলোয় নেয়ে সবুজ ধানের শিষগুলো ভোরের বাতাসে মাথা নাড়্ছে, আর হেলে দুলে তাকে ডাক্‌ছে। এ কি! সে কোথায়? এই ত তাদের দেশের সেই খাল, যার জলে প্রভাতের কিরণ চিক্ চিক্ করে গলিত রৌপ্যের ধারার মত দেখায়; এই ত তাদের সেই মেটে ঘর, যার উঠানে সিঁদুর পড়লে তুলে নেওয়া যায়; এই ত সেই মা! যাঁর মুখে সাঁজের বেলায় শাঁখের বাজনা শুনে সে তুলসীতলায় নতজানু হয়ে ঘরের ঠাকুরকে কত প্রণাম করেছে, সেই মা, যে মা গায়ে ধুলো লাগলে আঁচলে মুছে দিয়ে মুখে কত চুমো খেয়েছে, সেই মা ক্ষুধা পেলে যে খাইয়েছে, অসুখ হলে যে বুকে করে রেখেছে; আর আজ বড় হয়েও কি সে সেই মায়ের কালে শুয়ে রয়েছে? তবে কি তার কোনও অসুখ করেছে?

সুধাংশুর মাথাটা বন্‌বন্ করে ঘুরে গেল। সে চোখ বুজে কিছুক্ষণ

পড়ে রইল। চোখ চেয়েই সে মাকে জড়িয়ে ধরে কান্নার সুরে বল্‌লে, "মা, মা, আর যাব না। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরেছি, তোর কোল ছাড়া করে আর কোথাও পাঠাস নি মা!"

নিরাশে।

সঙ্গীতাচার্য্য,—শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ স্বরসতী বিরচিত।

আমি তাহার লাগিয়া, রয়েছি জাগিয়া
কত কত নিশিরে—
মোর মরম অশ্রু ফুটিয়া উঠেছে
আঁখি-পাতে শিশিরে!
হায় আসিবে বলিয়া গেল সে চলিয়া
আর যাই এল সে!
মোর জীবন-লতিকা লুটায়ে পড়িল
হতাশের আলসে!
আমি ফুলের মতন, নীরবে ফুটিয়া,
আছি চাহি নীরবে
হায় সে যদি না আসে বৃথা এ জনম
সকলি বৃথা হবে!
আমি সাজায়েছি তনু কুসুমের সাজে
হায় তার লাগিয়া।
মোর বৃথায় এ সাজ এ মরমে বাজ
অনলে দহে হিয়া!
হায় রহি রহি পিক কুহরিয়া উঠি
কি কথা কহি কারে।
ওই উড়ে চলে গেল, প্রাণ লয়ে মোর,
কোথায় কোন্ পারে।
হায় মৃদুল অনিল, এসে মোর কানে,
কি কথা গেল কহি!

আমি বুঝিতে নারিনু, তার সেই কথা,
মরম গেল দহি!
মোর যৌবন-ফুল, হতাশে শুকায়ে,
ঝরিছে পলে পলে!
মোর জনম সফল, হইত ঝরিলে,
তাহার পদতলে!
যদি ফিরে পাই তায়, আবার হেথায়,
পাই তার দরশে!
মোর যৌবন ফিরে, আসিবে না আর,
হাসিবে না হরষে!
আমি এখনো রয়েছি, তার পথ চাহি,
তার মুখ স্মরিয়া।
হায় সে যদি না আসে, মরণে পাঠায়ে,
নিক মোরে হরিয়া!

উচ্ছৃঙ্খল।

লেখক,—শ্রীডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি।

ভাবি নাই ভাবিব না থাকিতে জীবন।
ভেবে ব'ল কিবা ফল হইবে সাধন॥
চিন্তাহীন লক্ষ্যহীন, বহিয়া বহিয়া
নয়ন যে দিকে যায় যাইব ছুটিয়া॥
পথে যাহা পাব আমি তাই তুলে লব
যতনে আদর করি অঙ্কে পরশিব॥
হয় যদি সেই বস্তু সুধার আধার।
আকণ্ঠ পূরিয়া তাহা করিব আহার॥
হয় যদি সে রতন কালকূট সার।
তাহাও করিব পান না করি বিচার॥

সংযম জীবের ধর্ম্ম শিখিনি কখন।
সংযমে আমার যোগ হবে না সাধন॥
উচ্ছৃঙ্খল অসংযম হইয়া মিলিত।
করিয়াছে অভাগার জীবন গঠিত॥
এই পথে মোর সিদ্ধি অন্য পথে নয়।
অন্য পথে আমি সিদ্ধ হব না নিশ্চয়॥
যখন জীবনে মোর আসিবে জোয়ার।
আকণ্ঠ ভরিয়া সুধা করিব আহার॥
যেন সে নেশার ঝোঁকে শেষ কয় দিন।
বয়ে যায় অবহেলে দুঃখ দৈন্য হীন॥
কিন্তু দেব!
আমার এ অসংযম এক কার্য্যে নয়।
বিরাজিত এই গুণ সর্ব্ব কার্য্যময়॥
তব নামে যবে আমি হই গো বিভোর।
তখনো টুটিয়া যায় সংযমের ডোর॥
কভু তোমা বক্ষে ধরি কভু পিঠ 'পরে।
কভু আমি স্থাপি তোমা হৃদয় মাঝারে॥
কভু বা নেহারি তোমা মানস-নয়নে।
আস্ন পাতি বসি কভু তোমার সদনে॥
কভু পদরেণু তব মাখি সর্ব্বগায়।
পুলক পলকে মোর শরীর ভাসায়॥
কভু বা শতেক চুমা দানিয়া বদনে।
করে দেই রেখাঙ্কিত নেশার স্বপনে॥
এত করি মন, তবু শান্তি নাহি পায়।
যত ভালবাসি তত বাসিবারে চায়॥
সংযমে যোগের সিদ্ধি সে আমার নয়।
অসংযমে মোর সিদ্ধি হইবে নিশ্চয়॥

সমালোচনা।

ওলট-পালট।—শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত, শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত; মূল্য ছয় আনামাত্র।

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের শিষ্য অবিনাশবাবু সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী নাট্যকার মলিয়ারের "Le Marriage Force" পুস্তক অবলম্বনে এই সামাজিক রঙ্গ-নাট্যখানি রচনা করিয়াছেন। লেখক তাঁহার পিতৃকল্প গুরুদেব স্বর্গীয় মহাকবি গিরিশচন্দ্রের আশীর্ব্বাদে তাঁহারই পথানুসরণ করিয়া নাট্যসাহিত্যে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠালাভ করিবেন, এরূপ অনুমান করা যায়। আমরা "ওলোট-পালোট" কৌতূহলোদ্দীপক রঙ্গনাট্যখানি পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিলাম।

জ্যোতিষ-রহস্য।—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার জ্যোতির্ভূষণ ভট্টাচার্য্য এফ, টি, এস, প্রণীত ও কলিকাতা জ্যোতিষগণনা কার্য্যালয়, ৩৭০।২।১ নং অপার চিৎপুর রোড, জোড়াসাঁকো হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই আনামাত্র।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকে গ্রন্থকার কোষ্টিগণনার উদ্দেশ্য কি ?, তাহা বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিয়াছেন। জ্যোতিষ যে অতি প্রাচীন শাস্ত্র তাহা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন; তবে জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তির যে বর্ত্তমান সময়ে একান্ত অভাব, পরীক্ষা ক্ষেত্রে অনেকেই তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া হতাশ হইয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থকার কিরূপ সুদক্ষ তাহা আমরা পরীক্ষা করিবার সৌভাগ্য লাভ করি নাই, তবে বর্ত্তমান জ্যোতিষ-রহস্য ক্ষুদ্র পুস্তকের পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা পাঠ করিয়া অনুমান করা যায়, গ্রন্থকার জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং মানব-জীবনের শুভাশুভ প্রত্যক্ষফলপ্রদ জ্যোতিষশাস্ত্রের সাহায্যে ব্যক্ত করিতে অক্ষম নহেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে মানব-জীবনে ভাগ্য-গণনার আবশ্যকতা ও উদ্দেশ্য কি বুঝিতে পারিবেন।

অন্ধের চক্ষুদান।—শ্রীধাম বৃন্দাবন শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের সম্পাদক

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বলহরি দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ভক্তজনকিঙ্কর শ্রীরামদাস দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

এই পুস্তকখানি বর্ত্তমান সময়োপযোগী হইয়াছে। সনাতন বৈষ্ণব শাস্ত্রানুমোদিত অনেক জটিল বিষয় এই পুস্তকে মীমাংসিত হইয়াছে। অন্ধের কথা, জীবের ভবব্যাধি, অজ্ঞানের কথা, ব্যাধির ঔষধ, গুরুতত্ত্ব, বৈষ্ণবতত্ত্ব, ভগবত্তত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব, বিধি ও রাগমার্গ বিচার, চক্ষুর উন্মীলন বিমল চক্ষে দর্শনানুভূতি, রোগের শান্তি, সুমাধুর্য্য, লীলাস্বাদন, দিব্যচক্ষু, সার দর্শন প্রভৃতি অন্তরে বাহিরে কিরূপে শনৈঃ শনৈঃ ভগবৎ প্রেমভক্তি বিষয়ক শিক্ষালাভ করা যায়, গ্রন্থকার তাহারই আলোচনা করিয়াছেন। এই পুস্তক পাঠে বৈষ্ণবতত্ত্ব জিজ্ঞাসুদিগের প্রভূত উপকার হইবে।

প্রাপ্তি স্বীকার।

কামিনীরঞ্জন জর্দ্দা।— নং হ্যারিসন রোড হইতে বাদলরাম লছমী নারায়ণ উক্ত এক শিশি জর্দ্দা আমাদের উপহার দিয়াছেন। পানের সহিত প্রত্যহ ব্যবহার করিলে সৌগন্ধে প্রাণে স্ফূর্ত্তি আইসে, মনের অবসাদ চলিয়া যায়, মুখের দুর্গন্ধ দূর করিয়া দন্তপীড়ার উপশম হয়। "কামিনীরঞ্জন" উপাদেয় জর্দ্দা ব্যবহার করিয়া আমরা পরমপ্রীতিলাভ করিয়াছি। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আট আনা মাত্র।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

২৬ বর্ষ, ১৩২৭ সাল, পৌষ। ৯ম সংখ্যা।

মাতৃহীন।

লেখক,—শ্রীযুক্ত অসিতমোহন ঘোষ হাজরা বি-এ।

(১)

জ্ঞান হইয়া নরেন যে দিন প্রথম জানিতে পারিল যে, সে আশৈশব মাতৃহীন, সেই দিন সে যেন কেমন একপ্রকার হইয়া গেল। সে সর্ব্বদা বন্ধুবান্ধবের সহিত মিলিয়া মিশিয়া হাস্য-পরিহাসে সুখময় বাল্যজীবনের মধুর দিনগুলি অতিবাহিত করিত, সহসা তাহাকে নির্জ্জনে গম্ভীরভাবে থাকিতে দেখিয়া, অনেকে অনেক কথা বলিতে আরম্ভ করিল।

সহপাঠীরা বলিল, "নরেন ক্লাশে ভাল পড়াশুনা করে বলিয়া তাহার অহঙ্কার হইয়াছে।" বয়স্থেরা বলিল, "তাহার মাথা খারাপ হইয়াছে।" আত্মীয়েরা বলিল, "তাহার সংসার-চিন্তা আসিয়াছে।" নরেন্দ্রের মাথা সত্য সত্যই খারাপ হইয়াছিল কি না তাহা আমরা বলিতে পারি না, তবে সংসারের প্রতি যে তাহার কোন আস্থা ছিল না, তাহা আমরা তাহার কাজকর্ম্ম হইতে বেশ জানিতে পারিয়াছি।

নরেন্দ্রের সংসারে তাহার বিমাতা ও তাহার দুই বড় ভাই ব্যতীত আর কেহই ছিল না। বড় ভাই দুইজনেই পরিণীত, কিন্তু নরেন্দ্র অবিবাহিত। সে ইচ্ছা করিয়াই বিবাহ করে নাই। রোজগার না করিয়া বিবাহ করিবে না বলিয়া সে ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়াছিল। অনেক কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা আসিয়া বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। নরেন্দ্র কোন মতেই বিবাহ করিতে রাজী হইল না।

একদিন নরেন্দ্রের সংসারের অবস্থা বেশ ভালই ছিল, কিন্তু কালের অপ্রতিহত প্রভাবে তাহাদের দৈন্যদশা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

নরেন বেশ ভাস পড়াশুনা করিত, সে কারণ তাহার ভ্রাতারা বড় আশা করিত যে, নরেন যদি কোনকালে লেখা পড়া শিখিয়া মানুষ হইতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের দুঃখের অনেক লাঘব হইবে।

নরেন্দ্র লেখাপড়া করিত, পড়িতে তাহার ভাল লাগিত বলিয়া। লেখা-পড়া শিখিয়া যে চাকুরী করিতে হইবে, এ চিন্তা তাহার মনের মধ্যে এক দিনের জন্যও উদিত হয় নাই।

তাহার ভ্রাতারা তাহার অন্তরের কথা, তাহার মর্ম্মের ব্যথা বুঝিত না বলিয়া তাহার সম্বন্ধে এক ভ্রান্ত ধারণা করিয়া রাখিয়াছিল। তাহাদের সেই ভ্রান্তধারণা, সেই দিন দূরীভূত হইল, যে দিন নরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধি গ্রহণ করিয়া সংসারের দারুণ অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন রহিল। নরেন্দ্র অবস্থাহীন ঘরের ছেলে। নিজের ক্ষমতায় ও চেষ্টায় সে বি-এ, পাশ করিল। এম-এ, পড়িবার সে কোনরূপ সুযোগ পাইল না, তাই বাধ্য হইয়া তাহাকে সে আশা ত্যাগ করিতে হইল।

অর্থাভাবে নরেন্দ্র কলেজের পাঠত্যাগ করিতে বাধ্য হইল বটে, কিন্তু তাই বলিয়া পুস্তকের সহিত একেবারে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিল না। অর্থোপার্জ্জনের জন্য বৃথা ছুটাছুটি না করিয়া সংসারের জনকোলাহল হইতে নিজেকে দূরে রাখিবার অভিপ্রায়ে, সে গৃহে বসিয়া নানাবিধ সদ্‌গ্রন্থ পাঠে মনোযোগ দিল। সংসারের প্রতি তাহার অদ্ভুত ঔদাস্য দেখিয়া, তাহার ভ্রাতারা বিশেষ বিরক্ত হইত। সময়ে সময়ে তাহারা তাহাকে দুই চারিটা কটুকথা বলিতেও কুণ্ঠা বোধ করিত না। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ তাহাতে কোন ভ্রুক্ষেপই করিত না; সে নিয়ত আপনার চিন্তায় আপনি বিভোর হইয়া রহিত।

আহার-বিহার বা বেশভূষায় তাহার কোন লক্ষ্যই ছিল না। যদি তাহাকে কোন দিন কেহ স্নান বা আহার করিতে না ডাকিত, তাহা হইলে সে দিন সে স্নানাহার পর্য্যন্ত করিতে ভুলিয়া যাইত। বাটীস্থ লোকে ক্রমশঃ তাহার প্রতি এত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহাকে আর কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিত না। সে খাইল কি না খাইল তাহার কেহ খবর লইত না, সে কারণ অনেকদিন নরেন্দ্রনাথকে উপবাসী থাকিতে হইত। এত অবজ্ঞা, এত অবহেলাতেও কিন্তু তাহার কোন দুঃখ কষ্ট হইত না।

ইহাতেও যখন নরেন্দ্রকে তাহারা জব্দ করিতে পারিল না, তখন বাটীস্থ সকলেই তাহার উপর নানাবিধ অসহনীয় অত্যাচার আরম্ভ করিল। অত্যাচারের মাত্রা ক্রমশঃ এত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যে, অবশেষে নরেন্দ্রনাথ আর গৃহে তিষ্ঠিতে পারিল না। সে মনে মনে ভাবিল, "মাতৃহীন হওয়া অপেক্ষা মহাপাতক বুঝি সংসারে আর কিছু নাই। সংসারে যার মা নাই, তাহার কেহই নাই" এই ভাবিয়া একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় সে সমুদায় গ্রন্থাবলী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসাপত্রগুলি অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করিয়া দিল। তারপর অনন্ত আকাশের দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ জন্মের মত মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া গেল। স্বার্থপর সংসার মাতৃহীনের হৃদয়ের ব্যথা অনুভব করিল না, তাই তাহার কোন সন্ধান হইল না।

(২)

বিলাসপুরের নিশিকান্ত রায় কলিকাতায় কোন সওদাগরের অফিসে চাকুরী করিতেন। সংসারে তিনি, তাঁহার পত্নী মোক্ষদাসুন্দরী ও তাঁহাদের একমাত্র পুত্র অভয় ছাড়া তাঁহার আর কেহই ছিল না।

এই জন্য নিশিকান্তবাবু বিলাসপুরের পৈত্রিক বিষয়-সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া কলিকাতায় একখানি ছোট রকম বাড়ী খরিদ করিয়া আজীবন সেই স্থানেই বাস করিতেন। তদীয় পুত্র অভয়পদ রায় যখন ওকালতী করিয়া বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতেছিলেন, সেই সময় নিশিকান্তবাবু সংসারের সমস্ত দেনা পাওনা কড়ায় গণ্ডায় মিটাইয়া দিয়া কোন এক অজানা দেশে চলিয়া গেলেন। অভয়পদ রায় পিতৃশোকে নিতান্ত আকুল হইয়া কিছু দিন সংসারে উদাসীন রহিলেন; তারপর বিধবা মাতার একান্ত অনুরোধে তিনি ১ বৎসর পরে একটী পরমাসুন্দরী কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া পরমসুখে দিনযাপন করিতে আরম্ভ করিলেন।

অভয়বাবুর এত সুখ বিধাতার সহ্য হইল না। তাই দুই বৎসর মধ্যে তাঁহার গুণবতী ভার্য্যা একটী ৬ মাসের কন্যাসন্তান রাখিয়া পরলোকগমন করিলেন। তাঁহার কিছু দিন পরে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেবলমাত্র মাতার অনুরোধে অভয়বাবু পুনরায় দারপরিগ্রহ করিলেন। এখন অভয়বাবুর দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী মনোরমাই একমাত্র সংসারের কর্ত্রী। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন অভয় বাবুর মাতৃহীনা কন্যা সুরমার বয়স ১২ বৎসর এবং মনোরমার একমাত্র কন্যা লীলাবালার বয়স ৮ বৎসর।

DIFFERENT CONTRAST

অভয়বাবু ওকালতি করিয়া প্রভূত অর্থ অর্জ্জন করিতেন, মনোরমা স্বামীর উপার্জ্জনের সমস্ত টাকাই নিজের হস্তে লইয়া ব্যয় করিতেন। মনোরমা চারিধারে অনেক বাজে খরচ করিতেন কিন্তু দশমী বা দ্বাদশীর দিন শাশুড়ীর জন্য এক পয়সার জলখাবার আনিবার প্রয়োজন হইলে তাঁহার পয়সার অভাব হইত। বাস্তবিক মনোরমার কথাবার্ত্তায় ও কাজেকর্ম্মে এমন একটা ভাব মিশ্রিত থাকিত, যাহাতে বোধ হইত, মোক্ষদাসুন্দরী তাঁহার চোখে এক-জন সামান্য দাসীমাত্র।

স্বর্গাদপি গরিয়সী জননীর প্রতি রূপগর্ব্বিতা, দাম্ভিকা পত্নীর ঈদৃশী অবজ্ঞা ও অবহেলা অভয়বাবু লক্ষ্য করিতেন না, অথবা তিনি ইচ্ছা করিয়াই তাহা দেখিতেন না।

মোক্ষদা সুন্দরীর ইহাতে কিন্তু কোন দুঃখ কষ্ট ছিল না। তিনি বুঝিতেন যে, যেদিন তিনি সিঁথীর সিন্দুর, হাতের নোয়া যমের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন, সেই দিন হইতে তাঁহার খাওয়া পরার অবসান হইয়াছে।

তবে তাঁহার অহঃরহ বিরহকাতর হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত লাগিত মাতৃহীনা অনাদৃতা বালিকা সুরমার জন্য। মনোরমা সপত্নী কন্যা সুরমাকে দুটী চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। উঠিতে বসিতে, খাইতে শুইতে, তিনি তাহাকে তীব্র ভৎর্সনা করিতেন; এমন কি, সময়ে সময়ে প্রহার পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিতা হইতেন না। মনোরমার উপর মোক্ষদাসুন্দরীরও কোন কথা বলিবার শক্তি ছিল না। সুতরাং বিমাতার সকল প্রকার পাশবিক অত্যাচার সুরমাকে মুখ বুজিয়া সহ্য করিতে হইত।

যাহা হউক, দিন কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। মনোরমার নিকট প্রত্যহ নিয়মিতরূপে তিরস্কৃত ও প্রহৃত হইয়া অসহনীয় দুঃখের বোঝা কোন-রূপে বহন করিয়া, গভীর বেদনাপূর্ণ হাহাকার ভরা হৃদয় লইয়া, সুরমা দুঃখময় জীবনের দিনগুলি একে একে অতিবাহিত করিতে লাগিল। তাহার জন্ম-দাতাও যখন তাহার বিরহকাতর মলিন মুখের দিকে ভুলিয়াও চাহিতেন না, তখন অপরে আর কে তাহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিবে? নীহারবালাকে পড়াইবার জন্য একজন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মনোরমার অজ্ঞাত-সারে, সুরমা তাহার নিকট মধ্যে মধ্যে আসিয়া অনেক বিষয়ে অনেক উপ-দেশ লাভ করিত।

শিক্ষক মহাশয় নীহার অপেক্ষা সুরমাকে উপদেশ দান করিয়া অধিক

আনন্দলাভ করিতেন। কেন না, সুরমা বুদ্ধিমতী, অনায়াসে তাঁহার কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিত এবং একমনে তাঁহার উপদেশবাক্য শ্রবণ করিত। নামধামশূন্য অপরিচিত শিক্ষক মহাশয়ের সারগর্ভ উপদেশাবলী সুরমার দগ্ধ হৃদয় অনেকটা শীতল করিত। তাই ঘোর দুর্দ্দিনে সুরমা তাহার এই মহানু-ভব উপদেষ্টাকে নিতান্ত আপনার জন বলিয়া মনে করিত।

কিন্তু সুরমাকে পুনঃ পুনঃ এত দগ্ধ করিয়াও বিধাতার সাধ মিটে নাই। তাই আবার তাহার নূতন বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল। মনোরমা যে দিন জানিতে পারিল যে, সুরমা তাঁহার অজ্ঞাতসারে শিক্ষক মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করে, সে দিন সুরমাকে উত্তম মধ্যম প্রহার করিয়া, শিক্ষক মহা-শয়কে বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি যদি সুরমাকে বারান্তরে শিক্ষা দান করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বিদায় দেওয়া হইবে।

শিক্ষক মহাশয় যদিও চিরদিন সকল বিষয়েই উদাসীন ও নির্লিপ্ত, তথাপি তিনি সমস্তই জানিতেন ও বুঝিতেন, বহুপূর্ব্বেই তিনি ইহাদের সংসর্গ ত্যাগ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু সুরমার জন্য তিনি যাইতে পারিতেন না। তাঁহার কাছে শিক্ষালাভ করিয়া, সুরমা অশান্তিপূর্ণ জীবনে কিঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিত, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। তাই সর্ব্বজনঘৃণিতা, শান্তহারা সুরমার প্রতি তাঁহার এই হৃদয়ভরা সহানুভূতি।

কিন্তু দাম্ভিকা মনোরমার কথা তাঁহার সহ্য হইল না। তাই তিনি ক্ষণ-মাত্র বিলম্ব না করিয়া, তৎক্ষণাৎ বিদায় গ্রহণ করিতে মনস্থ করিলেন।

বিদায়কালে সুরমার সহিত একবার দেখা করিতে তাঁহার বড়ই ইচ্ছা হইল। কিন্তু মনোরমার কঠোর শাসনে সুরমার তখন বাহিরে আসিবার ক্ষমতা ছিল না। অন্তর্যামী ভগবান বোধ হয় শিক্ষক মহাশয়ের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার কামনার ধনকে পরক্ষণেই তাঁহার সম্মুখে লইয়া আসিলেন।

সুরমাকে দেখিয়াই শিক্ষক মহাশয়ের চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সুরমার সুকোমল গণ্ডস্থলে মনোরমার নিষ্ঠুর হস্তের প্রহারের চিহ্ন তখনও বেশ স্পষ্টই দেখা যাইতেছিল। ক্ষতস্থান হইতে তখনও রক্ত ঝরিতেছিল। শিক্ষক মহাশয় ভাবিলেন, যদি সুরমা তাঁহার নিকট না পড়িত, তাহা হইলে তাহাকে ওরূপ নির্দ্দয়ভাবে প্রহার খাইতে হইত না। নবনীত-দেহা কুসুমকোমলা সুরমা—যাহাকে বুকে রাখিয়া প্রতিক্ষণে ভয় হয়, পাছে

তাহার কোমল অঙ্গে কোনরূপ ব্যথা লাগে—সেই নবীন পুতলী সুরমার কুসুমাপেক্ষাও সুকোমল গণ্ডস্থল পিশাচী মনোরমার নিষ্ঠুর নখাঘাতে বিদীর্ণ হইতে দেখিয়া শিক্ষক মহাশয় চোখের জল রোধ করিতে পারিলেন না।

সুরমা কিন্তু শিক্ষক মহাশয়ের মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। শিক্ষক মহাশয়ের আকস্মিক অশ্রু বিসর্জ্জনের কারণ সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। সকলের ঘৃণিতা, সকলের লাঞ্ছিতা, সকলের পদদলিতা তাহার ন্যায় সামান্যা বালিকার দুঃখের জন্য সংসারের কোন অপরিচিত লোকের চোখে যে জল আসিতে পারে, সে ধারণা তাহার কখনও ছিল না।

বিদায়কালে শিক্ষক মহাশয় বলিলেন, "সুরমা, আমি চল্লুম, যদি কখনও নিতান্ত প্রয়োজন হয় আবার আসিব।" এই কথা বলিয়া শিক্ষক মহাশয় গভীর বেদনাপূর্ণ হৃদয়ে অভয়বাবুর গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

(৩)

নীহারবালা মনোরমার বড় আদরের কন্যা। সে যখন যাহা বায়না করিত, তখনই তাহা পাইত। সুরমা সেদিন কোনরূপে মনোরমার তীব্র তিরস্কার হইতে অব্যাহতি পাইতে সে দিন সে নিজেকে কৃতার্থ বলিয়া মনে করিত। নীহারের ভাল ভাল গহনাপত্র ও পোষাক-পরিচ্ছদ অনেক ছিল। সুরমা শতাছিন্ন মলিন বসনে দেহ আবৃত করিয়া কোনরূপে লজ্জা নিবারণ করিত। তথাপি সুরমার মনে কোন দুঃখ বা কষ্ট হইত না। নীহারের ভাল গহনা বা ভাল কাপড় দেখিয়া সে কখনও হিংসায় জ্বলিয়া মরিত না। দাম্ভিকা মাতার দাম্ভিকা কন্যা। নীহার সুরমাকে বরাবর ঘৃণার চক্ষে দেখিত। তাহার সহিত ভাল করিয়া কথাও কহিত না। বয়সে ছোট হইলেও মাতার ন্যায় সেও সুরমার উপর অকথ্য অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হইত না। সুরমার অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ, তাই সে সকলের নিকট ঘৃণিতা ও সকলের পদদলিতা।

ক্রমে ক্রমে সুরমা ও নীহার উভয়ে বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিল। নীহার মনোরমার একান্ত অভিমানিনী ও আদরিণী কন্যা। সে কারণ মনোরমা তাহাকে ভাল ঘরে, ভাল বরে পাত্রস্থা করিতে বিশেষ উৎকণ্ঠিতা হইলেন।

সুরমা নীহার অপেক্ষা বয়সে বড় কিন্তু তাহার বিবাহের কথা মনোরমার আদৌ মনে হইত না। সে কেবল আপন কন্যার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

যাহা হউক, মনোরমার তাড়নায় অভয়বাবু অজস্র টাকা খরচ করিয়া অল্পদিনের মধ্যে ভালঘরে ভালবরে নীহারকে পাত্রস্থা করিতে বাধ্য হইলেন।

সুরমা ঘৃণিতাই হউক বা লাঞ্ছিতাই হউক, তাহাকে কোনরূপে পাত্রস্থা করিতে হইবে। নতুবা অভয়বাবুর জাত কুল রাখা দায় হইয়া পড়িবে।

একে সুরমাকে রাখিয়া নীহারের বিবাহ দেওয়ায় অভয়বাবুর অখ্যাতির সীমা ছিল না, তাহার উপর সুরমা যখন ১৬ পার হইয়া ১৭তে পদার্পণ করিল, তখন লোকের কথার জ্বালায় অস্থির হইয়া অভয়বাবু পাত্রের জন্য বিশেষ অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন।

নীহারের ভাল বর শীঘ্র জুটিয়াছিল, মনোরমা অজস্র টাকা ঢালিয়াছিল বলিয়া। সুরমার বেলায় মনোরমা কিন্তু বেশী খরচ করিতে রাজী ছিল না। ইচ্ছা, যেমন তেমন বর দেখিয়া সুরমাকে পাত্রস্থা করা; কিন্তু আজকাল বরের বাজার যেরূপ চড়া, তাহাতে ৫০০৲ টাকার কমে যেমন তেমন বরও পাওয়া সুকঠিন।

যাহা হউক, বহু অনুসন্ধানের পর নানাবিধ ব্যাধিগ্রস্থ ৬০ বৎসরের বৃদ্ধের হস্তে কুসুমলতিকা সুরমাকে অর্পণ করিতে মনস্থ করিলেন। বিবাহের দিন ক্ষণ সমস্ত স্থির হইয়া গেল। সুরমা কিন্তু ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিল না। এ সমস্তই মনোরমার কাজ। মনোরমা পিশাচী অভয়বাবুর ঘাড়ে চাপিয়াছিল। মনোরমা যাহা বলিতেন, তিনিও ঠিক তাহাই করিতেন। নতুবা পিতা হইয়া কোন্ প্রাণে তিনি তাঁহার দুধের বাল্যকে শ্মশানঘাটের মড়ার হাতে অর্পণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন?

মনোরমার একান্ত ইচ্ছা, সুরমা যেন জীবনে কোথাও সুখ না পায়; চিরদিন তাহাকে যেন চোখের জল ফেলিতে হয়। তাই আজবাদে কাল সে মরিবে এমনি বৃদ্ধ স্বামীর হস্তে তাহাকে কৌশলে অর্পণ করিয়া আজীবন তাহাকে বৈধব্যের আগুনে পোড়াইবার জন্য তাহার এত চেষ্টা, এত উদ্যম! মাতৃহীনা সরলা অবোধ বালিকার প্রতি বিমাতার একি নিশ্চেষ্ট বিদ্বেষভাব!

পিতা হইয়া অভয়বাবু যখন এরূপ ভয়ঙ্কর কার্য্য করিতে উদ্যত, তখন অপরে আর কে তাঁহাকে বাধা দিবে? তবে মোক্ষদাসুন্দরী যদি বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি হয় ত বাধা দিলেও দিতে পারিতেন।

কিন্তু সুরমার দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি ২।৪ বৎসর পূর্ব্বেই সংসারের জ্বালা

যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কোন এক অজ্ঞাত দেশে চলিয়া গিয়াছিলেন। তবে এখন আর সুরমার মুখের দিকে কে চাহিবে?

যথাকালে বিবাহের স্থিরীকৃত দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। কোনরূপে সুরমার গাত্রহরিদ্রা ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। তখন সে বুঝিতে পারিল যে, তাহাকে আচরে পিত্রালয় ত্যাগ করিয়া স্বামীগৃহে যাইতে হইবে।

মনোরমার পাশবিক অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভ করিবে ভাবিয়া সুরমার হৃদয় আনন্দপূর্ণ হইল। জ্ঞানহীনা বালিকা তখনও জানিতে পারে নাই যে, তাহার হৃদয়হীন পিতার মনোনীত পাত্রের সহিত তাহার বিবাহের পরিণাম ফল, শত সহস্র পিশাচী মনোরমার নিষ্ঠুর অত্যাচার অপেক্ষা কত ভয়াবহ। বিবাহের দিন পর্য্যন্ত বরটী কে তাহা কেহ জানিতে পারিল না। সে কারণ পাত্র দেখিবার জন্য সকলেই বিশেষ উৎকণ্ঠিত। তৎপর রাত্রিকালে যথা-সময়ে পাত্র আসিল। পাত্র দেখিয়া সকলেই অবাক হইয়া গেল! সুরমার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া অনেকের চোখে জল আসিল। বাসর ঘর হইতে সুরমাও একথা শুনিল। আতঙ্কে তাহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। তখন মায়ের কথা স্মরণ হওয়াতে তাহার দুই চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

তাহার জন্মদাতা যখন এত নিষ্ঠুর, এত পাষাণ, তখন সে কাঁদিয়ে আর কি করিবে?

বিবাহের লগ্ন উপস্থিত দেখিয়া অভয়বাবু কন্যাদান করিবার জন্য বিবাহসভা হইতে বর আনিতে গেলেন। কিন্তু সুরমা কিছুতেই উঠিতে চাহিল না। অভয়বাবু হাত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন কিন্তু সুরমা তথাপি প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় নির্ব্বাক ও নিরাশ হইয়া বসিয়া রহিল। চোখের জলে তাহার গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইতেছিল। অভয়বাবু স্বীয় দুহিতার সেই মর্ম্মভেদী অশ্রুর অর্থ বুঝিয়াও বুঝিতে চাহিলেন না। সুরমার ঈদৃশ আচরণ দেখিয়া মনোরমা ক্রোধোন্মত্তা ব্যাঘ্রিণীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া হস্তস্থিত একটী কঠিন দ্রব্য সুরমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। তাহা সুরমাকে আঘাত না করিয়া দৈবাৎ নিকটে উপবিষ্টা নীহারের কপালে লাগিল। নীহারের কপাল ভাঙ্গিল।

যাহা হউক, অবশেষে সুরমাকে বলপূর্ব্বক উঠাইয়া ছাতনা তলায় লইয়া যাইতে অভয়বাবু বাধ্য হইলেন। পাত্র দেখিয়া সুরমা ছাতনা তলায় মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

চারি দিকে মহা গোলমাল উপস্থিত হইল। এই সময়ে এক ব্যক্তি অতি তাড়াতাড়ি আসিয়া অভয় বাবুকে বলিল, "বাবু শীঘ্র চলুন, আপনার জামতা কলেরা রোগে আক্রান্ত, দেরী হইলে সাক্ষাৎ হইবে না।"

এই নিদারুণ সংবাদ পাইয়া অভয় বাবুর মুখমণ্ডল একেবারে কালিবর্ণ হইয়া গেল। অতিকষ্টে অন্দরমহলে গিয়া তিনি পত্নীকে বলিলেন, "মনোরমা নীহারের বুঝি কপাল ভাঙ্গে। পঙ্কজের কলেরা হইয়াছে, অবস্থা অতি শোচনীয়। এখনই নীহারকে লইয়া যাইতে হইবে।" এই সংবাদ শুনিয়া, অজ্ঞাত আশঙ্কায় মনোরমার সমস্ত হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। কাল বিলম্ব না করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ নীহারকে লইয়া স্বামীর সহিত ঘোড়গাড়ী করিয়া ভবানীপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শেষরাত্রে সুরমার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। সে দেখিল যে, সে কাহার কোমল ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া শুইয়া আছে। ভাল করিয়া চাহিয়া চাহিয়া সে চিনিতে পারিল, তিনি তাহার চিরপরিচিত ব্যাথার ব্যথী, নিঃসঙ্গজীবনের একমাত্র সঙ্গী করুণ-হৃদয় সেই উদাসীন শিক্ষক মহাশয়। বহুদিন বিচ্ছেদের পরে ঘোরদুর্দ্দিনে মনের মানুষের সহিতে দেখা! সুরমার নেত্রদ্বয় হইতে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। মাষ্টার মহাশয় স্বীয় বস্ত্রাঞ্চলে তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া সস্নেহকণ্ঠে বলিলেন, "যে দিন তোমার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আসিলাম, সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত তোমার, বিরহ-কাতর মলিন মুখছবি আমার হৃদয়ের মধ্যে অহরহ অঙ্কিত রহিয়াছে। তোমার ও তোমার আত্মীয়স্বজনের অজ্ঞাতসারে, সর্ব্বদা তোমার খবর রাখিতাম। এক এক সময় তোমার জন্য সমস্ত প্রাণ হাহাকার করিয়া উঠিত। কিন্তু তোমার দাম্ভিকা মাতার তেজদৃপ্ত কথা মনে করিয়া সে হাহাকার চাপিয়া রাখিতে বাধ্য হইতাম! তোমার মত আমিও চিরদিন ঘৃণিত ও পদদলিত। তোমার মত আমিও চিরদিন মাতৃহীন। তাই আজ আমার সমস্ত মনপ্রাণ তোমাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ছুটে ছুটে এসেছে। তোমার যাহা অভাব তাহা আমি বেশ জানি। আমার যাহা অভাব তাহা তুমিও বেশ জানিবে। আমার বিরহ-কাতর হৃদয় তোমার বিরহ-কাতর হৃদয়ের সহিত এক হইয়া "বিষস্য বিষমৌষধির ন্যায় স্বর্গীয় সুধার উৎপত্তি করিতে পারে। এখন বল, তুমি আমার হইবে কি না?" সুরমা আর কি বলিবে! যখন তাহার চিরদিনের কামনার ধন

তাহার ক্ষীণ দুটী বাহুপাশে আপনা হইতে ধরা দিতে আসিয়াছে। তখন তাহার বলিবার বা কি ছিল?

সুরমা কোন কথা কহিতে পারিল না। কেবলমাত্র কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে আনন্দাশ্রুপূর্ণনেত্রে শিক্ষক মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

শিক্ষক মহাশয় তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া অশ্রুসিক্ত লজ্জাজড়িত রক্তিমগণ্ডে সস্নেহে বার বার চুম্বন করিলেন। বলাবাহুল্য এই শিক্ষকমহাশয় আমাদের চিরপরিচিত—নরেন্দ্রনাথ—এখন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থকার। প্রভাতে নরেন্দ্রনাথ ও সুরমা যখন শুনিল যে নীহারের সিঁথীর সিঁন্দুর জন্মের মত মুছিয়া গিয়াছে তখন সুরমা স্নেহের ভগিনী নীহারের ভবিষ্যৎ জীবন চিন্তা করিয়া যার পর নাই শোকাকুলা হইল। নরেন্দ্রনাথ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া দূর আকাশের দিকে চাহিয়া উচ্চারণ করিলেন, "অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস।"

সাধক-কমলাকান্ত।

লেখক,—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

(২)

মন্ত্র বড় কট মট। আর মন্ত্রে কাজ নাই। ঠাকুর হাসিয়া বলিবেন, "আমার মন্ত্র সেরূপ নয়, একটী কথা। বড় হলে দেখ্‌বে সন্ধ্যা গায়ত্রী সব ছেড়ে দিয়ে আমার দত্ত মন্ত্রই যপ কর্ব্বে।" বালক বালিলেন, "মন্ত্রটা কি বলুন দেখি, আমি খুব মুখস্থ কর্ত্তে পারি. তবে সন্ধ্যাটা বড় শক্ত বোধ হচ্ছে, কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। সাহসী বালকের কানের নিকট মুখ রাখিয়া বলিলেন. "আমার মন্ত্র এই একটী কথা।" বালক বলিলেন, "এই মন্ত্র এ খুব মনে থাক্‌বে। যোগী বলিলেন, "মাঝে মাঝে যপ করিবে পরে সর্ব্বদা যপ করিলে দেখিবে কি অমূল্য রত্ন লাভ করিলে।" বালক সন্ন্যাসীর পদস্পর্শ করিয়া বলিলেন, "আপনার মন্ত্র যপ কর্ব্বো. এখন কোথায় যাচ্ছেন, চলুন আমাদের বাড়ী, মা আমার অতিথি ফকিরকে বড় ভালবাসেন, নিজে না খেয়ে খেতে দেন।" সন্ন্যাসী মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, "তোমার মা তোমাকে আজ যে কাজে পাঠায়েছেন সেই কাজ করে বাড়ী যাও।

তোমার সঙ্গে আমি সময়ে দেখা কর্ব্বো" এই বলিয়া সন্ন্যাসী গ্রামের দিকে চলিলেন, বালক কিয়ৎক্ষণ তাঁহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া তাঁহার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে ধীরে ধীরে নদী পার হইলেন ও গ্রামান্তরে চলিলেন।

বালক মাতৃ নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সমাধা করিয়া প্রত্যাগত হইতেছেন। আবার সেই নদীর ধার, জল অল্প। নদী পার হইয়া সেই অশ্বথ বৃক্ষতলে দাঁড়াইলেন, ও শ্মশানের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীর কথা মনে হইল, তাঁহার দত্ত মন্ত্রও মনে পড়িল। ভাবিলেন, যেরূপ ভাবে গায়ত্রী যপ করিতে হয় যেরূপ ভাবে যপ করিয়া দেখি। শ্মশানের দিকে দৃষ্টি করিয়া হরিদ্রারঞ্জিত পূত উপবীত করে ধারণ করিলেন। সিদ্ধ সন্ন্যাসী প্রদত্ত সিদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ক্ষেত্র সরস ও উত্তম রূপে কর্ষিত হইলে সারগর্ভ বীজ অঙ্কুর উৎপাদন করে, অতি সুখময় ও সরস ফল উৎপাদন করে। বালকের হৃদয়ক্ষেত্র সরস। কলুষ, কপটতা মিথ্যা, ব্যভিচার প্রভৃতি সংসারের আবর্জ্জনা বালকের হৃদয়ে স্থান পায় নাই, মন্ত্রসিদ্ধ পুরুষ দত্ত, তেজস্কর। যপ ব্যর্থ হইবার নহে। বালক যপ করিতে করিতে কি এক আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। শ্মশানের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, এক হাস্যময়ী প্রসন্ন মূর্ত্তি। বর্ণ নবজলধর সদৃশ, শিরে মুকুট কেশকলাপ কদম্বশ্রেণীর ন্যায় কটিদেশ পর্য্যন্ত বিন্যস্ত, গলে মুণ্ডমালা। বালক একদৃষ্টে নিরীক্ষণ ও যপ করিতে লাগিলেন. ভাবিলেন শ্মশানে কালী বোধ হয় সেই যোগী পুরুষের। যোগী পুরুষ ঐ শ্মশানেই আছেন, নিশ্চয় দেখা পাইব, এই ভাবিয়া শ্মশানের দিকে চলিলেন। ধীর প্রবাহিনীর সলিলরাশির উপর দৃষ্টি পতিত হইবামাত্র দেখিলেন, সেই ভুবন-মোহিনী জলপ্রবাহের সঙ্গ নৃত্য করিয়া চলিতেছেন। বালক দাঁড়াইলেন, প্রাণ ভরিয়া আনন্দময়ীর নৃত্য দেখিয়া পুলকে শরীর রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। অশ্বথ বৃক্ষের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন, দেখিলেন সেই হাস্যময়ী মূর্ত্তি ধীরমলয় পবনসহ পল্লবে পল্লবে নৃত্য করিতেছেন, ভাবিলেন, সন্ন্যাসী শ্মশানে নাই তাহার দত্ত মন্ত্র সর্ব্ব দুঃখহরা ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি দৃষ্টি করাইতেছে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দেখিলেন, তাঁহার হৃদয়সরোজে শব শিবমোহিনী স্মরাননী শ্যামা। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি ফলে তাঁহার হৃদয় প্রেমরাগ পরিপূর্ণ ছিল, প্রেমের উচ্ছ্বাস বয়সের বশবর্ত্তী নহে, নবীনে প্রবীণে সকল সময়েই প্রেমের উচ্ছ্বাস হইতে পারে। নবীনের প্রেমের প্রবীণত্ব বড় মনোহর দর্শনীয়, সুফল দায়ক, বহু পুণ্যের ফল। প্রেমবারি তাঁহার নবীন তরল নয়নে সঞ্চারিত হইল, প্রভাত-বিকশিত-মনোজ্ঞ-

দল-পতিত-বারি-বিন্দুর ন্যায় মনোহর শোভা ধারণ করিল। ভাবিলেন, মন্ত্র যথার্থ অমূল্য রত্ন, আহা! এই স্থানে বসিয়া এই মন্ত্র যপ ও অপার আনন্দ অনুভব করি। বালক নদীপ্রান্তে দাঁড়াইয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার জনৈক প্রতিবাসী নদী পার হইয়া আসিতেছেন, কমলাকান্তকে তদবস্থায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কমলাকান্ত তুমি এ সময় এখানে কি করিতেছ, দেখিতেছ বেলা নাই, একলা বাড়ী যাইতে পারিবে না, এস আমার সঙ্গে এস, এখানে দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছিলে? কমলাকান্ত কহিলেন, "মা এ গ্রামে কোন কাজের জন্য পাঠাইয়াছিলেন, নদীরধারে দাঁড়াইয়া কত কি দেখিতেছিলাম। চলুন বাড়ী যাই। "এই বলিয়া কমলাকান্ত সন্ন্যাসীর বিষয় ভাবিতে ভাবিতে বাড়ীতে প্রত্যাগত হইলেন। নদীপ্রান্তের ঘটনা ও সন্ন্যাসীর কথা গোপনে রাখিলেন।

দ্বিতীয় অংশ।

মহাত্মা কমলাকান্ত শৈশবে পিতৃহীন। দুই সহোদর। তিনি জ্যেষ্ঠ। লক্ষ্মীস্বরূপিনী তাঁহার মাতা দুইটী শিশু পুত্রকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পরও কিছুদিন স্বামীর গৃহে বাস করিয়াছিলেন। কমলাকান্তের পিতার তাদৃশ ভূ সম্পত্তি ছিল না, কেবল কয়েক ঘর যজমানকে অবলম্বন করিয়া অম্বিকায় বাস করিতেন। তখন বর্ত্তমানের ন্যায় সংসারের ব্যয়ভার ছিল না। টাকায় ১ মণ চাউল, স্থল বিশেষে ততোধিক পাওয়া যাইত। জীবনধারণের উপযোগী অন্যান্য সামগ্রীও সুলভ ছিল। অনেক স্থলে ব্রাহ্মণগণ সামান্য বৃত্তির টাকা ও ২।৫ বিঘা নিষ্কর জমীর উপসত্ব হইতে সংসার নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। এখন সংসারের ব্যয়ভার তদপেক্ষা ৪০ গুণ বাড়িয়াছে। এখন উদারান্নের জন্য মধ্যবৃত্তি লোককে বিবিধ বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে। সুখের গৃহ, সুখের গ্রাম, স্নেহময়ী জননী, চারুভাষিনী দুঃখের সঙ্গিনী প্রিয়তমা প্রেয়সী, সহোদর সুহৃদ সহবাসও পরিত্যাগ করিয়া প্রবাস বাস অবলম্বন করিয়া বহু দুঃখভাগী হইতে হইয়াছে, আজীবন দাসত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছে। সমাজসুখে জলাঞ্জলি দিয়া সাগর পারে বিচরণ করিতে ছইয়াছে। হায়! হায়! সময়ের কি ভীষণ বিপ্লব! কি অকল্পিত পরিবর্ত্তন। অভাব ও ব্যাধি সমাজের মর্ম্মস্থান অধিকার করিতেছে। উত্তম সাহস বিদ্যা বুদ্ধি সমাজকে পরিত্যাগ করিতেছে। কেন! কারণ কি! এক দিকে দৈব

বিড়ম্বনা প্রতি বৎসরই অজন্মা, স্থল বিশেষে অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি, বৃক্ষ সকল অপেক্ষাকৃত ফল পুষ্প বিহীন, অন্য দিকে সমাজের অকর্ম্মন্যতাই অধোগতির কারণ। পুষ্করিণী সকল সংস্কার বিহীন, পানীয় জলের অভাব, সংক্রামক ব্যাধির উৎপত্তি। গোচরভূমির অভাব, গবাদির হ্রাস, জলাভাবে মৎসের অভাব, নিজের জীবন ধারণের উপযুক্ত দ্রব্য সমূহের জন্য পরের মুখপেক্ষা, সেই সকল বস্তু স্বহস্তে ও পরিশ্রমে উৎপাদনের নিশ্চেষ্টতা ইত্যাদি বহুবিধ কারণে সমাজ দুর্ব্বল হইয়া আসিতেছে! নিশ্চেষ্ট ও অলসের প্রতি দৈবও প্রতিকূল হন! সক্ষম ও কর্ম্মীর সহায় দৈব ও প্রকৃতি। লোক সমাজ উদ্যমশীল হইলে দৈবেরও শুভদৃষ্টি হয়। সৌভাগ্য ক্রমে আজ কাল অনেকেরই সমাজের উন্নতির সোপান কৃষিকর্ম্ম বাণিজ্য শিল্পের প্রতি আসক্তি দেখা যাইতেছে। সুশিক্ষিত হইয়া ঐ সকল কর্ম্ম নিজের জীবিকা উপার্জ্জন ও সমাজের উন্নতির জন্য অনেকেরই আগ্রহাতিশয় দেখা যাইতেছে, সুখের বিষয়! নিজের জীবিকা উপার্জ্জন ও পরিবার প্রতিপালন অনেকেই করিয়া থাকেন, তাহাতে তাদৃশ কৃতীত্ব নাই। যে জন দশের প্রতিপালক ও লোক সমাজের হিতকর কর্ম্মে ব্রতী তিনিই ধন্য। অভাব সৎকর্ম্ম ও সদভিপ্রায়ের শত্রু এ কথা সত্য, কিন্তু অভাব অনেক স্থলে বিলাস প্রসূত, অতএব বিলাস সর্ব্বোতভাবে পরিত্যাগ করা প্রথম কর্ত্তব্য। তখন মধ্যবর্ত্তীর লোকের কথা দূরে থাকুক ধনবানদিগের বিলাস কিছুমাত্র ছিল না। ধনবানদিগের অহঙ্কার সৎকর্ম্মের উপর ছিল, প্রজাপালন বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা, জলাশয় প্রতিষ্ঠা, গুণবান অনাথ ও দরিদ্রের প্রতিপালনে ধনবানদিগের মধ্যে প্রতিদন্দ্বিতা চলিত। মধ্যবর্ত্তী লোকেরাও ধনবানদিগের অনুকরণ করিতেন, তাই মহাত্মা কমলাকান্তের পিতা কয়েকঘর যজমান মাত্র অবলম্বন করিয়া অম্বিকায় সচ্ছন্দে বাস করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার মাতা শিশু পুত্রদ্বয় যজমানকার্য্যে অসমর্থ হইলেও প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। মহাত্মা কমলাকান্তের মাতুলালয় চান্না। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গতঃ বর্ত্তমান থানা জংসন রেল ষ্টেশনের এক ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। তাঁহার মাতুল বিষয়ী না হইলেও কর্ম্মক্ষম ছিলেন। ভগিনীপতির মৃত্যুর কিছুদিন পরে ভগিনীকে চান্নায় আনিয়া পৃথক গৃহাদি ও কিছু ভূসম্পত্তি দেন। মহাত্মা কমলাকান্ত বিদ্যা শিক্ষার জন্য অম্বিকায় যজমানগৃহে অবস্থান করিতেন।

মহাত্মা কমলাকান্ত প্রথমে অম্বিকার একটী টোলে ব্যাকরণ পড়িতে

আরম্ভ করেন। অম্বিকা গণ্ডগ্রাম, অর্দ্ধনগরী, স্বর তরঙ্গিণীর তীরবর্ত্তী, বিবিধ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ। টোল, সঙ্গীত আলয়, লোক প্রবাহ, বিপণী, ব্যবসা সব ছিল। পুরাতনের তরঙ্গের উপর নূতনের উৎভব, আগ্রহ ও অবস্থান দৃষ্ট হইত, সাধারণ, ধনী, মূর্খ, বিদ্বান, ফকির, সন্ন্যাসী সকল প্রকার লোকের লীলাভূমি ছিল। কমলাকান্তের মানস বিহঙ্গ গোপনে সেই পুণ্যভূমি বিচরণ করিয়া পরিপুষ্ট হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কমলাকান্তের কণ্ঠস্বর অতিশয় সুমধুর ছিল, এমন কি বালক পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গীত শুনিয়া নীরব হইত। টোলে অধ্যয়নকালে তাঁহার কণ্ঠস্বর অন্যান্য বালকের কণ্ঠস্বরকে পরাস্ত করিত। তৎকালে টোল ও বর্ত্তমান টোলের বিষয় রূপান্তর ঘটিয়াছে। তৎকালের টোল গৃহ চণ্ডীমণ্ডপের ন্যায় প্রায় সর্ব্বত্রই একভাবে নির্ম্মিত হইত। এখনও স্থানে স্থানে সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। টোলগৃহের দুইধারে দুইটী ক্ষুদ্র গৃহ থাকিত, মধ্যস্থান অনাবৃত। ক্ষুদ্র গৃহ দুইটীর দ্বার ভিতর দিকে মধ্য স্থানের সম্মুখে থাকিত। গৃহ দুইটীর দুই তিনটী জানালা থাকিত। টোল সম্মুখদেশ অবলম্বন করিয়া পরচালা থাকিত। প্রকোষ্ঠ মধ্যে মঞ্চপরে কাষ্ঠ ফলক বস্ত্র ও সূত্র বদ্ধ হরিদ্রারঞ্জিত কাগজে হস্ত লিখিত দীর্ঘতালা পুস্তক সকল সজ্জিত থাকিত, নিম্নে সামান্য শয্যা ও বিশ্রাম এবং শয়নের জন্য কতকগুলি কঠিন উপাধান ইতস্তত বিক্ষিপ্ত থাকিত। মধ্যবর্ত্তী স্থানে অধ্যাপক অধীত ব্যাকরণ বালকগণকে কাব্য স্মৃতি ও ন্যায় প্রভৃতি শিক্ষা দিতেন। সম্মুখস্থ বাহির্দ্দেশে (চালায়) তরলমতি বালকগণ উচ্চৈঃস্বরে ব্যাকরণ পাঠ করিত। মধ্যে মধ্যে উচ্চৈঃস্বরের উচ্চ সীমায় উঠিলে অধ্যাপক বলিতেন, "ওরে এতনা" তখনি সুর নামিয়া আসিত ও কিয়ৎক্ষণ অন্তরায় থাকিয়া আবার পঞ্চমে উঠিত। অধ্যয়ন দ্বারা শুধু মানসিক পরিশ্রমে নহে শারীরিক পরিশ্রমও বিলক্ষণ হইত। গুরু বায়ুভরে বিচলিত পাদপ পল্লবের ন্যায় বালকগণ মস্তক আন্দোলিত হইত ও প্রত্যেক উচ্চারণের সহ নাসিকা পুস্তক স্পর্শ করিত। সকলের পরিধান গেরুয়া বসন, উপবীত রঞ্জিত ও মস্তকে শিখা। অধ্যয়নের ব্যয়ভার নাই। পুস্তকের মূল্য নাই। অধ্যাপক গৃহিণী সেই সকল বালকবৃন্দের জননী হইতেন, হাস্যমুখে রন্ধন ভোজন করাইতেন। আহারীয় ও বসন যোগাইতেন রাজা, জমীদারগণ, সচ্ছল গৃহস্থগণ ছাত্রগণ নিয়মিত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে লঘু পুষ্টিকর আহারাদি দ্বারা সবল ও সুস্থকায় থাকিতেন, পরে এক এক বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়া শাস্ত্র ও জ্ঞানের

উন্নতি করিয়া মনুষ্য জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতেন। বর্ত্তমান টোলের সে ভাব নাই। সময়ের সঙ্গে সবই পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। জীব জন্তু, পশু পক্ষী মানবদেহ ও বৃক্ষাদির ন্যায় মনুষ্য সমাজের রীতি নীতিরও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। ভাল আসিয়া মন্দের স্থান, মন্দ আসিয়া ভালর স্থান অধিকার করিতেছে। এখন বৈদেশিক শিক্ষার ভীষণ প্রাদুর্ভাব। পাঠের সময় পরিবর্ত্তন, পাঠের স্থান পরিবর্ত্তন, পাঠের সময় বালকের অঙ্গভঙ্গির পরিবর্ত্তন। পাঠ্যজীবনের সকলেই অন্যভাব! পরিধান বিভিন্ন, ব্যয় ভার গৃহস্থের সাধ্যাতীত, শিক্ষনীয় বিষয়ও অন্যরূপ। তখন টোল প্রবেশের পূর্ব্বে পাঠশালে সামান্য শিক্ষা হইত, বালকগণ বুঝিতে না পারিলেও চাণক্যের শ্লোক মুখস্থ করান হইত। শৈশবে অধ্যস্থ বিদ্যা যৌবনে, প্রৌঢ়ে ও বৃদ্ধে অমূল্যরত্ন প্রসব করে, সংসারে কর্ম্মক্ষেত্রে পথ প্রদর্শক হয়, এখনও অনেক বৃদ্ধলোক চাণক্যের শ্লোক অনেক স্থলে উদাহরণ দিয়া থাকেন। বর্ত্তমানের প্রথম শিক্ষায় তেঁতুল খেলে টক লাগে, লঙ্কা খেলে ঝাল লাগে, লেখা পড়া করে যে, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে, ইত্যাদি পাঠ আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা হয়, কারণ বালকের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে এ সব সামান্য বিষয় উপলব্ধি করিতে পারে। যে পাঠে যৌবনে চরিত্র গঠিত হইবে, বিচার ও বিবেচনাশক্তি বর্দ্ধিত হইবে, অধীত বিদ্যা পথ প্রদর্শক হইবে, সেইরূপ শিক্ষা দেওয়াই উচিত। পুরাতনের সবই উৎকৃষ্ট ও নূতনের সবই অপকৃষ্ট তাহা বলিতে চাহি না; বর্ত্তমান টোলে পুরাতন টোল অপেক্ষা অনেক বিষয়ে উন্নত হইতে পারে, কিন্তু ব্যয়ভার অতিরিক্ত বৃদ্ধি হওয়ায় সাধারণে শিক্ষালাভ করিতে পারেন না। অধ্যাপকগণ কোন কোন স্থলে নিজব্যয়ে ২।৩টী মাত্র ছাত্রের ভরণ পোষণ করান তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার এক প্রকার কেহ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তখন যজমানগণ পুরোহিত পুত্রগণের শিক্ষার ভার লইতেন, কারণ শিক্ষিত পুরোহিতের দ্বারা ক্রিয়া যথাবিধি সম্পন্ন হইবে। সেইজন্য মহাত্মা কমলাকান্তকে তাহার শিষ্যগণ অম্বিকায় রাখিয়াছিলেন।

মহাত্মার অম্বিকা বাস বেশীদিন ঘটে নাই। অনুরাগের উপর বাধা দিবার ক্ষমতা কাহার নাই। অনুরাগের বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। সঞ্চিত বিদ্যা, সঞ্চিত প্রেম, সঞ্চিত ভক্তি, শত বাধা, শত উপদ্রব, সহস্র সহস্র সংসারের শোক দুঃখ অতিক্রম করিয়া প্রতিফলিত হইবে, তাহা নষ্ট করিবার কাহারও শক্তি নাই। গিরিগহ্বর নিঃসৃত বারিধারা যথা নানা স্থান দিয়া প্রবাহিত হইয়া,

নানা স্থান উর্ব্বর ও ফল পুষ্প ভারে পরিশোভিত করিয়া মহাসমুদ্রে পতিত হয়, প্রেমও সেইরূপ, ভক্তির উচ্ছ্বাসে, প্রেমের উচ্ছ্বাসে সঙ্গীত দ্বারা হৃদয় নিঃসৃত বাক্য দ্বারা সহস্র সহস্র মানব হৃদয়কে উর্ব্বর সহস্র সহস্র মানবের সংসারযন্ত্রণা দূর করিয়া প্রেমার্ণব পরমেশ্বরে লীন হয়।

সাধক-সঙ্গীত। *

পণ্ডিত—শ্রীশ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ বিরচিত।

আর্জি ধর মা এলোকেশি!
আমি খাট্‌তে আর পারিনে' বেশী॥
দেশে দেশে বদলী ক'রে মা
(আমায়) রাখ্‌লি' করে ঘোর বিদেশী॥
(এখন) দাও মা ছুটী, ঘরের ছেলে, ঘরে গিয়ে
হই স্বদেশী॥
রিপু ছটা বড়ই ঠ্যাঁটা, করে সদাই রেষারেষি!
দশেন্দ্রিয় দস্যুদলে মা (আমায়) টান্‌ছে দিয়ে
গলায় ফাঁসী॥
উপরি পাওনা চুলোয় গে'ছে মা,
গেঁটের কড়ি যাচ্ছে খসি'।
তাতে আবার পঞ্চভূতে চোখ্‌ রাঙায়ে আসে রুষি।
ভবের ভাব দেখে মন বিগ্‌ড়ে গেছে মা,
(এখন) দেশের তরেই মন উদাসী।
কোনরূপে মান বাঁচয়ে দেশে গেলেই হই মা খুসী॥
"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"
এই শাস্ত্র কথা অস্ত্র হ'য়ে বিঁধ্‌ছে বুকে দিবানিশি॥
ইতি শ্রীশ্রীপদ শর্ম্মা লিখ্‌ছে নয়ন জলে ভাসি।
আমার আর্জি ধরে আপীল মেরে ডিক্রী দে'মা
এলোকেশী!

---

* এই গীতটী রামপ্রসাদী সুরে গেয়।

ভারতের নূতন বড় লাট

লর্ড রেডিং বাহাদুর।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান বড়লাট লর্ড চেমস্‌ফোর্ড বাহাদুর অবসর গ্রহণ করিলে ভারতের ভাগ্যবিধাতা রাজপ্রতিনিধি বড়লাট কে হইবেন; এই বিষয় লইয়া প্রায় বৎসরাবধি বিলাতে ও ভারতের বিভিন্ন সংবাদ পত্রাদিতে নানারূপ কল্পনাজল্পনা চলিতেছিল। সম্প্রতি ভারতগবর্ণমেণ্টের প্রধান রাজধানি-দিল্লী হইতে এক কমিউনিক প্রচারিত হইয়াছে যে, পার্লামেণ্টের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রীমহোদয়ের প্রস্তাবে মহামান্য ভারতসম্রাট্‌ বাহাদুর রুফাস্‌ড্যানিয়েল্‌ আইজ্যাকস্‌ আর্ল অফ্‌ রেডিং মহোদয়কে ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি বড়লাট-পদে বরণ করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা নব নির্ব্বাচিত রাজপ্রতিনিধি লর্ড রেডিং বাহাদুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ত্তমান প্রস্তাবে লিপিবদ্ধ করিলাম।

লর্ড রেডিং বাহাদুর ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর তারিখে লণ্ডন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম মিঃ জোসেফ্‌ এম, ই, আইজাক বিলাতের একজন সুবিখ্যাত ব্যাবসায়ী। ইহাঁদের আদি বাস এসিয়ার অন্তর্গত পালেষ্টাইন নগরে, ইহাঁরা জাতিতে ইহুদী। বিলাতে যে সহরের নামে ইহাঁর পিতা "লর্ড" নামকরণ করিয়াছেন, সে সহরের নামের উচ্চারণ "রেডিং"।

লর্ড রেডিং বাহাদুর শৈশবে বিলাতের ইউনিভার্সিটি কলেজ স্কুলে জাতীয়ভাষায় জ্ঞান লাভ করেন; তৎপরে ইহাঁর জ্যেষ্ঠসহোদরের সহিত বেলজিয়ম রাজ্যের ব্রসেল্‌স্‌ নগরের এক বিদ্যালয়ে ও তৎপরে জর্ম্মনীর হ্যানোভারে জর্ম্মনীভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ইতিপূর্ব্বে ইনি ফরাসী-ভাষা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। লর্ড রেডিং বাহাদুরের পিতা মাতা তাঁহাকে আরও উচ্চশিক্ষা প্রদান করিবার কামনায় বিখ্যাত ক্যাম্ব্রিজ বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিবার সঙ্কল্প করেন; কিন্তু বাল্যকাল হইতে নানা ভাষায় জ্ঞানলাভার্থে দেশবিদেশে গমনাগমন করায় তাঁহার বিদেশভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা এতই প্রবল হইয়াছিল যে, যৌবনে পদার্পণ করিয়াই পিতা মাতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া "ব্লেয়ার এমল" নামক জাহাজে নাবিকের কার্য্য করিতে গমন করেন; এই জাহাজে তাঁহাকে পালগুটান ও জাহাজের পিতলের কাজগুলিকে পরিষ্কার করা প্রভৃতি কার্য্য করিতে হইত; কর্ম্মগুলি তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত শ্রমসাধ্য হওয়ায়, দক্ষিণ আমেরিকার

ব্রজিলদেশের রাইও ডিঃ জেনোরো হইতে তিনি জাহাজের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন; কিন্তু ধৃত হইয়া কলিকাতা প্রদক্ষিণ করতঃ সমুদ্র যাত্রা শেষ করিতে বাধ্য হন।

"মাগেনর্গ" নামক স্থানে তাঁহার পিতার ব্যবসায় জর্ম্মণ এজেণ্টের কার্য্যে তিনি দুই বৎসরকাল অতিবাহিত করেন। জাহাজে শ্রমসাধ্য নাবিকের কার্য্য অপেক্ষা জাহাজে নানাবিধ দ্রব্যের আমদানী রপ্তানী কার্য্যটি তাঁহার পক্ষে গৌরবজনক বলিয়া আপাততঃ তাঁহার ধারণা হইয়াছিল। এবার তিনি তাঁহার বাল্য-স্মৃতি-বিড়িত জননী জন্মভূমি লণ্ডন সহরে নবউদ্যমে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; প্রথমে ষ্টকএক্সচেঞ্জের কার্য্যও করিয়াছিলেন, তাহাতেও ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন হইলেন না।

২৪ বৎসর বয়সে ইনি আমেরিকায় বসবাস করিবার সঙ্কল্প করেন, কিন্তু তাঁহার মাতার অনিচ্ছায় তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এই সময় আইন ব্যবসায় দ্বারা লর্ড রেডিং বাহাদুর আপনার অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে রুফস আইজাক্স্ মিডনটেম্পল হইতে আইন ব্যবসায় করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। শিক্ষা উপলক্ষে বিভিন্নদেশে গমন ও বিভিন্ন প্রদেশের ব্যবসার অভিজ্ঞতায় তাঁহার প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ আরম্ভ হইল, ভাগ্য বিধাতা সুপ্রসন্ন হইলেন। আইন ব্যবসায়ে অতি অল্প দিনের মধ্যেই ভাগ্যোন্নতিলাভ ঘটিল। এই ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দেই সপ্তবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কালেই বিলাতের পরলোকগত বণিক মিঃ এলবার্ট কোহেনের তৃতীয়া কন্যার সহিত ইহাঁর শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হয়। ধী-শক্তি, তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রভাবে লর্ড রেডিং বাহাদুর ব্যারিষ্টারিতে অর্থোপার্জ্জন ও রাজসমাজে প্রথমশ্রেণীর ব্যারিষ্টার মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ইনি কে, সি, উপাধিলাভ করেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে মিডাল টেম্পলের বেঞ্চার হন। এই সময় হইতে ব্যবহারাজীব সম্প্রদায় সকলেই ইহাঁকে ভালবাসিতেন, এমন কি, লর্ড রেডিং বাহাদুর আদালতে উপস্থিত না থাকিলে কোন অনুষ্ঠানই সুসম্পন্ন হইত না। এই সময় বিখ্যাত হুইটেকার, রাইট, ক্রিপেন প্রভৃতির বিরুদ্ধে আনীত কতিপয় ফৌজদারি খুনী মোকদ্দমায় ইনি আসামীর পক্ষ সমর্থন করেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ইনি বিলাতের লিবারেলদলের পক্ষ হইতে পার্লামেণ্টের সদস্য নির্ব্বাচিত হন।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে ইনি সলিসিটার জেনারেল পদে অভিষিক্ত হন। অল্পদিন পরে এই বৎসরই ইনি এটর্ণী জেনারেল পদে নিযুক্ত হইয়া ১৯১০ খৃষ্টাব্দেই "নাইট" পদবী লাভ করেন, ১৯১১ খৃষ্টাব্দে কে. সি-ভি এবং প্রিভিকাউন্সিলর হন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ইনি মন্ত্রিসভায় প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন। তৎপরে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে "ব্যারণ", ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে জি-সি-বি; ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ভইকাউণ্ট এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে রিডিংএর প্রথম আর্ল হন।

লর্ড রেডিং বাহাদুরের বয়স এক্ষণে ৬১ বৎসর। ইনি বিলাতে সর্ব্ব প্রধান বিচারপতি লর্ড চীফ-জষ্টিস পদের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন; সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে বর্ত্তমান ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ১৭ মার্চ্চ তারিখে লণ্ডন ত্যাগ করিবেন, ১৯শে মার্চ্চ মার্শেলিস সহর হইতে জাহাজে উঠিয়া ভারতাভিমুখে যাত্রা করিবেন।

১লা এপ্রিল শুক্রবার সায়ঙ্কে 'কৈসর-ই-হিন্দু" জাহাজে বোম্বাই সহরে পৌঁছিবেন। পরদিন প্রাতে জাহাজ হইতে নামিবেন। বর্ত্তমান বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ড বাহাদুর ২রা এপ্রিল তারিখে নূতন বড়লাট লর্ড রেডিং বাহাদুরকে কার্য্যভার প্রদান করিয়া বোম্বাই হইতে জাহাজে উঠিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিবেন।

রাজনীতিক্ষেত্রে লর্ড রেডিং বাহাদুরের দূরদর্শিতা অনন্য সাধারণ ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ইনি মার্কিণে য়্যাংলো ফ্রেঞ্চ এবং লোনমিশনের প্রেসিডেণ্ট হইয়াছিলেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে মার্কিণের বিশিষ্ট ইংরাজদূত এবং ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে মার্কিণে বিলাতের বিশেষ প্রতিনিধিপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিলাতে ও মার্কিণে ইহাঁর রাজনৈতিক কৌশল দেখিয়া সকলেই বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন। গত যুদ্ধের সময় লর্ড রেডিং বাহাদুর বহুদায়িত্বপূর্ণ পদে কার্য্য করিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে অসাধারণ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। আমরা চির-রাজভক্ত ভারতবাসী ভগবানের নিকটে নব বড়লাট লর্ড রেডিং বাহাদুরের সুশাসন ও দীর্ঘজীবন কামনা করি।

সহধর্ম্মিণী।

লেখক,—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বসু বি, এ।

(১)

গৃহিণী আহারান্তে দিবানিদ্রার আয়োজন করিতেছেন, এমন সময়ে সুখী-দাসী আসিয়া একখানি পত্র দিল। পত্রখানি ডাকে আসিয়াছে, লিখিয়াছে পুত্র অনাথনাথ।

পত্র পাইয়া গৃহিণী তন্দ্রালসজড়িত নয়ন উন্মিলিত করিয়া বলিলেন, "সুখী, আমার চস্‌মাটা নিয়ে আয়ত, অনাথ লিখেছে বুঝি!"

চস্‌মা লাগাইয়া গৃহিণী পড়িতে লাগিলেন,—

শ্রীশ্রীহরি

শরণং

বালুরঘাট। জেলা হুগলী।

৪ঠা বৈশাখ, সন ১৩২৫ সাল।

শ্রীচরণেষু—

প্রণামাঃশতকোটী নিবেদঞ্চাগে।—পরে আপনার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে এ দাসের নিস্তার পরং। মা! উপরের ঠিকানা দেখিয়া বুঝিতেছেন. আমি কলিকাতায় বাসায় নাই। যে কারণে এখানে আসিয়াছি এবং আসিয়া যে কাজ করিয়া ফেলিয়াছি, তাহা এই স্থানে বসিয়াই আপনাকে জানাইতেছি। জীবনে কখনও আপনার অনুমতি না লইয়া কোনও গুরুতর কার্য্য করিতে অগ্রসর হই নাই, এই প্রথম করিলাম। ত্রুটি হইলেও ইহা প্রথম বলিয়া আমায় মার্জ্জনা করিবেন, ইহাই ভরসা।

৩রা বৈশাখ অর্থাৎ গত কল্য আমার কোনও সতীর্থ বন্ধুর বিবাহ ছিল। আমরা অনেকে বন্ধুর বিবাহে বরযাত্রী হইয়া এই গ্রামে আসিয়াছিলাম। বিবাহের পূর্ব্বে কন্যাপক্ষের দেয় অলঙ্কারপত্র লইয়া বরপক্ষের সহিত কন্যাপক্ষের কলহ ও বচসা হয়। বরপক্ষ মহা ক্রুদ্ধ হইয়া বর লইয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হন। তখন গ্রামের একদল বণ্ডা গুণ্ডালোক লাঠিসোঁটা লইয়া বরপক্ষকে মারপিট করিতে এবং বলপূর্ব্বক বিবাহ দিতে আসে। ভয়ে বর লোকের

আনাচে কানাচে গিয়া অন্যত্র পলায়ন করে। সে রাত্রে তাহাকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। শুনিয়াছি যে, নিকটেই কাহার গোয়ালঘরে বিচালীর গাদার উপর লুকাইয়া রাত্রিযাপন করিয়াছিল।

কন্যার বিধবা জননী কাঁদিয়া কাটিয়া আকুল। অনাথার ঐ একটী কন্যা। নিজে অত্যন্ত দরিদ্র, পরের আশ্রয়ে থাকিয়া বহুকষ্টে ভিক্ষা করিয়া বিবাহের আয়োজন করিয়াছিলেন। বাহিরের গোলযোগের কথা তিনি জানিতেন না। গ্রামের এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় বিবাহের ভার লইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট শুনিলাম, যথার্থই কন্যার গলার হার ছড়াটা স্বর্ণকার সময়ে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। আত্মীয় বরপক্ষকে সেই স্বর্ণকার গৃহে গিয়া অলঙ্কার যে অবস্থায় আছে দেখিয়া আসিতে অনুরোধ পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার বন্ধুর (বরের) ভ্রাতারা উহাতেও সন্তুষ্ট হন নাই, তাঁহারা অযথা কন্যাপক্ষকে অপমান করেন। ইহাতেই আগুন জ্বলিয়া উঠে।

তাহার পর যখন কন্যার জননী বিবাহপণ্ড হইয়া যায় দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া লজ্জা ত্যাগ করিয়া বাহিরের অঙ্গনে আসিয়া আছাড় খাইয়া কাঁদিয়া পড়িলেন, তখন সেই করুণ দৃশ্য দেখিয়া আমাদের পাষাণ প্রাণও ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। বলুন দেখি মা! এ অবস্থায় স্বজাতির স্বধর্ম্মীর এ দুঃখ দেখিয়া কি চুপ করিয়া থাকা যায়? সকলে আমাকে অবিবাহিত ও কায়স্থ দেখিয়া পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেন। তাহারা দত্ত কায়স্থ শুনিয়া ও কন্যাটীর জাত যায় দেখিয়া আমি তাহাকে বিবাহ করিয়াছি। ইহাই আমার অপরাধ, ইহাই আমার ত্রুটি। আমার এ অপরাধ ক্ষমা করিবেন কি? সে সময়ে আপনার অনুমতি লইয়া বিবাহ করিবার অবসর ছিল না। জানি আপনি আমাদের বংশ গৌরবকে প্রাণাপেক্ষা মূল্যবান জ্ঞান করেন, কিন্তু উপায় ছিলনা বলিয়া এই কার্য্য করিয়াছি। যদি ক্ষমা করেন, তবে আপনার দাসীকে লইয়া আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিতে যাইবার অনুমতি দিবেন।

সাক্ষাতে সমস্ত কথাই শ্রীচরণে নিবেদন করিব। ইতি

প্রণত সেবক

শ্রীঅনাথনাথ মিত্র।

পত্রখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া গৃহিণীর চক্ষু দুটী বিস্ময় বিস্ফারিত হইল। প্রথমটা পত্রের কথায় তাঁহার বিশ্বাস করিতেই প্রবৃত্তি হইল না।

বার বার তিনবার পাঠ করিবার পর যখন ব্যাপারটা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল, তখন তাঁহার নাসিকান্ধ্র স্ফীত হইয়া উঠিল, দুই তিনটা বড় বড় দীর্ঘশ্বাস প্রবাহিত হইল। তাঁহার দিবা নিদ্রা দূরে গেল। উঠিয়া বসিয়া পত্রখানাকে মুষ্টির ছাপে পিষ্ট করিয়া আপনা আপনি বলিয়া উঠিলেন, "হাড়ীর মেয়েই বিয়ে কর, আর মুচির মেয়েরই গলায় মালা দে, আমায় জানিয়ে কর্‌লি নি কেন? আমি কি দাসী বাঁদীর সামিল হলুম?"

(২)

পটলডাঙ্গার বাসায় জমিদার পুত্র (এখন স্বয়ং জমিদার) অনাথনাথ অস্থিরচিত্তে বারাণ্ডায় পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছে। তাহার কোন চিন্তা নাই। ভাবনা নাই। সংসারে অর্থবল ও লোকবলে যাহা কিছু ভোগ আসিতে সম্ভবে, অনাথনাথের তাহার কিছুরই অভাব ছিল না। সে রাজীবপুরের ৺রমানাথ মিত্রের একমাত্র পুত্র, মিত্রদের অগাধ বিষয়ের একমাত্র মালিক। তাহার মুখের কথা খসিতে না খসিতে দশজনে আজ্ঞাপালন করিতে ছুটিয়া আসে, তাহার অভাবের কথা জানাইতে না জানাইতে তাহার সকল অভাব পূর্ণ হয়। অথচ আজ সে কিসের অভাবে এত চিত্ত-চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছে?

আজ একসপ্তাহ মাত্র তাহার বিবাহ হইয়াছে, অথচ এযাবৎ সে জননীর স্নেহমাখা পত্রে বঞ্চিত রহিয়াছে। তবে কি জননী অসন্তুষ্ট হইলেন? কেন জবাব আসে না? তিনি ত কখনও এমন নীরব থাকেন না। যতই দোষ অপরাধ করুক সে, তাঁহার জননী একদিনও ত তাহার খবর না লইয়া থাকিতে পারেন না।

বিবাহের পর নব পরিণীতা বধূকে তাহার জননীর নিকট রাখিয়াই অনাথনাথ চলিয়া আসিয়াছিল। শাশুড়ীকে বুঝাইয়াছিল, আগে জননীকে সন্তুষ্ট করিয়া তাহার পর বধূকে লইয়া যাইবে। পটল ডাঙ্গার বাসায় স্ত্রীলোকের সম্পর্ক নাই, সেখানে তাহার পড়িবার আস্তানা বলিয়া কেবল চাকর বামুন দরোয়ান থাকে মাত্র; সুতরাং সেখানে সস্ত্রীক উঠিবার ব্যবস্থা হইতে পারে না।

যতই রেলগাড়ী বালুনঘাটকে পশ্চাতে রাখিয়া কলিকাতার দিকে অগ্রসর হয়, ততই অনাথনাথের মনে তাহার কৃতকার্য্যের পরিণামফল কণ্টকাকীর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হইতে থাকে। সে তাহার জননীর দারুণ

বংশাভিমানের কথা জানিত। সমান ঘরে বিবাহ না করিলে—বিশেষতঃ তাঁহার বিনা অনুমতিতে—তাহার জননী যে তাহাকেও সহজে ক্ষমা করিবেন না, তাহা সে মানসচক্ষে স্পষ্টই দেখিতে পাইল। এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে, সে তাহার জননীকে বংশ গৌরবের যূপকাষ্ঠে স্বভাব জাত স্নেহদয়ামায়া অম্লান বদনে বলি দিতে দেখিয়াছে। তাহার একমাত্র ভগিনীর যে জমিদার ঘরে বিবাহ হইয়াছিল, সামান্য কারণে তাহাদের সহিত মনান্তর হওয়াতে তাহার জননী তাহার ভগিনীকে শ্বশুরালয় হইতে দীর্ঘকাল আনয়ন করেন নাই বা কোনও রূপে কোনওভাবে সেই কুটুম্ব-গৃহের সহিত সম্পর্ক রাখেন নাই। উষা (তাহার ভগিনী) কত কাঁদিয়া কাটিয়া লিখিয়াছে, কত লুকাইয়া খবর পাঠাইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই গৃহিনীর মন টলে নাই। সুতরাং তাহার হঠকারিতা জননী কি ভাবে লইবেন, অনাথ সে বিষয়ে ভাবিয়া কুলকিনারা পাইল না। অনাথ তাহার জননীর বড় আদরের ছিল বটে; কিন্তু সেই ভালবাসার ভিতরেও একটা কেমন দূরত্বের ভাব একটা কেমন প্রাধান্যের ভাব, একটা কেমন গর্ব্বের ভাব মিশ্রিত ছিল; অনাথ সেই ঝাঁঝের কাছে ঠিক প্রাণ খুলিয়া নিজের ভালবাসাটা পৌঁছাইয়া দিতে সাহস করিত না।

আজ অনাথের মনটা বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। সাত দিন অতীত হইয়াছে, অথচ একখানিও পত্র নাই, একটা জবাব নাই। তখন যথার্থই তাহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। যদি জননী এই বিবাহ গ্রাহ্য না করেন। তাহা হইলে সে কি করিবে? তাহার আরাধ্যা জননীকে সে ত ত্যাগ করিতে পারিবে না। তবে কি সে পত্নী ত্যাগ করিবে? তাহার কি অপরাধ? সে ত অবলা পরাদেশ বর্ত্তিনী বালিকা, কোন্ অপরাধে সে পরিত্যক্তা হইবে। আহা সে বড় দুঃখিনীর সন্তান, জন্মাবধি দুঃখই ভোগ করিয়া আসিয়াছে?

কিন্তু জননী কি এতই অবুঝ হইবেন? যদি তাঁহার পায়ে ধরিয়া এই দুঃখিনীদের হইয়া কাকুতি মিনতি করি, তাহা হইলেও কি তাঁহার মনে দয়া হইবে না? অবশ্যই হইবে। আচ্ছা, মা পত্রের জবাব দিলেন না কেন? তবে কি—তবে কি—মিথ্যা অপবাদের কথা কেহ তাঁহার কাণে লাগাইয়া মন ভারি করিয়াছে? না, না, তাহা হইতেই পারে না। কে এমন শত্রু আছে, মিথ্যা কলঙ্কে বিশ্বাস করিয়া দুঃখিনীদের এমন সর্ব্বনাশ করিবে?

অনাথনাথের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। ভৃত্য একখানি ডাকের চিঠি দিয়া গেল। চিঠি খানি আসিতেছে তাহার শ্বশুরালয় হইতে। তুরসম্পর্কীয় যে ভদ্রলোকটা মাঝে দাঁড়াইয়া দুঃখিনীর কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন, পত্রখানি তিনিই লিখিতেছেন। পত্রে আছে, বিবাহের পরদিন হইতে কন্যার জননীর জ্বর হইয়াছে, সেই জ্বর বিকারে পরিণত হইয়াছে, এখন জীবন সংশয়, এ সময় অনাথনাথের উপস্থিতি ও সাহায্য একান্ত প্রয়োজন।

অনাথনাথের চক্ষুস্থির হইল। মাত্র ৮ দিন বিবাহ হইয়াছে, ইহার মধ্যে একি অশুভ সংবাদ! যদি অপ্রত্যাশিত বিপদ বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় পতিত হয়। অনাথ অস্থির হইয়া উঠিল! সেই দিনই বিকালের গাড়ীতে শ্বশুরালয়ের গ্রামে রওনা হইল।

মানুষের শতচেষ্টাতেও বিধাতার অমোঘ বিধান লঙ্ঘিত হয় না। অনাথের সংসার জ্ঞানানভিজ্ঞা জননী গত প্রাণা বালিকা বধূ কাঁদিয়া পৃথিবী ফাটাইয়া দিয়াও জননীকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না, মাত্র ৬।৭ দিনের জ্বর ভুগিয়া তাহার দুঃখিনী জননী এই কষ্টময় পৃথিবীর সকল জ্বালাযন্ত্রণার হাত এড়াইয়া অন্য জগতে মহাপ্রয়ান করিলেন।

তখন অনাথের সম্মুখে এক মহাসমস্যা উপস্থিত হইল। যিনি মোড়ল হইয়া আশার (অনাথের নবপরিণীতা) বধূর বিবাহ দিয়াছিলেন, তিনি স্পষ্ট জবাব দিলেন, "তিনি নিজের সংসায়ের জ্বালায় জ্বালাতন, তিনি পরের ঝুঁকি ঘাড়ে লইবেন না।" তিনি যখন এমন কথা বলিলেন, তখন গ্রামের পরিচিত অপর কোনও আত্মীয় যে অনাথার বিশেষতঃ কপর্দ্দকহীনা অনাথার ভার লইবার সময় আমতা আমতা করিয়া সরিয়া পড়িবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? সুতরাং শাশুড়ীর সৎকারের পর আশাকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসা ভিন্ন অনাথের উপারান্তর ছিল না। অথচ তখনও অনাথ জননীর কোনও অনুমতি পায় নাই! অনাথ কোন পথে যায়? একদিকে জননীর ক্রোধ ও উপেক্ষা, অপর দিকে সহায়হীনা অনাথা বালিকা বধূকে পথে বসান,—কোন্ কর্ত্তব্যের গুরুত্ব অধিক, অনাথ ভাবিয়া ভাবিয়া তাহার মীমাংসা করিতে পারিল না। যতই ভাবনা বাড়ে, ততই যে অনর্থের মূল এই আকাস্মিক বিবাহের উপর তাহার ক্রোধ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এবং বিবাহের উপর যতই সে ক্রুদ্ধ হয়, ততই এই অভাগিনী আশাকেই তাহার যত অনিষ্টের মূল বলিয়া মনে হয়। এই আশা যদি না জন্মিত, যদি এই আশা

দুঃখিনীর কন্যা না হইত, যদি আশা পরের দয়ায় বর্দ্ধিত হইয়া বিবাহযোগ্যা না হইত, যদি তাহার বিবাহকালে অনাথকে উপস্থিত থাকিতে না হইত—যত অনিষ্টের মূলই আশা! কি কুক্ষণেই জন্মিয়াছিল ঐ মেয়েটা! অনাথ লেখাপড়া শিখিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া সংস্কারের হাত এড়াইতে পারে নাই।

গাড়ীতে যখন আশাকে লইয়া অনাথ কলিকাতা রওনা হইল, তখন হইতে কেমন একটা বিরক্তির ভাব অনাথের মুখে চোখে প্রকটিত হইয়া উঠিল। আশা নিতান্ত বালিকাটী নহে, সে গরীবের মেয়ে বলিয়া এতদিন তাহার বিবাহ হয় নাই, নহিলে সে ষোড়শ বর্ষ বয়সে পদার্পণ করিয়াছে! সে আবক্ষ অবগুণ্ঠন টানিয়া বসিয়া থাকিলে, ক্বচিৎ দুই একবার সুযোগ পাইয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছিল। বুদ্ধিমতী বালিকা—সংসারের দুঃখ কষ্টের পাঠশালে পড়িয়া অতি অল্প বয়স হইতেই সে সংসার জ্ঞানবৃদ্ধা গুরুগম্ভীর প্রকৃতি বিশিষ্টা হইয়া উঠিয়াছিল। এই কচি বয়সেই তাহার মুখে বালিকাবয়সোচিত চাঞ্চল্য বা হাসি তামাসার কোনও লক্ষণই দেখা যাইত না। সুতরাং ভূয়োদর্শনের ফলে সে দুই একটী চকিত চাহনিতেই স্বামীর মনোভাব স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিল। পারিয়াছিল বলিয়াই তাহার বিষাদক্লিষ্ট মুখ আরও মলিন হইয়া উঠিল, বাতনার একটা অস্পষ্ট অভিব্যক্তির মত দীর্ঘশ্বাস তাহার বক্ষভেদ করিয়া উত্থিত হইল।

ঠিক সেই সময়ে অনাথ বিরক্তিস্বরে বলিয়া উঠিল, "আঃ এই পৃথিবীতে মেয়েমানুষগুলো না থাকে! বিবাহটা উঠে যায়!"

আশা ভয়ে জড়সড় হইয়া গাড়ীর কোণ ঘেঁসিয়া অন্ধকারে মিলাইয়া যাইবার চেষ্টা করিল। সে ভাবিল, সে যেন সকল দোষে দোষী; তাহার মত তুচ্ছ নগণ্য একটা জীবকে বিবাহ করিয়া তাহার দেবতুল্য স্বামী মহাপাপ করিয়াছেন!

সারা পথটা উভয়ের মধ্যে এমনই একটা নীরবতা ও কঠোরতার ব্যবধান দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ কত নিকট, অথচ কত দূর বলিয়া অনুমিত হইতেছে! আশা মাতৃশোকে অন্তরে গুমরিয়া কাঁদিতেছিল। সংসারে একা মা বলিয়া একমাত্র আপনার জনকে সে জানিত, জ্ঞান হইয়া অবধি সে পিতাকে দেখে নাই; সুতরাং সেই মা হারা হইয়া তাহার সংসারদুঃখ প্রাণটা হা হা করিয়া কাঁদিতেছিল।

সে শোকে স্বামীর শান্তনার পরিবর্ত্তে সে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ও অনাদরই পাইতেছিল। তাহার শোক ও অভিমান যেন দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। অশা দরিদ্রের কন্যা হইলেও তাহার নারীত্ব মর্য্যাদা জ্ঞান বড় প্রবল ছিল। অন্য বালিকা হইলে বিবাহের পরেই স্বামীর আদর অনাদরের জন্য বড় একটা লালায়িত হইত না, হয় ত তাহাদের সে অনুভব শক্তিই থাকিত না; কিন্তু আশা সে ধাতুতে গঠিত নহে, সে স্বামীর অনাদর হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছিল।

কলিকাতার বাসায় পৌঁছিয়া অনাথনাথ হাত মুখ ধুইয়া তাহার পড়িবার ঘরে গিয়া বসিল। শয়নকক্ষে একা থাকিতে আশার প্রাণ হাপাইতে লাগিল। বাসায় পাচক, দাস দাসী ও বৃদ্ধ সরকার ব্যতীত আত্মীয়স্বজন কেহ নাই। আশা জানালার ফাঁক দিয়া রাজপথের জনস্রোত দেখিতে লাগিল, সে স্রোতের যেন আর বিরাম নাই! কোথায় তাহাদের ক্ষুদ্র গ্রাম, আর কোথায় এই বিরাট সহর কলিকাতা। এ বিরাটের মাঝে কি আশার ক্ষুদ্র অস্তিত্ব মিলাইয়া যায় না!

অনাথনাথ একটু প্রকৃতিস্থ হইলেই বৃদ্ধ সরকার মহাশয় একখানি পত্র আনিয়া তাহার হাতে দিল। পত্রখানি দুই দিন হইল আসিয়া পড়িয়া আছে। পত্রের শিরোনামায় তাহার দেশের ডাকঘরের ছাপ দেখিয়া অনাথের প্রাণটা চমকিয়া উঠিল। বিশেষতঃ যখন তাহার নাম ঠিকানা তাহার জননীর স্বহস্তে লিখিত দেখিল, তখন আর তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাহার জননী নিজে কখনও পত্র লিখেন না, তিনি বলিয়া দেন, অপরে লিখে। কিন্তু এক্ষেত্রে বিপরীত ভাব কেন? নিশ্চিতই অপরের পক্ষে পত্রমর্ম্ম গুপ্ত থাকে ইহাই জননীর ইচ্ছা। অতি গোপনীয় না হইলে এমন দায় হইত না। ভয়ে বিস্ময়ে অনাথের বুক গুরু গুরু করিয়া উঠিল। না জানি কি লেখাই আছে! চিঠি খুলিতে অনাথের হাত কাঁপিয়া উঠিল। শেষে অনাথ বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে পড়িতে লাগিল:—

কল্যাণবরেষু—

আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে কয়দিন তোমার পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হইল, তাহার কারণ একটা বিষয়ে আমি অনুসন্ধানে ব্যস্ত ছিলাম। অনুসন্ধান শেষ হইয়াছে। অকারণে তোমায় অপরাধী করিব না বলিয়াই আমি প্রকৃত ঘটনা ও অবস্থা জানিতে চাহিয়াছিলাম। এখন জানিয়াছি, তাই ধর্ম্মের কাছে খালাস হইয়া তোমায় এই পত্র লিখিতেছি।

তুমি যে ঘরে বিবাহ করিয়াছ, তাহার পরিচয় সমস্তই সংগ্রহ করিয়াছি। সুতরাং মুচির মেয়েকে বউ বলিয়া বরণ করিতে আর যে পারে করুক আমি পারিব না, বিশেষতঃ আমার তীর্থ এই পরম পবিত্র শ্বশুরের ভিটায়। ইহা বুঝিয়া কার্য্য করিবে।

তুমি এখন শ্বশুরের সমস্ত বিষয় সম্পত্তির মালিক; সুতরাং কলিকাতায় কি আর এখানেই কি—যেখানে শ্বশুরের কণামাত্র সম্পত্তি আছে, সবই তোমার। তোমার ইচ্ছা হইলে যেখানে খুসি যাহাকে ইচ্ছা লইয়া বাস করিতে পার। সুতরাং ইচ্ছা করিলে তুমি কলিকাতার বাসায় বা এখানকার ভিটায় অথবা নিমুলতলা বা কাশীর বাটীতে তোমার পত্নী বলিয়া পরিচিত স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইয়া বাস করিতে পার, কাহারও সাধ্য নাই তোমায় নিষেধ করে। কিন্তু যদি দেশের ভিটায় সপরিবারে বাস করাই তোমার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ দিও, মুচির মেয়ে এখানে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে আমি কাশীবাসিনী হইব।

তোমার কল্যাণ নিয়ত ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতেছি। আশীর্ব্বাদ করি, চিরজীবী হও।

ইতি নিত্য আশীর্ব্বাদিকা
তোমার মাতা।

কি ভয়ানক পত্র! এতটুকু দয়ামায়ার কথা নাই! না হয় না বলিয়া বিবাহ করিয়া সে একটা অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিয়াছি কিন্তু তাহার ক্ষমা কি নাই? কথায় বলে, কুপুত্র যদি বা হয়, কুমাতা কদাপি নয়। গরীবের মেয়ে হইলেই কি মুচির মেয়ে হইতে হইবে? সত্য বটে, তাহার শাশুড়ী পরের ভাত খাইতেন বলিয়া দুষ্ট লোক তাঁহার অপবাদ রটাইয়াছিল, কিন্তু সে অপবাদ ত মিথ্যা। তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া জননী এমন নিষ্ঠুর হইতে পারেন!

কে তাঁহাকে এই মিথ্যা কলঙ্কের কথা লাগাইল? কে এমন শত্রুতাসাধন করিল? অনাথনাথ জানে, তাহার জননী কিরূপ বংশাভিমানিনী, কিরূপ নির্ব্বন্ধপরায়ণা। যখন একবার তাঁহার মনে এই ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে, তখন উহার উচ্ছেদসাধন করা সহজসাধ্য নহে। জননীর মনে এই ভাব বদ্ধমূল থাকিলে আশাকে আশ্রয় দেওয়া অসম্ভব। অথচ এই আশ্রয়হীনা অনাথা বালিকা কোথায় যাইবে? হাজার হউক, সে ত তাহার বিবাহিতা পত্নী—

বিবাহিতা? এই কথাটা মনে পড়তেই বিবাহের কথা স্বতঃই মনে উদিত লইল! অমনই শরীরটা তাহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। বিবাহটাই হইল অনর্থের মুল। অনাথ দারুণ ক্রোধভরে শয়নকক্ষে গিয়া পত্রখানা আশার কোলে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, "পড়! এখানা মার চিঠি: আমি দেশে চল্‌লুম! যদি তাঁর মন ফিরুতে পারি, তবে ফির্‌বো! না হলে এই পর্য্যন্ত।"

অনাথনাথ রাগে গর্‌গর্ করিতে করিতে বাহিরে চলিয়া গেল। আশা ভয়ে কাঁপিতেছিল। সে কেবল ভগবানকে মাথা কুটিয়া ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছিল, সে কি দোষে দোষী, তাহার কি পাপে স্বামীর এত মনস্তাপ!

(৩)

রাজীবপুরের কৃষ্ণনাথ শিরোমনির টোলে মহা তর্ক লাগিয়াছে। কৃষ্ণনাথ এতদঞ্চলে সাক্ষাৎ মনু অথবা দোফলা রঘুনন্দন বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে! প্রত্যহ দলে দলে গাঁয়ের ও ভিন্ন গাঁয়ের লোক তাঁহার নিকট ব্যবস্থা লইতে আসে! তাঁহার আরও একটা সুনাম আছে,—তিনি নাকি সিদ্ধ পুরুষ, মন্ত্র কবজাদি দানে তিনি নাকি মুমূর্ষু লোককেও প্রাণ দিতে পারেন। ডাক্তার কবিরাজে যে রোগীর আশা ছাড়িয়া দিয়াছে, এমন রোগীকেও নাকি তিনি তুলসীতলা হইতেও ফিরাইয়া আনিয়াছেন।

আজ এইমাত্র শিরোমনি মহাশয় একটা ব্যবস্থা দিয়া বলিয়াছেন, এমন সময়ে অনাথনাথ টোলে আসিয়া উপস্থিত। গত কল্য একাদশী তিথি গিয়াছে! ঐ দিন গ্রামের একটী একাদশ বর্ষীয়া বিধবা ব্রাহ্মণ বালিকা পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গিয়া দুই এক ঢোক জল খাইয়া ফেলিয়াছিল। শিরোমনি সবেমাত্র উহার প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থার কথা বলিয়া দিয়াছেন, এমন সময়ে অনাথকে দেখিয়া একগাল হাসিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "এই যে বাবাজী কি মনে করে এমন অসময়ে? কবে দেশে এলে?"

অনাথনাথ যথাযোগ্য সম্ভাষণাদি করিয়া বিনীতস্বরে বলিল, "আজ্ঞে, আজই এসেছি। আপনার কাছে একটা বড় প্রয়োজন আছে। যদি আপনার সময় থাকে, একবার শুন্‌বেন কি?

শিরোমনি বলিলেন, "এ্যাঁ, সে কি বাবা, তোমার প্রয়োজন শুন্‌বো না? কি জিজ্ঞাসা করবার আছে বল।"

অনাথনাথ উপবেশনান্তে বলিল, "ঠাকুর মশাই, একটা খারাপ কাজ করেফেলেছি, মা তাতে বড় বিরক্ত হয়েছেন। তিনি আপনার কথা শোনেন, আপনাকে মধ্যস্থ থেকে মাকে ঠাণ্ডা করতে হবে। "এইরূপ ভণিতা করিয়া অনাথনাথ তাহার বিবাহের কথা আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিল।

কথা শুনিতে শুনিতে ঠাকুর মহাশয়ের মুখ গম্ভীর হইল। ক্ষণেক নীরব থাকিয়া শিরোমণি বলিলেন, "তা, এতে আমি কি করতে পারি?"

"আপনি? আপনি সবই করতে পারেন। আপনি যদি মাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ব্যবস্থা দিয়ে আসেন, তাহা হইলে সব দিক বজায় থাকে?"

"আমার দ্বারা তা হবে না বাপু, আমি অধর্ম্ম করতে পারবো না।"

"অধর্ম্ম? অধর্ম্ম কিসে হ'ল? আপনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, শাস্ত্রজ্ঞানী পণ্ডিত, আপনিই বিবেচনা করে দেখুন, অগ্নি সাক্ষী করে শাস্ত্রসম্মত বিবাহ করেছি, স্বজাতি স্বধর্ম্ম এতে কি দোষ হয়েছে? আর যদিই বা মার অনুমতি না নিয়ে বিবাহ করে আমার অপরাধ হয়ে থাকে, সেই দুঃখিনী বালিকার কি অপরাধ হয়েছে?"

শিরোমণি জলদগম্ভীরনাদে বলিবেন, "কি অপরাধ করেছে? জেনে শুনে দোষগ্রস্ত হয়েও তোমাকে বিবাহ করে সে নিজেও পাপ করেছে, তোমাকেও পাপে ফেলেছে। দোষ করেনি আবার?"

অনাথ তখনও বিনীতস্বরে বলিলেন, "আপনি রাগ করছেন কেন ঠাকুর মহাশয়? সে বালিকা কি করে জেনে শুনে দোষগ্রস্ত হয়েও বিবাহ করবে? বিশেষতঃ তার জননীর দোষগ্রস্ত হওয়ার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। মিথ্যা অপবাদে বিশ্বাস করে একটা জীবনকে ব্যর্থ করা কি শাস্ত্রের নির্দ্দেশ?

"পাঁচ শ বার। অপবাদ কি অমনই রটেছে? আমার শ্বশুরালয়ের পাশেই ত সেই গ্রাম! আমি সব শুনে এসেছি। সব কথাই জানি।"

"দেখুন, অপবাদ অমন কত রটে থাকে। দুঃখিনীর আর কেউ ছিল না বলে কন্যাকে নিয়ে ঐ দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের গলগ্রহ হয়েছিল। শ্বশুর-বাড়ীতে স্থান পেলে কি তার এমন দশা হত? সে ত আমাদের সমাজের দোষ?"

শিরোমণি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "সমাজের দোষ? সমাজ কি পাপকে প্রশ্রয় দেবে? দু-পাতা ইংরেজী পড়ে এই বিদ্যে হয়েছে বটে? তোমার বাপ পিতামহ ত এমন ছিল না।"

"আজ্ঞে, আপনি ভুল বুঝ্‌চেন কেন? সমাজের দোষ অর্থে আমি ঐ বিধবাকে তার শ্বশুরঘর থেকে তাড়ানর কথা বল্‌ছি।"

"শ্বশুরঘরে যখন জায়গা হল না, তখন ভিক্ষে করে খেলে না কেন? পরের ঘরে কি সুবাদে আশ্রয় নিয়েছিল? তার রূপ যৌবন ছিল বলে পরের স্কন্ধে গিয়ে চেপে বসেছিল ত! সব শুনেছি হে, সব শুনেছি তোমায় না জানতে চেয়েছিল বলে সব খবর নিয়ে এসেছি।"

এতক্ষণে অনাথনাথ ধৈর্য্যহারা হইল। সে ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া বলিল, "ওঃ তাহলে আপনিই এই কুকার্য্য ঘটিয়েছেন? আপনাদের এই কাজ? আপনারা না সমাজের মাথা, ব্যবস্থাদাতা? আপনারাই না সমাজ নিয়ে আছেন, ধর্ম্ম নিয়ে আছেন? অপবাদ কার না রটে? স্বয়ং ভগবানেরও রটেছিল। তাই বলে আপনি জ্ঞানী হয়ে মূর্খের মত, খলের মত, কোনও কিছু অনুসন্ধান না করে পরের কুৎসাটা মিষ্টি লাগে বলে। শুনবামাত্র বিশ্বাস করলেন?"

শিরোমণির চক্ষু জবাফুলের মত হইয়া উঠিল, সর্ব্বশরীর ক্রোধে থর্ থর্ কাঁপিতে লাগিল, তিনি চীৎকার করিয়া জবাব দিতে গেলেন, বিষম ক্রোধে ভো ভো করিয়া কথা বাহির হইল না, মুখ দিয়া ফেণপুঞ্জ নির্গত হইল।

অনাথনাথ তাঁহার নিকট সুবিচারের আশায় নিরাশ হইয়া তাঁহাকে দুই কথা শুনাইয়া দিবার লোভ ছাড়িতে পারিল না। সে বলিল, "অনেক আশা করে আপনার কাছে এসেছিলুম। দেখুন রেল থেকে নেমে আমি বাড়ী না গিয়ে আপনার কাছে এসেছি, আর আপনিই কিনা মার এ ... কঠিন হবার কারণ! তা বেশ শিক্ষা হয়েছে। আপনাদের সম্মান এই রকমে আপনারাই হারাচ্ছেন। আপনি জানেন, বিবাহের সময় গ্রামের সকল লোকই বিবাহে কন্যাযাত্রী হয়ে এসেছিল, সকলেই খেয়েছিল, কারণ অপবাদ সত্য হলে কেউ তা করতো? প্রথম বরপক্ষরা অপমানিত হয়েছিল বলে এই কলঙ্ক গ্রামের আশেপাশে রটিয়ে গিয়েছিল। শত্রু সকলেরই আছে! তাই গ্রামের যে দুই এক জন শত্রু ছিল, তারাই কথাটা ফেনিয়ে তুলেছে।"

শিরোমণি মহাশয় তখন কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন, তাই ব্যঙ্গের সুরে বলিলেন, "তারা মায়ে ঝিয়ে সতী সাবিত্রী, আমরা খল, মূর্খ। তবে আমাদের কাছে এসেছো কেন বাপু? তুমি বড়মানুষের বেটা, জমিদার; আমরা দুঃখী ব্রাহ্মণ, আমাদের যা ইচ্ছা তাই বলতে পার। তুমি জমিদার হতে পার, কিন্তু তা বলে জেনে শুনে অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিতে পারবো না।"

অনাথনাথের রাগ পড়িয়া গিয়াছিল। অপ্রস্তুত হইয়া তাঁহার চরণে ধরিয়া বলিল, "ঠাকুর মশাই, রাগের মাথায় যা বলেছি, ক্ষমা করবেন রাগ চণ্ডাল। আপনাদের ক্ষমাই গুণ। আমার একটা উপায় করে দিন।"

"কি উপায় করব? শাস্ত্রে ত এর কোনও ব্যবস্থা নেই।"

"আছে বৈ কি? এইমাত্র এই ছোট বিধবা মেয়েটীর একাদশীতে জলখাওয়ার প্রায়শ্চিত্তের কথা বলে দিলেন, এই রকমে একটা যা হয় প্রায়শ্চিত্তের কথা মাকে বুঝিয়ে বলুন, ভগবান আপনাকে দয়া করবেন।"

"দেখ বাবা, হিন্দুশাস্ত্র বড় কঠিন। এর আদেশ পালন করা যে কত শক্ত তা আমরা বামুন পণ্ডিতরাই জানি। এতে যে কত স্বার্থত্যাগ, কত সংযম, কত সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিতে হয়, তা অনধিকারীরা বুঝতে পারবে না। ... দেখ না, ব্রহ্মচর্য্যে অভ্যস্ত করবার জন্য ঐ ছোট বিধবা মেয়েটীকেও একাদশীর দিন ডুব দিতে গিয়ে জল খেয়েছে বলে একটা প্রায়শ্চিত্তের একটা পাপের শাস্তির ব্যবস্থা দিলুম।"

শৈশব-সঙ্গীত।

লেখিকা—শ্রীমতী হরিরমা সিংহ।

(১)

থাকি থাকি মনে পড়ে শৈশবের গান—
কোথায় শৈশব মম করিলে পয়াণ।
তোমারে হারায়ে ভাই, প্রাণে মোর শান্তি নাই,
তোমারে খুঁজিয়া আমি মরি যে কেবল,
কোথা গেলে প্রাণে মোর দিয়া চিন্তানল?

(২)

শুইয়া তোমার সেই শান্তিময় কোলে—
কত খেলা খেলিয়াছি, কত সুখ লভিয়াছি,
আজও সেই স্মৃতি খেলাহৃদয়ের তলে!
তোমার কোলেতে ছিনু শুইয়া যখন,
কপালে পরেছি চাঁদ ধরেছি তপন।

(৩)

মরুভূমি সরজিনী দেখেছি তখন,
গনেছি তারকাদল, শুখাইয়েছি সিন্ধুজল,
ভক্ষিয়াছি ফুলবাস মেলিয়া বদন,
দেখিয়াছি, দেবদেশ নন্দন কানন
কভু বা ছুটিয়া গেছি ধরিতে গগধ।

(৪)

কে আমি কিসের তরে এ'সেছি এখানে
এ কথা তখন ভাই, মরমেতে জাগে নাই,
ছিলনা ভাবনা লেখা একবিন্দু মনে
বিষয় লালসা মাঝে হইয়ে মগন ;
তখন ত ছিল না আমার এ মন।

(৫)

রোগ শোক তাপ পাপ কই এতদিন—
আমার সুখের প্রাণ, করে নাই আনচাম,
এক দণ্ড তরে হিয়া হয়নি মলিন।
তখন সবার কাছে পেয়েছি আদর,
এখন আমাকে সবে ভাবে পর।

(৬)

আজও ত সেই সব আছে এ ধরায়—
আজও ত সেই গাছে, সেই ফুল ফুটে আছে,
কেবল আমার প্রাণ-শান্তিশূন্য হায়,
কোথায় শৈশব মম করিলে গমন ;
হৃদয়ের সুখ শান্তি করিয়া হরণ !

(৭)

তোমারে খুজিয়া আমি মরি চিরদিন
স্মৃতিটুকু মোরে দিয়া, গেলে তুমি পলাইয়া,
তোমার বিরহে আমি হইয়াছি দীন ;
তব কোলে স্থান মোরে দাও আর বার !
অশান্তি যাতনা পুড়ে হোক ছার খার।

(৮)

তোমারে হারায়ে সদা দহিছে পরাণ—
জানিনা কি পাপ ফলে, হৃদয় যেতেছে জ্বলে,
জানিনা যে কত দিনে হবে এ নির্ব্বাণ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

জন্মভূমি

২৬শ, বর্ষ। ১৩২৭ সাল, মাঘ। ১০ম সংখ্যা।

কোষ্ঠীশিক্ষা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত পশুপতি সরকার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জন্ম শকাব্দা ও মাসাদি।

জন্ম কুলগুলী চক্রের উপরে প্রথমে জন্ম সন, ইংরাজী জন্ম খৃষ্টাব্দ ও জন্ম শকাব্দার অঙ্ক লিখিয়া পরে জাতকের যে মাসে জন্ম হয়, তাহার পূর্ব্ব মাসের অঙ্ক যথা বৈশাখ হইলে ০, জ্যৈষ্ঠ হইলে ১, আষাঢ় মাস হইলে ২, শ্রাবণ মাস হইলে ৩, ভাদ্র মাস হইলে ৪, আশ্বিন মাস হইলে ৫, কার্ত্তিক মাস হইলে ৬, অগ্রহায়ণ মাস ৭, পৌষ মাস হইলে ৮, মাঘ মাস হইলে ৯, ফাল্গুন মাস হইলে ১০, ও চৈত্র মাস হইলে ১১ লিখিতে হয়। মাসাঙ্কের পর জন্ম তারিখের পূর্ব্ব তারিখের অঙ্ক যথা মাসের ১লা তারিখে জন্ম হইলে, ও ২রা তারিখে জন্ম হইলে ১, ৩রা তারিখে জন্ম হইলে ২, ৪ঠা তারিখ জন্ম হইলে ৩, ৫ই তারিখে জন্ম হইলে ৪, ৬ই তারিখে হইলে ৫, ৭ই তারিখে হইলে ৬, ইত্যাদি রূপে

লিখিতে হয়। অবশেষে জাতকের যত দণ্ড পলাদি সময়ে জন্ম হইয়াছে তাহার অঙ্ক ঠিক ঠিক লিখিয়া যাইতে হয়। যদি কোন জাতকের রাত্রিতে জন্ম হয় তাহা হইলে ঐ দিন সূর্য্যের উদয়কাল অবধি জন্ম সময় পর্য্যন্ত যত দণ্ড পলাদি হয়, তাহার অঙ্ক লিখিতে হইবে।

জন্ম দিন ও তাহার পূর্ব্ব বা পর দিন।

জাতকের জন্মকুণ্ডলী চক্রের দক্ষিণে ও বামে জন্ম দিনের এবং তাহার পূর্ব্ব বা পর দিনের সংখ্যা দ্বারা তিথি বার ইত্যাদি লিখিত থাকে। যথা পূর্ব্বোক্ত জাতকের জন্ম দিনের নিম্নে ১ম শ্রেণীতে ৫ এই সংখ্যা লেখা আছে। ইহা দেখিয়া বুঝিতে হইবে যে, পঞ্চমবারে অর্থাৎ বৃহস্পতিবারে জাতকের জন্ম। পরবর্ত্তী অঙ্ক ৯ অর্থাৎ শুক্ল নবমী তিথি। এই শ্রেণীর পরবর্ত্তী অঙ্কগুলি ঐ নবমী তিথিরই অন্তর্গত স্থিতি কাল। দ্বিতীয় শ্রেণীর উপরিস্থ ২২ অঙ্কটী নক্ষত্র বোধক, অর্থাৎ শ্রবণানক্ষত্রে জাতকের জন্ম। তৎপরে ৩টী অঙ্ক। ঐ নক্ষত্রের স্থিতি দণ্ড পলাদি। নিম্নস্থ ৩ অঙ্ক করণ বোধক। অর্থাৎ জাতকের কৌলবকরণ। তৃতীয় শ্রেণীর প্রথম ৮ অঙ্ক যোগ সূচক অর্থাৎ জাতকের ধৃতি যোগে জন্ম। পরবর্ত্তী অঙ্ক তিনটী ঐ যোগের স্থিতি দণ্ড পলাদি। সর্ব্বশেষস্থ ৩০ অঙ্ক ঐ দিনের তারিখ। কুণ্ডলী চক্রের বামদিকস্থ পূর্ব্ব দিনের অঙ্কগুলিও ঐ রূপে তিথি নক্ষত্রাদি বোধক। পূর্ব্ব বা পরদিন দিবার তাৎপর্য্য এই যে, জাতকের যে নক্ষত্রে জন্ম তাহা পূর্ব্ব বা পরদিনে থাকিতে পারে। অথচ নক্ষত্র অনুসারে যখন দশা নিরূপণ হয় তখন সেই নক্ষত্রের পরিমাণ জানা নিতান্ত আবশ্যক নয় কি?

জন্ম কুণ্ডলী চক্র।

রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু এই নয়টী গ্রহ মেষাদি দ্বাদশ রাশিতে সর্ব্বদা ভ্রমণ করেন। রবি এক রাশিতে এক মাস, চন্দ্র সওয়া দুই দিন মঙ্গল তিন পক্ষ বুধ আঠার দিন, বৃহস্পতি এক বৎসর, শুক্র আটাইশ দিন, শনি আড়াই বৎসর, রাহু ও কেতু দেড় বৎসর অবস্থান করেন। এইরূপে গ্রহগণ জাতকের জন্মলগ্নে ও তথা হইতে অন্যান্য স্থানে অবস্থিত হইয়া জাতকের কর্ম্মানুসারে শুভাশুভ ফল দাতা হয়েন। জাতক

সুকৃতিসম্পন্ন হইলে গ্রহগণ কুণ্ডলীচক্রের শুভস্থানে অবস্থান করিয়া শুভফল প্রদান করেন। এবং জাতক কুকর্ম্মান্বিত হইলে গ্রহগণ অশুভ স্থানে অবস্থান করিয়া অশুভ ফল দাতা হয়েন।

জাতকের জন্ম সময়ে কোন গ্রহ কোন রাশিতে অবস্থান করিতেছেন, তাহা পঞ্জিকা দেখিয়া সহজেই নির্ণয় করা যায়। আজ কাল বিশুদ্ধ পঞ্জিকায় প্রত্যেক তারিখের বাম দিকে গ্রহগণের স্ফুট লেখা থাকে তাদৃষ্টে জন্মদিনের কোন গ্রহ কত অংশ কত কলাতে অবস্থান করিতেছেন, তাহা জানিতে পারা যায়। যথা—১৩০৩ সালের পঞ্জিকায় ৩০শে আশ্বিন তারিখের বাম পার্শ্বে দেখুন. রবি ৫।২৯।২৬।৫৬, চন্দ্র ৯।১৩।৫০।২০, মঙ্গল ২।১।৯।২৩। বুধ ৫।১৫।১৭।৩৬, বৃহস্পতি ৪।১১।৪০।৪৯, শুক্র ৬।২৬।২৭।১৫, শনি ৬।২৫।৫৪।৩৩, রাহু ১০।০।৪৮;০, কেতু ৪।০ ৪৮।০, ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, ঐদিন সূর্য্যোদয় কালে রবি ৫ সংখ্যক (অর্থাৎ সিংহ) রাশিকে অতিক্রম করিয়া তাহার পরস্থিত কন্যা রাশির ২৯ অংশ ২৬ কলা ৫৬ বিকলাতে অবস্থান করিতেছেন। চন্দ্র ৯ সংখ্যক (অর্থাৎ ধনু) রাশিকে অতিক্রম করিয়া তাহার পরস্থিত মকর রাশির ১৩ অংশ ৫০ কলা ২০ বিকলাতে অবস্থান করিতেছেন। মঙ্গল ২ সংখ্যক (অর্থাৎ বৃষ) রাশিকে অতিক্রম করিয়া তাহার পরস্থিত মিথুন রাশির ১ম অংশ ৯ কলা ২৩ বিকলাতে, বুধ ৫ম সংখ্যক (অর্থাৎ সিংহ) রাশিকে অতিক্রম করিয়া কন্যা রাশির ১৫ অংশ ১৭ কলা ৩৬ বিকলাতে, বৃহস্পতি ৪ সংখ্যক (অর্থাৎ কর্কট) রাশিকে অতিক্রম করিয়া সিংহ রাশির ১১ অংশ ৪০ কলা ৪৯ বিকলাতে, শুক্র ৬ সংখ্যক (অর্থাৎ কন্যা) রাশিকে অতিক্রম করিয়া তুলা রাশির ২৬ অংশ ৫৪ কলা ৩৩ বিকলাতে, রাহু ১০ অংশ (অর্থাৎ মকর) রাশিকে অতিক্রম করিয়া কুম্ভরাশির ০ অংশ ৪৮ কলাতে, কেতু ৪ সংখ্যক (অর্থাৎ কর্কট) রাশিকে অতিক্রম করিয়া তাহার পরস্থিত সিংহ রাশির ০ অংশ ৪৮ কলাতে অবস্থান করিতেছেন।

এখন পূর্ব্বোক্ত জাতকের ১২টী কোষ্ঠযুক্ত একটী কুণ্ডলী চক্র অঙ্কিত করিয়া বৃশ্চিক রাশিতে "লং" এই চিহ্ন দিয়া ১৩০৩ সালের ৩০শে আশ্বিনের স্ফুট দেখিয়া গ্রহ সন্নিবেশ করা হইল এবং আশ্বিন মাসের কুজাদি গ্রহের সঞ্চার ও রাশি চক্র দেখিয়া কোন্ গ্রহ কোন্ নক্ষত্রে আছেন তাহাও দেওয়া হইল। জাতকের কুণ্ডলী চক্র দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

জন্ম কুণ্ডলী চক্রের দ্বাদশ স্থান।

কুণ্ডলী চক্রের লগ্নের নাম তনুস্থান। এই স্থানে জাতকের শরীর, ক্ষমতা, স্বভাব ও নিপুণতার বিষয় অবগত হওয়া যায়। এইটি শুভ ভাব। এই স্থানের অধিপতির নাম লগ্নাধিপতি বা তনুভাবপতি।

লগ্ন হইতে দ্বিতীয় স্থানের নাম ধন স্থান। এই স্থানে জাতকের ধনরত্ন, মুখ ও কুটুম্বের বিষয় অবগত হওয়া যায়। এইটী অশুভ ভাব। এই স্থানের অধিপতির নাম ধনাধিপতি বা দ্বিতীয়াধিপতি।

লগ্ন হইতে তৃতীয় স্থানের নাম সহজ বা ভ্রাতৃস্থান। এই স্থানে জাতকের বিক্রম, সহোদর ও যুদ্ধের বিষয় অবগত হওয়া, যায়। এইটী অশুভ ভাব। এই স্থানের অধিপতির নাম ভ্রাতৃভাব পতি বা তৃতীয়াধিপতি।

লগ্ন হইতে চতুর্থ স্থানের নাম বন্ধু বা মাতৃস্থান। এই স্থানে জাতকের মাতৃসুখ, মাতা, রাজ্য ও আলয়ের বিষয় অবগত হওয়া যায়। এই স্থানের অধিপতির নাম বন্ধুভাবপতি বা চতুর্থাধিপতি।

লগ্ন হইতে পঞ্চম স্থানের নাম বুদ্ধি বা পুত্রস্থান। এই স্থানে জাতকের বুদ্ধি, মন্ত্রণা ও পুত্রের বিষয় অবগত হওয়া যায়। এইটী শুভ ভাব। এই স্থানের অধিপতির নাম পুত্রাধিপতি বা পঞ্চমাধিপতি।

লগ্ন হইতে ষষ্ঠ স্থানের নাম শত্রুস্থান। এই স্থানে জাতকের রস ও শত্রুর বিষয় অবগত হওয়া যায়। এইটী অশুভ ভাব। এই স্থানের অধিপতির নাম শত্রুভাব পতি বা ষষ্ঠাধিপতি।

লগ্ন হইতে সপ্তম স্থানের নাম পত্নীস্থান। এই স্থানে জাতকের কাম, স্ত্রী, বাণিজ্য ও পথের বিষয় অবগত হওয়া যায়। এইটী শুভভাব। এই স্থানের অধিপতির নাম পত্নীভাব পতি বা সপ্তমাধিপতি।

লগ্ন হইতে অষ্টম স্থানের নাম রন্ধ্র বা মৃত্যুস্থান। এই স্থানে জাতকের পাপ, পরমায়ু ও মৃত্যুর বিষয় অবগত হওয়া যায়। এইটী অশুভ ভাব। এই স্থানের অধিপতির নাম মৃত্যুভাবপতি বা অষ্টমাধিপতি।

লগ্ন হইতে নবম স্থানের নাম ধর্ম্ম বা ভাগ্যস্থান, এই স্থানে জাতকের ধর্ম্ম, গুরু ও ভাগ্যের বিষয় অবগত হওয়া যায়। এইটী শুভভাব। এই স্থানের অধিপতির নাম ভাগ্যাধিপতি বা নবমাধিপতি।

লগ্ন হইতে দশম স্থানের নাম কর্ম্ম বা পিতৃস্থান। এই স্থানে জাতকের কর্ম্ম, আজ্ঞা ও পিতার শুভাশুভ জানিতে পারা যায়। এইটি শুভভাব। এই স্থানের অধিপতির নাম কর্ম্মভাবপতি বা দশমাধিপতি।

লগ্ন হইতে একাদশ স্থানের নাম আয় স্থান। এই স্থানে জাতকের লাভ ও সঞ্চয়ের বিষয় অবগত হওয়া যায়। এই স্থানের অধিপতির নাম আয়ভাব পতি বা একাদশাধিপতি।

লগ্ন হইতে দ্বাদশ স্থানের নাম ব্যয়স্থান। এই স্থানে জাতকের ব্যয়ের বিষয় অবগত হওয়া যায়। এইটি অশুভ ভাব। এই স্থানের অধিপতির নাম ব্যয়াধিপতি বা দ্বাদশাধিপতি।

৩য় অধ্যায়।

লগ্ন, ধন প্রভৃতি দ্বাদশ ভাবস্থ গ্রহফল।

লগ্নে রবি থাকিলে জাতক শৈশবে রুগ্ন, ক্ষীণকায়, স্ত্রীপুত্রহীন, দুঃখী, নীচানুগত, নেত্ররোগী ও রক্তবর্ণ চক্ষু বিশিষ্ট হয়।

লগ্নে চন্দ্র থাকিলে জাতক লোকপ্রিয়, ধনী, মানী, সুখী, সচ্চরিত্র ও বলবান হয়। কিন্তু চন্দ্র যদি নীচস্থ থাকেন তাহা হইলে শুভফল হয় না।

লগ্নে মঙ্গল থাকিলে জাতক বক্রদেহবিশিষ্ট, রোগী, অর্শ ও ভগন্দর প্রভৃতি রোগযুক্ত বৃহৎ নাভী বিশিষ্ট, পাপানুরাগী, উৎসাহী ও অসুখী হয়।

লগ্নে বুধ থাকিলে জাতক সুন্দর, সুখী, নিপুণ, শান্ত, প্রিয়ভাষী, দয়ালু, বিদ্বান, স্মৃতিশক্তিশালী, কবি, কিন্তু অনর্থক ক্রুর স্বভাব বিশিষ্ট হয়।

লগ্নে বৃহস্পতি থাকিলে জাতক কবি, গীতে অনুরক্ত, সুশ্রী সুখী, দাতা, আহারে পটু, রাজার ন্যায় মাননীয়, পবিত্র, দেব, দ্বিজ ভক্ত ও ধনবান হয়।

লগ্নে শুক্র থাকিলে জাতক বহুভাষী, সঙ্গীতপটু, শিল্পী, নীতিপরায়ণ কাব্যশাস্ত্রে পণ্ডিত আমোদপ্রিয় ও ধার্ম্মিক হয়।

লগ্নে শনি থাকিলে জাতক মনুষ্যের মধ্যে অধম, রোগী, অঙ্গহীন বা বিকলাঙ্গ ও অল্পায়ু হয়। কিন্তু তুলা, ধনু, ও মীনলগ্নে, শনি থাকিলে শুভ ফল হয়।

লগ্নে রাহু থাকিলে জাতক পাপী, কুকর্ম্মে আশক্ত, সাহসী, বক্র চক্ষু, বিশিষ্ট, বাচাল, ও রোগাক্রান্ত হয়।

লগ্নে কেতু থাকিলে জাতক অসুখী, পীড়িত, উদ্বিগ্ন, বায়ুরোগী ও কষ্টান্বিত হয়।

ধন স্থান।

ধন স্থানে রবি থাকিলে জাতক ধনহীন, দুঃখী, কৃশ, শরীর বিশিষ্ট, ও স্ত্রী পুত্র হীন হয়।

ধন স্থানে চন্দ্র থাকিলে জাতক ধনী, মানী, নানা অলঙ্কার ভূষিত, কর্পূর চন্দন প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্য প্রিয়, কীর্ত্তিমান ও সহিষ্ণু হয়।

ধন স্থানে মঙ্গল থাকিলে জাতক অল্প ধনযুক্ত, কৃষি ও বাণিজ্য প্রিয়, বক্তা ক্রিয়াশক্ত, সহিষ্ণু, প্রবাসীর ও শারিরীক পরিশ্রম দ্বারা ধনোপার্জ্জনে সক্ষম।

ধন স্থানে বুধ থাকিলে জাতক সত্যবাদী, সুখী, প্রবাসী, পিতৃভক্ত, সুবোধ, সুন্দর ও সৌভাগ্যশালী হয়।

ধন স্থানে বৃহস্পতি থাকিলে জাতক কবি, গায়ক, দাতা, ভোক্তা, রাজপ্রিয়, সুখী, সুন্দর, পবিত্র ও দেব দ্বিজ ভক্ত হয়।

আর্য্য ভেষজ প্রভাব।

লেখক—কবিরাজ শ্রীযুক্ত মেঘনাথ দত্ত।

"কবিরাজ মহাশয় একেবারেই থ"

তা না হইবে কেন? তোমার থোতমত দেখিয়া কবিরাজ মহাশয়ও 'থ' আমিও 'থ"।

"কেন, আমার আবার থোতমত কি?"

বলি দিশেহারা,—রোগী দেখে দিশেহারা, কবিরাজ দেখে দিশেহারা, তাই দেখে আমিও দিশেহারা! বলি চাঁপা, তুইত দিশেহারা হোস্‌নি?

চাঁপা! আমার মাথামুণ্ড।

বুড়ি। কেন? যখন বিপিনের বাড়ি তার ছেলের মূর্চ্ছা হইতেছিল; আমি তার গলায় বান্ধতে দিলাম, ও ছেলের হাতে বেন্ধে দিল, আর কবিরাজ মশায়ের দিকে চাইতে লাগ্‌লো। তুই দেখিস্‌নি বুঝি।

চাঁপা। না আমি ছেলেটীর ভাব ভঙ্গির দিকে লক্ষ্য করিতেছিলাম, এবং তার চোক মুখের আভ্যন্তরিক কোন যন্ত্রণা আসে কিনা; তাহাই দেখিতেছিলাম। তা বাড়ি ফির্‌তে পেরেছিলি ত?

লতা। না—পথভুলে দাদাবাবুর বাড়ী উঠে বসেছিলাম।

চাঁপা। তোকে দেখেনি বুঝি?

লতা। আমায় দেখ্‌বেনা কেন, সেদিন তুমি কনকের মেয়ের গলায় বিয়ের আংটী পরাইয়া তার মুর্চ্ছা সেরে এসেছিলে, তাই ডাক্তারবাবু হতজ্ঞান হইয়া চাঁপাতে তন্ময় হয়ে বসে আছেন। আমি কত ডাক্‌লেম,—কথাটা কহিল না। কেবল বলিলেন, চম্পক এসেছ? আমি চম্পক নহি; কাজেই নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

চাঁপা। তাই বুঝি করিরাজ মহাশয়কে,—

লতা। আমিত তাই ভাবছিলেম। কিন্তু বউদিদি তোমাকে সব শিখিয়ে দিয়েছেন, তাইতে তোমার বাহাদুরী ছিল,—মনেরও বল ছিল? ডাক্তারবাবু দেবা কি মানবী জ্ঞানে তাই তোমাতে হাবুডুবু খাইতেছিল। আর আমার শিক্ষা নাই, তাই আন্ধারে সাঁপ ধরার ন্যায় গলায় বান্ধতে হাতে বেঁধে ফেলেছিলেম আর বল নাই তা বুঝাব কি করে? তাই আজ মাঝে মাঝে দেখ্‌ছিলেম, তোমাদের দোহাই দিয়ে পারি কিনা।

বুড়ি। তা বুঝেছি, লতাকে ক্রিমির চিকিৎসার উপদেশ দেওয়া হয় নাই; তাই এ অনুযোগ। আচ্ছা? আজ তোমাকে ঐ সম্বন্ধে কিছু বলা হবে শুন; শাস্ত্রে মানুষের দেহে কুড়ি প্রকার ক্রিমি আছে বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তার মধ্যে কেঁচো ও ফিতার ন্যায় চেপ্টা বড় ক্রিমিই জ্বরাদি নানাপ্রকার মৃত্যুপ্রদ উপসর্গ উপস্থিত করে। কাস, মুর্চ্ছা, বমন, অতিসার, উদরাধ্যান ও পেট বেদনা এই গুলিই প্রধান উপসর্গ। ইহাই ঘটাইয়া রোগীকে মৃত্যুমুখে নিপতিত করে। অতএব যাহাতে ঐ উপসর্গ সত্বর সাম্য করা যায়। তাহার চেষ্টাই ক্রিমির চিকিৎসা।

ক্রিমি কর্ত্তৃক ঐ সব উপসর্গ একবার নিবারণ করিলেও পুনঃ পুনঃ হইতে থাকে। সাবধানতার সহিত পুনরাক্রমন বন্দ করা প্রধান কাজ। মনে

কর, জ্বরের মধ্যে ঐ প্রকার উপসর্গ যথা মূর্চ্ছা উপস্থিত হইল। তুমি উপস্থিত মূর্চ্ছায় চোখে মুখে ঠাণ্ডা জলের ছিটা মাথায় ঠাণ্ডা জলের ধারানি বা পটী, ও মাথায় ঠাণ্ডা বাতাস দিলে তাহাতে মূর্চ্ছা দূর হইল, কিন্তু কারণ দূর হইল না, অর্থাৎ জ্বর কর্ত্তৃক শরীর বিক্ষোভিত হওয়ায় ক্রিমিগণ জ্বালাতন হইয়া নিজ নিজ বাসস্থান হইতে চারিদিকে ছুটাছুটী করিতে করিতে উর্দ্ধগামী হইয়া হৃদয়ন্ত্র আক্রমণ করিলে মূর্চ্ছা হয়। তুমি উপস্থিত মূর্চ্ছা প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা দূর করিলে বটে, কিন্তু কারণ দূর হইল না। এমতে পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা হওয়াও বিচিত্র নহে। তাই বলি, যেমন উপস্থিত মূর্চ্ছাভঙ্গের উপায় করিবে, সঙ্গে সঙ্গে কারণ দূর করিবার বিশেষ ভাবে চেষ্টা ও যত্ন পাইবে।

লতা। কি করিলে মূর্চ্ছার ভাবী আক্রমণ দূর হইবে?

বুড়ী। বিবাহের অঙ্গুরি—যাহার দ্বারা বিবাহ সময়ে কন্যার কপালে সিন্দুর দেওয়া হয়। ঐ অঙ্গুরি গলায় পরাইয়া দিলে মূর্চ্ছার ভাবি ভয় দূর হয়। আর চালতাগাছের পূর্ব্বদিকের একটুকরা শিকড় গলায় বাঁধিয়া দিলেও উক্ত কাজ হয়।

লতা। এখন অন্যান্য উপসর্গের উপায় কি?

বুড়ি। পেট ফাঁপিলে সর্ব্বাগ্রে মলমূত্র নিঃসরণের চেষ্টা করিবে। বকুল বিচির শাঁস পুরাতন ঘৃত ও অত্যল্প তুতে একত্র পেষণ করিয়া পানের বোঁটা দিয়া মলদ্বারে প্রবেশ করাইলে অল্প সময়েই দাস্ত হইয়া পেটফাঁপা দূর হইবে। মুক্তঝুরি বা দেনাড়িশাকের পাতাও ঐভাবে দেওয়া যায়। পেটের উপর কাণ্ডন্দে পাতার রস ও পুরাতন ঘৃত উদরাধ্মান নিবারক। অত্যন্ত বমনবেগ নিবারণ জন্য শঠীর রস বা পুইশাক পাতার রস অল্প অল্প পান করাইবে। তাহাতে ক্রমে বমির বেগ থামিয়া যাইবে। যদি তাহাতেও উঠিতে থাকে, তবে উক্ত স্বরস পান করাইয়া বমির পূর্ব্বে বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা রোগীর নাভি চাপিয়া ধরিবে। ঐ রস পেটে কিছু সময় থাকিলে পেট ঠাণ্ডা করিবে। তখন দাড়িম বা বেদানার একঝিনুক রসে ঐ রস ২।১ ফোঁটা দিয়া খাওয়াইবে। আর বমি হইবে না। পেটবেদনার পক্ষে ছোটমুখীর শিকড়, গালিশামান্দারছাল ও সুপারির কচি শিকড় স্বচ্ছচুণের জলে থেতো করিয়া অত্যল্প মিছরি সংযোগে একঝিনুক পরিমাণে ২।১ বার খাওয়াইলে আর কোন প্রয়াস পাইতে হয় না। দাস্ত হইতে থাকিলে অতিসাররোক্ত মৃদুবীর্য্য প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

লতা। এখন বুঝিলে ত ক্রিমিবিকারে এইভাবে চিকিৎসা করিও হাতে হাতে ফল পাইবে।

চাঁপা। আচ্ছা বুড়িদিদি! আমি ঐভাবে কয়েকবার চিকিৎসা করিয়া সকলটাতে কৃতকার্য্য হইয়াছি। কিন্তু আমাদের একটা সন্দেহ আছে। বিবাহের অঙ্গুরি না হইয়া অন্য স্বর্ণাঙ্গুরি দিলে এবং চালতাগাছের পূর্ব্বদিকের শিকড় ভিন্ন অন্য দিকের শিকড় দিলে ঐ কাজ হয় কিনা?

বুড়ি। সন্দেহের কারণ থাকিলেও ইহাতে সন্দেহ করিবার নাই। কেননা ইহা ঐশ্বরিক শক্তি। ঐ অনির্ব্বচনীয় শক্তি বা প্রতাপ মনুষ্যবুদ্ধির অতীত। ভগবান মঙ্গলময়ের যে শক্তিতে পৃথিবীতে অমূল্য মণিরত্নাদির সৃষ্টি হইতেছে, যে শক্তিতে একই ভূমিতে বিভিন্ন বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রসবীর্য্য প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা যেমন ধারণা করা ক্ষমতার অতীত তদ্রূপ দ্রব্যের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করাও বুদ্ধির অতীত। তোমরা যাহা শুনিবে নিঃসন্দেহ-চিত্তে তাহাই ব্যবহার করিবে অন্যথা করিবে না।

চাঁপা। আচ্ছা বুঝিলাম, যে দ্রব্যের প্রভাব সম্বন্ধে যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করিবার কথা থাকিবে ঠিক তাহাই করিতে হইবে।

বুড়ি। হাঁ! তাহাই করিও, যেখানে প্রভাব বলে যোগ আরোগ্য বিধি কথিত হইবে, সেখানে তৎপ্রক্রিয়া মনোযোগ সহকারে সম্পন্ন করিবে? নতুবা ব্যর্থমনোরথ হইবে।

চাঁপা। আজ লতাকে শিক্ষার বেলায় যাহা শুনিলাম। আমাকে ইহার দুই একটা পৃথক পৃথক ভাবে শিক্ষা দিয়াছেন?

বুড়ি। ক্রিমি বিষয়ে শিক্ষা দিবার এখনও অনেক যোগযুক্তি ও প্রক্রিয়া বিশেষ বলিবার আছে।

চাঁপা। তবে আরও কিছু বলিয়া দিউন।

আগন্তুক। বুড়ি মা; এখনই আমাদের বাড়ি যাইতে হইবে। আমার স্ত্রীর আজ তিন দিন অনাব্রত রক্তস্রাব হইতেছে। অনেক চিকিৎসা হইয়াছে, কিছুতেই নিবৃত্তি হইল না। এখন ভ্রমি লাগিতেছেন। অনেকে আপনার কথা বলিতেছে। আমার স্ত্রীও একবার আপনাকে দেখিতে যাইতেছে। অতএব বিলম্ব না করিয়া এখনই যাইয়া আমাকে রক্ষা করুন।

বুড়ি। লতা! চাঁপা আজ এই পর্য্যন্ত শুনিলে কল্য তোমাদিগকে আরও শিক্ষা দিব। এখন যাওয়ার বাধা না থাকে আমার সঙ্গে চল।

শোকসঙ্গীত।

—:—

লেখিকা—শ্রীমতী হরিরমা সিংহ।

ফেটে গেল বুক আহা নাই প্রাণধন;
থাম থাম পারে নাক শুনিতে শ্রবণ।
নিষ্ঠুর কালের ফাঁস
কি করিল সর্ব্বনাশ,
হরিলি কি হৃদয় হীন কাল দুরাচার।

(২)

তুই কি হৃদয় হীন কাল দুরাচার,
সোণার কমল আহা করিলি অঙ্গার।
হায় রে কপাল পোড়া,
কার বুক বাজে গড়া,
কে দিল সে সোণামুখে জ্বালিয়া অনল;
নিঠুর নিঠুর সে যে পাষাণ কেবল?

(৩)

কাঁদাইয়া জনকেরে কাঁদাইয়া মায়
কেমনে অকালে ভাই নিলেরে বিদায়।
হায় হায় ভাই ধন
স্মরিতে যে ফাটে মন,
তুমি আজ নাই ভাই এ মর ধরায়!

(৪)

কেন গেলি কে করিল তোরে অযতন,
কেন রে মোদের দিলি যাতনা এমন!
তোর বিনা আজ ভাই
আঁধার আঁধার তাই
আজ কেন উঠে নাই চাদিমা তপন।

(৫)

তোর কচি হিয়াখানি স্নেহের নিলয়,
কেমনে হইলে ভাই এমন নির্দ্দয়?
তোর কচি বুক হায়
ভরি প্রীতি মমতায়
আজ কেন বিপরীত হেরি সমুদয়?

(৬)

কেন রে নীরবে শুয়ে উঠ ভাই ধন,
ডাকাডাকি করে তোরে কত লোকজন,—
কে আর উঠিবে হায়,
প্রাণ নাই এ ধরায়,
সে যে চির অস্তাচলে করেছে গমন!

(৭)

তুই যদি দয়ামায়া করি বরজন,—
অনাসে চলিয়া গেলি হৃদয় রতন,
স্মৃতিটুকু কেন হায়,
দিয়া গেলে মো সবায়,
সে যে রে পোড়ায় সবে থাকিতে জীবন।

(৮)

তুই যে সংসারের আহা বড় প্রিয়ধন
তোমা বিনা সকলের কাতর জীবন।
বিসর্জ্জিয়া তোমা-ধনে
তোর মায়ে শূন্য মনে
শান্তিহারা হইয়াছে পাগল যেমন।

(৯)

জননী জীবনে মরা হায় রে তোমার!
কেবা পারে প্রাণ দিতে করিতে বিদায়?
হায় রে অভাগীর,
হৃদয় হয়েছে চির,
হৃদি-পিণ্ড গেছে তাঁর ভস্ম হয়ে হায়?

(১০)

ওরে নিদারুণ কাল কি করিলি হায়;
এ রতন হরি নিতে
দয়া কি হল না চিতে
কেমনে কাঁদালি হায় আমা সবাকায়,
নাহি কিরে দয়ামায়া তোর ও হিয়ায়।

(১১)

শুনেছি দয়াল অতি বিভু দয়াময়,
তাঁর (ই) কি দয়ার ফলে,
জননীর হৃদয় জ্বলে ?
অকালে কলিকা দলি বিভু দয়াময়,
অপার দয়ার বুঝি দিলা পরিচয় ?

প্রেম।

লেখিকা,—শ্রীমতী চারুলতা দেবী।

কত ভালবাস নাথ, সতত আমায়,
আবরি রেখেছ তুমি প্রীতি-সুষমায়।
চেয়ে দেখি চারি পাশে
তোমার করুণা ভাসে,
হাসে রবি-শশী-তারা নীলাভ গগনে,
তোমারই প্রেম ভাসে তাহাদের সনে।

দেখি চেয়ে, বয়ে যায় নিরমলা নদী,
তাতেও তোমার প্রেম জাগে নিরবধি।
পাখীর ললিত তানে
তব প্রীতি জাগে প্রাণে,

অমৃত আবেশে দেব ভরে যায় হিয়া,
তোমারি আদরে গেছে জীবন ভরিয়া।

কি চাহিব প্রেমময় নিকটে তোমার.
কি অভাব আছে ক্ষুদ্র জীবনে আমার !
চির পবিত্রতা ময়
তুমি যে করুণালয়,
তোমারে বেসেছি ভাল আর কি চাহিব !
আর কি লভিলে তৃপ্তি জীবনে পাইব।

আমারি দেবতা তুমি, আমারই সখা,
আমার হৃদয়ে আছে তব স্নেহ মাখা।
তোমারি তোমারি আমি,
তুমিই জীবন স্বামী,
তোমারে বেসেছি ভাল জনমের তরে,
বাসিব তোমারে ভাল মন প্রাণ ভরে !

সাধ্বী।

লেখিকা,—শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী।

(১)

ছোট বৌ—"মা, কেমন আছ ? কিছু কষ্ট হচ্ছে কি ?"
শাশুড়ী—"না, মা, বেশ আছি ; যা দুটী খেয়ে আয়, বেলা আর নাই, আমার কিছু কষ্ট হচ্ছে না, এই বেলা খেয়ে এস লক্ষ্মী মা আমার।"
ছোট বৌ—"মা, একটু বেদানার রস খান দেখি ! কিছু খচ্ছেন না, একটু কিছু না খেলে যে শরীর আরও দুর্ব্বল হবে।"
শাশুড়ী—"না—না ; আর খাবনা, ও সমস্ত দিওনা, কেবল একটু গঙ্গাজল

দাও। ওমা, বৌমা, গীতাখানা আমার শরীরে স্পর্শ করিয়ে রেখ, কি জানি কখন কি হয়?"

ছোট বৌ—"গীতা আপনার নিকটেই আছে, মা! আপনি ওসমস্ত কি ভাব্‌ছেন? অসুখ করেছে, শীঘ্রই সেরে যাবে! আপনি যে আমায় মেয়ের অধিক যত্ন করেন, আপনার স্নেহে যে আমি মায়ের অভাব বুঝ্‌তে পারি না! আপনার অভাবে যে আমার চক্ষে সংসার অন্ধকার হবে! মা, আপনার শরীরের ভিতর কি খুব খারাপ বোধ হচ্ছে? কবিরাজকে আবার ডাকাব?"

শাশুড়ী—"দূর পাগ্‌লী! আমার হয়েছে কি যে, কবিরাজকে ডাক্‌তে হবে! গীতা ধর্ম্ম-পুস্তক; কাছে থাকাই ভাল, তাতে ব্যারামের শান্তি হয়। গীতাখানি আমার বুকের উপর দাও, আমায় আর বকিও না, একটু চোখ বুঁজে শুয়ে থাকি, বড় বৌমাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে তুমি খেয়ে নাও গে।"

(২)

বড় বৌ খাওয়া দাওয়া করিয়া ইতিপূর্ব্বে ঘুমাইয়া ছিল। একটু আগে উঠিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে আসিয়া বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া শাশুড়ীর সহিত সতীনের কথোপকথন শুনিতেছিল। উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া সুশীলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"তোমার কি রকম আক্কেল গা? তুমি কি কচি খুকী? তুমি কি জাননা যে, রোগা মানুষকে বেশী বকাইতে নাই? একেবারে অজ্ঞ! বাপের বাড়ীতে কেবল ভাত গিল্‌তে শিখেছ? যাও! আর মায়া মান্নার কাজ নাই! ওঁর অবস্থা তত মন্দ নয়; তা হলে কি কথা বল্‌তে পারেন।"

সুশীলা। মৃদুস্বরে বলিল,—"মার শরীরে যে পাপ নাই, তাই ভয় হয়, যদি কথা বল্‌তে বল্‌তে কিছু হয়! আমার বাবা কথা বল্‌তে বল্‌তে ঈশ্বরের নাম কর্‌তে কর্‌তে মারা গিয়েছিলেন।"

বড় বৌ—"সকল টাতেই বাড়াবাড়ি! নিজের বাপ ভারি পুণ্যাত্মা ছিলেন, তাই জানান হচ্ছে! নাও আর ন্যাকামী কর্‌তে হবে না। শীঘ্র করে খেয়ে এস। আমি এখানে বেশী সময় থাক্‌কে পার্ব্বনা।"

শাশুড়ী—"বড় বৌমা! থাম; ও নয় জানেনা রোগীকে বকাইতে নেই,

তুমি জান ভাল! তোমার শিক্ষা কি এই হয়েছে যে, রোগীর ঘরে গলাবাজি কর্‌তে হবে!"

(৩)

বড় বৌয়ের কথানুসারে সুশীলা আগেই খেতে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি দু টী নাকে মুখে গুঁজেই আবার শাশুড়ীর কাছে এসে বসিল। তাঁর ভাবনায় সুশীলার খাওয়া দাওয়া রহিত হয়েছিল। ছেলে মানুষ! মনের আবেগে কত কি বল্‌ছিল।

সুশীলা যখন খেয়ে এসে বসিল, তখন শাশুড়ী একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলেন। একটু পরেই চাহিয়া তাকে ম্লান মুখে নিজ পার্শ্বে বসিয়া থাক্‌তে দেখিয়া সস্নেহে তাহার গায়ে মাথায় হাত দিলেন।

বেলা তিনটার পর প্রায় আড়াই ঘণ্টা যাবৎ মাঝে মাঝে জ্ঞান ও মাঝে মাঝে তন্দ্রাবেশ ঘটিতে লাগিল। সাড়ে চারটার সময় দিব্য জ্ঞান হইল। তখন তিনি ইষ্ট দেবতার নাম জপ করিতে লাগিলেন। ঠিক সাতটার সময় পরম পবিত্র মহাভাগবত গীতাখানি বক্ষের উপর করিয়া সুধামাখা হরিনাম করিতে করিতে এ মর জগৎ পরিত্যাগ করিলেন।

একাদশ দিবসে যথারীতি শ্রাদ্ধ শান্তি হইয়া গেল! এ কয় দিন কাজের গোলমালে সুশীলা এক রকম করিয়া দিন কাটাইয়া ছিল। এখন তার কান্না ও মর্ম্মভেদী তপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাস দিবারাত্রির সম্বল হইয়া উঠিল।

(৪)

ইঁহাদের সংসারিক পরিচয় এইখানে একটু দিবার প্রয়োজন। গৃহ স্বামিনীর একটী পুত্র। পুত্রটীকে লইয়াই বিধবা হন। উহাকে লেখা পড়া শিখাইবার অনেক চেষ্টা করেন; কিন্তু ফাষ্ট ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়িয়াই পুত্র রত্ন মা সরস্বতীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক বেমালুম ত্যাগ করিলেন। জমা জমির আয় বৎসরে পাঁচ হাজার টাকা। পুত্রটীর যখন লেখাপড়া হইল না, তখন একজন কেরাণীর কন্যার সঙ্গে উহার বিবাহ দিলেন। বৈবাহিকের বেতন মাসিক দুই শত মুদ্রা। বৌয়ের দুই তিনটী সন্তান হইবার বয়স চলিয়া গেল; পৌত্র পৌত্রির মুখ দেখিবার সাধ পূর্ণ হইল না। বংশ লোপ হইবার ভয়ে গৃহ-স্বামিনী অধীরা হইয়া উঠিলেন, কিছু দিন পরে তিনি একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কন্যার সহিত দ্বিজেন্দ্রের পুনরায় বিবাহ দিলেন। এখন দ্বিজেন্দ্রের দুইটী স্ত্রী কিন্তু সে বড় বৌয়েরই অনুগত হইল। ছোট বৌ অর্থাৎ আমাদের

সেই সুশীলা গরীবের মেয়ে। এই জন্যই বোধ হয় তাহার উপর উপেক্ষা। ধন্য অর্থ, বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রণয়ের উপরেও উহার প্রভাব! সুশীলার দরিদ্র পিতাকে দ্বিজেন্দ্র শ্বশুর বলিয়া পরিচয় দিতেও ঘৃণা বোধ করিত। তবে মায়ের তাড়না ভয়ে সুশীলার সহিত বাহ্যতঃ মন্দ ব্যবহার করিত না। কিন্তু বড় বৌ সেটুকু পোষাইয়া লইত। বড় বৌয়ের দুর্ব্যবহার চক্রবৃত্তিহারেই অনুষ্ঠিত হইত।

ভিতরে ভিতরে দ্বিজেন্দ্রের দুর্ব্যবহার, প্রকাশ্যতঃ সতীনের সদা সর্ব্বদা অসদাচরণ এ সবই সুশীলা শ্বাশুড়ীর অপার স্নেহসিক্ত হইয়া হাসিমুখে সহ্য করিত।

(৫)

সুশীলার বিবাহের এক বৎসর পূর্ব্বে তার মা মারা যান। দুই বৎসর পরে পিতারও স্বর্গপ্রাপ্তি হইল। সুশীলার একটী কাকা ছিল, ছেলে বেলায় সুশীলা তাঁকে বড় ভাল বাসিত। তিনিও সুশীলাকে বড় স্নেহ করিতেন।

কালক্রমে সুশীলার পিতার সহিত তাঁর মনোমালিন্য ঘটিল। তখন তিনি বিদেশে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। বহুদিন যাবৎ বড় ভায়ের সহিত একেবারেই সংস্রব ত্যাগ করিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর পিতৃগৃহে সুশীলার আর কেহই রহিল না। সুশীলা মা বাপের একটী মাত্র সন্তান, বড়ই আদরে লালিত পালিত হইয়া ছিল, শ্বাশুড়ীর সোহাগ স্নেহে সে একদিনের জন্যও মা বাপের অভাব বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু শ্বাশুড়ী মারা যাওয়ায় এখন সকল অভাব এক সঙ্গে সুশীলার অন্তরে জাগিয়া উঠিল।

(৬)

দ্বিজেন্দ্রের মাতা পাকা গৃহিণী ছিলেন। তিনি থাকৃতে দ্বিজেন্দ্র ও বড় বৌ বেশী বাড়াবাড়ি করিতে পারিত না। এখন কথায় কথায় ছুতা ধরিয়া উহারা অসহায় নিরপরাধা সুশীলাকে যন্ত্রণা দিতে লাগিল।

দ্বিজেন্দ্রের মাতা বিষয়ী লোক ছিলেন। তিনি বিলাসিতা আদৌ দেখিতে পারিতেন না! তাঁর সময়ে সংসারে অপব্যয় কিছুই হইত না। তবে হিন্দুর নিত্য কর্ত্তব্য দেব, দ্বিজের সেবা, আতিথ্য-সৎকার, সামাজিক লৌকিকতা এ সব সম্বন্ধে তিনি পূর্ণ মাত্রায় কর্ত্তব্য পরায়ণ ছিলেন।

এখন ঘোর পরিবর্ত্তন! দ্বিজেন্দ্রের বড় বৌয়ের বাপের বাড়ীর অনুকরণ আসিয়া পড়িয়াছে। প্রতি পাদ-বিক্ষেপে দ্বিজেন্দ্র সেই চালে চলে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, তার শ্বশুর একজন কেরাণী। তাঁর চাল চলন দাম্ভিকতা পূর্ণ; কথা-বার্ত্তা লম্বা চৌড়া। তিনি নিজেকে ওজন ছাড়া একটা মস্ত কিছু মনে করেন। তাঁর বেতন দুইশত মুদ্রা; তার এক শত মুদ্রা পোষাক-পরিচ্ছদে ব্যয়িত হয়। তা ছাড়া মধ্যে মধ্যে আধুনিক প্রথা প্রচলিত বন্ধু-বান্ধবকে সান্ধ্যভোজ, গার্ডেন-পার্টী প্রভৃতি অনুষ্ঠানে আপ্যায়িত করেন। এইরূপ বাজে খরচের অবধি নাই। উপর চালই নব্য সভ্যতার কৌলিক ধর্ম্ম, এই বৈশিষ্ট্যে দ্বিজেন্দ্রের শ্বশুর মণ্ডিত ছিলেন। এটি গিল্‌টীর যুগ। এ যুগের বাহ্য চাকচিক্য অস্বাভাবিকরূপে অধিক। দ্বিজেন্দ্রের শ্বশুর যুগ ধর্ম্মের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতেন। তাঁহার বাবুগিরির চাকচিক্যে একটু মাত্রা ছাড়া। দ্বিজেন্দ্র এতদিন মায়ের ভয়ে বিলাস সুখে বঞ্চিত ছিল। এখন বিলাসের খর স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছে। এখন তার মাসিক ব্যয় সাত আট শত টাকা।

(৭)

বড় বৌ—"ওগো শুনছ? তোমার এই বাঁদরটীকে ত আর বাড়ীতে রাখা চলেনা!"

দ্বিজেন্দ্র—"কেন, আবার কি বাঁদ্‌রামি কর্‌লে?"

বড় বৌ—"কর্‌বে আবার কি? ওর কোন্ কাজটী মানুষের মত? কাল আমার মেজ দাদার বন্ধু এলেন, ও তখন একটী প্রদীপ নিয়ে তুলসী গাছের মূলে রেখে উপুড় হয়ে প্রণাম কর্‌তে লাগ্‌ল! আচ্ছা, দাদা কি ভাব্‌লেন বল দেখি?"

দ্বিজেন্দ্র—"কেন, তুমি কিছু বল্লে না!"

বড় বৌ—"ও নয় বাঁদর, কিন্তু আমি ত মানুষ! কি করে একটী ভদ্র লোকের সাম্‌নে বকাবকি করি?"

দ্বিজেন্দ্র—"তার পরে কেন বল্লেনা যে ও রকম বাঁদরামি কর্‌লে এ বাড়ীতে তোমার স্থান হবে না। গলা টীপে দূর করে দেব!"

বড় বৌ—"ও গো আমি বল্‌তে কি কম করেছি? বলেই বা কি কর্‌ব। ওকে হাতে মার্‌তে হয় না, ভাতে মার্‌তে হয়, দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলে তবে গায়ের রাগ যায়। দেবো কোন্ চুলোয়? ওর কোন কুলে কি একটা চুলো আছে যে সেখানে যাবে? তুমি যেমন ঠাণ্ডা মানুষ তাই দুটো চার্‌টে

বকেই অমনি চুপ করে থাক। ওর অসুধ হচ্ছে মা'র। আজ আবার ঘরের মধ্যে কতকগুলি ফুল বিল্বপত্র প্রভৃতি এনে রেখেছে। বেলা প্রায় দশটা বাজে এখনও রান্না হ'ল না। দশটার পর কি কোন ভদ্র লোক খায়?

বড় বৌয়ের কথা শুনিয়া দ্বিজেন্দ্র রাগে ফুলিতে ফুলিতে রান্না ঘরের সাম্‌নে আসিয়া ক্রোধভরে বলিল—"রান্না হয়েছে?"

সুশীলা—"সবই হয়েছে, ভাত চড়েছে।"

দ্বিজেন্দ্র ঘরের ভিতর যাইয়া চারিদিক চাহিয়া বলিল,—"ঘরের কোণে বিল্ব পত্র, ফুল! ও সব কি হবে?"

সুশীলা—"মা বলেছিলেন রোজ শিব পূজা করিও। তাই পূজা করিব, বলিয়া রেখেছি।"

"তোমার মাথা করিবে" বলিয়া, দ্বিজেন্দ্র সুশীলাকে গালে, মাথায়, পিঠে সর্ব্বাঙ্গে কিল, লাথি মারিতে লাগিল।

বড় বৌ তখন দোরের সাম্‌নে এসে বল্লে—"বেশ হচ্ছে? যেমন ইতরের মত স্বভাব, তার তেমন ওষুধ! কই, আমায় ত কখনো কিছু বলে না।"

দ্বিজেন্দ্র প্রহার করিয়া চলিয়া গেল। প্রহার ফলে সুশীলার হাতের শাঁখা ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিয়া, বাঁ হাত থেকে একগাছি নোয়া খুলিয়া দক্ষিণ হাতে দিল।

বড় বৌ তাহা দেখিয়া বলিল,—"তোর বাপের বাড়ীর লোকেরা কি রকম ছোটলোক যে দুগাছি রুলিও দিতে পারে নি?"

ইহার সুন্দর জবাব ছিল। সুশীলা কিন্তু কোন জবাব করিল না। যারা অকারণে মানুষকে, মারে তারা কি সুশীলার পিতামাতা অপেক্ষাও ভদ্র? এই পাল্টা প্রশ্ন সুশীলার ওষ্ঠপ্রান্তে আসিলেও বাহিরে ফুটিল না। সুশীলা বাস্তবিকই সুশীলা। ঝগড়াঝাটি করা, কথা কাটাকাটি করা, তার প্রকৃতি বিরুদ্ধ। সে রান্নায় মন দিল।

(৮)

বৈকাল বেলা। সুশীলা কাজকর্ম্ম সারিয়া, কাপড় চোপড় কাচিয়া বারান্দায় একটু বসিয়াছে। এমন সময় তার একজন সমবয়সী প্রতিবেশিনী আসিল। সে সুশীলাকে বড় ভালবাসিত। সুশীলাও তাকে প্রাণের কথা বলিত। দুইজনে খুব মনের মিল। সে আসিয়াই বলিল,—"ভাই সুশীলা একটু জল নিয়ে আয়না।"

সুশীলা—"জল কি কর্‌বি, ভাই ননী?"

ননী—"তোর শাঁখা ভেঙ্গে গিয়েছে; তাই চুড়ী সাবান নিয়ে এসেছি, আমি ত ভাই চুড়ী পরাইতে জানিনে, সাবান দিয়ে পরিয়ে দিই।"

সুশীলা—"আমার শাঁখা ভেঙ্গেছে, তুই কি করে জান্‌লি?

ননী—"তোর বর যখন রাগ করে রান্না ঘরের দিকে আসে তখন আমি নদী থেকে নেয়ে আস্‌ছিলাম। তোদের দোরের কাছে এসে দাঁড়িয়ে সমস্ত কাণ্ড কারখানা দেখে শুনে গেলাম। হ্যাঁ ভাই! তোর বর কি চাষা! মানুষ একটা অন্যায় কর্‌লে তাকে অমন করে কেও মারেনা।"

সুশীলা—"ভাই চাষা বলিও না। আমি কর্ম্মফল ভোগ করিতেছি।"

ননী—"তোর কর্ম্ম ফল; তা নয় স্বীকার কর্‌লাম। কিন্তু তোর বর যে চাষা, তা নিশ্চয়ই স্বীকার কর্‌তে হবে।"

সুশীলা—"ভাই, আমার সাম্‌নে ওসব আর বলিওনা। তুইও ত মেয়ে মানুষ, স্বামীর নিন্দায় নিশ্চয়ই তোরও প্রাণে লাগে।

ননী—"আমিও তার নিন্দা সইতে পারিনে, সত্য। সে ত ভাই দোষ করেনা। যদি অন্যায় কাজ করিত, তবে বাধ্য হইয়া তার নিন্দা আমাকে শুন্‌তে হইত।"

সুশীলা—"তবে ত, ভাই, তুই স্বামীর দোষ দেখ্‌তে পাস্‌নে। সত্যই বল্‌ছি, স্বামীকে প্রকৃতরূপ ভাল বাস্‌লে তার দোষ চোখে পড়েনা; তার উপর কখনও রাগ হয় না।"

ননী—"তুই কি কখনও তোর স্বামীর উপর রাগিস্‌ নে?"

সুশীলা—"না; আমার রাগ হয় না। আমি যখন ছোট, আমার মনে আছে বাবা একজনকে বল্‌ছিলেন, যে মেয়ে মানুষ রেগে স্বামীর দিকে চায়, শাস্ত্রে তাকে দ্বিচারিণী বলে। তাকে শাস্ত্র বলে পরিত্যাগ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।"

ননী—"সে ত শাস্ত্রে আছে। তাই বলে কি মনে রাগ চাপা যায়? স্বামী যদি অন্যায় কাজ করে, মিছামিছি দুর্ব্যবহার করে, স্বামীকে নিয়ে যদি সুখ না হয়, তবে ত রাগ হওয়া স্বাভাবিক।"

সুশীলা—আমার, ভাই, রাগ হয় না। ও যাতে সুখে থাকে, তাতেই আমার সুখ। ওর যদি প্রফুল্ল মূর্ত্তি দেখি, তাহা হইলে আমার আনন্দ ধরে না। ওর উপর আমার রাগ হয় না। ওর কোন কাজে আমি অন্যায় দেখ্‌তে পাইনে।"

ননী—"আচ্ছা, আজ যে তোকে মার্‌লে, সেটা কি অন্যায় নয়?"

সুশীলা—"না, ভাই, ওর অন্যায় হয় নি। আমি সকাল করে রাঁধ্‌তে পারি নি, শিব-পূজা উনি ভাল বাসেন না, তা আমি জেনেও পূজার সব যোগাড় করে রেখেছিলাম। সবই আমার অন্যায়।"

ননী—"ভাই, তোর কাছে এখনও আমার অনেক শিখিবার আছে। তুই ভাই যথার্থ স্ত্রী-ধর্ম্ম পালন কর্ত্তে শিখেছিস্। আমাদের স্বামী আমাদের এত যত্ন করে, তবুও পানের থেকে চুণ খস্‌লেই আমরা রেগে যা-তা বলি। আয়, ভাই, বেলা গেল চুড়ী পরিয়ে দিয়ে যাই।"

(৯)

দ্বিজেন্দ্রের এখন অনেক দেনা হইয়াছে। দেনার দায়ে জমা জমি, বিষয় সম্পত্তি সবই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। মাত্র বসত বাটীখানি আছে। তাহাও ঋণে আবদ্ধ। আজ কালই বিক্রয় হইয়া যাইবে। সেই ভাবনায় দ্বিজেন্দ্র অস্থির।

অনন্যোপায় হইয়া দ্বিজেন্দ্র বড় বৌকে বলিল,—"তোমার গহনাগুলি দিলে বাটীখানি রক্ষা করিতে পারি।" বড় বৌ বলিল—"যদি আমার নামে বাটী লিখিয়া দাও, তবে দিতে পারি।"

স্বামীর নামে বাটী থাকিলে সপত্নী সুশীলা তাহার অংশ পাইবে, ভাবিয়াই বড় বৌ ঐরূপ প্রস্তাব করিল।

দ্বিজেন্দ্র তাহাতে বলিল—"আমি এখনই ত মারা যাচ্ছিনা যে, ছোট বৌ অংশ পাবে? হঠাৎ যদি আমি মারা যাই, তবে তখন তোমার নামে লিখিয়া দিব। আমি স্ত্রীলোকের বাড়ীতে বাস করিব, সে বড়ই লজ্জার কথা! নচেৎ তোমার নামে বাড়ী বে-নামী করিলেই ত সব গোল চুকে যায়! কিন্তু আমি তত অধর্ম্ম করিব না। তোমার গহনাগুলি দাও।"

স্বামী বেশী পীড়াপীড়ি করিয়া গহনা চাহিলে, বড় বৌ পিত্রালয়ে গিয়া মায়ের নিকটে সকল কথা বলিয়া গহনাগুলি তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখিয়া আসিল। পরে স্বামীকে বলিল—"এত তাড়াতাড়ি কি? আমাদের ত আর উঠিয়ে দিতে পার্ব্বেনা। একটু রয়ে সয়ে শোধ দিলেই হবে।"

হঠাৎ একদিন চিঠি আসিল যে, বড় বৌয়ের মা নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া পাঁচ ছয় দিন হইল মারা গিয়াছেন। পত্র পাইয়া বড় বৌ কাঁদিয়া কাটিয়া পিত্রালয়ে গেল। যাইয়া নিজের গহনাগুলির একখানিও পাইল না।

ভাই ও ভাজেরা বলিল,—"তোমার গহনা কোথা'র আমরা কি জানি? মা কোথায় রেখেছেন খুঁজে দেখ।" গহনা লইয়া ঝগড়া ঝাটি হইল। পরিশেষে অপমানিতা ও লাঞ্ছিতা হইয়া, স্বামী গৃহে আসিয়া তাঁহাকে সকল কথা বলিল। শুনিয়া, দ্বিজেন্দ্র বড় বৌয়ের উপর প্রাণে প্রাণে চটিয়া গেল।

(১০)

সুশীলার কাকা এতদিন বিদেশে থাকিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁর সন্তান-সন্ততি হয় নাই। সংসারের একমাত্র বন্ধন স্ত্রী পাঁচ ছয় মাস ভুগিয়া মারা গেলেন। তিনি স্ত্রী বিয়োগে প্রাণে দারুণ আঘাত পাইলেন। তখন বিদেশস্থ যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। স্ত্রীর গহনাপত্র এবং বিক্রয়লব্ধ কুড়ি হাজার টাকা সঙ্গে লইয়া দেশে আসিলেন। ঐ অর্থের মধ্যে পনের হাজার টাকা তার সঞ্চিত ছিল।

দেশে আসিয়া সুশীলার সংবাদ লইয়া জানিলেন যে, সে বাঁচিয়া আছে এবং কোথায় তার বিবাহ হইয়াছে, তাহাও শুনিলেন। তখন তিনি সুশীলাকে দেখিবার মানসে রওনা হইলেন। সুশীলাকে সমস্ত গহনা ও টাকা কড়ি দিয়া সংসারের বন্ধন ছিন্ন করিয়া শ্রীবৃন্দাবন ধামে জীবনের অবশিষ্ট কাল যাপন করিবেন, সঙ্কল্প করিলেন।

(১১)

দ্বিজেন্দ্র পাওনাদারের বাক্য যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া শয্যাশায়ী। তার ভাবনার অবধি নাই। কালই বাড়ী নিলাম হইবে, কোথায় দাঁড়াইবে তার স্থিরতা নাই। তার উপর প্রথমা স্ত্রীর দুর্ব্যবহার। যাহার জন্য দ্বিজেন্দ্র প্রাণ দিতে পারিত, যাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসিত, সেই স্ত্রী তাহাকে অবিশ্বাস করিয়া তাহার নিকট কথা গোপন করিয়াছে। সে তার মাকে বিশ্বাস করিয়া সমস্ত গহনা রাখিয়া আসিয়াছিল। এই সব চিন্তা দ্বিজেন্দ্রকে, উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। মান, যশ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি পরদিনই নলিনীদলগত জলবৎ অদৃশ্য হইয়া যাইবে এই ভাবিয়া দ্বিজেন্দ্র অস্থির হইল। সে ভাবিল বড় বৌ শঠতা না করিয়া যদি গহনাগুলি পূর্ব্বে দিত তাহা হইলে তাহাকে আজ দশের কাছে এরূপ অপমানিত হইতে হইত না। তার কুটিলতা দ্বিজেন্দ্র যতই চিন্তা করিতে লাগিল, ততই তাহার উপর বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণা আসিয়া পড়িল। দ্বিজেন্দ্র এখন দুশ্চিন্তায় ক্ষিপ্ত!

দুঃখের রাত্রি দীর্ঘ হইলেও প্রভাত হইল। দেখিতে দেখিতে বেলা আটটা বাজিল। সুশীলা স্নানাদি শেষ করিয়া রন্ধনের যোগাড় করিতেছে, এমন সময় জনৈক ভদ্রলোক আসিয়া বলিল—"ওমা এই বাড়ীতে আমার সুশীলার বিবাহ হইয়াছে?"

সুশীলা ভদ্রলোকের মুখে নিজের নাম শুনিয়া একটু সংকোচের সহিত বলিল,—"হাঁ, আমার নাম সুশীলা।"

সে অনেক দিন কাকাকে দেখে নাই। অতি শৈশবে দেখিয়াছিল, এখন তাহা মনে নাই। তবে শুনিয়াছিল—কাকা বিদেশে কোথায় আছেন।

সুশীলার কাকাও তাকে শিশুকালে দেখিয়াছেন। তখন তাকে কতই ভালবাসিতেন। এতদিন ভায়ের উপর অভিমান করিয়া কোন খোঁজ খবর লন নাই।

সুশীলার এখন কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাই তার কাকা তাকে চিনিতে পারেন নাই। বলা বাহুল্য সুশীলাও চিনে নাই তার সংকোচ।

সুশীলা যখন বলিল,—"আমার নাম সুশীলা, তখন তাঁর মনে যুগপৎ আনন্দ ও দুঃখ দেখা দিল। তিনি উভয় আবেগে অভিভূত হইয়া বলিলেন,—"মা, আমায় চিনতে পার? আমি তোমার সেই হতভাগ্য কাকা। হায়, বাড়ী গিয়া শুনিলাম, দাদা ও বৌ ঠাকুরাণী দুজনেই মারা গিয়াছেন। তাঁহাদিগকে জন্মের মত আর দেখিতে পাইব না।"

তখন তিনি সংক্ষেপে সুশীলাকে আপন জীবন কাহিনী বলিয়া তাহাকে দুই সেট গহনা ও কুড়ি হাজার টাকার নোট প্রদান করিয়া বলিলেন,—"মা, আমার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না; আমি চলিলাম; তোমায় যে আর একটী বার দেখিতে পাইলাম, ইহার জন্য ভগবানের করুণাকে ধন্যবাদ।

সুশীলা অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া তাঁকে থাকিতে বলিল। উত্তরে তিনি বলিলেন,—"না, মা, আমি স্থির করিয়াছি, আর গার্হস্থ্য-আশ্রমে অন্ন জল গ্রহণ করিব না। আমি ৺বৃন্দাবন ধামে চলিলাম।"

সুশীলাকে কথা বলিবার অবসর না দিয়াই তাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তিনি সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

(১২)

দ্বিজেন্দ্র দুশ্চিন্তায় গত রাত্রিতে ঘুমায় নাই। ভোরের সময় একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়াছিল মাত্র। এখন বেলা নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। এখন তাড়াতাড়ি

উঠিয়া শয্যার উপরে বসিল। ঠিক এমন সময় সুশীলা আসিয়া বলিল—"আর চিন্তা নাই; তুমি আর ভাবিও না, ভগবান্ মুখ তুলে চেয়েছেন।"

দ্বিজেন্দ্র বলিল—"তার মানে?"

"এই নাও" বলিয়া সুশীলা তখন স্বামীর হাতে কুড়ি হাজার টাকার নোট ও অলঙ্কারগুলি দিয়া তাহার কাকার বৃত্তান্ত বলিল।

শুনিয়া দ্বিজেন্দ্র সুশীলার হাত ধরিয়া নিজের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল—"তোমার সহিত না বুঝিয়া কত অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি, ক্ষমা করিও; তুমি আজ হইতে আমার হৃদয়ের দেবী হইলে। তুমিই আজ আমার জীবন দান করিলে; তুমিই প্রকৃত সাধ্বী, তুমি আমায় এত ভালবাস—সম্পূর্ণ বিশ্বাস কর, তাহা না বুঝিয়া আমি তোমার সহিত পিশাচের মত ব্যবহার করিয়াছি।"

তখন কত ভালবাসার কথা বলিয়া, আদর করিয়া, দ্বিজেন্দ্র নিজ হাতে সুশীলার সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার পরাইল। বলিল,—"সুশীলা আমার শত সহস্র অপরাধ সত্ত্বেও তুমি আমার উপর কখন রাগ কর নাই—অভিমান কর নাই। তোমার ঋণ অপরিশোধ্য; তোমার গুণ অতুলনীয়। কিন্তু এত দিন যাহাকে বিশ্বাস করিয়াছি, যাহার সহিত ভাল ব্যবহার করিয়াছি, সে কিনা সামান্য এক হাজার টাকার গহনার জন্য আমার বিশ্বাস করিতে পারিল না। আমি আর তার মুখ দর্শন করিব না।"

সুশীলা বলিল—"সে কি হয়? দিদি আমার গুরু। তিনি আমার আগে এসেছেন। তাঁর প্রাণে কষ্ট দিলে চলিবে না। তিনি যেমন আদরে ছিলেন, সেইরূপ আদরেই তাঁকে রাখিতে হবে।"

(১৩)

সুশীলা আর এক সেট গহনা আনিয়া তার সপত্নীকে পরাইল। দ্বিজেন্দ্র সেই টাকা হইতে সমস্ত বিষয় উদ্ধার করিল।

দ্বিজেন্দ্র এখন হইতে সকল কাজেই সুশীলাকে জিজ্ঞাসা করিত—তার পরামর্শ ব্যতীত একটী কাজও করিতে ইচ্ছুক নহে। তার ইচ্ছা সুশীলাই সর্ব্ব বিষয়ের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করুক। কিন্তু সুশীলা সকল ভার দিদির উপর দেয়। সে বলে—"দিদি থাক্‌তে আমায় কেন জিজ্ঞাসা কর? দিদি সব জানেন।"

এখন দ্বিজেন্দ্রের সংসারিক অবস্থা পূর্ব্বের চেয়ে অনেক ভাল হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্র এখন সুশীলাকে না দেখিলে একেবারে অস্থির হয়। সুশীলার গুণে সংসারে এখন নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও শান্তি বিরাজ করিতেছে।

বড় বৌ সংসারের কর্ত্রী হইলেও এখন সকল বিষয়ে স্বামীর উপেক্ষা দেখিয়া, নিজের হীনতা বুঝিয়া লজ্জায় ম্রিয়মানা।

দ্বিজেন্দ্র ঠিক কথাই বলিয়াছে যে, স্বামীর শত অপরাধ থাকিলেও যে স্ত্রী রাগ করেনা; সেই স্ত্রীই প্রকৃত সাধ্বী।

শিশু।

লেখিকা,—শ্রীমতী স্বরেণুবালা দেবী।

স্বরগের দূত এসেছে এ ভবে
শিশুর মুরতি ধরি।
আপন ভুলান মধুমাখা ভাব
হাসিতে পড়িছে ঝরি॥
কিবা মধুময় আধ আধ বাণী
সুধা বরিষণ করে।
এ ধরা মাঝেতে নেচে আসে শিশু
হরষ দিবার তরে॥
কুসুম জিনিয়া সরল আনন
হাসিতে হাসিতে ভরা।
তুলনা মেলেনা এত কোমলতা
আছে গো শিশুতে ধরা॥
নাচিছে গাহিছে হাসিছে খেলিছে
হরষে উলসে হিয়া।
এ হেন সরল মাধুরীর ছবি
এঁকেছে বিধি কি দিয়া॥
নাহি কোন ব্যথা না জানে ভাবনা,
হাঁসিটি মাখান সবে।

(যেন) ত্রিদিব হইতে সোণার কোরক
খসিয়া পড়েছে ভবে॥

রাক্ষসগণ।

(গল্প)

লেখক,—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় B. A

১।

ছেলে বেলা থেকে মুখুর্য্যেদের চারুবালার সঙ্গে আমার খুব ভাব। চারুবালা আমাদের গ্রামের রমেশ কাকার মেয়ে। রমেশ কাকা আমার নিকট সুবাদে কাকা নহেন, গ্রাম সুবাদে কাকা; বাবার সঙ্গে তাঁর খুব মাখামাখি ভাব,—এক আফিসে কাজ করেন। আমি চারুর চেয়ে পাঁচ বৎসরের বড়। চারুর সঙ্গে আমার ছেলে বেলাতেই সম্বন্ধ হয়, চারুও ছেলে বেলা থেকে জানে, আমি তার বর। চারু মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিত, আর আমায় 'বর-বর' করিয়া খেপাইত। আমার দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমি চারুকে খেলা ঘর বাঁধিয়া দিতাম, এবং দুইজনে খেলা করিতাম। সেই খেলা ঘরে চারু আমার ক'নে আর আমি তাহার বর হইতাম। ঘর সংসারের সকল কাজই সেই খেলা ঘরে হইত। চারু খেলা ঘরের রান্না-বান্না করিত, এবং আমার পাত লইয়া সেই পাতে প্রসাদ পাইত। আমি যেন আফিস হইতে টাকা আনিয়া তাহার হাতে দিতাম, সে আমায় সত্য সত্য বাতাস করিত, খেলা ঘরের জল খাবার খাওয়াইত ও পান দিত। এইরূপে খেলা ঘর পাতিয়া আমি দুই বৎসর কাল চারুকে লইয়া সংসারী হইয়াছিলাম। শেষে আমার দশ বৎসর বয়স হইয়া গেলে, যখন স্কুলে যাইতে আরম্ভ করিলাম, তখন চারুকে লইয়া খেলা ঘরে খেলিতে আমার কেমন লজ্জা করিতে লাগিল। আমি সে খেলা বন্ধ করিয়া দিলাম। ইহাতে চারুর দুঃখের সীমা ছিল না, সে আমাদের বাড়ী আসিয়া আর সেরূপ খেলা খেলিতে না পাইয়া কাঁদিত, আর আমায় 'বর বর' করিয়া খেপাইত। চারুকে কাঁদিতে দেখিলে আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইত,

মনে হইত এখনই গিয়া তাকে দুটা ভাল কথা বলিয়া তার কান্না থামাই,—চখের জল মুছাই; কিন্তু কেমন লজ্জা—লজ্জা করিত, গাটাও কেমন ছম্ ছম্ করিত। আমার সঙ্গে খেলিতে না পাইয়া চারু কাঁদিত, আর তার কান্না দেখিয়া আমিও লুকাইয়া লুকাইয়া কাঁদিতাম। শেষে সেই কান্নাই আমার জীবনের সম্বল হইবে বলিয়াই কি এইরূপ হইত না কি?

২।

পরে চারুরও যখন বয়স হইল, তখন সেও আর আমাদের বাড়ী খেলিতে আসিত না, তখন কেবল কোন কাজকর্ম্ম উপলক্ষে সেও আমাদের বাড়ী আসিত, আমিও তাদের বাড়ী যাইতাম। তখন আমার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হইলে, হয় সে লজ্জায় চোখ দুটি বুজিত, না হয়, একটু ফিক্ করিয়া হাসিয়া দৌড়িয়া পলাইয়া যাইত। আমি তার সে সলজ্জভাব আর ফিক্ করিয়া হাসিটুকু, এ জীবনে কখন ভুলিতে পারিব না। বষ্টিবাঁটার সময়, পূজার সময় আর পৌষমাসে রমেশ কাকা আমায় তত্ত্ব করিতেন, আর আমার বাবাও চারুকে তত্ত্ব পাঠাইতেন। রমেশ কাকা বাবাকে 'বেহাই' বলিয়া ডাকিতেন, বাবাও রমেশ কাকাকে 'বেয়াই' বলিতেন। চারুর মা আমার মাকে 'বেয়ান' বলিতেন; মাও চারুর মাকে 'বিয়ান' বলিয়া ডাকিতেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে আমি এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়া জলপানি পাইলাম, তখন রমেশ কাকা চারুর সঙ্গে আমার বিবাহের দিনস্থির করিতে আসিলেন, কিন্তু বাবা তখন আমার বিবাহ দিতে রাজী হইলেন না, তিনি বলিলেন,—"বেয়াই, এত তাড়াতাড়ি কেন? নরেন আর একটা পাশ করুক, তার পর বিয়ে দেবো—আর তোমার চারুর বয়সত এখন সবে ন বৎসর বইত নয়?"

কাজেই রমেশ কাকা থামিয়া গেলেন। এই ঘটনায় মার মনে বড় কষ্ট হইল; আর আমিও মনে মনে বড়ই দুঃখিত হইলাম।

৩।

তার পর ষোল বৎসর বয়সে আমি F A পাস করিলাম, এবারও জলপানি পাইলাম, তখন রমেশ কাকা একেবারে নাছোড়বান্দা হইয়া বাবাকে ধরিয়া বসিলেন, বাবাও বিবাহ দিতে রাজী হইলেন। আমার আহ্লাদের আর সীমা রহিল না। জ্যোতিষ শাস্ত্রে বাবার অগাধ বিশ্বাস; ভূতনাথ আচার্য্য একজন গণক ও জ্যোতিষী—বাবার কাছে সর্ব্বদাই আসিতেন, বাবা তাঁর কাছে নিজে জ্যোতিষ শিক্ষা করিতেন। এক দিন বাবা আমার আর চারুর কোষ্ঠী দুই

খানি লইয়া তাঁকে দেখাইলেন। তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া দুইখানি কোষ্ঠী দেখিয়া বলিলেন.—"কন্যাটির রাক্ষসগণ, এ কন্যার সঙ্গে তুমি তোমার ছেলের বিয়ে দিতে পার না, আর শুধু রাক্ষসগণ নয়, এ মেয়ের বৈধব্যযোগ আছে দেখ্‌ছি—এ মেয়ে নিশ্চয়ই বিধবা হবে।"

নিকটেই বসিয়া আমি পড়িতেছিলাম, আমার মাথায় তখন যেন বিনা মেঘে হঠাৎ একটা বজ্রাঘাত হইল। বাবারও মুখে আর কথা নাই—তিনিও সে কথা শুনিয়া যেন অবাক হইয়া রহিলেন। গণনায় ভুল হইয়াছে কি না দেখিবার জন্য বাবা জ্যোতিষীকে পুনরায় গণিয়া দেখিতে বলিলেন, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না! জ্যোতিষী চলিয়া গেলেন, বাবা তখন বিষণ্ণ মনে বাড়ীর ভিতর গেলেন। মাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন. বলিতে বলিতে বাবা কাঁদিয়া ফেলিলেন, মাও কাঁদিলেন। আর আমি? আমার আর সেদিন কলেজ যাওয়া হইল না—অসুখ করিয়াছে বলিয়া আমি বিছানায় গিয়া শুইলাম।

৪।

ক্রমে সে কথা প্রচার হইয়া পড়িল। রমেশ কাকাও শুনিলেন। তিনি রুদ্ধশ্বাসে আমাদের বাড়ী দৌড়িয়া আসিলেন। বাবার সঙ্গে অনেক ক্ষণ ধরিয়া কি কথা হইল, তাহা আমি জানি না, তবে আমাদের দুইখানি কোষ্ঠি লইয়া অন্যান্য জ্যোতিষীকে দেখাইতে দুইজনে বাহির হইলেন—এ কথা মার মুখে শুনিলাম। বাবা যখন বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন, বাবার মুখ দেখিয়াই আমি বুঝিতে পারিলাম যে আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। বাস্তবিকই আমার কপাল ভাঙ্গিল, চারুর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল। এদিকে চারু বড় হইয়াছে দেখিয়া রমেশ কাকা অন্যত্র তার সম্বন্ধ স্থির করিলেন। আমি সে বৎসর B A ফেল হইলাম। ফেল হইয়া পড়াশুনা বন্ধ করিলাম, কারণ আমার একটা মাথার অসুখ জন্মিল। ডাক্তারেরা পশ্চিমে হাওয়া পরিবর্ত্তনে যাইতে বলিলেন। বাবার তাতে মত হইল না, কিন্তু আমি বাবাকে খুব জেদ করিয়া ধরিলাম, কারণ গ্রামে বাস করা আমার বড়ই কষ্টকর হইয়া উঠিল। আমার এক মাতুল এলাহাবাদে কর্ম্ম করিতেন, চারুর বিবাহের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে তাঁর কাছে এলাহাবাদে গেলাম। সেই যে গেলাম—আর দেশে ফিরিলাম না।

৫।

এলাহাবাদে আমার একটী ভাল চাকুরী হইল। বাবা আমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া ছুটি লইয়া দেশে আসিতে ক্রমাগত পত্র লিখিতে লাগিলেন।

কিন্তু আমি দেশে আর ফিরিলাম না—শেষে বাবাকে স্পষ্ট পত্র লিখিলাম যে, আমি আজীবন আইবুড়ো থাকিব—বিবাহ কখন করিব না। বাবা পত্রের দ্বারা আমায় অনেক বুঝাইলেন, মামা এলাহাবাদেই এক সম্বন্ধ স্থির করিয়া একেবারে না-ছোড়বান্দা হইলেন, কিন্তু আমি অটল ও অচল রহিলাম। আমি আমার বাবার এক ছেলে।

চারুর সংবাদ আমি মধ্যে মধ্যে পাইতাম। তার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, বৎসরান্তে সে শ্বশুর বাড়ী গিয়াছে। সুখী হইয়াছে কি না—সে সংবাদ জানিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু সে কথা জানিবার আমার কোন সুযোগ হয় নাই! চারুর বিবাহের দুই বৎসর পরে এক দিন সংবাদ পাইলাম—চারু বিধবা হইয়াছে। সে সংবাদ শুনিয়া আমি কাঁদিলাম—সে দিন আর আমার আফিস যাওয়া হইল না।

আরও দুই বৎসর পরে এক দিন বারুণীর যোগে আমি প্রয়াগের বেণীঘাটে স্নান করিতে গিয়াছি, সে দিন বেণীঘাটে একেবারে লোকে লেকোরণ্য। স্নান করিয়া বালির চড় ভাঙ্গিয়া আসিতে আসিতে দেখি, একটি পূর্ণ যৌবনা সুন্দরী মাথানেড়া বিধবা স্ত্রীলোক সঙ্গী হারাইয়া আকুল প্রাণে ছুটিয়া বেড়াইতেছে; আমার প্রাণটা যেন ছ্যাঁক করিয়া উঠিল। আমি তাড়াতাড়ি সেই স্ত্রীলোকের সাহায্যের জন্য তার কাছে গেলাম। কিন্তু তার কাছে গিয়া দেখি—সে আমাদের গ্রামের সেই চারু—আমার রমেশ কাকার মেয়ে! আমি চারুকে চিনিতে পারিলাম, চারুও আমাকে চিনিল। এখন তার সেই থান-কাপড় আর নেড়া-মাথা দেখিয়া আমার প্রাণ কাঁদিল। আর ছেলেবেলার খেলাঘরের কথা আমার মনে জাগিয়া উঠিল। চারুও কিন্তু একটি কথা কহিল না, তার মনের ভাব আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমি তাদের বাসার ঠিকানা জানিয়া লইলাম, আর একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া চারুকে সেই বাসায় লইয়া যাইতে চাহিলাম। চারু আমার সঙ্গে গাড়ীতে যাইতে প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, কিন্তু তখন আর অন্য উপায় নাই—কাজেই রাজী হইল। অনেকক্ষণ গাড়ীর মধ্যে আমরা নীরবে চলিলাম, আমাদের মধ্যে কেহ কোন কথা কহিল না। শেষে আমি আর থাকিতে পারিলাম না, একটা কথা কহিয়া ফেলিলাম—"চারু তুমি আমায় ভুলে গেছ, না মনে আছে?"

চারু উত্তর করিল—"ভুলে গেছি।" চারি বৎসর পর আমার চারুর সঙ্গে

দেখা—আর তার মুখে এই কথা! আমি কহিলাম—"তুমি বড় নিষ্ঠুর—আমায় কি করে ভুলে গেলে?"

চারু অনেকক্ষণ সে কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না, শেষে যেন অনেক কষ্টের সহিত ধীরে ধীরে কহিল—"আমি বিধবা, আর তুমি আমার পরপুরুষ; তোমার কথা ভুলে যাওয়াই এখন আমার পক্ষে ভাল।"

অনেকক্ষণের পর আমি পুনরায় কহিলাম—"আচ্ছা, তুমি ত আমার রমেশ কাকার মেয়ে, সে সুবাদেও তুমি আমায় মনে রাখিতে কি ভাল বাসিতে চাও না?"

চারু এবারও ধীরে ধীরে উত্তর করিল—"না।"

সেই ক্ষুদ্র 'না' কথাটি আমার প্রাণে একটা ভয়ঙ্কর আঘাত করিল—আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। এই সময় হঠাৎ আমার মুখ হইতে বাহির হইল—"কেন?"

চারু উত্তর করিল—"আমায় ভালবাসিতে নাই, "আমার যে রাক্ষসগণ।" তখন গাড়ী তাদের বাসার নিকট পৌছিয়াছিল, আমি তাড়াতাড়ি তাহাকে সেই বাসা দেখাইয়া দিয়া দৌড় দিলাম।

—•—

সাধক-সঙ্গীত।

পণ্ডিত শ্রী শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ বিরচিত।

সরস্বতী বন্দনা।

(খাম্বাজ—ত্রিতালী।)

জয় শ্বেত শতদল বাসিনী!
জয় শ্বেতাঙ্গে, চারু ত্রিভঙ্গে।
বেদ-বেদাঙ্গ ধারিণি!
ইন্দু বিনিন্দিত উজ্জ্বল বরণে,
জ্ঞান বিধাত্রি, অজ্ঞান হর্ত্রি!
করুণামূর্ত্তি ভুবনে!

সচ্চিদানন্দে, ত্রিলোক বন্দ্যে!
রাগ রাগিণী যুত সঙ্গীতানন্দে!
ছন্দোবন্ধে ত্রিভুবন মোহিনী, বাগ্বাদিনি!
মন্দ-মধুর বীণা বাদিনি, ভাবিনি!
কাতর তনয়ে তারয় তারিণি!
নমি সরস্বতি, গীর্ব্বাক ভারতী,
শ্রীশ্রীপদ হৃদয় বিলাসিনি!

বিবিধ প্রসঙ্গ।

(সঙ্কলিত।)

দন্ত-রক্ষণ।—যাঁহারা অধিক পরিমাণে মৎস্য বা মাংস ভক্ষণ করেন, নিরামিষাশীদিগের অপেক্ষা তাঁহাদিগেরই দন্তরোগের আধিক্য পরিদৃষ্ট হয়। যাঁহারা অধিক পরিমাণে মিষ্ট ভোজন করেন, তাঁহারাও দন্ত পীড়ায় কষ্ট পাইয়া থাকেন। ফল অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করিলে দন্তমূল পরিষ্কৃত হয় এবং দন্ত দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। আপেল ও খেজুর দন্তের পক্ষে বিশেষ উপকারী। শশা ন্যাসপাতি, বেদানা আঙ্গুর, লেবু ইত্যাদিও দন্তের উপকারী নহে।

পঙ্গুর পরমায়ু।—কর্ণেল ও পলস নামে একজন বিখ্যাত ইংরাজ ডাক্তার বলেন, "মানুষের দুটো পায়ের একটা যদি কাটা পড়িয়া যায়, তাহা হইলে যতদিন বাঁচা তারপক্ষে স্বাভাবিক অবস্থায় সম্ভব ছিল, তদপেক্ষা অধিক দিন সে অঙ্গহীন অবস্থায় বাঁচিতে পারে। দুখানা পা নষ্ট হইয়া গেলে মানুষের পরমায়ু আরও বাড়িয়া যায়, কেবল ইহাই নহে; দুই পা কাটিয়া ফেলিলে মানুষের জলে সাঁতার দিবার সামর্থ্যও যথেষ্ট বাড়িয়া উঠে।" কেহ পরীক্ষা করিয়াছেন কি?

ডাক্তার হাচিনসনের মতে, নিয়ম করিয়া যাঁহারা কাঁচা পেয়াজ খান তাঁহাদের স্বাস্থ্য বেশ ভাল থাকে।

রঙ্গ-রস।

(সঙ্কলিত।)

পরামাণিক ও ভদ্রলোক।—জনৈক ভদ্রলোক পরামাণিকের নিকটে দাঁড়ী কামাইয়া উঠিয়াই চিৎকার করিয়া বলিলেন,—"শীঘ্র শীঘ্র এক গেলাস জল এনে দাও তো?

পরামাণিক। জল নিয়ে কি করবেন মশাই?

ভদ্রলোক। মুখে ঢেলে দেখব, জলটা পেটের মধ্যে যায়, না গলা দিয়েই "লিক" করে বেরিয়ে আসে। তুমি কি কর হে?

পরামাণিক। আমি ছাঁট কাটের ব্যবসা করি; আপনি বল্লেন, তাই আজ আপনাকে কামাইয়াছি।

ভদ্রলোক। তবে তোমার ছাঁটই বা কি? আর কাটই বা কি?

পরামাণিক। আজ্ঞে আমি পরামাণিক নহি, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করি, যখন কাজ জোটে তখন আমি লোকের চুল ছাঁটি, আর যখন কাজ জোটে না, তখন আমি লোকের পকেট কাটি।

শিক্ষক ও ছাত্র।—গুরু মশাই ক্লাশে আসিয়াই ছাত্রদিগকে প্রশ্ন করিলেন, বল দেখি, ছাতা কি কাজে লাগে?

১ম ছাত্র উত্তর করিল, ছাতা মানুষের অনেক উপকার করে,—ছাতা মাথায় দিলে রৌদ্রে টাক তাতে না।

গুরু মহাশয়ের মাথায় বৃহৎ টাক ছিল, তাই তিনি ১ম ছাত্রকে যারপর নাই তিরস্কার করিলেন।

২য় ছাত্র ভাবিল, ছাতায় রৌদ্র ও বৃষ্টি আটকায়, এতো সকলেই জানে। একটা নূতন কিছু বলা আবশ্যক,—আজ মাসের ২৯শে গুরু মহাশয় এ মাসের বেতন এখনও পান নাই; ২য় ছাত্র উত্তর দিল,—"মদীর কাছে ধার কর'লে তার দোকানের সাম্‌নে দিয়ে ছাতার আড়াল দিয়ে আসা যায়। ভাগ্যক্রমে মাসের শেষে গুরু মহাশয়ের সত্য সত্যই মদীর দোকানে ধার ছিল। পাছে প্রাণের কথাটা ছাত্রদিগের নিকটে প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাই বলিলেন,—"বা ঠিক বলেছিস্ বাবা" বলিয়াই প্রস্থান করিলেন।

কি রেখে গেছেন?—তোমার বড় মানুষ খুড়ো ত মারা গেছেন, তিনি কি তোমার নামে কিছু রেখে গেছেন?

—"হ্যাঁ, রেখে গেছেন বটে।"

"কি রেখে গেছেন ?"

"উইল থেকে আমার নাম ছেঁটে রেখে গেছেন।"

জ্যোতিষী ও গ্রন্থকার।—জ্যোতিষী মহাশয় বাঙ্গালার গ্রন্থকারের হস্ত রেখা দৃষ্টে বলিলেন, "আরও প্রায় ত্রিশবৎসর কাল আপনাকে দারিদ্রতার জন্য কষ্ট ভোগ করিতে হইবে।

বাঙ্গালার গ্রন্থকার। (সাগ্রহে) তার পর ?

জ্যোতিষী। তার পর দারিদ্রতার কষ্ট ক্রমশঃ আপনার সহ্য হইয়া যাইবে।

দীর্ঘজীবনের কারণ কি ? শ্যাম বাবুকে প্রতিবাসী একজন জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এমন নীরোগ দেহে এতদিন কি করে বেঁচে আছেন ?

বৃদ্ধ শ্যামবাবু উত্তরে বলিলেন, "বাপু হে, তোমাদের এ কালের ডাক্তারদের রোগের Germ বা বীজাণু আবিষ্কার করে লোককে ভয় দেখাবার আগেই আমি জন্মে ছিলুম, বলে এতকাল পরেও আমার অস্তিত্ব লোপ হয়ে যায় নি।"

দাতাকর্ণ। বিখ্যাত জবর দস্ত জমিদার গঙ্গারাম রায় চৌধুরী মহাশয় অন্তিম কাল আসন্ন আশঙ্কা করিয়া এটর্ণীর নিকটে শেষ উইল লিখিতেছেন।

গঙ্গারাম। আমার জমিদারী সেরেস্তায় যে সব কুড়ি বৎসরের পুরাতন কর্ম্মচারি আছে, তাহাদের প্রত্যেককে আমি দুই হাজার টাকা দান করিলাম; আমার মৃত্যুর পর টাকা পাইবে।

এটর্ণী। (সবিস্ময়ে লেখা থামাইয়া) কি আশ্চর্য্য! আপনি যে সাক্ষাৎ দাতাকর্ণ দেখ্‌চি!

গঙ্গারাম। দাতাকর্ণের কপালে আগুণ, তুমি কদিনের কোথাকার এটর্ণী হে ? আমার জমিদারীতে কুড়ি বৎসরের পুরাণো লোক একটিও নাই, টাকাও কেউ পাবে না!

এটর্ণী। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) আজ্ঞে তবে এ কথা লেখ্‌বার দরকার কি ?

গঙ্গারাম। কে তোমায় বল্‌লে, দরকার নাই ? খবরের কাগজে যখন এই দানের সংবাদ বাহির হইবে, তখন চারিদিকে আমার নামে ধন্য ধন্য রব পড়ে যাবে তা জানো ?

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

জন্মভূমি

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

২৬শ, বর্ষ। ১৩২৭ সাল, ফাল্গুন। ১১শ সংখ্যা।

ব্যর্থিতা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী।

(গল্প।)

দত্ত পুকুরের কান্তি ভট্টাচার্য্য যখন আকাশ পাতাল ঘুরিয়াও আপন চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া অরক্ষণীয়া কন্যার জন্য সুপাত্রের সন্ধান পাইলেন না, তখন বাধ্য হইয়া এক বাঙ্গালের করে কন্যা পঙ্কজ বালাকে সমর্পণ করিলেন। পাত্র রঙ্গলাল দেখিতে অতি সুশ্রী, বয়স চব্বিশ কি পঁচিশ, F A পর্য্যন্ত পড়িয়া সংবাদ পত্র কার্য্যালয়ে চাকুরী করে। রঙ্গলাল কান্তিচন্দ্রের কন্যাদায়ের কথা শুনিয়া এবং বৃদ্ধের সজল নেত্র দেখিয়া একটী কপর্দ্দক না লইয়াই বিবাহ করিল। কিন্তু সুচতুর দুনিয়ার লোকে তাহার সে অন্তরের মহত্ত্ব বুঝিয়াও বুঝিল না। রঙ্গলালের সাদাসিদা পোষাক পরিচ্ছদ, আলু থালু কেশ পাশ এবং সরল কথা বার্ত্তায় সকলে স্থির করিল ছেলেটি নিতান্ত হাবা, বোবা গো-বেচারী। শ্বাশুড়ী বুকে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমার একটী মাত্র মেয়ে, কোত্থেকে এক পাগল এনে ধ'রে দিল।" কান্তিচন্দ্র পত্নীর কথায় উচ্চ বাচ্য না করিয়া অন্তরালে যাইয়া বসিয়া রহিলেন।

শাশুড়ীর কথাটা যতই অস্পষ্ট হউক না কেন, তাহা রঙ্গলালের কর্ণে পৌঁছিতে বাকী রহিল না। তাই বাসর ঘরে পাড়ার মেয়েরা যখন নানাপ্রকার ঠাট্টা তামাসা, আমোদ প্রমোদে সঙ্গীতে নৃত্যে—নব জামতার অধরপ্রান্তে হাসির রেখা দেখিবার চেষ্টা করিল, প্রভাতে তাহারা হতাশ হৃদয়ে রঙ্গলালের উপর নানাপ্রকার মিষ্ট উক্তি বর্ষণ করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিল। সারা-রাত জাগরণ হেতু ঢলু ঢলু চক্ষু দুইটী লইয়া রঙ্গলাল যখন বাহিরে বন্ধুবান্ধবদের নিকট আসিয়া বসিল, তখন তাহাদের প্রীতি-সম্ভাষণটা নিতান্তই শেলের ন্যায় তাহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। রঙ্গলাল আন্‌মনে ভাবিতে লাগিল, "আমি না বুঝিয়া না জানিয়া কেন এমন অপকর্ম্ম করিলাম। চিরদিন বিবাহ করিব না, প্রতিজ্ঞা করিয়া শেষে যদিও বা বিবাহ করিলাম তাহারও প্রারম্ভে "পাগল" বলিয়া শ্বাশুড়ীর গঞ্জনা সহ্য করিতে হইল। না জানি যাহার প্রারম্ভ এইরূপ তাহার শেষটা কিরূপ দাঁড়াইবে।"

বিবাহ বাসরে রঙ্গলালের বন্ধু-বান্ধবেরা বিশেষ করিয়া পঙ্কজ বালার সৌন্দর্য্য দেখিয়া ছিলেন। পঙ্কজ চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া, উদ্ভিন্ন যৌবনা, লাবণ্যে উচ্ছ্বসিতা অসামান্য রূপের একখানি চিত্রিত প্রতিকৃতি। বস্তুতঃ গরীবের ঘরে ওরূপ অসামান্য সৌন্দর্য্য প্রায়শঃ দেখা যায় না। রঙ্গলালও যে শুভ দৃষ্টির সময় সেই মৃগাক্ষির ক্ষণিক কটাক্ষ দর্শন না করিয়াছে এমন নহে, অথচ তাঁহার মুখখানি সহসা এরূপ বিষাদ মাখা হইল কেন, তাহা তাহারা আদতেই বুঝিতে পারিল না। ক্রমে বেলা বাড়িল, ধীরে ধীরে সূর্য্যদেব প্রায় মধ্য গগনে আসিয়া উপস্থিত হইল। কান্তি বাবু একে একে বরযাত্রীগণকে লইয়া সাদরে ভোজন করাইলেন, রঙ্গলাল নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে দুইটি আহার করিয়া উঠিলেন—বন্ধুরা এ ভাবান্তরের কোনই কারণ বুঝিতে পারিল না।

(২)

ফুল শয্যার রাত্রে একত্রে শয়ন করিতেই পঙ্কজ বালা নিতান্ত সলজ্জভাবে বিছানার একটি পার্শ্বে শুইয়া রহিল। রঙ্গলালের ইচ্ছা হইল, একবার পার্শ্বগতা পত্নীর গায়ে হাত দিয়া তাহার সহিত দুইটী বাক্য বিনিময় করেন। কিন্তু বলি বলি করিয়া কিছুতেই তাঁহার মুখ হইতে কথা বাহির হইল না। সমস্ত গায়ে গলদ্ ঘর্ম্ম ছুটিল—রঙ্গলাল বলি বলি করিয়াও মনের কথা বলিতে পারিল না। অবশেষে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল রসনা ও মনের সহিত ঘোর যুদ্ধ করিয়া রঙ্গলাল "পঙ্ক" বলিয়া ডাক দিলেন। পঙ্কজ এতক্ষণ মুখ লুকাইয়া স্বামীর

দিকে পিঠ দিয়া মুখ ফিরাইয়া শুইয়া ছিল। এতক্ষণে স্বামীর প্রথম আহ্বান শুনিবা মাত্র সে মুখ ফিরাইয়া একটু সরিয়া আসিয়া স্বামীর নিকট শয়ন করিল। রঙ্গলাল ধীরে ধীরে পঙ্কজের ডান হাত খানি আপন বুকের মধ্যে লইয়া বলিলেন,—"পঙ্ক তোমার মা ত আমায় পাগল ব'লে সাব্যস্ত ক'রেছে, তুমি কি আমার সহিত বিবাহে সুখী হ'য়েছ?"

পঙ্কের বুকের ভিতর ধড়্ ফড়্ করিতে লাগিল। কি বলিয়া যে সে উত্তর করিবে, তাহা কোন মতেই মনে মনে স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। অব-শেষে অনেক চিন্তা করিয়া সে এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, "সুখী হ'ব না ত হ'ব কি? ভগবান যখন লিখেছেন; তোমার সহিত বিবাহ হ'বে, তখন দুঃখিত হ'বার তো কোন কারণ নাই।"

রঙ্গলাল প্রণয়িনীর সেই প্রথম সম্ভাষণ সেই অর্দ্ধস্ফুট স্বরলহরী শুনিয়া রঙ্গলালের সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল—এক নবীন তাড়িত প্রবাহ তাহার প্রত্যেক শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইল। এই ভাবে কিছুকাল গত হইলে রঙ্গলাল দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আমরা তো অতি গরীব, দেখ্‌তেই পাচ্ছ, তোমাকে দিবার মত আমার কিছুই নাই, এই শাঁখা শাড়ী নিয়ে সুখী হ'তে পার্ব্বে তো?"

পঙ্কজ বলিল, "সুখী হব না, এ কথা ভাব্‌লেও পাপ হয়।"

রঙ্গলাল বুঝিল, পঙ্ক কেবল তাহাকেই চাহে. স্বামীর সঙ্গ ও ভালবাসা পাইলে পঙ্ক শাঁখা শাড়ীতেই আজীবন সুখী থাকিবে—ইহা বুঝিতে রঙ্গলালের বাকী রহিল না। এই ভাবে সারারাত অতিবাহিত হইল—উভয়ের চোখেই ঘুম নাই, বৃথা জল্পনাও নাই—কথা নাই, বার্ত্তা নাই অথচ দু'জনই যেন দু'জনেই মাতোয়ারা! উষার বালার্ক কিরণচ্ছটা যখন উন্মুক্ত গবাক্ষের মধ্য দিয়া নব-দম্পতীর হরিদ্রাভ মুখ মণ্ডলে পতিত হইল, আর নিষ্ঠুর বায়স যখন সুখ-নিশার অবসান বার্ত্তা ঘোষণা করিল, তখনই রঙ্গলালের চৈতন্য হইল। তিনি দেখি-লেন, পঙ্ক তাঁহার বুকের মধ্যে মাথা দিয়া একটু তন্দ্রা মত আসিয়াছে। রঙ্গলাল এতক্ষণ পঙ্ককে ভাল করিয়া দেখেন নাই। শ্রান্ত প্রকৃতির শোভা অপেক্ষা 'সুষুপ্তা প্রকৃতির সৌন্দর্য্য যেমন মিষ্ট হইতেও মিষ্টতর' রঙ্গলাল তেমনি পঙ্কের মুখশ্রী আরও মিষ্ট হইতে মিষ্টতর দেখিলেন। রঙ্গলাল একাগ্রমনে যতই সে রূপরাশি দেখিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার তৃষ্ণা আরও বাড়িতে লাগিল। তিনি একদৃষ্টে তাকাইয়া তাকাইয়া পঙ্কের সৌন্দর্য্যরাশি দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও এতটুকু খুঁত পাইলেন না। তাঁহার বোধ হইল, যেন অত রূপ—

অত সৌন্দর্য্য আর যেন কোথাও নাই। বিশ্ব যেন তাহার সমস্ত সৌন্দর্য্য রাশি লইয়া সে কমনীয় মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। দেওয়ালের গায়ে একখানি রমণীমূর্ত্তি টাঙ্গান ছিল, শকুন্তলা প্রিয়ংবদা ও অনুসূয়া আলবোলায় জল দিতেছে, আর অন্তরাল হইতে রাজা দুষ্মন্ত তাহা নিরীক্ষণ করিতেছেন। রঙ্গলাল নিবিষ্টচিত্তে সেই কবি কল্পিত মূর্ত্তির সহিত বাস্তব মূর্ত্তির তুলনা করিয়া দেখিলেন,—দেখিলেন তাহার বাস্তব মূর্ত্তিই শ্রেষ্ঠতর। ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল, উন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়া প্রচুর রৌদ্র কিরণ আসিয়া সমস্ত ঘরখানি আলোকময় করিয়া ফেলিল, বাহিরের দরজার কড়া নাড়িয়া পাড়ার রসিকা বৌ ও মেয়েরা বলিল, "কি গো সাধের ঘুম যে আর ভাঙ্গে না, এ দিকে যে রবি শশী জ্বলে।" কেহ বলিল, "তা ভাই সারারাত দু'জনে কথাবার্ত্তা ব'লে এখন শেষরাত্রে হয়ত একটু ঘুমিয়েছে, তা জাগাবার জন্যে তোমাদেরই বা অত মাথাব্যথা কেন?"

রঙ্গলাল ধীরে ধীরে নিঃশব্দে যাইয়া দরজার খিল খুলিয়া দিয়া নিজে অন্য দ্বার দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। আগতা রমণীগণ ইহার বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারিল না। শেষে অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করিবার পর একটি মেয়ে "দরজাটা ভাঙ্গব নাকি।" এই বলিয়া দরজায় একটি ঠেলা মারিতেই দরজা খুলিয়া গেল, সকলে ঘরে ঢুকিয়া দেখে রঙ্গলাল নাই, কেবল নিমীলিত নেত্রে পঙ্কজবালা পর্য্যঙ্কের উপর নিদ্রা যাইতেছে। একটি মেয়ে তাড়াতাড়ি পঙ্কজকে উঠাইতে যাইতেছিল. অমনি আর একজন তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "না ভাই, জাগিয়ে কাজ নাই, এইমাত্র শুয়েছে, বেচারী একটু ঘুমুক।

সমাগতা রমণীগণের কথাবার্ত্তায় পঙ্কজের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, সে চোখ মেলিয়াই লজ্জায় মরমে মরিয়া গেল। তাড়াতাড়ি ঘোম্‌টা টানিয়া দিয়া শয্যা ছাড়িয়া একটি পার্শ্বে নিতান্ত অপরাধিনীর মত দাঁড়াইয়া রহিল, এতগুলি লোকের মধ্যে অপ্রস্তুত করায় মনে মনে স্বামীর উপরও তাহার ভয়ানক অভিমান হইল। সুশীলা নামে একটী সমবয়স্কা বালিকা পঙ্কজের মুখের ঘোম্‌টা খুলিয়া বলিল, "কিগো একেবারে দিন কি রাত ভুলিয়াই গেছিলে।" পঙ্কজ তাড়াতাড়ি ঘোম্‌টাটা টানিয়া দিয়া আনত বদনে দাঁড়াইয়া রহিল।

(৩)

শ্বশুর বাড়ী হ'তে শ্যামপুকুরে আসামাত্রই পঙ্কজকে কি কি গহনা দেওয়া হইয়াছে,—বাঙ্গাল দেশটা কেমন? তাদের আচার ব্যবহারটাই বা কি রকম

ইত্যাদি বিষয় জানিবার জন্য ও দেখিবারজন্য পালে পালে পাড়ার মেয়েরা পঙ্কজদের বাড়ীতে উপস্থিত হ'লো। পঙ্কজ যথাসম্ভব স্বামীর দেশের গুণানুকীর্ত্তন করিল এবং হঠাৎ বিবাহ হইয়াছে বলিয়া কোন গহনা দিতে পারে নাই বলিয়া, স্বামীকুলের লোকদিগকে প্রতিবেশিনীদের নিন্দা হইতে অব্যাহতি দিল। কিন্তু পঙ্কজের মা সে শ্রেণীর স্ত্রীলোক ছিলেন না। তিনি ক্রোধে আত্মহারা হইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে নানাপ্রকার কটুবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। "আমার একটি মাত্র মেয়ে, না হয় আর দু'বছর বিবাহ নাই বা হোত, তুমি কেন, ইটে ছাড়া, ভিটে ছাড়া এক পাগলের হাতে আমার মেয়েটীকে দিয়া এই সর্ব্বনাশটা কর্‌লে।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "তুমি কেন অত ব'কছ, মেয়ে জামাই আমার যদি গাছতলায় থেকে সুখে থাকে, তাতেই আমার সুখ। দেখ্‌ছ না ছেলের বাজার কিরূপ চড়া, আজ দু'বছর ধ'রে খুঁজে খুঁজে তবে এই পাত্রটী পেয়েছি। তা বিনা পয়সায় ঐরূপ একটা পাশ করা, সুশ্রী ছেলে এনে দাও দিকি?"

ভট্টাচার্য্য পত্নী পূর্ব্বাপেক্ষা আরও গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "কোথায় বা যশোর জেলা, আর কোথায় বা চব্বিশ পরগণা, নিরবুংশে এমন জায়গায় মেয়েটাকে আমার দিলে যে, আজীবন আর তার মুখখানা দেখ্‌বারও উপায় রাখ্‌লে না।"

কান্তি বাবু বলিলেন, "ছেলেটী যখন কল্‌কাতায় চাকরী করে, তখন সে কি আর তোমার মেয়েকে দূরে রাখবে, হয়ত কল্‌কাতাতেই মেয়ে নিয়ে বাসা করে থাক্‌বে। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ যা তার উপর কথা কইতে নাই, যা হবার তা হ'য়েছে, এখন জামাই নিয়ে আদর যত্ন কর।"

(৪)

বছর না ঘুরিতেই রঙ্গলালের ভাগ্যের উপর দিয়া এক পরিবর্ত্তনের চক্র ঘুরিয়া গেল। বৃদ্ধ পিতা হরিশ্চন্দ্র তিন দিনের জ্বরবিকারে যে রাজ্যে জরা নাই, মৃত্যু নাই, সেই রাজ্যে চলিয়া গেলেন। সে সংবাদ শুনিয়া রঙ্গলালের সম্মুখে সমস্ত জগতটা কুম্ভকারের চাকার ন্যায় ঘুরিতে লাগিল। রঙ্গলাল বৃদ্ধা মাতা ও বিধবা ভগ্নীর তত্ত্বাবধারণ করিবার জন্য কর্ম্মময় কলিকাতা ছাড়িয়া সুদূর পল্লীগ্রামে যাইয়া সামান্য পনের টাকায় স্কুল মাষ্টারী আরম্ভ করিল। কান্তিবাবু জামাতার এই আকস্মিক বিপদের কথা শুনিয়া স্বয়ং কন্যাকে লইয়া জামাতৃ ভবনে গমন করিলেন এবং যথারীতি বৈবাহিকের পারলৌকিক ক্রিয়া করিয়া কন্যাকে রাখিয়া ফিরিয়া আসিলেন। কান্তি বাবুকে একলা ফিরিয়া

আসিতে দেখিয়াই গৃহিণী রাগে ফুলিয়া তিনটা হইলেন এবং বলিলেন, "তুমি কোন্ আক্কেলে সেই জঙ্গলা দেশে আমার মেয়েটীকে রেখে এলে। আমার মেয়ে আমার কাছে এনে দাও।"

কান্তি বাবু এবার আর রাগ সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "মেয়ে বিবাহ দিয়াছ কি বাপের বাড়ী আটকাইয়া রাখতে? বয়স্থা মেয়ে, স্বামীর কাছে থাকবে, সেই ত তাহার সুখ, তুমি নিতান্ত অভদ্র জাতের মত কথা বল্‌ছ।"

গৃহিণী স্বামীর কথা শুনিয়া পদক্ষিপ্ত কালভূজঙ্গের ন্যায় গর্জ্জিয়া বলিলেন, "কি যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা। তুমি আমার বাপ মায়ের জাত তু লবার কে? এই এখনই চল্লেম, তোমার বাড়ী ছেড়ে"——এই বলিয়া রণরঙ্গিনী-বেশে গৃহিণী পদভরে মেদিনী কাঁপাইয়া অন্দরে গেলেন।

(৫)

আজ দুই বৎসর হইল পঙ্কজ শ্বশুরালয়ে আসিয়াছে। পশ্চিম দেশীয়া অর্থাৎ কল্‌কাতার ধারের মেয়েরা লজ্জাহীনা, বিলাসিনী, আলস্যপরতন্ত্রা, মুখরা বলিয়া বাঙ্গাল জাতির মধ্যে যে একটি বদ্ধমুল সংস্কার আছে, পঙ্কজ তাহা তাহার কার্য্যের দ্বারা ও আচরণের দ্বারা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছে। গ্রামের মধ্যে যেখানেই যাও, সেখানেই পঙ্কজের প্রশংসা। পঙ্কজ সকালে উঠিয়া ঘর দোরে গোবর ছড়া দি,য়া বাসন মাজিয়া, রান্নাঘর নিকাইয়া, সকাল সকাল স্বামীর স্কুলের ভাত রাঁধিয়া দেয়। যতক্ষণ স্বামী খাইতে থাকে, ততক্ষণ স্বামীর ভোজ্যপাত্রের সম্মুখেই বসিয়া পাখার বাতাসে গরম ভাত জুড়াইতে থাকে। তারপর নিজ হস্তে স্বামীকে পান তামাক সাজিয়া দিয়া স্বামী স্কুলে গেলে শ্বাশুড়ীর জন্য অতি শুচিভাবে নিরামিষ রন্ধন করে। শ্বাশুড়ীও ননদের আহার শেষ হইলে পঙ্কজ ভুক্তাবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা খাইয়া শ্বাশুড়ীর নিকট বসিয়া কখনোবা তাঁহার পাকা চুল বাছিয়া দেয়, আবার কখনোবা রামায়ণ, মহাভারত পড়িয়া তাঁহাকে শুনায়। বেলা চারিটার সময় স্বামী স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিবামাত্র পঙ্কজ তাঁহার হাত মুখ ধুইবার জন্য জল আনিয়া দেয় এবং চিড়া, গুড়, নারিকেল কোরা দিয়া স্বামীকে জল খাবার দেয়। স্বামী জলযোগান্তে সান্ধ্য ভ্রমণে বহির্গত হইলে পঙ্কজ জলের কলসীটি কক্ষে লইয়া আনাভি অবগুণ্ঠন দিয়া সন্নিহিত নদী হইতে জল আনিয়া রাত্রি কালীন রন্ধন কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইবা মাত্রই স্বামীকে

খাওয়াইয়া, পঙ্কজ শ্বাশুড়ী ও ননদকে জল খাবার দেয় এবং তাঁহাদের জলযোগ সমাপ্ত হইলে পঙ্কজ স্বামীর ভুক্তাবশিষ্ট দুইটি প্রসাদ লইয়া স্বামীর নিকট শয়ন করিতে যায়। রঙ্গলাল সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর পঙ্কজের পদ্ম-হস্তের স্পর্শে স্বর্গসুখ অনুভব করে, এত অভাব, এত অনাটন যেন তাহার অভাব বলিয়াই বোধ হয় না। যে নিজেকে বাদশাহ বা আমীর ওমরাহ অপেক্ষাও সুখী বলিয়া মনে করে। বস্তুতঃ এমনই লক্ষ্মীপ্রতিমা পঙ্কজ যে সংসারে তাহার সুবন্দোবস্তে রাত দুপুরেও দশজন অতিথি আসিলে গৃহস্থকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না, কিংবা শ্বাশুড়ী, ননদকে ডাহিনের কূটা বামে সরাইতে হয় না। এমনই ধারা স্বর্গ সুখের মধ্যে যখন রঙ্গলালের ক্ষুদ্র পল্লীজীবনটা অতিবাহিত হইতেছিল, তখন হঠাৎ এক কালো মেঘ আসিয়া হঠাৎ তাঁহার সুখের সংসার ছাইয়া ফেলিল। সেদিন স্কুলে যাইতেই ডাকপিওন তাঁহার হাতে একখানি চিঠি দিল, রঙ্গলাল চিঠির মোড়ক ছিড়িতেই দেখেন, তাহাতে তাঁহার শ্বশুরের নিদারুণ মৃত্যু সংবাদ লিখিত রহিয়াছ। কি করিয়া এই মর্ম্মভেদী সংবাদ পঙ্কজের কাণে দিবেন এবং এই দারুণ পিতৃ বিয়োগ সংবাদ শুনিয়া কত না কাঁদিবে, এই ভাবনায় রঙ্গলালের সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইল। তিনি কোন্ প্রাণে পঙ্কজের জলভরা চোখ ও বুকভরা দীর্ঘনিশ্বাস দেখিবেন। কোন গতিকে যন্ত্র চালিতের ন্যায় স্কুলে যাইয়া প্রধান শিক্ষকের নিকট হইতে দশদিনের বিদায় লইয়া রঙ্গলাল নিতান্ত বিষণ্ণ মুখে বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। স্বামীর এই আকস্মিক প্রত্যাবর্ত্তনে ও তাঁহার ম্লান মুখ দেখিয়া পঙ্কজ অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া বিদ্যুৎবেগে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "কি তোমার কি কোন অসুখ ক'রেছে।"

রঙ্গলাল "না" বলিয়াই পর্য্যঙ্কের উপর নিতান্ত ঔদাসিন্য সহকারে বসিয়া পড়িল। একটা যে কিছু গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহা অনুমান করিতে পঙ্কজের বাকী রহিল না। শ্রাবণের মেঘের গর্জ্জনের ন্যায়, তাহার বুকের মধ্যে গুরু গুরু করিতে লাগিল—পঙ্কজ স্বামীর হাত দু'খানি ধরিয়া বলিল, "কি হ'য়েছে আমায় বল না।"

রঙ্গলাল সত্যকথা চাপা দিয়া বলিল, "হয় নাই বিশেষ কিছু, কল্‌কাতা হ'তে ইনেস্পেক্টর সাহেব ডেকে পাঠিয়েছেন, আজই দুইটার ষ্টীমারে রওনা হতে হ'বে। ভাব্‌ছি তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাই।"

পঙ্কজ বলিল, "আমি গেলে মাকেও দিদিকে কে দেখ্‌বে, আর দুই এক

দিনের জন্য আমাকে আন্‌তে নিতে গেলে তোমার খরচও তো কম্ পড়বে না।”

রঙ্গলাল। খরচের না হয় এক রকম ক’রে যোগাড় হবে। তোমারও তো বাপ মা আছে, দু’বছর যাও না, না হয় একবার ঘুরে এলে!

বাপের বাড়ীর নাম শুনলে নিতান্ত বৃদ্ধারও বাসনা হয় একবার যাইতে। সুতরাং নিতান্ত সরলা পঙ্কজের যে হৃদয়ে ইহাতে একটু আনন্দ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কিছু নাই।

বেলা দুইটার সময় ষ্টীমারে স্বামী স্ত্রীতে রওনা হইল। পঙ্কজ যাইবার সময় শ্বাশুড়ীকে ও ননদকে প্রণাম করিয়া বলিয়া গেল যে, “উনি ফিরবার সময়ই আবার উহার সঙ্গে আস্‌ব।”

(৬)

শুধু শাঁখা চুড়ি হস্তে পঙ্কজ যখন বাপের বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইল, তখন তাহার মায়ের কথাতে তাহার শোকসিন্ধু আরও দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। পঙ্কজের মা বলিলেন, “মা তোর হাতের বালা, কানের মাকড়ী, মাথার চিরুণী কোথায় গেল?”

পঙ্কজ তখন পিতৃশোকে অধীরা, অতি কষ্টে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া বলিল, “উহার মধ্যে বড় ভারী ব্যামো হ’য়েছিল, হাতে এক পয়সাও ছিল না, তাই সে গুলি বাঁধা দিয়ে ডাক্তার ও ওষুধের খরচ চালাতে হয়েছে।”

মেয়েরকথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ গৃহিণী তেলে বেগুণে জ্বলিয়া উঠিলেন। বলিলেন, “দেখেছ, মেয়ের দুর্দ্দশা! আজ দু’বছর বিবাহ হয়েছে, এই দু’বছরের মধ্যে এক টুক্‌রা সোনা দেওয়া দূরে থাকুক, আমরা যা দিয়েছিলেম তাও বন্দক দিয়ে কিনা চিকিচ্ছে হয়েছে। এমন অক্ষমের হাতেও আমার মেয়েটীকে দিয়ে গেছে।” এই বলিয়া পঙ্কজের মাতা দু’ফোটা চোখের জল ফেলিতেও ত্রুটী করিলেন না।

পঙ্কজেরা তিন ভাই বোনে। অপর দুই ভাই তাহার বড়, মার্চ্চেণ্ট অফিসে চাকুরী করে, দুইজনে একশতেরও উপর মাহিয়ানা পায়, তা ছাড়া টাকাটা সিকেটা ও প্রত্যহ উপরি পায়। নাম তাদের যথাক্রমে রত্নেশ্বর ও সন্তোষ। রত্নেশ্বর ভগ্নীর নিরাভরণ অবস্থা দেখে দৃঢ়স্বরে বলিল, “আর আমরা বোনকে অমন জঙ্গলা দেশে পাঠাচ্ছি না—দুই দু’টা ভাই চাকুরী করি, যে ভাবে হোক একটা বোন্ খেতে পর্ত্তে দিতে পার্ব্ব।”

সন্তোষ বলিল, “এবার নিতে এলে ধরে আচ্ছামত মার দেব। ’পাজি হারাম-জাদা কিনা আমার বোন্‌কে দিয়ে ধান্ ভাঙ্গেয়ছে।”

পঙ্কজের মা বলিল, “মেয়ে আমি পাঠাচ্ছি না কোন মতে। হয় কল্‌কাতা এসে মা বোন্ নিয়ে পুনরায় চাকুরী করুক, আর না হয়, মেয়ের আশা ছেড়ে দিয়ে দেশে চলে যাক।”

পঙ্কজ অন্তরাল হতে সমস্ত কথা শুনিতেছিল। তাহার জীবনের জীবন—ইহ কাল ও পরকালের একমাত্র সম্বল, পতিদেবতার প্রতি মা ভাইয়ের এরূপ কটুবাক্য শুনিয়া তাহার অন্তর ব্যথিত হইল,—পঙ্কজ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিল।

দশদিন কলিকাতায় থাকিবার পর রঙ্গলাল যখন শ্বশুরালয়ে যাইয়া উপস্থিত হইল, তখন শ্বাশুড়ী ও শ্যালক সবারই মুখে একটা ঘোর বিরক্তির ভাব লক্ষ্য করিয়া রঙ্গলাল বুঝিল, নিশ্চয়ই একটা কিছু অঘটন ঘটিয়াছে। নতুবা একমাত্র জামাতা আমি, আমার প্রতি এত অনাদর কেন, এত তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ভাবই বা কেন? রঙ্গলালের মনে তখন একে একে অতীতের আনন্দ স্মৃতি সমূহ উদিত হইতে লাগিল। বিবাহ বাসরের সেই নৃত্য, গীত, শ্বশুরের সেই আদর আপ্যায়ন, পঙ্কজের সেই সহানুভূতি জড়িত মর্ম্মকথা—রঙ্গলালের মনে উদিত হইয়া মুহূর্ত্তের তরে তার হৃদয় এক আনন্দ রাজ্যে লইয়া গেল। শ্বশুরের কথা মনে হওয়ায় রঙ্গলালের নেত্রদ্বয় হইতে অজ্ঞাতসারে দু’বিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন করিল। কোন গতিকে শ্বশুবালয়ে দুই দিন অতিবাহিত করিবার পর, রঙ্গলাল পঙ্কজকে স্বদেশে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিতেই শ্বাশুড়ী বলিয়া উঠিলেন, “এই দু’বছর পরে মেয়ে আমার এসেছে, তাতে আবার এবার তিনি নাই, এই শোকের সময় না হয় দু’মাস এখানে থাক।”

রঙ্গলাল সানন্দে বলিল, “তাতে আর আপত্তি কি? বেশ দু’মাস পরে এসেই গ্রীষ্মের বন্ধের সময় না হয় লইয়া যাইব।”

দুই মাস কোন গতিকে স্বগ্রামে কাটাইবার পর রঙ্গলাল যখন পঙ্কজকে আনিবার জন্য দত্ত পুকুরে গেল, তখন শ্বাশুড়ী বলিলেন, “তোমার কেমন ধারা আক্কেল বাবা, আম কাঠালের সময় এখন; এখন কি কোলের মেয়ে কেহ পরের ঘরে পাটায়? আষাঢ় মাসের শেষে এসো, আমরা সে সময় বিনা আপত্তিতে মেয়ে পাঠিয়ে দিব।”

সেবারেও রঙ্গলাল হতাশ হৃদয়ে প্রস্থান করিল। আষাঢের শেষে দত্ত

পুকুরে পৌছিতেই ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট রঙ্গলাল শুনিল যে, তাঁহার শ্যালকদ্বয় ও শ্বাশুড়ী পঙ্কজকে লইয়া কলিকাতায় বাসা করেছে. রঙ্গলাল শ্বশুর বাড়ীর ধারে গিয়া সকলের নিকট তাহাদের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কেহই সঠিক ঠিকানা বলিতে পারিল না। গ্রামের সবাই একবাক্যে রঙ্গলালের শ্বাশুড়ী ও শ্যালকদ্বয়কে নিন্দাবাদ করিতে লাগিল। রঙ্গলাল তৎশ্রবণে বলিল, "উহাদের আর অপরাধ কি? একটি মাত্র মেয়ে, তাতে হয়েছে দুর দেশে বিবাহ, উহারা বেয়েটীকে অতিশয় ভাল বাসেন, তাই কাছে কাছে রাখ্‌তে চান, এ ত মানব চরিত্রের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।"

রঙ্গলালে কথা শুনিয়া প্রতিবেশিনী মণ্ডলী রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। রঙ্গলাল কাহারও কু-পরামর্শে আপন পত্নীর প্রতি কোপান্বিতা হইবার ছেলে নহেন।

বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া রঙ্গলাল স্কুলের কার্য্যে ইস্তাফা দিয়া মা ও ভগ্নী সমভিব্যহারে কলিকাতার উল্‌টাডাঙ্গা অঞ্চলে যাইয়া একটি বাসা করিল এবং আপনি পূর্ব্ববৎ সংবাদ পত্রের মধ্যে চাকুরী করিতে লাগিল। রঙ্গলালের মা ও ভগ্নী এবং অপরাপর পরিচিত বন্ধুবান্ধবগণ বলিলেন, রঙ্গলালকে পুনরায় বিবাহ করিতে। রঙ্গলাল তাহাতে উত্তর করিল, "মা ভাইয়ে জোর পূর্ব্বক আটকাইয়া রাখিলে সে ছেলে মানুষ কি করিবে? দেখা যাউক, সে যদি নিজে ইচ্ছা পূর্ব্বক না আসিতে চায়, তবে তাহাকে পরিবর্জ্জন করিয়া দ্বিতীয়বার বিবাহের চেষ্টা করিব।"

কিছু দিন এই ভাবে কাটিবার পর, হঠাৎ একদিন বৌবাজারে একটা গলির মধ্যে একটা দোতলা ঘরের বারান্দার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই রঙ্গলাল দেখিল, উন্মুক্ত অবগুণ্ঠনে দাঁড়াইয়া পঙ্কজবালা। রঙ্গলালকে দেখিতে পাইয়াই পঙ্কজ অঞ্চল টানিয়া মাথায় ঘোম্‌টা দিল, রঙ্গলাল সেই বাটীর দরজায় আসিয়া "রত্নেশ্বর বাবু, রত্নেশ্বর বাবু" বলিয়া ডাক দিতেই মেজ শ্যালক সন্তোষ আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। রঙ্গলাল সন্তোষের সহিত শ্বাশুড়ীর নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানাইয়া বলিলেন, "আমি মা ও বোনকে লইয়া উল্‌টাডাঙ্গায় বাসা করেছি, আবার সংবাদ পত্রে চাকুরী কর্‌ছি।"

শ্বাশুড়ী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তা বেশ করেছ বাবা, বেঁচে থাক, শতায়ুঃ হও। আমার ইচ্ছা তুমি এই বাসারই নিম্নতলের দুইটী ঘর ভাড়া লইয়া থাক, আমরা দুই বেয়ানে মিলিয়া মিশিয়া থাক্‌ব এখন।"

শ্বাশুড়ীর কথানুযায়ী রঙ্গলাল তাহাই করিল। কিন্তু এক পক্ষকাল অতীত না হইতেই রঙ্গলাল বুঝিতে পারিল, শ্বাশুড়ীর চাতুরী। পঙ্কজকে রঙ্গলালের শ্বাশুড়ী আর এখন দিনরাত পরিশ্রম করিতে দেয় না, কিংবা পঙ্কজও তাহার মায়ের অনুমতি ব্যতীত ইচ্ছাসত্ত্বে কোন কাজ করিতে পারে না। পঙ্কজ প্রতিদিনই বলে, "দেখ, তুমি এদের সহিত থেক না, আমার মা চান যে তুমি দেশের ঘর বাড়ী বিক্রী করে, দত্তপুকুরে বাড়ী ঘর দোর কর, তুমি কেন তা কর্ত্তে যাবে। তোমার পৈতৃক জমাজমি ছেড়ে—পৈতৃক বাস্তুভিটা ছেড়ে, শ্বশুর বাড়ীর গোলাম হতে যাবে কেন?"

পঙ্কজের কথা শুনিয়া রঙ্গলাল বলিল, "এতই যদি শ্বশুর শ্বাশুড়ীর বাস্তু ভিটার উপর তোমার টান, তবে এতদিন মা ভাইয়ের কাছে রয়েছ কেন?"

পঙ্কজ—আমি কি কর্ব্ব বল। আমি কতদিন বলেছি, দাদাকে একখানা পোষ্টকার্ড এনে দিতে, পাছে আমি তোমার নিকট এদের ঠিকানা জানাই, এই ভয়ে দাদারা তাহা দেন নাই। মা ভাইয়ের অমতেই বা আমি কোন কাজ করি কিরূপে?

রঙ্গলাল পঙ্কজ সম্বন্ধে যে ধারণা এতদিন পোষণ করিয়াছিল, এখন দেখিল, সত্যই তাহাই। রঙ্গলাল তৎপর দিন হইতে নূতন বাসার বন্দোবস্ত করিয়া মা বোনকে লইয়া গাড়ীতে উঠিল, পঙ্কজ তাহার মায়ের পায়ে প্রণাম করিয়া ও দাদাদের পদধূলি লইয়া স্বামীর হাত ধরিয়া গাড়ীতে আসিয়া উঠিল।

পঙ্কজের মা ও দাদারা তাহার ভাব দেখিয়া অবাক হইয়া রহিল।

বাড়ীর অধিকারিণীর নিকট পঙ্কজের মা বলিল, "দেখ্‌লে দিদি, মেয়েটির আক্কেল, আমি তোর ভালর জন্যই তো এতদিন আট্‌কিয়ে রেখে ছিলুম, আমাকে কি না শেষটায় এম্‌নি করে অপদস্থ কর্‌লে। যাক্ অমন অবাধ্য মেয়ের মুখ আর আমি দেখ্‌ব না—ও মেয়ে আমার মরে গেছে বলে জানব।"

বাড়ীর অধিকারিণী বলিল,—"তা দিদি, মেয়ের বিয়ে দিয়ে পরের ঘরে দিলেই জান্‌তে হবে যে, মেয়ে ম'রে গেছে। তবে যদি কালে ভদ্রে জামাই মেয়েকে মা বাপের কাছে পাঠায়, সে তার দয়া বলে জান্‌তে হবে।"

বীরেন্দ্র।

লেখিকা,—শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী।

(১)

বেলা অবসান প্রায়। মিহিরের ম্লান কিরণ বৃক্ষচূড়ে, সৌধ শিরে, রোগীর হাস্যের মত সামান্য সামান্য প্রকাশ পাইতেছে। সাঁজের পাতলা পাতা অন্ধকার উদাস প্রাণের অবসাদের মত পৃথিবীর উপর যেন ঢলিয়া পড়িতেছে। দিবসের কর্ম্ম কল্লোলের সজীব প্রফুল্লতার পরে, বহির্জগতে সাঁজের এই গম্ভীর ঔদাস্য মাখা নীরবতা।

ঠিক এমনি সময় একটী দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক বালক এক মনে তন্ময় তদ্‌গত-চিত্তে কি চিন্তা করিতেছে। বালকের অন্তঃকরণেও যেন সাঁজের মলিন ছায়া। বালকের যেন দুইটী জগতের নিরাশা অবসাদ যুগপৎ আসিয়া মিশিয়াছে। কৈশোরের চাপল্য প্রফুল্লতা নাই, চিন্তায় যেন প্রৌঢ়ের স্থিরতা আসিয়া পড়িয়াছে।

বালক কিসের চিন্তা করিতেছে? সম্মুখে শারদীয়া পূজা। সকল বালক বালিকাই আনন্দে উৎফুল্ল। নিজের নিজের মাতা পিতার নিকটে জামা কাপড়ের ফরমাইজ ত করিতেছে। সমবয়স্কদের সঙ্গে খেলা ধূলা করিয়া আমোদ আহ্লাদে দিন কাটাইতেছে। চিন্তা কীট তাহাদের হৃদয়-রাজ্য অধিকার করিতে পারে নাই।

তবে বীরেন্দ্রের প্রাণে আজ এত চিন্তা কিসের?

ক্রমে অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার বীরেন্দ্রের চারিদিকে জমাট বাঁধিয়া দাঁড়াইল। তবুও তার চৈতন্য নাই। কি যেন একটা চিন্তায় তাহার সমস্ত সত্তাটুকু ভাসিয়া ডুবিয়া চলিয়াছে। কচি ছেলের প্রাণে কি এত ভাবনার বোঝা সহ্য পায়, এই ভাবিয়াই দেব-যোনিরা মাথার উপরে নক্ষত্র চক্ষু উন্মীলন করিয়া যেন সহানুভূতি সম বেদনা প্রকাশ করিতেছে।

শৈশবেই বীরেন্দ্র স্নেহের উৎস মাতা পিতাকে হারাইয়াছে। জ্যেষ্ঠ সহোদরের অনাবিল ভালবাসায় সে বর্দ্ধিত হইতেছিল, কিন্তু আরও প্রদীপ্ত আগুণে দগ্ধ করিয়া তাহাকে খাঁটী করিয়া লইবার নিমিত্ত পরম মঙ্গলময়, করুণা সাগর, অখিল ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা সে সহোদরটিকেও জগতের নাট্য শালা হইতে অন্তর্হিত করিলেন।

বীরেন্দ্র এখন অকুল সংসার সমুদ্রে একা। বেলাভূমিতে তরঙ্গাঘাতের ন্যায় কত রকম ঘাত প্রতিঘাতে, কত প্রকার প্রতিকূল চিন্তায় তার কোমল প্রাণ আলোড়িত।

বীরেন্দ্র দরিদ্র-সন্তান। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে সে ছেলে বেলা থেকেই সংযমী চরিত্র গঠন করিবার পক্ষে দারিদ্র্য যেমন মস্‌লা, এমনটী আর কিছুই নহে। এ মসলায় চরিত্র সৌধ গঠিত হইলে উদ্দাম ইন্দ্রিয়ের কঠিন কুলীশেও তাহার অঙ্গ হইতে একটী পরমাণুও স্খলিত হয় না। মানুষ দারিদ্র্যে পড়িয়া সচ্চরিত্র হয়, দূরদর্শী হয়, পরের দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিতে, সমবেদনা দেখাইতে শিখে, এক কথায় মানুষ, মানুষ হইতে শেখে। কে বাসন্তী কুঞ্জের উচ্চরাবী পিকবঁধু, আর কে দুর্দ্দিনের প্রাবৃট্ সহচর, তাহা এই দারিদ্র্যই চিনাইয়া দেয়। দারিদ্রেই আমাদের দিব্য দৃষ্টি ফুটাইয়া তোলে।

অনেকক্ষণ পরে সহসা বীরেন্দ্রের চৈতন্য হইল। দেখিল, রাত্রি হইয়াছে। তখন ধীরে ধীরে গৃহে গেল।

সে গ্রামের স্কুলে ফ্রী পড়িত। কতকগুলি কুটিল প্রকৃতি লোকের কু-পরামর্শে নূতন হেড্ মাষ্টার তাহার ফ্রীশিপ কাটিয়া দিয়াছেন। কেমন করিয়া পড়িবে, এইটীই তার চিন্তার মূল কারণ। এই চিন্তাতেই সে আত্মহারা হইয়াছিল।

পূজায় তার জামা জুতা নাই, সে চিন্তা বা তজ্জন্য কোন খেদ তার মনে স্থান পায় নাই; কারণ সে সংযমী, অবস্থানুরূপ চলিতে শিখিয়াছে।

(২)

বীরেন্দ্র সংসারে একা হইলেও অজ্ঞকুলে তার আত্মীয়ের অভাব ছিল না। মাসতুতো ভাই মাসীমা, পিশতুতো ভাই, বোন ভগিনী পতি, মাতুল, মাতুলানী সকলেই বর্ত্তমান। তাঁদের অবস্থাও সচ্ছল। তা হইলে কি হইবে? এ অসময়ে তাঁরা তার মুখের দিকে চাহিল না। বীরেন্দ্রের জীবনে এখন ধারা শ্রাবণের বারিধারা, তার ভাগ্য গগনে এখন দুঃখের ঘন ঘোর ঘটা, এখন ঐ মাসতুতো পিসতুতো কোকিলের দল সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। বীরেন্দ্রকে তার আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দিতেও সঙ্কুচিত।

সকল শ্রেণীতেই বীরেন্দ্র পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। কিন্তু তার পুস্তকের একান্ত অভাব। সহধ্যায়ীদের পুস্তক একটু আধটু দেখিয়া লয়, একটী কাঁঠাল গাছ ছিল, বেশ কাঁঠাল ধরিত। সেই কাঁঠাল বিক্রয় করিয়া একবার

একখানা ইতিহাস কিনিল। সেবার তার কাঁঠাল খাওয়া না হইলেও জীবনে একখানা বহি নিজের হইল, ভাবিয়াই তার বিপুল আনন্দ।

বীরেন্দ্রের পিস্‌তুতো ভাই কলিকাতায় মেট্রপলিটান্ কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক। তিনি ইচ্ছা করিলে তাকে অনায়াসে পুস্তক দিয়া সাহায্য করিতে পারিতেন। করিলেন না। কেননা তার জীবনে বর্ষা, আর পিস্‌তুতো ভায়ের জীবনে বসন্ত। বসন্তের পিক্ বর্ষার মস্তকের দিকে চাহিবে কেন?

বর্ষাকালে বীরেন্দ্রের স্কুলে যাওয়ার বড়ই কষ্ট। ছাতা নাই। বীরেন্দ্র চিরদিনই উপায়ী। সে বড় বড় কচুর পাতা মাথায় দিয়া অর্দ্ধসিক্ত হইয়া স্কুলে যাইত।

বর্ষাকাল; চারিদিকে খাল বিল জলে ডুবিয়া গিয়াছে। গ্রামটী যেন সাগর-মেখলা হইয়া উঠিয়াছে। ঘরে যে চাউল আছে, তাহা দু-বেলা খাইলে শ্রাবণ মাসের মাত্র পনের দিন চলে। কিন্তু ভাদ্র ব্যতীত খাজানা পত্র আদায় করিয়া অন্ন সংস্থানের উপায় নাই। তখন বীরেন্দ্র এক বেলা করিয়া খাইতে লাগিল, অন্য বেলা শশা খাইয়া কাটাইল। এ শশা গাছ নিজের হাতে রোপণ করিয়াছিল; শশাও বিস্তর ফলিয়া ছিল। এইরূপে শ্রাবণ মাসটা যেন তার বুকে বাধিয়া গেল। অনাহারে অর্দ্ধাশনে একরূপ করিয়া শ্রাবণ মাসটা কাটাইল।

বীরেন্দ্র যখন প্রথম শ্রেণীতে পড়ে, তখনও তার পায়ে জুতা নাই, পরণে সামান্য মূল্যের আধ ময়লা বস্ত্র, গায়ে ছেঁড়া জামা। তাহাতে তার লজ্জা নাই। শিক্ষকেরা তার তীক্ষ্ণবুদ্ধি দেখিয়া তাকেই সর্ব্বাপেক্ষা আদর করেন।

(৩)

দুঃখের হউক, সুখের হউক, দিন কাটিবেই দিন কাহারও বাধিয়া থাকেনা। উদ্বেগ অশান্তি মাথায় করিয়া বীরেন্দ্রের দিন গুলিও আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। পূজার ছুটি ফুরাইল।

'ফ্রী' কাটা গিয়াছে; এ দিকে মাহিয়ানার সংস্থান হইল না। হয় তো পড়া বন্ধ হইবে। কিন্তু বীরেন্দ্র দমিবার ছেলে নহে। বিপদে ধৈর্য্য ধরিতে ও কর্ত্তব্য নিরুপণ করিতে সে অভ্যাস করিয়াছে। তার পড়িবার ইচ্ছা খুব বলবতী, কাজেই তার চিন্তাও শতমুখী।

অনেক চিন্তার পর, সে একটী দূরদেশস্থ স্কুলে ফ্রী লইবার জন্য দরখাস্ত করিল। ভগবান্ তার সহায় হইলেন। সপ্তাহ পরে এইরূপ উত্তর আসিল:—

"তোমার দরখাস্তে অবগত হইলাম, তুমি সকল শ্রেণীতেই প্রথম হইয়াছ, কোন দিন দ্বিতীয় হও নাই। তোমার মত ছাত্র আমরা সযত্নে আদরে গ্রহণ করিয়া থাকি। তুমি পত্র পাঠ চলিয়া আসিবে। আমরা তোমাকে খেতে দিব, পুস্তক দিব এবং পরীক্ষার ফীও দিব। ইতি—

প্রধান শিক্ষক,
—হাইস্কুল।

নলডাঙ্গা,
১৫ই নভেম্বর,
১৮৯২।

পত্র পাইয়া বীরেন্দ্র যুগপৎ আনন্দ ও দুঃখ অনুভব করিল। পড়িবার একটী উপায় হইল—এই তার আনন্দ; আবার, জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে—এই তার দুঃখ।

যাহা হউক ট্র্যান্‌স্ফার লইয়া পরদিন বীরেন্দ্র বাণীর সাধনার জন্য বিদেশ যাত্রা করিল।

যথা সময়ে বীরেন্দ্র প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। তার পর সে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিয়া কয়েক দিবসেই পদব্রজে বাড়ী আসিয়া পঁহুছিল।

বাড়ী আসিয়া কি দেখিল? দেখিল—বাড়ীতে যে একখানি মাত্র ঘর ছিল তাহাও ভূমিস্যাৎ হইয়াছে। কয়েক বৎসর বাড়ী মেরামত করিতে পারে নাই; বিদেশেই অন্যের আশ্রয়ে থাকিয়া পড়াশুনা করিতে ছিল। দুর্ব্বল দেহ দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করাও শক্ত আবার গাড়ী করিয়া আসিবে, তারও অর্থাভাব। বাধ্য হইয়াই তাহাকে নলডাঙ্গায় থাকিতে হইয়া ছিল।

গৃহশূন্য, জঙ্গলাকীর্ণ বাস্তুভিটার উপর পলক হীনভাবে বীরেন্দ্র, বসিয়া রহিল। বসিয়া বসিয়া আকাশ পাতাল কত কি ভাবিল। কত শত চিন্তা আসিয়া তার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল।

মাথা রাখিবার স্থানটুকু পর্য্যন্ত নাই, অর্থ নাই, সহায় সম্বল নাই—এমন অবস্থায় মানুষ মাত্রই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে! কিন্তু বীরেন্দ্র জীবন সংগ্রামে অচল অটল। এ সংগ্রামে সে শৈশবেই নামিয়াছে। কাজেই শত বিপদেও বীর হৃদয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে। এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটিল না।

খাওয়া দাওয়া কোনরূপে শেষ করিয়া, বীরেন্দ্র জামা উত্তরীয় লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইল। তার গ্রাম হইতে পনের ক্রোশ দূরে একটী পল্লীগ্রামে যাইয়া তত্রত্য মাইনর স্কুলের হেড্ মাষ্টারের জন্য সেক্রেটারীর নিকটে আবেদন করিল।

নলডাঙ্গা হইতে গৃহে আসিবার সময় পথেই বীরেন্দ্র ঐ চাকুরীর সন্ধান পাইয়াছিল। পূর্ণ আশায় এখন সে সেখানে যাইয়া উপস্থিত।

বীরেন্দ্রকে দেখিয়া সেক্রেটারীর মনে ধরিল না। তিনি বলিলেন,—আপনাকে দেখিলে ত ছাত্র মনে হয়। আপনি ক্লাশ ঠাণ্ডা রাখিয়া ভাল করিয়া পড়াইতে পারিবেন বলিয়া আমার মনে হয় না।

বীরেন্দ্র বলিল—মাস খানেক কাজ করিয়া দেখি, যদি না পারি, ছাড়িয়া দিব।

সেক্রেটারী—তা বেশ, কাজ করুন, মাহিয়ানা ত বেশী দিতে পারিব না; আঠার টাকা পাইবেন।

বীরেন্দ্র সেই চাকুরী করিতে লাগিল। আহার ও বাসার বাবদ খরচ লাগিল না। সেক্রেটারীর বাড়ীতেই ঐ দুইটীর ব্যবস্থা হইল।

এইরূপে অল্পদিনের মধ্যেই কিছু টাকা জমাইয়া এক শনিবারে বাড়ী যাইয়া একজন প্রতিবেশীর হাতে ঘর করাইবার জন্য উহা দিয়া আসিল। ঘরও যথাশক্তি তৈয়ারী হইল। ক্রমে দুই তিন খানা ঘর, মেটে প্রাচীর, কূপ, পায়খানা, পুষ্করিণী, এতগুলি হইল। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের যেরূপ সংসার পাতাইয়া বাস করেন, বীরেন্দ্রের বাড়ীটী ঠিক সেইরূপই হইল। বহির্ব্বাটী, অন্দরবাটী ও বাগানবাটী এই তিনটী প্রকোষ্ঠ বেশ শৃঙ্খলার সহিত দাঁড়াইয়া বীরেন্দ্রের নিত ব্যয়িতার ও সুরুচির পরিচয় দিতে লাগিল।

(৪)

বীরেন্দ্র সুশিক্ষক বলিয়া চতুর্দ্দিকে তাঁর যশ বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। তার অধ্যাপনা কালে ছাত্রেরা মন্ত্রমুগ্ধ মত চুপ করিয়া শুনিত। ক্লাশ নীরব! সে এমন নীরবতা যে, একটী সুচ পতনের শব্দও শুনা যাইত। তার অধ্যাপনায় ছেলেরা এত সন্তুষ্ট যে সে ক্লাশে গেলে তাহাদের আনন্দের সীমা থাকিত না। তাকে নিয়ে সকল ক্লাশের ছেলেই টানাটানি করিত।

ঐ স্কুলে যখন বীরেন্দ্র প্রথম প্রবেশ করে তখন মাত্র ২৩টী ছাত্র, খানকতক ভাঙ্গা পুরাতন চেয়ার বেঞ্চ, ও দুইজন শিক্ষক উহার সম্বল। ঐ দুইজনের মধ্যে যিনি প্রবীণ তিনি স্কুলের সংশ্লিষ্ট একটি ব্রাঞ্চ পোষ্ট আফিসের পোষ্ট মাষ্টারি করিয়াও আট দশ টাকা পাইতেন। ধানে খন্দে, যোগে যাগে শাক মাছ খাইয়া, ফিকির ফন্দী করিয়া, বাড়ীর মোটা ভাত খাইয়া ঐ ভদ্রলোক জীবন কাটাইতে ছিলেন। অপর শিক্ষকের সংসার সচ্ছল। তিনি স্কুলে

বেগার দিয়া যে দু'পয়সা পাইতেন, তাতেই পান তামাকের উপাসনা ও গ্রাম্য ইয়ার্কি একরূপ চলিয়া যাইত।

স্কুলের ঐ দুরবস্থার মধ্যে সচ্চরিত্র, কর্ম্মী বীরেন্দ্র যাইয়া উঠিয়াছিল। এক বৎসর পূর্ণ না হইতেই ছাত্র সংখ্যা দেড়শত হইল। আরও আটজন শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন, ডিবেটীং ক্লাব স্থাপিত হইল, স্কুল লাইব্রেরীতে বহুমূল্যবান্ পুস্তক সংগৃহীত হইল। এক কথায় চতুর্দ্দিকে স্কুলের ও বীরেন্দ্রের সুশিক্ষা ও সদ্‌গুণের কথা ছড়াইয়া পড়িল।

সাধারণের সঙ্গে বীরেন্দ্র মিশিয়া গেল। সকলেই তাকে বাড়ীর ছেলে মনে করিত। বৌ-ঝিরাও তার সঙ্গে নিঃশঙ্ক ভাবে কথা বলিত। বীরেন্দ্রের অমায়িক চরিত্রে সকলেই মুগ্ধ। সকলেরই ইচ্ছা বীরেন্দ্রকে চিরদিন স্নেহ বন্ধনে বাঁধিয়া রাখে। বীরেন্দ্রেরও ইচ্ছা সেই স্নেহ আকণ্ঠ ভোগ করে। কিন্তু মানুষের ইচ্ছায় কি হয়? দারুণ ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া বীরেন্দ্রকে সে স্থান ত্যাগ করিতে হইল। আসিবার সময় ছাত্রেরা কাঁদিতে কাঁদিতে প্রায় এক ক্রোশ পথ সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল। সকলেই বীরেন্দ্রের বিদায়ে কষ্ট পাইল।

কাজ ছাড়িতে ছাড়িতেই কোন একটী মহকুমার পদস্থ ব্যক্তি বীরেন্দ্রকে পুত্রের প্রাইভেট টিউটর করিয়া লইয়া গেলেন।

সেখানকার জল বাতাস স্বাস্থ্যকর। তাই সেখানে তার সু-স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিল। সেই ভদ্রলোক ও তাঁর পত্নী তাঁকে পুত্র নির্ব্বিশেষে ভাল বাসিতেন। তাঁরাই অভিভাবক হইয়া বীরেন্দ্রের বিবাহ দিলেন।

বীরেন্দ্র যেমন সংসারের উন্নতি করিয়াছে, সেইরূপ আত্মোন্নতিও যথেষ্ট করিয়াছে। অর্থাভাব বশত কলেজে পড়িতে না পারিলেও যে সব ক্লাস ফ্রেণ্ড আই, এ, বি, এ, পড়িত সে তাহাদের পাঠ্য পুস্তক লইয়া ঘরে বসিয়া অভিধানের সাহায্যে পড়িত। অভিধান বীরেন্দ্রের চিরসহচর। শুধু তাহাই নহে, অন্যান্য বিস্তর ভাল ভাল ইংরেজি বাঙ্গালা পুস্তক পড়িয়া ছিল। নূতন বই দেখিলেই সে পড়ে; পড়া তার একটি নিত্য-কর্ম্ম, একটি অটুট সাধনা, একটি পবিত্র ব্রত। রাত্রি ১২টা ১টা পর্য্যন্ত বীরেন্দ্র পড়িয়া থাকে। এটি তার চির অভ্যাস। ফলে, তার যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছে।

এই প্রতিভা-মণ্ডিত, বিনীত, সুশ্রী যুবক মাতা-পিতৃ হীন হইলেও তার বিবাহটা একজন ধনীর কন্যার সঙ্গে হইল।

(৫)

আজ ৪।৫ মাস হইল, বীরেন্দ্রের বিবাহ হইয়াছে। ঘরে লোক না থাকায় নব-বধূ আজও স্বামী-গৃহে আইসে নাই।

বীরেন্দ্র স্ত্রীকে আনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তার শ্বশুর মহাশয়কে পত্র লিখিল। তিনি প্রত্যুত্তরে আর কিছু না লিখিয়া তাকে যাইতে লিখিলেন। বীরেন্দ্রও শ্বশুর মন্দিরে যাইয়া উঠিল।

এখানে তার শ্বশুর শ্বাশুড়ীর সংক্ষেপে একটু পরিচয় দিব। শ্বশুর ধনী; তাঁর ঐ একটী মাত্র কন্যা। পুত্র হয় নাই। মেয়েটীই সবে ঘরের নীলমণি।

বীরেন্দ্র শ্বশুরালয়ে যাইবার সময় নূতন ঘর কান্না পাতাইবার মত আবশ্যকীয় দ্রব্য গোছ গাছ করিয়াই গিয়াছিল। ভাবিয়া ছিল, তার জীবন নাট্যে একটা নবীন অঙ্কের অভিনয় হইবে; জীবন-কুঞ্জে একটা নূতন রাগিণী ঝঙ্কার দিয়া উঠিবে; আশা বল্লরীতে একটা দিব্য কুসুম ফুটিয়া উঠিবে; তাপ দগ্ধ প্রাণে উষর ক্ষেত্রে মন্দাকিনীর একটা পীযুষ ধারা বহিতে আরম্ভ করিবে। এতগুলি সুমিষ্ট আশা প্রাণের মধ্যে পুরিয়া লইয়া স্ফীত বক্ষে বীরেন্দ্র শ্বশুর ভবনে জীবন সঙ্গিনীকে আনিতে গিয়াছে।

(৬)

কৃষ্ণগঞ্জের মুখুজ্যেরা বড় লোক। সন্ধ্যা বেলায় নীলমণি বাবুর মোসাহেবের দল সান্ধ্য গগনের নক্ষত্রের মত একটি একটি করিয়া ফরাসে ফুটিয়া উঠিল। অকেজো লোকের গল্পের শৃঙ্খলা উদ্দেশ্য নবীনত্ব সঙ্গতি উপসংহার না থাকিলেও গল্প ছুটিতে লাগিল। সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, ইহকাল, পরকাল, স্বর্গ-নরক, ভূতপ্রেত, রামমোহন রায় হইতে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কেহই বা কিছুই বাদ পড়িল না। লক্ষ্মণ, রামের খুড়ীমা এইরূপ উদ্ভট মীমাংসার মত, সীতা রাবণের কন্যা অদ্ভুত রামায়ণের এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তের মত অনেক মীমাংসা করিয়া ফেলিলেন, এক কথায় সেটা দ্রব্য বিশেষের আড্ডার সহিত সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্য।

নীলমণি বাবুর সান্ধ্য মজলিসে প্রত্যহই এইরূপ হাস্য বিভৎস করুণ আদি রসাত্মক গল্পের অবতারণা হইয়া থাকে।

পল্লীগ্রামে এরূপ নিষ্কর্ম্মা তারুণ, মোসাহেব বৎসল নীলমণি এখনও এই বিজ্ঞানের ছুটাছুটির দিনেও অনেক আছে। এখনও উহা প্রত্নতত্ত্বের বিষয়ীভূত হইয়া দাঁড়ায় নাই। বাস্তব জগতে চর্ম্মচক্ষেই উহার অস্তিত্বের উপলব্ধি করা চলে।

তাই বলিতেছিলাম, মজলিশ গুল্‌জার; নীলমণি বাবু সুখাবেশে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় তাকিয়ায় বিপুল দেহের কতকটা ভার ন্যস্ত করিয়া, অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে গড়গড়ার নল মুখে দিয়া থাকিয়া থাকিয়া, গল্পের সঙ্গে একটা তাল রাখিয়া, "অবসর মত ভালবাসিও" এই ধূয়াটার অর্থের মত, মধ্যে মধ্যে সুখটান দিচ্ছেন, কখনও বা বীরপুঙ্গব কর্ম্মীর মত সজোরে সবেগে গড়গড়াটীর ঈড়া, পিঙ্গলা সুষুম্না পর্য্যন্ত শোষণ করিয়া ধূম মুখের ভিতর পুরিয়া ঊর্দ্ধমুখে বিসুবিয়সের ন্যায় উহার উদ্গিরণ করিয়া নিজেকে যেন একটা মস্তবড় বাহাদুর করিয়া তুলিতেছেন।

মোসাহেবের দলও ধূমপানে বিরত বা বঞ্চিত নহে। একটা রূপা বাঁধা হুক্কা। সকলেরই মনোরঞ্জন করিয়া ফিরিতেছে।

প্রকোষ্ঠের বাহিরে রোয়াকের উপর ভৃত্যের দল অবস্থান করিতেছে। মজলিস্ গৃহ হইতে কখন্ কি আদেশ আসিবে, তারই প্রতীক্ষা করিতেছে। ফটকে দরোয়ান মোতায়েন।

ঠিক এমনি সময় একখানি ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া ফটকের সাম্‌নে দাঁড়াইল। অবিলম্বে একজন সজ্জিত ভৃত্য গাড়ী থেকে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

গাড়ীর ঘর্ ঘর্ শব্দে মজলিসের সকলেই উৎকর্ণ হইয়া যেন কাহারও প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

অনতিবিলম্বে একজন ভৃত্যের সহিত বীরেন্দ্র সেখানে উপস্থিত হইল। শ্বশুর নীলমণি বাবুর সঙ্গে মোসাহেব কোম্পানি জামাতা বাবাজীর উপর আদর আপ্যায়ন কুশল প্রশ্ন প্রভৃতি বর্ষণ করিতে লাগিল। বীরেন্দ্র শ্বশুরকে প্রণাম করিয়া, পরে যথাযোগ্য ব্যক্তিকে যথাযোগ্যরূপ সম্মান প্রদর্শন করিয়া উপবেশন করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরেই একটী ছোট মেয়ে আসিয়া বীরেন্দ্রকে অন্তঃপুরে লইয়া গেল।

(৭)

পরদিন অপরাহ্নে শ্বশুর জামাতার মধ্যে নানারূপ গল্প সুরু হইতে লাগিল। গল্প করিতে করিতে নীলমণি বাবু বলিলেন,—"তুমি উষাকে লইয়া যাওয়ার কথা লিখিয়াছিলে; উষা আমার একমাত্র সন্তান; উহাকে পাঠিয়ে দিতে পার্ব্ব না; তুমিও আর সেখানে গিয়ে কি কর্‌বে, এ বিষয় সম্পত্তি সবই তোমাদের।"

বীরেন্দ্র। আপনার কথা বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা; আপনার কি ইচ্ছা আমায় ঘর জামাই রাখ্‌বেন?

শ্বশুর। তা কি ব'লে দিতে হবে? আমায় ত ছেলে হয় নি, মেয়েই আমার বাড়ীতে থাকবে, তুমিও ছেলের মত থাকো।

বীরেন্দ্র। মাপ করবেন; আমার দ্বারা তাহা হইবে না; আপনার যদি সে অভিপ্রায় ছিল, তাহা হইলে বিবাহের পূর্ব্বে আমায় বলিলেই ভাল করতেন।

শ্বশুর। মন্দটা কি ক'রেছি? তখন বলি নাই, এখন বলিতেছি। আমি মেয়ে কিছুতেই পাঠাব না।

বীরেন্দ্র। তবে আপনার মেয়ে রাখুন; আমায় রাখ্‌তে পারবেন না।

শ্বশুর। তুমি লেখা পড়া শিখে এই জ্ঞান লাভ ক'রেছ যে স্ত্রী এক স্থানে ও স্বামী অন্য স্থানে থাকবে?

বীরেন্দ্র। তাই বলিয়া ত বিবেক বিসর্জ্জন দিতে পারি না! আমি আমার পিতৃকুলের একমাত্র বংশধর; পিতার বাস্তুভিটা নিষ্প্রদীপ করিয়া আমি শ্বশুরের অন্নদাস হইয়া থাকিতে পারিব না। আপনি গুরুজন আপনার সহিত বেশী কথা বলা ধৃষ্টতা মাত্র। পাঠাইবেন কিনা বলুন, যদি না পাঠান তবে চলিয়া যাই।

শ্বশুর। কখনও না। আমি মেয়ে পাঠাব না।

বীরেন্দ্র। বেশ। তাহা হইলে আমি আজই চলিয়া যাইতেছি।

এই বলিয়া বীরেন্দ্র বাড়ীর মধ্যে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমনের জন্য প্রস্তুত হইয়া সহসা স্ত্রীকে নির্জ্জনে পাইয়া তাহাকে বলিল,—"আমি চলিলাম। তোমার পিতা তোমায় পাঠাইবেন না। কখনই পাঠাইবেন না, বলিলেন। যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়, করিও। যদি তোমার কখন যাইতে ইচ্ছা হয়, আমায় পত্র লিখিও।

এই বলিয়া উষাকে উত্তর করিবার অবসর না দিয়াই, ক্ষিপ্রগতিতে বীরেন্দ্র সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বাহিরে আসিল।

উষা বালিকা। এরূপ আকস্মিক বিরহে কি বলিবে—কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কেবল প্রাণের আকুলতার কথা তার চোখ দুটি শত মুখে নীরবে বলিতে লাগিল।

বীরেন্দ্র বাহিরে আসিয়াই দেখিল—শ্বশ্রূঠাকুরাণী। তাঁকে প্রণাম করিয়া বলিল,—"মা, আমি চলিলাম।"

শ্বশ্রূঠাকুরাণী। তুমি এখানে থাকিলেই পারিতে! বড় লোকের মেয়ে কি গরীবের সংসারে থাকতে পারে?

বীরেন্দ্র আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

(৮)

তার পর দু'বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। বীরেন্দ্রের সংসার আজও স্ত্রীলোক-শূন্য। তার শ্বশুর শাশুড়ী এ পর্য্যন্ত তার কোন খোঁজ-খবর লন নাই। অনেকে বীরেন্দ্রকে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিতে বলেন। কিন্তু সে তাহা ভাল মনে করে নাই।

অনেক দিন ধরিয়া বলি বলি করিয়া উষা একদিন তার মাকে বলিল,—"মা, আমায় শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দাও; আমি হিন্দুর মেয়ে, টাকা কড়ি কি করিব? স্বামী-সেবাই যদি না করিলাম তবে এ জীবন নিষ্ফল। দরিদ্র হইলেও তিনি আমার আরাধ্য দেবতা।"

মা। আমি কি ক'রে পাঠাব? উনি শুন্‌লে অতিশয় রেগে উঠ্‌বেন!

উষা। তবে আমি নিজেই যাইবার জন্য তাঁকে পত্র লিখ্‌ব। হিন্দুর মেয়ে স্বামীছাড়া হয়ে থাক্‌তে পারে না। তাঁর সংসার যেমনই হোক, আমার নিকটে সেইটীই পুণ্যতীর্থ—সেইটীই গৌরব ভূমি।

(৯)

উষা এখন বীরেন্দ্রের গৃহে প্রফুল্ল নলিনী। দিব্য ঘর-কন্নার কাজ-কর্ম্ম স্বহস্তে করিতেছে। সুমিষ্ট একটী হাসি সর্ব্বদার জন্যই তার মুখে লাগিয়া আছে। এর আগে নিজের হাতে পরণের কাপড়খানি পর্য্যন্ত কখন কাচে নাই। এখন সমস্ত কাজই নিজে করিয়া অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিতেছে। স্বহস্তে রন্ধন করিয়া স্বামীকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া নারীধর্ম্ম পালন হইল ভাবিয়া সে প্রাণে একটা গৌরব উপলব্ধি করিতেছে।

মাতা পিতার অমতে উষা স্বামীগৃহে আসায় তাঁরা হাড়ে চটিয়া গিয়াছে। সে জন্য তার কিছুমাত্র দুঃখ নাই। স্বামী সেবায় সে সকল দুঃখ ভুলিয়াছে। তার প্রাণে এখন কত শান্তি।

বীরেন্দ্র এতদিন পর একটু শান্তির মুখ দেখিয়াছে। এখন তার হৃদয় দাম্পত্য-প্রেমে পরিপূর্ণ।

অনাবিল আনন্দ, নিরবচ্ছিন্ন সুখ এ জগতে কুত্রাপি নাই। যেখানেই সুখের স্বাস্থ্যোচ্ছ্বাস, সেখানেই আবার অসুখের নিবিড় কালিমা। ইহাই জগৎ প্রপঞ্চের ভাগ্যবতী ব্যবস্থা।

তাই, ঐ নব-দম্পতির সুখের জীবনের পাশেও একটা অসুখের দৃশ্য আসিয়া

দাঁড়াইল, উষার উপর চটিয়া নীলমণি বাবু তাঁর বিপুল সম্পত্তি স্থাবর অস্থাবর সমস্তই ভাগিনেয়ের নামে উইল করিলেন তাহাকেই বাড়ীতে আনিয়া রাখিলেন।

ঐ সম্পত্তিচ্যুত হওয়ায় বীরেন্দ্র ও উষা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইল না। বীরেন্দ্র তিন চারি বৎসর ধরিয়া একই সময়ে পাঁচ ছয়খানি মাসিক পত্রিকায় বিস্তর প্রবন্ধ লিখিল। বিখ্যাত মনীষীদিগের অনেক ইংরাজী পুস্তকের বাঙ্গালা অনুবাদ করিল। সেই সব লেখার বিশেষ সুখ্যাতি বাহির হইল। এইরূপে বীরেন্দ্র শিক্ষিত সমাজে সুলেখক বলিয়া সুপরিচিত হইয়া উঠিল।

অর্থাভাবে বীরেন্দ্রের লেখা এতদিন পুস্তকাকারে বাহির হয় নাই, মাত্র মাসিক পত্রিকাতেই বাহির হইয়াছিল।

একদিন উষা বলিল,—আমার গহনা আছে; তাহার খানকয়েক বিক্রয় করিয়া সেই মূল্যে দু'একখানি পুস্তক বাহির কর।

বীরেন্দ্র ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। উষা তখন জিদ্ করিয়া বসিল; বলিল,—গহনা আমার কি হইবে? তুমি গ্রন্থকার হও, এটা দেখিতে আমার বড় সাধ। তুমি "অথর" হইলে আমার কতই গৌরব! গহনা গায়ে দিলে কি সেরূপ গৌরব হইতে পারে?

তাহাই হইল। বীরেন্দ্র দু-খানা পুস্তক বাহির করিল। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষাধিক টাকা লাভ। যশ ও অর্থ হাত ধরাধরি করিয়া আসিয়া কর্ম্মী বীরেন্দ্র ও সাধ্বী উষার গলে জয়মাল্য পরাইল।

তখন বীরেন্দ্র আরও পুস্তক বাহির করিতে লাগিল। তাহাতে বিপুল অর্থ ও দিগন্তব্যাপী যশের সমাগম হইল।

বীরেন্দ্র তখন স্বচ্ছলভাবে চলিবার মত ভূ সম্পত্তি করিয়া একখানি প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইল। ভদ্রজনোচিত আসবাব-পত্রে গৃহ সজ্জিত করিল।

অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হইলেও বীরেন্দ্রকে বিলাস-রাক্ষসী তাহার ছায়া স্পর্শ করিতে পারে নাই। তার এখনও সেই সামান্য বেশ; উষাও স্বামীর আদর্শের অনুগামিনী। উহাদের চাল-চলনে, আচার-ব্যবহারে কিছুমাত্র আড়ম্বর নাই।

বীরেন্দ্র দারিদ্র্যে লালিত-পালিত হওয়ায়, তাহার প্রাণে দরিদ্র জীবনের একটা ছাপ পড়িয়াছিল। তাই দরিদ্রদিগের কষ্ট দূর করিবার নিমিত্ত দেশে

একটি দাতব্য চিকিৎসালয়; একটি অবৈতনিক হাই স্কুল, তৎসঙ্গে ছাত্রদিগের বিনা খরচায় থাকিবার ও খাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিল। ডিষ্ট্রীক্ট্ বোর্ডের মেটে রাস্তাটী পাকা করিয়া দিল। দোল দুর্গোৎসবের পরিবর্ত্তে প্রত্যহ তার বাড়ীতে অজস্র কাঙ্গাল গরীবকে অন্নদান ও বস্ত্রদানের ব্যবস্থা হইল।

বীরেন্দ্র দরিদ্রের সন্তান; বাল্য জীবনে সহায় সম্বলহীন, আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক উপেক্ষিত, হইয়াও আজ স্বাবলম্বন ও প্রতিভার গুণে অতুল যশে যশস্বী, বিপুল ধনে ধনী, অনাথ অনথার পিতৃস্থানীয় রূপে দণ্ডায়মান। যে বীরেন্দ্র একদিন ছিন্নবসনে, কচুর পাতা মাথায় দিয়া স্কুলে যাইত, সে আজ কত লোককে বস্ত্র দান করিতেছে। যে একদিন পরের সাহায্যের ভিখারী হইয়া পড়িবার জন্য বিদেশে গিয়াছিল, আজ তার অর্থে কত শত দরিদ্র বালক বিদ্যালাভ করিতেছে। তাই বলিতেছি স্বাবলম্বনে সবই হয়।

উপহার।

লেখক,—ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য M. B.

উপহার কি দিব তোমারে?
যেই-হৃদি করিয়াছ দান।
বিনিময়ে কিবা দেব-তার,—
দিয়েছি তো সব-টুকু প্রাণ॥

(তবুও)

বোঝেনা এ পরাণ অবোধ—
ছিঁড়িতে নারে সমাজ আচার।
তব তরে কুড়ায়ে এনেছি—
তাই—এই ক্ষুদ্র উপহার॥

ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

কোষ্ঠীশিক্ষা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত পশুপতি সরকার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ধনস্থানে শুক্র থাকিলে—জাতক নিজ বিদ্যা দ্বারা ধনোপার্জ্জনে সক্ষম, রৌপ্য ও স্ত্রীধনে ধনী হয়।

ধনস্থানে শনি থাকিলে জাতক কাষ্ঠ, লৌহ, অঙ্গার প্রভৃতি ব্যবসায়ে বা কুকার্য্য দ্বারা ধনসঞ্চয়কারী ও অতি দীন হয়।

ধনস্থানে রাহু থাকিলে জাতক নীচসেবী, দুঃখী, ভক্ত ও মৎস্য মাংস, অস্থিচর্ম্ম প্রভৃতি ব্যবসায়ী হয়।

ধনস্থানে কেতু থাকিলে জাতক বিষয়-হীন, মান-হীন, মুখ-রোগী ও রাজভয়ে ভীত হয়।

ভ্রাতৃস্থান।

ভ্রাতৃস্থানে রবি থাকিলে জাতক ভ্রাতৃনাশক স্ত্রীপুত্র কর্ত্তৃক অভিযুক্ত ধৈর্য্য-শালী, সহিষ্ণু, গুণবান, ধনবান, ও নারীগণের প্রিয় হয়।

ভ্রাতৃস্থানে চন্দ্র থাকিলে—জাতক সুখী, গুণী, কাব্যামোদী ও অনেক ভগ্নি-যুক্ত হয় কিন্তু চন্দ্র শত্রুগৃহগত হইলে জাতক মূর্খ ও ভ্রাতৃনাশক হয়।

ভ্রাতৃস্থানে মঙ্গল থাকিলে জাতক ভ্রাতৃনাশক বিলাসী, দীর্ঘজীবী, ধনী ও সুখী হয়।

ভ্রাতৃস্থানে বুধ থাকিলে জাতক ধনবান বাল্যরোগী, কৃশকায়, চঞ্চল, ক্ষীণ, নির্লজ্জ, বহু স্ত্রীপুত্রযুক্ত হয়। কিন্তু বুধ পাপযুক্ত বা পাপগৃহগত হইলে জাত-কের ভ্রাতা ও স্ত্রীপুত্র বিনাশ হয়।

ভ্রাতৃস্থানে বৃহস্পতি থাকিলে জাতক ভ্রাতা ও কুটুম্বযুক্ত রাজার আদরণীয় কৃপণ ও ধনী হয়।

ভ্রাতৃস্থানে শুক্র থাকিলে জাতক নেত্ররোগী, ক্রুর, মনোরমা ভগ্নিযুক্ত, ধনবান, ও কাতর স্বভাববিশিষ্ট হয়।

ভ্রাতৃস্থানে শনি থাকিলে জাতক ভ্রাতা ভগিনীর নাশক হয়, কিন্তু নিজে স্ত্রীপুত্রসহ ধনশালী ও রাজতুল্য সুখী হয়।

ভ্রাতৃস্থানে রাহু থাকিলে জাতক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগ্নীনাশক হয়। কিন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ধনবান ও বলবান করে।

ভ্রাতৃস্থানে কেতু থাকিলে জাতক ধনী, শত্রুহীন, চিন্তাযুক্ত ও ভ্রাতৃহন্তা হয়।

বন্ধুস্থান।

বন্ধুস্থানে রবি থাকিলে জাতক হীনবুদ্ধি, শত্রুবিজয়ী পুত্রবান, সম্পত্তিশালী, ধীর প্রকৃতিযুক্ত, গীতানুরাগী ও রাজপ্রিয় হয়।

বন্ধুস্থানে চন্দ্র থাকিলে জাতক ধনরত্নযুক্ত, নিরোগী, মৎস্য মাংস লোভী, প্রিয়জন হিতকারী ও রমণীরঞ্জক হয়।

বন্ধুস্থানে মঙ্গল থাকিলে জাতক দরিদ্র দুঃখী, বন্ধুহীন, কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট, শ্লেষ্মাযুক্ত, চপলা, কুবস্ত্রধারী, সুখহীন ও পাপী হয়।

বন্ধুস্থানে বুধ থাকিলে জাতক বহুমিত্রযুক্ত ধনবান, নাসারোগী ও বিলাসী হয়, কিন্তু পাপযুক্ত বুধ থাকিলে বিপরীত ফল হয়।

বন্ধুস্থানে বৃহস্পতি থাকিলে জাতক মিত্র সম্পন্ন, ধনরত্নযুক্ত, সুখী ও লোকপ্রিয় হয়।

বন্ধুস্থানে শুক্র থাকিলে জাতক সুন্দর সুখী, কবি, সচ্চরিত্র ও বান্ধবযুক্ত হয়। শুক্র তুঙ্গী হইলে জাতক উৎকৃষ্টা রমণীকে অদ্ভুত রূপে গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়।

বন্ধুস্থানে রাহু থাকিলে জাতক দরিদ্র, অল্প পুত্রক, কৃশাঙ্গ, খল, পাপাশক্ত, নীচসেবী, ও গ্রামের প্রান্তরভাগে বাসকারী হয়।

বন্ধুস্থানে শনি থাকিলে জাতক দুঃখী, রোগী, বিকলাঙ্গ, বন্ধুহীন, স্থানভ্রষ্ট, ও ভগ্নগৃহবাসী হয়।

বন্ধুস্থানে কেতু থাকিলে জাতক মাতা ও বন্ধু হইতে অসুখী, পৈতৃকসম্পত্তি নষ্টকারী ও উদ্বিগ্নচিত্তবিশিষ্ট হয়।

পুত্রস্থান।

পুত্রস্থানে রবি থাকিলে জাতক পুত্রহীন, শৈশবে সুখী, যৌবনে পীড়াযুক্ত চপল, নির্লজ্জ ও কুবেশধারী হয়।

পুত্রস্থানে চন্দ্র থাকিলে জাতক কন্যাপুত্র, পৌত্রাদিযুক্ত হয় কিন্তু ক্ষীণ চন্দ্র হইলে জাতকের একটিমাত্র চপলা কন্যা জন্মে।

পুত্রস্থানে মঙ্গল থাকিলে জাতক অসুখী পুত্রহীন হয়। কিন্তু যদি মঙ্গলের উচ্চ গৃহ হয় তাহা হইলে জাতকের একটীমাত্র মলিন ও কুহকী পুত্র জন্মে।

পুত্রস্থানে বুধ থাকিলে জাতক দেবদ্বিজভক্ত সুখী, স্ত্রীপুত্রযুক্ত, কবি ও প্রফুল্লবদন বিশিষ্ট হয়।

পুত্রস্থানে বৃহস্পতি থাকিলে জাতক ধনী. সুশ্রী, স্ত্রীপুত্র সম্পন্ন, সুখী ও লোকপ্রিয় হয়।

পুত্রস্থানে শুক্র থাকিলে জাতক ধনী, মানী, গুণী, দাতা, ভোক্তা, অল্প-পুত্রক ও বহুকন্যাযুক্ত হয়।

পুত্রস্থানে শনি থাকিলে জাতক পুত্রহীন হয়। কিন্তু যদি ঐ স্থানে শনির তুঙ্গী হয়, তবে জাতকের একটী মাত্র উগ্র পুত্র জন্মে।

পুত্রস্থানে রাহু থাকিলে জাতকের একটীমাত্র মলিন পুত্র জন্মে। কিন্তু যদি ঐ স্থানে রবি বা চন্দ্রের গৃহ হয়, তবে পুত্র জন্মে না, জন্মিলেও শীঘ্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

পুত্রস্থানে কেতু থাকিলে জাতক অল্পপুত্রক, রোগী ও দুঃখী হয়।

শত্রুস্থান।

শত্রুস্থানে রবি থাকিলে জাতক কৃশ, ধার্ম্মিক, রোগী জ্ঞাতিবর্গের প্রিয়কারী কুলের হিতৈষী, ধীমান, তেজস্বী, শত্রুহীন, বিলাসী ও দীর্ঘজীবী হয়।

শত্রুস্থানে চন্দ্র থাকিলে জাতক বিষয়ী ও পীড়িত হয়। যদি ঐ স্থানে চন্দ্রের উচ্চ গৃহ হয় তবে জাতক সুখী হয়।

শত্রুস্থানে মঙ্গল থাকিলে জাতক রাজ তুল্য সুখী হয়। শত্রুগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া থাকিলে জাতক বিকটাকার কুৎসা ও কুকর্ম্মা হয়। উচ্চ গৃহে হইলে জাতক বহুপুত্র, অর্থ ও মিত্র সম্পন্ন হয়।

শত্রুস্থানে বুধ থাকিলে জাতক শত্রুহীন ও ঐশ্বর্য্যসুখী হয় পাপ দৃষ্ট বা পাপ যুক্ত হইয়া থাকিলে জাতক শত্রুযুক্ত ও দুঃখী হয়।

শত্রুস্থানে বৃহস্পতি থাকিলে জাতক শত্রুজয়ী ও সুখী হয়। বৃহস্পতি শত্রুগৃহে থাকিলে জাতক বহুশত্রু কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হয়।

শত্রুস্থানে শুক্র থাকিলে জাতক শত্রুজয়ী ও ভয়শূন্য হয়। আর যদি শুক্র শত্রুগৃহে নীচস্থানে অথবা অস্তমিত থাকে, তাহা হইলে জাতক শত্রু কর্ত্তৃক ভীত ফলযুক্ত ও রোগী হয়।

শত্রুস্থানে শনি থাকিলে জাতক শত্রুহীন হয়। যদি ঐ স্থানে রবির তুঙ্গী হয় তবে জাতক মহা সুখী হয়। নীচগৃহে থাকিলে শত্রুবৃদ্ধি হয়।

শত্রুস্থানে রাহু থাকিলে জাতক প্রথমা স্ত্রীহীন, ধন পুত্র সুখে সুখী, সৌভাগ্যশালী ও রিষ্টহীন হয়। শত্রুস্থানে কেতু থাকিলে জাতক রোগহীন ও মহাসুখী হয়। কিন্তু মাতুল বা আত্মীয় কর্ত্তৃক অমর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

পত্নীস্থান।

পত্নীস্থানে রবি থাকিলে জাতক সুখহীন, চঞ্চল, ভ্রমণরত পাপাশক্ত, মধ্যমাকৃতিবিশিষ্ট কপিলনেত্র ও পিঙ্গল কেশযুক্ত, স্ত্রীহীন ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়।

পত্নীস্থানে চন্দ্র থাকিলে জাতক মনোরমা স্ত্রীযুক্ত হয়। কিন্তু চন্দ্র ক্ষীণ হইলে জাতক অসুখী ও বিকলাঙ্গ স্ত্রীলাভ করে।

পত্নীস্থানে মঙ্গল থাকিলে জাতক ক্ষতশরীর বিশিষ্ট রোগী হীনমতি, দুষ্ট-কর্ম্মকারী ও কৃশ হয়। মঙ্গল নীচস্থ হইলে জাতকের স্ত্রীনাশ হয়।

পত্নীস্থানে বুধ থাকিলে জাতক চঞ্চল, বন্ধুগণের অনুরাগী, অতিশয় সুখী ও উচ্চ বংশোদ্ভবা পত্নীযুক্ত হয়।

পত্নীস্থানে বৃহস্পতি থাকিলে জাতক ভূপতিসদৃশ সুখী, ধনবান, পুত্রবান, কুলভূষণ, সুন্দর ও সুশ্রী সুখযুক্ত এবং সকলের প্রিয় হয়।

পত্নীস্থানে শুক্র থাকিলে জাতক ধনবান, গুণবান, সুস্থ মিষ্টভাষী অনেক রমণীযুক্ত ও সুখী হয়।

পত্নীস্থানে শনি থাকিলে জাতকের সমস্ত স্ত্রী নষ্ট হয়। কিন্তু শনি মিত্র বা উচ্চগৃহগত হইলে জাতক অঙ্গহীনা কুরূপা স্ত্রীলাভ করে।

পত্নীস্থানে রাহু থাকিলে জাতক ধূর্ত্ত, দুষ্টমতিবিশিষ্ট ও স্ত্রীহীন হয়। অপিচ জাতক চণ্ডালীগতচিত্ত হইয়া থাকে।

পত্নীস্থানে কেতু থাকিলে জাতক রুগ্নাস্ত্রীযুক্ত চঞ্চল ও ভিক্ষাজীবী হয়।

মৃত্যুস্থান।

মৃত্যুস্থানে রবি থাকিলে জাতকের বজ্রাঘাত, সর্পাঘাত কিম্বা অত্যন্ত কষ্টে মৃত্যু হয়। কিন্তু এই স্থানে যদি রবির স্বগৃহ হয় তবে জাতকের সুমৃত্যু ঘটে।

মৃত্যুস্থানে চন্দ্র থাকিলে জাতকের অকালমৃত্যু হয়। বৃহস্পতি, শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট কিম্বা স্বগৃহে পূর্ণচন্দ্র থাকিলে জাতক শ্বাস কাশ প্রভৃতি পীড়া দ্বারা কষ্ট পায়।

মৃত্যুস্থানে মঙ্গল থাকিলে জাতকের অগ্নি, অস্ত্র, রাজদণ্ড, কুষ্ঠ ব্রণ, গ্রহণী অর্শ, প্রভৃতি পাপজ রোগে মৃত্যু হয়।

মৃত্যুস্থানে শুভ বুধ থাকিলে জাতকের তীর্থস্থানে কিম্বা গঙ্গাজলে মৃত্যু হয়। যদি পাপস্থ বুধ মৃত্যুস্থানে থাকেন, তবে জাতকের নিকৃষ্ট স্থানে মৃত্যু হইয়া থাকে।

মৃত্যুস্থানে বৃহস্পতি থাকিলে জাতক পূর্ণতাভাব সজ্ঞানে প্রাণত্যাগ করিয়া মুক্তিলাভ করে।

মৃত্যুস্থানে শুক্র থাকিলে জাতক বিশুদ্ধকর্ম্মা বিশাল নয়নযুক্ত, রাজসেবক রোমাবৃত দেহবিশিষ্ট ও ধীমান হয়।

মৃত্যুস্থানে শনি থাকিলে জাতক দুঃখী, শোকী ও বিদেশবাসী হয়, জাতক চৌর্য্যাদি অপরাধে নীচ লোকের হস্তে কি বদনকম্প, সূচিরোগ বা নেত্ররোগে অতি দুঃখে প্রাণত্যাগ করে।

মৃত্যুস্থানে রাহু থাকিলে জাতক ধনবান, কাপুরুষ ও মহাপাপী হয়। এবং জন্তুমুখে রাজদণ্ডে বা অপরাধে মৃত্যু সংঘটিত হয়।

মৃত্যুস্থানে কেতু থাকিলে জাতক পীড়াগ্রস্ত ও গুহ্য রোগী হয়। অগ্নি দ্বারা তাহার বিশেষ ভয়ের সম্ভাবনা।

ভাগ্য স্থান।

ভাগ্যস্থানে রবি থাকিলে জাতক ভাগ্য ও পুত্রহীন হয়। কিন্তু যদি ঐ স্থান রবির উচ্চ বা স্বগৃহ হয়। তবে জাতক ধার্ম্মিক, দীর্ঘজীবী সত্যবাদী ও রাজপ্রিয় হয়।

ভাগ্যস্থানে চন্দ্র থাকিলে জাতক ললনাপ্রিয়, পুণ্যবান ও সৎকর্ম্মশীল হয়। কিন্তু যদি চন্দ্র ক্ষীণ বা নীচগৃহগত হয় তাহা হইলে জাতক অশুভ ফল লাভ করে।

ভাগ্যস্থানে মঙ্গল থাকিলে জাতক ভাগ্যহীন, রোগী, শিল্পজীবী, সুবেশধারী ও পিঙ্গলাবর্ণযুক্ত হয়

ভাগ্যস্থানে বুধ থাকিলে জাতক ধনবান ও পুত্র কলত্রাদিযুক্ত হয়; কিন্তু যদি বুধ পাপযুক্ত বা শত্রুগৃহে থাকেন, তবে জাতক বেদনিন্দক ও নরাধম হয়।

ভাগ্যস্থানে বৃহস্পতি থাকিলে জাতক ভাগ্যবান রাজপ্রিয়, গুণবান, ধনী যজ্ঞপরায়ণ, ধার্ম্মিক, কীর্ত্তিমান ও কুলশ্রেষ্ঠ হয়।

ভাগ্যস্থানে শুক্র থাকিলে জাতক দেব-দ্বিজ-ভক্ত, শ্রদ্ধাবান, ধনবান, গুণী ও তীর্থপর্য্যটনকারী হয়।

ভাগ্যস্থানে শনি থাকিলে জাতক অহঙ্কারী, প্রবঞ্চক, ক্ষীণস্ত্রীযুক্ত ও কুকর্ম্মান্বিত হয়।

ভাগ্য স্থানে রাহু থাকিলে জাতক অধার্ম্মিক উদ্বিগ্নচিত্ত, অশুচি ও ভাগ্যহীন হয়।

ভাগ্যস্থানে কেতু থাকিলে জাতক সুখী, দাতা, তপস্বী নীচজাতি কর্ত্তৃক ভাগ্যবান ও বাহুরোগী হয়।

কর্ম্মস্থান।

কর্ম্মস্থানে রবি থাকিলে জাতক পৈতৃক ধন সম্পন্ন, রাজপ্রিয়, অভিলাষী, চক্ষুরোগী ও বৃদ্ধকালে রোগযুক্ত হয়।

কর্ম্মস্থানে চন্দ্র থাকিলে জাতক ভোগী, গুণবান ও শ্রীযুক্ত হয়। চন্দ্র ক্ষীণ বা নীচগৃহগত হইলে জাতক বিপরীত ফললাভ করিয়া থাকে।

কর্ম্মস্থানে মঙ্গল থাকিলে জাতক সাহসী, যোদ্ধা, ক্রোধী, ভূমিজীবী, স্ত্রীপ্রিয় ও দেবদ্বিজভক্ত হয়।

কর্ম্মস্থানে বুধ থাকিলে জাতক রাজপ্রিয়, যশস্বী, মিত্রযুক্ত, ধনবান ও ধার্ম্মিক হয়। কিন্তু বুধ পাপযুক্ত বা পাপগৃহগত হইলে বিপরীত ফল হয়।

কর্ম্মস্থানে বৃহস্পতি থাকিলে জাতক ধার্ম্মিক নীতিজ্ঞ, অজেয়, ধন-রত্ন-যুক্ত ও মহাসুখী হয়।

কর্ম্মস্থানে শুক্র থাকিলে জাতক ঐশ্বর্য্যশালী স্ত্রীধন সম্পন্ন, নেত্ররোগযুক্ত ও লোভী হয়।

কর্ম্মস্থানে শনি থাকিলে জাতক ক্রূর, নির্ভীক, ক্রোধী, নৃপসেবী, শত্রুজয়ী, যক্ষ্মারোগী, প্রাজ্ঞ, ধনবান, ও ধার্ম্মিক হয়।

কর্ম্ম স্থানে রাহু থাকিলে জাতক হতভাগ্য, পরান্নভোজী কামুক, চপল, সুখহীন, স্নানে বিরক্ত, ও মূখরাস্ত্রীর পতি হয়।

কর্ম্মস্থানে কেতু থাকিলে জাতকের পিতা অসুখী ও ভার্য্যা বিনষ্ট হয়। কেতু ধনু বা মীন রাশিতে থাকিলে জাতকের শত্রুক্ষয় হয়।

আয় স্থান।

আয় স্থানে রবি থাকিলে জাতক ধনশালী বিদ্বিজ্ঞ, গুণবান, নৃপতিসদৃশ

কৃশাঙ্গ, ভোগহীন, কামুক ও হীনচরিত্র রমণীপ্রিয়, চপলচিত্ত ও বন্ধুগণ প্রমোদী হয়।

আয় স্থানে চন্দ্র থাকিলে জাতক ধনবান, সুখী, দীর্ঘজীবী ও সৌভাগ্যশালী হয়।

আয় স্থানে মঙ্গল থাকিলে জাতক ধনবান, বাঞ্ছিত সুখভোগী, সাহসী ও ধনধান্যযুক্ত হয়।

আয় স্থানে বুধ থাকিলে জাতক ক্রূরবুদ্ধি ও স্থূলনেত্রযুক্ত হয়। কৃপণ, সুখী, ধনবান, রমণীরঞ্জক ও ধার্ম্মিক হয়।

আয় স্থানে বৃহস্পতি থাকিলে জাতক অপরিমিত আয় সম্পন্ন, বহুভৃত্য ও মিত্রযুক্ত, সাধু এবং কল্পবিশ্বাস ও সুসন্তানযুক্ত হয়।

আয় স্থানে শুক্র থাকিলে জাতক গুণী কুলের হিতকারী সৎব্রতাবলম্বী, সুন্দর বপুযুক্ত ও হাস্যবদন বিশিষ্ট হয়।

আয় স্থানে শনি থাকিলে জাতক দীর্ঘজীবী, বিত্তবান ও সাহসী হয়।

আয় স্থানে রাহু থাকিলে জাতক দাতা সুখহীন সুখী চঞ্চল প্রবাসী, শাস্ত্রদ্বেষ্টা ও লজ্জাহীন হয়।

আয়স্থানে কেতু থাকিলে জাতক সুশ্রী, বিদ্বান, মিষ্টভাষী, উদরপীড়াযুক্ত ও সন্তান ভাগ্যহীন হয়।

ব্যয় স্থান।

ব্যয় স্থানে রবি থাকিলে জাতক বিকল-শরীর-বিশিষ্ট কাশরোগী, সন্তানহীন, পিতৃবন্ধুর অনিষ্টকারী, দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্রকায়বিশিষ্ট হয়।

ব্যয় স্থানে চন্দ্র থাকিলে জাতক কৃপণ ও অনিষ্টকারী হয়। ব্যয় স্থানে মঙ্গল থাকিলে জাতক নয়নরোগী, কুলনাশক ও অতিশয় ক্রোধী হয়।

ব্যয় স্থানে বুধ থাকিলে জাতক বাক্যগ্রাহী, অলস, প্রাঞ্জল বক্তা ও দরিদ্র হয়।

ব্যয় স্থানে বৃহস্পতি থাকিলে জাতক হিংসক অলস আঘাতে ভগ্নপঞ্জর বিশিষ্ট, পতিত ও সেবারত হয়।

ব্যয় স্থানে শুক্র থাকিলে জাতক চঞ্চলা স্ত্রীর স্বামী, ধনবান, পিতৃবঞ্চক, জন্মরোগী, ক্রূরমতি, প্রচণ্ড, ভারবাহা ও নির্লজ্জ হয়।

ব্যয় স্থানে শনি থাকিলে জাতক শৌর্য্য ও লজ্জাহীন, চক্ষুর পীড়া বা

বিকৃতিযুক্ত ও বিদেশবাসে প্রসন্ন হয়। নীচ বা শত্রুগৃহে শনি থাকিলে নীচসংসর্গযুক্ত বহুব্যয়ী, প্রবাসী, শোকগ্রস্ত ও ঋণী হয়।

ব্যয় স্থানে রাহু থাকিলে জাতক ধর্ম্মহীন, অর্থহীন, প্রবাসী, অহঙ্কারী, সুখহীন ও পিঙ্গলনেত্রবিশিষ্ট হয়।

ব্যয় স্থানে কেতু থাকিলে জাতক নৃপতিসদৃশ, সদ্বেয়ী, মাতুলান্ন ভোজী ও গুহ্যরোগী হয়।

৪র্থ অধ্যায়।

তুঙ্গী ও তাহার ফল।

গ্রহগণ যে রাশিতে থাকিলে বিশেষ বলবান হয়েন, তাহাকে সেই গ্রহের তুঙ্গী বা উচ্চ স্থান বলে।

যথা—মেষ রাশি রবির উচ্চ স্থান, বৃষ রাশি চন্দ্রের, মকর রাশি মঙ্গলের কন্যা রাশি বুধের, কর্কট রাশি বৃহস্পতির, মীন রাশি শুক্রের, তুলা রাশি শনির মিথুন রাশি রাহুর, ধনু রাশি কেতুর তুঙ্গ বা উচ্চস্থান। *

কোন কোন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতের মতে সিংহ, কন্যা, বুধ, কর্কট, রাহুর উচ্চ স্থান। মীন, কুম্ভ, মকর, ধনু কেতুর উচ্চস্থান।

রবি তুঙ্গী হইলে জাতক শাস্ত্রজ্ঞ, ধার্ম্মিক, ধীর, নীরোগী, অনেক সন্তান যুক্ত, সুখী, দাতা, লোকের নিকট আদৃত ভোগী হয়।

চন্দ্র তুঙ্গী হইলে জাতক ধনবান, বাহনযুক্ত, মিষ্টান্নভোজী, কীর্ত্তিমান ও ভোগী হয়!

মঙ্গল তুঙ্গী হইলে জাতক কীর্ত্তিমান, নরশ্রেষ্ঠ, রাজকর্ম্মচারী এবং রাজার সদৃশ মণি মুক্তা, ছত্র, দণ্ড, অশ্ব, উষ্ট্র, গো, হস্তী, বাহন ও ধনযুক্ত হয়।

বুধ তুঙ্গী হইলে জাতক বলবান, রাজপূজ্য, মানী, নরাধিপতি, বিদ্বান, সুখী ও পুত্রকন্যা এবং রত্নযুক্ত হয়!

বৃহস্পতি তুঙ্গী হইলে জাতক রাজমন্ত্রী নরশ্রেষ্ঠ বলবান ক্রোধী, ধনবান, গো, অশ্ব, হস্তীযুক্ত, উৎকৃষ্টা রমণীর পতি, অনেক সন্তান যুক্ত ও সুখী হয়।

---

* যে গ্রহের যে স্থান উচ্চ তাহার সপ্তম ঘর নীচ বলিয়া কথিত, যথা—তুলা রাশি রবির, বৃশ্চিক রাশি চন্দ্রের, কর্কটরাশি মঙ্গলের, মীনরাশি বুধের, মকর রাশি বৃহস্পতির, কন্যা রাশি শুক্রের, মেষরাশি শনির, ধনু রাশি রাহুর, মিথুন রাশি কেতুর, নীচ স্থান। গ্রহগণ নীচস্থ হইলে হীনবল হইয়া থাকেন।

শুক্র তুঙ্গী হইলে জাতক মিষ্টান্নভোজী, গুণবান, মঙ্গলযুক্ত, রাজমন্ত্রী দীর্ঘজীবী, দাতা, বুদ্ধিমান ও রোগহীন হয়॥

শনি তুঙ্গী হইলে জাতক দাসদাসী অশ্ব হস্তী উষ্ট্র গো প্রভৃতির অধিপতি, অত্যন্ত রোগী, দুরাত্মা ও ভূম্যাধিকারী হয়।

রাহু তুঙ্গী হইলে জাতক নরনাথ রাজা কিম্বা তৎসদৃশ অশ্ব, হস্তী, নর, নৌকা প্রভৃতি বাহনযুক্ত ও বিপুল ধনের অধিপতি হয়।

কেতু তুঙ্গী হইলে জাতক সর্ব্ববিদ্যা পারদর্শী, দীর্ঘজীবী গুণবান, হস্তী ঘোটক ও নৌকাদি বাহনযুক্ত, নৃপতি প্রিয় ও নরশ্রেষ্ঠ হয়।

মূল ত্রিকোণ ও তাহাতে গ্রহস্থিতির ফল যে রাশিতে যে গ্রহ থাকিলে তিন পাদ বলবান হয়েন, সেই স্থানকে সেই গ্রহের মূল ত্রিকোণ বলে। সিংহ রাশি রবির মূল ত্রিকোণ, বৃষরাশি চন্দ্রের, মেষ রাশি মঙ্গলের, কন্যারাশি বুধের, ধনু রাশি বৃহস্পতির, তুলারাশি শুক্রের, কুম্ভরাশি শনির, কুম্ভরাশি রাহুর, সিংহ রাশি কেতুর মূল ত্রিকোণ।

রবি মূল ত্রিকোনে থাকিলে জাতক সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী, দাতা ধনবান বিনয়ী ক্রোধী, গুণবান, উদার ও ভূসম্পত্তিযুক্ত হয়।

চন্দ্র মূল ত্রিকোণে থাকিলে জাতক ধনবান, কীর্ত্তিমান উদার, সচ্চরিত্র, বিনয়ী বিদ্বান, স্থূলাকায়-শরীর-বিশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠ বাহনযুক্ত হয়।

মঙ্গল মূল ত্রিকোণে থাকিলে জাতক তেজস্বী, বলবান, ধনবান, দীর্ঘায়ু, ভোগবান, শ্রেষ্ঠবাহনযুক্ত ও নীচব্যক্তির প্রিয় হয়।

বুধ মূল ত্রিকোণে থাকিলে জাতক বুদ্ধিমান, সচ্চরিত্র, গুণানুরাগী, ধীর, রোগযুক্ত, শ্রেষ্ঠবাহনবিশিষ্ট ও শত্রুনির্য্যাতনে পটু হয়।

বৃহস্পতি মূল ত্রিকোনে থাকিলে জাতক কাব্যবিলাপী স্বধর্ম্মে ভক্তিমান, নীতিজ্ঞ পবিত্র, গম্ভীর স্বভাববিশিষ্ট, উদার, কীর্ত্তিমান ও নীচলোকের নিকট প্রসিদ্ধ হয়।

শুক্র মূল ত্রিকোনে থাকিলে জাতক তেজস্বী, বিজ্ঞ দাতা, শিল্পপটু, শাস্ত্রজ্ঞ ও নীচলোকের নিকট প্রসিদ্ধ হয়।

শনি মূল ত্রিকোনে থাকিলে জাতক দুঃখী; মঙ্গলযুক্ত অমঙ্গলযুক্ত, গাধা উষ্ট্র গো প্রভৃতির অধিপতি হয়।

রাহু মূল ত্রিকোনে থাকিলে জাতক সাহসী, ক্রোধী ও ধনবান হয়।

কেতু মূল ত্রিকোনে থাকিলে জাতক উপরোক্তফল লাভ করে। (ক্রমশঃ)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক নং
শ্রেণী সং

জন্মভূমি

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

২৬শ, বর্ষ। ১৩২৭ সাল, চৈত্র। ১২শ সংখ্যা।

সেকেলে।

(গল্প।)

গ্রামে অনেক ভদ্র গৃহস্থ থাকিলেও, রমেশ রায়েদের বাড়ীতে সর্ব্বদাই থাকিত কেন, কেহ তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। নিজের বাড়ীতে মা, ভাই, বোন সকলেই রহিয়াছে, তবু রমেশ রায়েদের ছোট বড় সকলকে, নিজের বাড়ীর আত্মীয় অপেক্ষা বেশী ভালবাসে কেন—এই একটা সমস্যা; গ্রামের নিষ্কর্ম্মা বৃদ্ধ নরনারী সকলে তাহার মীমাংসার জন্য প্রত্যহ দু-পুর ও সন্ধ্যাবেলায় বিস্তর চেষ্টা করিয়াও কিছু একটা নিষ্পত্তি করিতে পারিত না। ঐ রাঙ্গা টুকটুকে ছোঁড়াটা তাহাদের সকলের কাছে না আসিয়া রায়েদের বৌ'য়েদের কাছে যায় কেন,—ঘাটে, বাটে, মাঠে সর্ব্বত্রই সন্তানবতী ও সন্তানহীনা অনেক যুবতী ও প্রৌঢ়া এই প্রশ্নের একটা উত্তর পাইবার আশায় জল্পনা কল্পনার সাহায্যে একটা এমন কিছু খাড়া করিয়া তুলিল, যাহা ভদ্রলোকের অশ্রাব্য ও কলঙ্কের বিষয়।

অনেকে অনেক কথা বলা সত্ত্বেও রমেশ রায়েদের বাড়ী যাওয়া ছাড়িল না—ছাড়িতে পারিল না। তাহার সমবয়স্ক বন্ধু-বান্ধব, প্রৌঢ় প্রতিবেশী শেষে তাহার মা স্বয়ং, তাহাকে রায়েদের বাড়ী যাইতে নিষেধ করিয়াছেন,—কিন্তু তবু রমেশ পারিল না—রায়েদের বাড়ী ছাড়িতে সে কিছুতেই পারিল না। এই সামান্য ব্যাপার লইয়া একটা গুরুতর কাণ্ড ঘটিতে পারে, একথা রমেশও বুঝিত, রায়েরাও বুঝিত; কিন্তু উভয় পক্ষের কেহ কাহাকে ছাড়িয়া থাকা অসম্ভব বলিয়া মনে করিত। অন্য কেহ একথা মনে করিলেও, সেজবৌ তাহা পারিত না। রমেশ ও তাহার প্রকৃতি এরূপ ভাবে খাপ খাইয়াছে যে, তাহাদের ছাড়াছাড়ি কেবল মৃত্যু ভিন্ন আর কখনও হইবে না বলিয়াই মনে করিত। বাস্তবিক বাড়ীর ছোট ছেলে মেয়ে পর্য্যন্ত রমেশের একান্ত অনুরক্ত ও অন্যায় পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাকে পর ভাবিতে হইলে রায়েদের বাড়ী-খানির প্রতি অঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিত। এরূপ হইবার একটা কারণ ছিল।

রমেশের যখন তিন বৎসর বয়স, তখন হইতেই সে প্রায় সকল সময়েই রায়েদের বাড়ীতে কাটাইত। রায়েদের সেজবাবু সতীশ রমেশের পিতাকে কাকা বলিতেন এবং তাঁহাকে সেইরূপ সম্মানও করিতেন। রমেশ বাল্যকাল হইতেই সেজবাবুর প্রিয়পাত্র হইয়া উঠে। রমেশ দেখিতে অতি সুন্দর ছিল। সুন্দর ছোট ছেলের আকর্ষণী শক্তির জন্যই হোক, বা কাকার তুষ্টির জন্যই হোক, সতীশ বাবু রমেশকে সর্ব্বদা নিজের কাছে রাখিতেন। সুতরাং ছেলে বেলা হইতেই রমেশ রায়েদের বাড়ী আপনাদের বাড়ী বলিয়াই মনে করিত। তাহার লেখাধূলা সবই সেইখানে হইত। এমন কি মায়ের আর একটি সন্তান হইলে, তাহার আহার ও নিদ্রা প্রায়ই সেই খানেই সম্পন্ন হইত। রায়েদের সকলেই এই সুন্দর, শান্ত, শিষ্ঠ শিশুটিকে স্নেহ করিত। তাহার সহিত 'আগাডুম বাগাডুম' প্রভৃতি খেলায় যোগদান করিয়া শিশুর উৎসাহ বর্দ্ধন করিত। ছয় বৎসর বয়সে রমেশের একটি নূতন খেলার সাথী জুটিল। সেটি রায়েদের সেজবৌ। নূতন সঙ্গীর সহিত রমেশ শীঘ্রই সদ্ভাব করিয়া লইল এবং তৎসঙ্গে, খেলার মাত্রা দ্বিগুণ বাড়াইল। নিজের আত্মীয় স্বজন ছাড়িয়া 'পরের' বাড়ী আসিয়া নয় বৎসরের বালিকা সেজবৌ সুশীলা আপনাকে বড়ই একা মনে করিতেছিল। এমন সময়ে একজন সঙ্গী পাইবার জন্য তাহার প্রাণ যেন চঞ্চলভাবে আর একজনের আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছিল। বাপের বাড়ীতে তাহার

রমেশেরই মত একটি ভাই ছিল। সুতরাং রমেশ তাহার সহিত 'ভাব' করিতে চাহিলে সুশীলা সাগ্রহে তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিল। সতীশ বাবুর অনুরোধ উৎসাহ রমেশও সুশীলার সম্পর্ক গাঢ় করিয়া তুলিল। এইরূপে রমেশ ও রায়েদের সেজবৌয়ের মধ্যে এরূপ একটা ভাব দাঁড়াইল যে, একজনের অনুপস্থিতি অন্যের সহ্য করা কষ্ট কর মনে করিতে লাগিল। কালিকাতায় চাকুরী করিতে যাইবার সময়, সতীশ বাবু রমেশ ও সেজবৌকে একত্রে থাকিবার জন্য আদেশ দিয়া গেলেন। রমেশ বড় হইয়া যখন স্কুল যাইতে লাগিল, তখন তাহার পাঠাগার হইল সেজবৌয়ের শয়ন কক্ষ। যে বৎসর সে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিল, সেই বৎসর হৃদ্‌রোগে সতীশ বাবু রমেশকে তাঁহার স্ত্রী ও দুই বৎসরের কন্যার সমগ্র ভার দিয়া, পরপারে যাত্রা করিলেন। রমেশ দ্বিতীয় বার পিতৃশোক পাইল। সতীশ বাবুর মৃত্যুতে রায়েরা পুরুষ অভিভাবক শূন্য হইল। সুতরাং রমেশ এই সদ্য বিধবা নারী, পিতৃহীনা শিশু কুমারী ও অনাথ পরিবারটির জন্য বিষম চিন্তিত হইয়া পড়িল। স্বামী হীনা সেজ বৌ প্রাণের সমস্ত স্নেহ ও ভালবাসা দিয়া রমেশকে সজোরে আকড়াইয়া ধরিল। এ সর্ব্বনাশের সময়ে রমেশ ভিন্ন তাহার যে আর কেহ নাই। রমেশ স্বেচ্ছায় সে বন্ধন গ্রহণ করিল। এবং যতদূর সম্ভব সেজবৌয়ের চিত্তবিনোদনের চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু পতিহীনা নারীর নীরব মর্ম্মভেদী হাহাকার, আর্ত্তনাদ তাহার প্রাণে বজ্রপাতের মত আঘাত করিতে লাগিল। এ শোকে আর সান্ত্বনা কি? রমেশ সেজবৌয়ের কাছেই রহিল।

রমেশ সেজবৌয়ের কাছে পূর্ব্বেও থাকিত, এখনও রহিল। কিন্তু গ্রামের লোকে সে থাকাটা ঠিক পূর্ব্বের মত গ্রহণ করিতে পারিল না। যতদিন সতীশ বাবু জীবিত ছিলেন কেহ কোন কথা বলে নাই। কিন্তু সতীশ বাবুর মৃত্যুর পর দিন হইতেই, প্রথমে চুপি চুপি, পরে ইঙ্গিত ইসারায়, পরে নেপথ্যে, পরে প্রকাশ্যে, ঘাটে, পথে মজলিসে ও বারোয়ারীর তলায় রমেশ ও সুশীলার নামে জটলা হইতে লাগিল।

একদিন মধ্যাহ্নে রায়েদের বাড়ী যাইবার সময়ে রমেশ সেজবউয়ের সহিত তাহার নাম একত্রে শুনিল। ঘাটে কতকগুলি বয়স্কা রমণী দাঁড়াইয়া তাহাদের সম্বন্ধে বিবিধ কৌতুকপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিল। রমেশকে দেখিয়া একজন ব্যঙ্গস্বরে শুধাইল, "এত রৌদ্রে কোথা গো?" অপমানে রমেশের মুখ লাল হইয়া উঠিল। কোন কথা না বলিয়া সে চলিয়া গেল। একটা নিষ্ফল ক্রোধ তাহার হৃদয় মধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠিতেছিল। একটা অস্বাভাবিক

কল্পনা স্রোতের মত তাহার মস্তিষ্কে ঘুরিয়া বেড়াইতে ছিল। দ্রুতপদক্ষেপে ঘরে ঢুকিয়া সে সেজবৌয়ের নিকট এমনি ভাবে শুইয়া পড়িল—যেন একটি নিরপরাধ শিশু অপরের নিকট অন্যায়রূপে প্রহৃত হইয়া মাতৃক্রোড়ে আশ্রয় লইতেছে ও মাতার নিকট নালিশ করিতেছে। সেজবৌ তাহার মুখ দেখিয়া চমকাইয়া উঠিল। বহুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ রমেশের নিকট ব্যাপারটা শুনিয়া হাসিয়া বলিল, "এই! সত্যই ত আমরা দুই ইয়ার। আর সে ত আজ নূতন নয়,—দশ বার বৎসরের।" লোক মুখে পুত্রের নাম ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়া রমেশের মা রমেশকে রায়েদের বাড়ী যাওয়া ছাড়িতে কঠোর আদেশ দিলেন। রমেশ আকুল হইয়া পড়িল। কালকাতায় I. A. পড়িতে যাইবার দিন নিকট আসিতেছিল। রমেশের যাত্রার জন্য একটি শুভদিন দেখান হইয়াছিল। কিন্তু গ্রামের এই কর্কশ ব্যবহারে সে এত বেশী উত্যক্ত ও উত্তেজিত হইয়াছিল যে, নির্দ্দিষ্ট দিনের পূর্ব্বেই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। একদিন বৈকালে গোপনে খুকীকে (সেজবউয়ের কন্যা) সেজ বউয়ের "নামীয়" একখানি পত্র দিয়া ও তাহাকে স্নেহাশীর্ব্বাদ করিয়া পরদিন অতি ভোরে সে গ্রাম ত্যাগ করিল। সেজদি'র জন্য তাহার প্রাণ যে কিরূপ করিতেছিল তাহা কে বুঝিবে? একটা দূরাগত করুণ অন্তর্ভেদী আর্ত্তনাদ তাহার কর্ণ দিয়া প্রবেশ করিয়া মর্ম্মে সজোরে আঘাত করিতেছিল। তাহারো ইচ্ছা হইতে ছিল, সেও সেই করুণ স্বরে স্বর মিশাইয়া হাহাকার করিয়া খানিক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করে। তাহা হইলে হয়ত তাহার হৃদয়াবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইতে পারিত। দ্রুত স্পন্দিত বক্ষঃস্থল দুই হস্তে চাপিয়া ধরিয়া রমেশ ক্ষিপ্র পদক্ষেপে ভোরের অন্ধকার মধ্যে অদৃশ্য হইল।

× × × × ×

সেজ বউয়ের দিন আর কাটে না। রমেশ থাকিতে দিনগুলো ঘোড়ার মত ছুটিয়া যাইত—এখন হাঁসের চেয়েও যেন কম চলিতেছে। সাত আট মাস রমেশ গিয়াছে, তার কোন সংবাদ নেই। কেন সে সংবাদ দেয় না? সে ভাল আছে ত? যাহাকে একদণ্ড না দেখিলে থাকিতে পারিত না, সেই রমেশ আজ সাত আট মাস তার সংবাদও লয় না; ব্যাপার কি?—কারণ কি? প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা সেজবউ আকাশ পাতাল ভাবে, তার কূল নেই—শেষ নেই। বিধবা রমণী মাতৃস্নেহে যাহাকে আপনার জীবন হইতেও প্রিয় করিয়া লইয়াছিল, কি দোষে গ্রামের লোক তাহাকে সে প্রিয় বস্তু হইতে

বিচ্ছিন্ন করিল? দেবতার নির্ম্মাল্যের মত তাহাদের পবিত্র ভালবাসায়, কি স্বার্থে গ্রামবাসী এ ঘোর কলঙ্ককালি ঢালিয়া দিল। অভিমানের কষাঘাতে, তাহার হৃদয় খানি বিদীর্ণ হইয়া যাইত। যদিই বা সেজবউ কোন রকমে আপনার হৃদয়ের গরিক নিঃস্রাবের মত জ্বালাময় উচ্ছ্বাস প্রশমিত করিতে চায়, তাহার আড়াই বৎসরের কন্যা বিমলা কিন্তু তাহা করিতে দেয় না। সে যে রমেশের সঙ্গ ছাড়া থাকিত না, তাহার কোল নহিলে ঘুমাইত না, তাহার গল্প না শুনিলে শান্তিলাভ করিত। সাত আঠ মাস রমেশ গিয়াছে—এই কয় মাসে বালিকা তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য হারাইয়াছে। প্রতিদিন সে রমেশ কাকার নিকট যাইতে চায়, চাঁদা মামার ভিতর হইতে বাহিরে আসিবার জন্য তাহাকে কত অনুরোধ, উপরোধ করে এবং প্রতিদিন তাহাকে মিথ্যা আশ্বাসে ভুলাইয়া রাখিতে হয়। কতদিন এই মিথ্যার অভিনয় করিতে হইবে। কতদিনে এই লুকোচুরির অবসান হইবে। সেজবউয়ের হৃদয় প্রতিদিন মুচড়াইয়া মুচড়াইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। একে ত কন্যার অবিরাম রোদন তাহাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার উপর গ্রামের নরনারীর, বিশেষতঃ সেনেদের (রমেশদের) তীব্র শ্লেষবাক্য ও কলঙ্কবাদ সুশীলাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। সে প্রতিদিন মৃত্যুর উপাসনা করিতে লাগিল। জীবনে কি হইবে? শিশু কন্যা? সে যাহা হউক হইবে। মানুষ মরিলে ত দেখিতে আসেনা! সেজবউ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

সন্ধ্যা হয় হয়, সুশীলা একটা পিতলের কলসী লইয়া গঙ্গায় গা ধুইতে চলিল। তখন জোয়ার ধীরে ধীরে ভাঁটায় পরিণত হইতেছিল। সুশীলা ধীরে ধীরে অন্যমনস্কভাবে একগলা জল পর্য্যন্ত নামিয়া গেল। গঙ্গার তরঙ্গ ভঙ্গের মত তাহারও মনে চিন্তার তরঙ্গভঙ্গ। আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া সেজবৌ ভাবিতেছিল—এইত গঙ্গা, এরই তীরে সেও ত আছে। চিরদিনের অভ্যাসবশত সেও হয়ত এখন গা' ধুইতে আসিয়াছে! হাঁ, ঠিক এই সময়ে, ঠিক সময়ে কতদিন সাঁতরাইয়া সে গঙ্গা পার হইতে গিয়াছে, ঘাটের মেয়েদের সঙ্গে সুশীলাও তাহাকে সভয়ে নিষেধ করিয়াছে। স্বামীর চিন্তাস্রোত আজ তাহার প্রতি অঙ্গ দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। নিমিলীত নেত্রে সে দেখিতে পাইল দূরে তাহার স্বামী রমেশের হাত ধরিয়া কত কথা কহিতেছে, কত উপদেশ দিতেছে। দূরে—আরও দূরে—সেজবৌ আর থাকিতে পারিল না, ডাকিল—"স্বামী স্বামী দেবতা ফের ফের।"

এমন সময় গঙ্গার তীরস্থ বনমধ্য হইতে একটা শৃগাল চীৎকার করিয়া উঠিল। সেজবৌয়ের চিন্তার স্রোত থামিয়া গেল। কি ভ্রম! কে কোথায়! সে একা! একটা চাপা নিশ্বাস ফেলিয়া সুশীলা পুনরায় অনামনস্ক হইল। আবার ভাবিল, এই ভাটার জলস্ত তাহার কাছে যাইবে! এরা সেজবৌকে সেখানে কি লইয়া যাইতে পারিবে না? একটিবার মাত্র তাহাকে দেখিয়া আসিবে! পারিবে না? খুব পারিবে—খুব পারিবে! অজ্ঞাতসারে সেজবৌ নামিয়া চলিল। হটাৎ তাহার মনে হইল, সে একি করিতেছে! ছি! ছি! একি দুর্ব্বলতা। সেজবৌয়ের মনে হইল, লোকে যেন তাহার এই দুর্ব্বলতায় হাসিতেছে! লজ্জায় ও ক্ষোভে আরক্তিম মুখে সেজবউ দ্রুত বাড়ী ফিরিল এবং কাপড় ছাড়িয়া কন্যাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া অন্ধকারে শয্যা লইল। খুকী তখন আব্দার ধরিয়াছে, "রমেশ কাকার কাছে যাবো আমি রমেশ কাকার কাছে যাবো।" কন্যাকে সজোরে চপেটাঘাত করিয়া, ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া, সেজবউ বালিশে মুখ লুকাইয়া বালিকার ন্যায় ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কলিকাতায় আসিয়া প্রথম প্রথম রমেশের সময় আর কাটিত না। সহরের দর্শনযোগ্য, অযোগ্য সকল স্থান দেখিয়া বেড়াইয়াও, রমেশ সময় কাটাইবার উপায় খুঁজিয়া পাইত না। প্রাণটা যেন কেমন উদাস, মনটা কেবল ফাঁকা! এক জনের অভাব বোধ সে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে করিত। কিন্তু এ অভাব পূর্ণ হইবার কোন উপায় নাই। রায়েদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখায় তাহার দাদা ও মা তাহাকে বহুবার নিষেধ ও তিরস্কার করিয়াছেন। এমন কি তাহার সাক্ষাতেও সেজবউয়ের কুৎসা রটনা করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। কিন্তু তবু রমেশ থাকিতে পারিল না। গোপনে সেজবউকে পত্র দিল। কিন্তু সাত আট খানি পত্র দিয়াও যখন কোন উত্তর পাইল না, তখন সে হতাশ হইয়া ভাবিল, যাহাদের জন্য সে এত সহ্য করিয়াছে, তাহারাই যদি তাহাকে না চায়, তবে কেন তাহাদিগকে ব্যস্ত করে! রমেশ পত্র দেওয়া বন্ধ করিল। কিছু দিন পরে তাহার লিখিত পত্র গুলির সহিত তাহার মায়ের লেখা একখানি পত্র আসিল। তিনি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, এরূপ ভাবে পত্রদিয়া রায়েদের বিশেষ সেজবৌয়ের তত্ত্ব লইবার জন্য সে কলিকতায় প্রেরিত হয় নাই। পুনঃ পুনঃ নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়াছে। এইবার যদি সে না শোনে, তবে তাহাকে বাড়ী থেকে দূর করিয়া দেওয়া হইবে। পত্র পাঠ করিয়া রমেশ বুঝিল, কেন সে পত্রের উত্তর পায় নাই। একখানি চিঠিও যে সেজবৌ পায় নাই, তাহা সে বেশ বুঝিল। রমেশ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, চক্ষু মুছিল।

দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে রমেশ চার পাঁচ বার বাড়ী আসিয়াছিল। কিন্তু রমেশ কি সেজবৌ কেহ কাহার সহিত দেখা করিতে সাহস করে নাই। প্রথমবার বাড়ী আসিলে খুকী রমেশকে দেখিতে ছুটিয়াছিল। কিন্তু রমেশের মা তাহাকে প্রহারের ভয় দেখাইলে, সে আর রমেশের কাছে যাইতে সাহস করিল না। প্রহৃত হইবার ভয়ে দূর হইতে রমেশকে দেখিয়া পলাইত। রমেশ বাড়ী আসিলে, তাহাকে দেখিবার প্রলোভন সুশীলাকে আত্মহারা করিয়া ফেলিত। বহুকষ্টে সে আপনাকে প্রলোভন হইতে দূরে রাখিয়াছিল। কিন্তু যেবার শুনিল, বসন্ত রোগাক্রান্ত হইয়া রমেশ বাড়ী আসিয়াছে, সেবার সে কিছুতেই আপনাকে স্থির রাখিতে পারিল না। কম্পিত পদক্ষেপে ও কম্পিত বক্ষে সেজবৌ সেনেদের বাড়ী উপস্থিত হইল। রমেশের কক্ষে প্রবেশ করিতে যাইতেছে, এমন সময় সেনগিন্নি আসিয়া তাহাকে বাড়ী হইতে দূর হইবার আদেশ করিল। সংজ্ঞাহীন রমেশকে বারেক দেখিয়াও মনে মনে মা শীতলার নিকট তাহার জীবন ভিক্ষা করিয়া অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে অভাগিনী ফিরিয়া আসিল। এ অপমানে তাহার দুঃখ নাই! অপমান লাঞ্ছনা, এ সব ত অঙ্গের ভূষণ! মা শীতলা তুমি রমেশকে নীরোগ কর।

আরো এক বৎসর চলিয়া গিয়াছে। পৌষমাসের অপরাহ্নে গায়ে ও মাথায় আঁচলের "টেপ" দিয়া দরজায় বসিয়া সুশীলা তাহার বিশ বৎসরের অতীত জীবনের ইতিহাস দেখিতেছিল। এমন সময় একজন লোক একটি প্রকাণ্ড বোঝা মাথায় লইয়া রাস্তায় আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা ঠাকরুণ রায়েদের বাড়ী কতদূর?" সুশীলা গভীর চিন্তায় মগ্ন, সুতরাং শুনিতে পাইল না; দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করায় স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় বলিল, "এঁ্যা, কি বল্‌ছ বাছা?" লোক "রায়েদের বাড়ী কতদূর মা?" সুশীলা, "কোথা হ'তে আস্‌ছ?" লোক বলিল, "কোলকেতা হ'তে।" "কল্‌কাতা, কল্‌কাতা"—সুশীলা অন্যমনস্ক হইল। মুটে বেচারা প্রকাণ্ড বোঝার ভারে হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। কাতরস্বরে শুধাইল, "কতদূর মা?" সুশীলা অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "এই যে! ভেতরে যাও! আহা এত শীতেও যে তুমি নেয়ে উঠেছ বাছা?" লোকটি ভিতরে প্রবেশ করিতেছে, এমন সময় সহসা সেজবৌ শুধাইল, "কে তোমায় পাঠালে বাছা?" প্রশ্ন করিয়া উৎকণ্ঠিত ভাবে উত্তরের আশায় দাঁড়াইয়া রহিল।

লোক বলিল, রমেশ চন্দর সেন—বাহুড় বাগানে বাসা।" সুশীলা দুই

হাতে সজোরে কপাট চাপিয়া ধরিয়া পাষাণ মূর্ত্তির মত নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে দুইহাতে দুইটা কমলা নেবু ও কুল লইয়া খুকী যখন বাড়ীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে আসিতে হাঁকিতে ছিল, "মা মা, রমেশ কাকা কি পাঠিয়েছে, দেখ্‌বে এস।" তখন সুশীলা আপনাকে সামলাইয়া লইয়াছে। অশ্রুভারাক্রান্ত চক্ষে কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার মুখ চুম্বন করিতে করিতে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। সেজবউয়ের জা' তখন লোকটিকে বসিতে দিয়া, জিনিষ পত্র ঘরে তুলিবার জন্য ব্যস্ত। সুশীলাকে দেখিয়া বলিল, "দেখ্‌ সেজবউ, রমেশ এই সব পাঠিয়েছে। আর এই ত্রিশ টাকা। আহা এতদিন সে আমাদের বাড়ী ছিল, সেকি আমাদের মায়া কাটাতে পারে?" সেজবউ কন্যাকে কোলে লইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তখন সে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত। রমেশের কুশল শুধাইতেও ভুলিয়া গিয়াছে। এমনি দিনে যখন তাহার স্বামী এইরূপ দ্রব্য সম্ভার লইয়া আসিতেন, রমেশ তখন কত না আনন্দ প্রকাশ করিত। আজ সেই রমেশ এই সব জিনিষ পাঠাইয়াছে। হায়! কোথায় তিনি, তাহার সেই দেবতা! সেজবউয়ের জা' আপন মনে বলিতে ছিলেন, "আহা, সে ত আমাদের অবস্থা সবই জানে। এতদিন কেবল পরের ভয়ে কিছু পাঠায় নি।" যে লোকটি জিনিষ লইয়া আসিয়াছিল, সে বলিল, "তা, মা ঠাকরুণ, এও কি কেউ জানে? তিনি লুকিয়ে পাঠিয়েছেন।" চমকিত হইয়া সুশীলা শুধাইল, "কি তিনি?" লোক "কাউকে জানিয়ে পাঠালে কি তাঁর রক্ষে ছিল? তা'হবার যো নেই মা।" সেজবউ নীরবে রহিল। সহসা দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "এগুলো ফেরৎ পাঠাও দিদি, আমার চাই না।" দিদি বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিল। এ বলে কি? এতগুলো জিনিষ, আর এত গুলো টাকা—এ সব ফেরৎ পাঠাইতে হইবে, কোন দিন অর্দ্ধাশনে, কোন দিন উপবাসে তাহাদের দিন কাটিতেছে, এ সময় যদি কেউ দয়া পরবশ হইয়া কিছু সাহায্য করে—সে দান গ্রহণ করিবে না? তবে কি উপবাস করিয়া মরিবে? সেজবৌ ক্ষেপিয়াছে নিশ্চয়! জিনিষ গুলি পূর্ব্বের মত গুছাইয়া সুশীলা লোকটিকে বলিল, "রমেশকে বলিও, সে রাজা হউক। ভগবান যা করিয়া হউক আমাদের দিন চালাইতেছেন। যখন চলিবে না, তখন আমরাই তাহার নিকট ভিক্ষা করিয়া লইব।" তাহার জা' গর্জ্জন করিতে করিতে চলিয়া গেল—"তোর দিন চলিবে মা, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেল্‌লি—তোর দিন চলিবে?" জিনিষ ও টাকা লইয়া লোকটি বিস্মিত ভাবে ধীরে ধীরে চলিয়া

গেল। এতগুলি নেবু ও কুল যাইতে দেখিয়া খুকী চীৎকার করিতে লাগিল। লোকটি চলিয়া যাইলে, সেজবউ টলিতে টলিতে নিজের ঘরে যাইয়া দ্বার বন্ধ করিয়া মেঝেয় উপর শুইয়া পড়িল।

গোপনে ছাত্র পড়াইয়া রমেশ এইকয়টি টাকা জোগাড় করিয়াছিল এবং গোপনে সেজবউয়ের নিকট পাঠাইয়া উৎকণ্ঠিত ভাবে লোকটির প্রত্যাবর্ত্তনের অপেক্ষা করিতেছিল। সে সেজবৌকে চিনিত। তাই সে ভয়ে ভয়ে প্রতি ঘণ্টা কাটাইতেছিল, হয়ত লোকটা জিনিষ সমেত ফিরিয়া আসে! তাহার আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইতে দেখিয়া রমেশ বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিল। যাহাদের সে প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাসে, তাহাদের সহিত তাহার এ সম্বন্ধ হইল কেন? ভগবান সেজবউদিকে ও খুকীকে সেকি আপনার বলিতে পাইবে না? অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া রমেশ জিনিষ ও টাকা বিলাইয়া দিল।

রমেশ বি, এ, পাশ করিয়াছে। তাহার বিবাহ হইয়াছে। বিবাহে রায়েরা নিমন্ত্রিত হয় নাই। রমেশের বউকে দেখিবার জন্য সেজবউ আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। সে আশা করিয়াছিল, এই আনন্দের দিনে, সেও হয়ত উপেক্ষিত হইবে না। কিন্তু হায়! কেহত তাহাকে একবারও বলিল না! সে আপনার মনে গুমরাইতে লাগিল। এত কাছে তাহারা—কিন্তু তবু কত কতদূরে।

স্বামীর মুখে সেজদি'র কথা শুনিয়া নূতন বৌ সুরমা একদিন তাহার ননদের কাছে, সেজবেউকে দেখিবার প্রস্তাব করিল। নূতন বৌয়ের আপার্দ্ধার কথা শুনিয়া, রমেশের মা, হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, "সে যদি পুনরায় সে ভ্রষ্টার প্রসঙ্গ মাত্র তাহাদের বাড়ীতে তোলে, তাহা হইলে তাহাকে বিদায় করিয়া দেওয়া হইবে। সেজবৌ কথাটা শুনিল। চোখের জল মোছা ব্যতীত তাহার অন্য উপায় ছিল না। সে কি করিবে? আজ কত দিন ধরিয়া সে কিরূপ ভাবে আপনার হৃৎপিণ্ড ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, রমেশের নিকট হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে, কি ভয়ঙ্কর দেবাসুরের সংগ্রাম, আজ সাত বৎসর ধরিয়া দিনরাত তাহার অন্তরে চলিতেছে, ভগবান ভিন্ন তাহা আর কে বুঝিবে?

বিজয়া দশমীর দিন অপরাহ্নে কলসী লইয়া সুশীলা সেনেদের খিড়কিতে জল আনিতে গেল। গঙ্গায় কাঁকড়া ও ডিম হওয়ায় বিধবারা সেজল পান করিত না। সান বাঁধান ঘাট। "বারুণীর" মত পরিষ্কার, সচ্ছ জল। সুশীলা

জল লইয়া চলিয়া আসিবে ভাবিয়াছিল। কিন্তু পরিচিত স্থানে যাইয়া দাঁড়াইবার জন্য তাহার প্রবল ইচ্ছা হইতেছিল। রাণায় জলপূর্ণ কলসীটি নামাইয়া সুশীলা স্থানটিকে দেখিতে লাগিল। পুরাতন পরিচিত স্থান সমুহ তাহাকে বিহ্বল করিয়া ফেলিল। বার চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বের কথা মনে হইতে লাগিল। এই সেই রাণা,—এইখানে তাহারা কত সন্ধ্যা গল্পগুজবে কাটাইয়াছে। কতদিন ঐ কামিনী কুঞ্জের তলায় সে, রমেশ ও পাড়ার অন্যান্য বালক বালিকা "দশ পঁচিশ", "গোলাম চোর" খেলিয়াছে। কি সুখেই সে সব দিন কাটিয়াছে! রমেশ তখন তাহার নিজস্ব সম্পূর্ণ আপনার। আর আজ—আজ সেই রমেশ—একটা বিলম্বিত দীর্ঘশ্বাস সুশীলার প্রাণ বায়ুটুকু লইয়া যাইতে চাহিল। সহসা তাহার অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। কেন—কেন—সে তাহাকে পাইবে না? সে নীরবে শত লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছে, কেন করিয়াছে? সে আর সহ্য করিবে না। রমেশকে আবার পূর্ব্বের মত আদর করিয়া বক্ষে তুলিয়া লইবে। পরের কথায় আপনার প্রাণ পর হইবে? নিজের পূর্ব্বের দুর্ব্বলতা স্মরণ করিয়া সেজবৌ নিজের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। এখনি সে সকলকার সাক্ষাতে রমেশের সহিত দেখা করিবে। যে যা বলে বলুক! সে কর্ণপাতও করিবে না! না, কিছুতেই না। কলসী লইয়া সেজবৌ সেনেদের বাড়ী পানে চলিল। রাণা ছাড়াইবার সময় মুখ তুলিয়া চাহিতেই—একি! একি! মনে হইল, পায়ের তলা হইতে যেন পৃথিবী সরিয়া যাইতেছে। সেজবৌ রাণার শেষাংটা ধরিয়া বসিয়া পড়িল। কলসীটি ভক্ ভক্ করিতে করিতে গড়াইতে লাগিল। ক্ষণেক পরে সেজবৌ অনুভব করিল কে যেন তাহার পায়ের তলায় পড়িয়া। সেই ত বটে! সেই ত বটে! সুশীলা চাহিয়া দেখিতে সাহস করিতে ছিল না। রমেশ আদৌ কথা কহিতে পারিতেছিল না। কতকগুলো কথা আসিয়া তাহার কণ্ঠরোধ করিয়াছিল। আপনাকে সামলাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কম্পিতকণ্ঠে সেজবউ বলিল, "যাও—যাও—এখনি কে দেখ্‌তে পাবে—বক্‌বে তোমায়।" রমেশের কণ্ঠ হইতে কেবল একটি "না" শব্দ বাহিরে আসিল। সেজবউয়ের বক্ষ মধ্যে কি ভয়ানক তরঙ্গভঙ্গ এখন। একটু পূর্ব্বে যাহাকে সে দেখিতে চাহিতেছিল—এখন সে এত কাছে, তবে কেন সে এরূপ হইয়া পড়িতেছে। কি ঘোর অন্তর্বিপ্লব। সেজবউ হাপাইয়া উঠিতে ছিল। প্রায় রুদ্ধশ্বাসে বলিল, "রায়েদের সম্মান রক্ষার জন্য, আমার সহিত তোমার দেখা করা উচিত নয়। কলসী লইয়া সেজবউ দ্রুত প্রস্থান করিল।

সেজবৌ কিছুতেই বিদ্রোহী মনটাকে বাগাইতে পারিতেছিল না। দশমীর সন্ধ্যায় খুকীকে লইয়া সে দ্বাররুদ্ধ করিয়াছিল—কিছুতেই খুলিল না। সমস্ত রাত্রি একটি বারও সে ঘুমাইতে পারিল না। কেবলি তাহার মনে হইতে লাগিল—এত দিনের পর দেখা! হায়, হায়, কি বলিতে সে কি বলিয়া আসিয়াছে। একাদশীর দিন সহস্র সহস্র গৃহকার্য্যের মধ্যেও সে আপনাকে লুকাইতে পারিল না। মনের সহিত যুদ্ধ করিয়া সে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিল। সন্ধ্যার সময় মাথায় ও পায়ে জল ঢালিয়াও কিছুতেই সে তাহার দারুণ পিপাসা দমন করিতে পারিতে ছিলনা। কোনরূপে রাত্রি কাটাইয়া, সকালে উঠিতে যাইয়া সে দেখে, তাহার শরীর অসম্ভব হাল্‌কা। পা ঠিক থাকিতেছে না। মাথা ভয়ানক ঘুরিতেছে! সেজবৌ পুনরায় বিছানায় শুইয়া পড়িল। জা'য়ের বিশেষ পীড়াপীড়িতে উঠিয়া কোনরূপে স্নান করিয়া আসিয়া রকে দাঁড়াইয়া চুল মুছিতেছে, এমন সময় গর্জ্জন করিতে করিতে সেন গিন্নি উপস্থিত।

বৈকালে কাপড় তুলিতে যাইয়া জনৈকা পরিচারিকা সুশীলা ও রমেশকে একত্র দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ছিল। একাদশীর দিন সেই কথাটাকে নানা-রূপে বিশেষিত করিয়া সেন গিন্নিকে কহিয়া, নিজের অদ্ভুত আবিষ্কারের জন্য নিজেই বাহবা দিতে লাগিল। উপবাস হেতু সেন গিন্নি একাদশীর দিন আসিতে পারেন নাই। দ্বাদশীর দিন সকাল করিয়া জলযোগ সারিয়াই রায়েদের বাড়ী উপস্থিত হইলেন। সুশীলাকে অকথ্য ভাষায় গালি দিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, সেজবৌ প্রতিদিন গোপনে গোপনে যে রমেশের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার ও নিজের সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহা ধর্ম্ম আপনিই জাহির করিয়া দিয়াছেন ইত্যাদি। শেষে মন্তব্য প্রকাশিত হইল, সেজবৌ বিধবার ধর্ম্ম বিগর্হিত একটা সর্ব্বনাশ না করিয়া থাকিবে না। সেজবৌ দুর্ব্বলতা হেতু কোনরূপে দাঁড়াইয়া এতক্ষণ মাথা পুঁছিতেছিল। অন্য দিন হইলে সে সব মিথ্যা অপবাদ অনায়াসে সহ্য করিতে পারিত। কিন্তু আজ দ্বাদশীর দিন সকালে এরূপ রূঢ় কথা শুনিয়া, সে আপনাকে ঠিক রাখিতে পারিল না। নিকটেই খুকী যাঁতা করিয়া কলাই ভাঙ্গিতে ছিল। সুশীলা তাহার উপর পড়িয়া গেল। মাথা কাটিয়া প্রবল বেগে রক্ত বাহির হইতে লাগিল। খুকীও সেজবৌয়ের জা' চীৎকার করিয়া উঠিল। চীৎকার শুনিয়া অন্যান্য সকলের সহিত রমেশও আসিল। সেজদি'কে এরূপ অবস্থায় দেখিয়া সে কাঁদিতে কাঁদিতে ডাক্তার ডাকিতে ছুটিল। বহুক্ষণ পরে যখন ডাক্তার আসিল, তখন

সেজবৌ অজ্ঞান। ডাক্তার দেখিয়া বলিলেন, "অবস্থা ভাল নয়, বড় জোর আধ ঘণ্টা। রমেশ বালকের মত কাঁদিতে লাগিল। সেজবৌ পড়িয়া যাইতেই সেনগিন্নি পলাইয়া ছিলেন। এখন রমেশকে আসিতে দেখিয়া ঝড়ের মত প্রবেশ করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, "রমা, চলে আয় বল্‌ছি—আয়।" মায়ের দিকে তাচ্ছিল্য পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রমেশ রোগীর মস্তক আপনার ক্রোড়ে তুলিয়া লইল। সেন গিন্নি ক্রুদ্ধা ব্যাঘ্রীর মত গর্জ্জন করিতে লাগিল। রোগীকে চাহিতে দেখিয়া সকলে আশা করিল—সে বাঁচিবে। ডাক্তার বলিলেন, "আর মিনিট কতক।" রমেশকে দেখিয়া সেজবউয়ের কপোল বহিয়া দুই একবিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। পাণ্ডুবর্ণ ওষ্ঠ একবার মাত্র কাঁপিয়া উঠিল। সেন গিন্নি এখনত হাঁকিতে ছিলেন, "রমা আয় বল্‌ছি—নইলে তোকে দূর করে দেব—আয়।" সেজবৌয়ের পা-দুটি ধরিয়া রমেশ চীৎকার করিয়া কাঁদিতে ছিল, "সেজদি'—দিদি—দিদি—ও দিদি।" সকলেই চক্ষু মুছিতে ছিল। মায়ের দিকে চাহিয়া রমেশ বলিল, "তাই দাও, তাই দাও,—কিছু চাইনি, তোমাদের কিছু চাই না।" একবার মাত্র রোগীর দেহ খানি কাঁপিয়া উঠিয়া সব স্থির হইয়া গেল।

সাধক-সঙ্গীত।

লেখক,—পণ্ডিত শ্রীশ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ বিরচিত।

ব্রহ্ম সাধনা।

ললিত ভৈঁরো—একতালা।

এক ব্রহ্ম ব্যাপ্ত চরাচর সর্ব্বরূপ ময়।
বিশ্বরূপে ভাব তাঁরে না কর সংশয়॥
হর হৃদে যেই কালী,
সেই ব্রজে বনমালী,
একাধারে কৃষ্ণকালী প্রভেদ না রয়॥
যেই বিধি বিশ্বধাতা,
সেই বিষ্ণু বিশ্বপাতা,

সেই প্রলয় বিধাতা হর গুণময়,—
যেরূপে মজ'না কেন,
সেই ব্রহ্ম রূপ জেন'.
প্রভেদ ভাবিয়ে যেন ভজ'নাক' তায়॥
মণিহার সূত্রে যথা,
এ বিশ্ব সংসার তথা,
সেই ব্রহ্ম-সূত্রে গাথা অন্যথা না হয়,—
ভেদ জ্ঞান পরিহরি
সেই ব্রহ্ম পদ তরী,
ভজ দিবা বিভাবরী, হবে ব্রহ্মে লয়॥

ভাগ্যচক্র।

লেখক,—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ।

বিলাতী গল্প।

(হার্লির কথা।)

আমাদের ষোড়শী সুন্দরী পাচিকা অলিন্দা যদিও দরিদ্রা, কিন্তু তাহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য্য ও লালিত্যে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইত যে, সে নিশ্চয়ই সুখের ক্রোড়ে শৈশব অতিবাহিত করিয়াছে। তাহার চম্পক কলির ন্যায় অঙ্গুলি গুলির দর্শনে বিশেষতঃ স্পর্শনে, স্বতঃই মনে হইত, শারীরিক শ্রমের সহিত তাহার কোন পরিচয়ই ছিল না। তাহার কথা বার্ত্তার সংযমতা ও প্রণালী তাহার ভদ্রবংশে জন্ম গ্রহণের সুস্পষ্ট পরিচয় প্রদান করিত। সে জাতিতে ফরাসী হইলেও, ইংরাজী ভাষায় তাহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। এমন কি মোজেসের স্বরলিপি ও রাগিণী সম্বন্ধে তাহার যে কিঞ্চিৎ অধিকার আছে, তাহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার ভগিনীর সঙ্গীত শিক্ষয়িত্রীকে সে পরিচয় একদিন সে দিয়া ফেলিয়াছিল।

যুবতী পাচিকার রূপলাবণ্য, শীঘ্রই আমার মত নব যুবকের অন্তরে একটা

গভীর রেখা অঙ্কিত করিয়াছিল। কিন্তু আমার মত বিত্তবান সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের পুত্রের একটা পাচিকার সহিত প্রণয়ের কথা শুনিলে, পাছে পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন বিরক্ত হন, এই ভয়ে আমার অন্তরের ইচ্ছা অন্তরেই গোপন রাখিতে হইয়াছিল। কিন্তু আমার অন্তরের মধ্যে সিংহাসন পাতিয়া বসিয়াছিল—ঐ অলিন্দা! আর আমার হৃদয়ের এই গুহ্য কথা কাহারও নিকট কিছুমাত্র প্রকাশ হইয়া থাকে, তবে তাহা ঐ অলিন্দার নিকট!

একদিন কি একটা খেয়ালের বশে আমি নীচে রান্নাঘরের উপরিস্থিত একটা বারান্দায় লইয়া ঘুরাইতেছিলাম, এমন সময় অকস্মাৎ পশ্চাৎ হইতে অলিন্দা ডাকিল, "মাষ্টার হার্লি!" আমি চমকিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিলাম, "কেন অলিন্দা কি?" সেই সময় আমি লক্ষ্য করিলাম, তাহার অশ্রু গোপনের চেষ্টা বিফল হইয়াছে, কেননা সযত্নে অপসারিত অশ্রুর স্থলে আবার নূতন অশ্রু দেখা দিয়াছে। অলিন্দা ভূতলপানে অবনত দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

আমি উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে বলিয়া উঠিলাম, "অলিন্দা—অলিন্দা তুমি কি আমায় উন্মাদ করিতে চাও? আমি শীঘ্রই দেখিতেছি উন্মাদ হইব।"

অলিন্দা ধীরে ধীরে বলিল, "সে কি মাষ্টার হার্লি, আমি তোমাদের দাসী, আমি কি তোমার যোগ্যা! ছিঃ মাষ্টার হার্লি, আমাকে ভাল বাসিয়া ভাল কাজ কর নাই।"

আমি তাড়াতাড়ি অলিন্দার নিকটে যাইতে ছিলাম, সে একটু দূরে গিয়া বলিল, "ভগবান তোমায় সুমতি দিউন মাষ্টার হার্লি।"

আমি বলিলাম, "অলিন্দা, অলিন্দা তোমার ঐ অসামান্য রূপ ও গুণ স্পষ্টই প্রমাণ দিতেছে, যে, তুমি দরিদ্রের বংশে জন্ম গ্রহণ কর নাই। মিস্ অলিন্দা সত্য বল, নয় কি?"

কম্পিতকণ্ঠে অলিন্দা বলিল, "অতীতের কথা ছাড়িয়া দাও, মাষ্টার হার্লি! বর্ত্তমানে আমি তোমাদের পাচিকা।" তাহার পর একটু থামিয়া, অবনত দৃষ্টিতে ধীরে ধীরে বলিল, "মাষ্টার হার্লি আমি শীঘ্রই বোধ হয়, বিবাহ করিব, আমি অন্যের পত্নী হইলে তুমি নিশ্চয় আমায় ভুলিয়া যাইবে মাষ্টার হার্লি! কল্য রবিবার, গীর্জ্জায় গিয়া তোমার জন্য প্রার্থনা করিব।"

আমি আবেগপূর্ণ স্বরে বলিয়া উঠিলাম, "মিস্ অলিন্দা, তুমি সত্য বল, তোমার ঐ নিষ্ঠুর হৃদয়ের এক কোণেও আমার জন্য এক বিন্দুও স্থান নাই—তুমি কি আমায় একটুও ভালবাস না?"

"ভালবাসি মাষ্টার হার্লি, কিন্তু শীঘ্রই তাহা ভুলিতে হইবে, কেননা আমি আর একজনকে ভালবাসিতে শিখিব।"

"না না মিস্ অলিন্দা তাহা হইবে না, আমি শীঘ্রই পিতামাতার সহিত স্বতন্ত্র হইয়া তোমায় বিবাহ করিব। আমি স্বোপার্জ্জিত ধনে তোমায় সুখী করিব।"

"উন্মাদের মত কথা কহিও না মাষ্টার হার্লি, ভগবান তোমায় সুমতি দিউন।" বিদ্যুৎ চমকাইয়া অলিন্দা চলিয়া গেল।

তাহার পর হইতে পিয়ার্সন নামে একটা দাঙ্গাবাজ যুবক প্রায়ই অলিন্দার নিকট যাতায়াত করিত। আমি বুঝিলাম, অলিন্দার সহিত পিয়ার্সনের বিবাহের স্থির হইতেছে। হায় হায়, অলিন্দার মত রমণী একটা পিশাচের অঙ্কলক্ষ্মী হইবে, ইহা আমার সহ্য হইল না। আমি পিতার নিকট পিয়ার্সনের যাতায়াতের কথা বলিয়া বলিলাম, "পিয়ার্সন অত্যন্ত দুশ্চরিত্র যুবক।" পিতা সেই দিন হইতে পিয়ার্সনের যাতায়াত বন্ধ করিয়া দিলেন।

(অলিন্দার কথা।)

আমি মাষ্টার হার্লিজের পাচিকা। আমার জন্মভূমি ফ্রান্স। ফ্রান্সের সহরে পিতা একজন সমৃদ্ধিশালী ব্যবসায়ী ছিলেন। আমি বেশ সুখ সচ্ছন্দেই পিতামাতার সহিত শৈশব অতিবাহিত করিয়াছিলাম। আমার বয়স যখন আন্দাজ একাদশ তখন হইতে কতকগুলি দুশ্চরিত্র লোকের সহিত পিতার আলাপ হয়। দুই তিন বৎসরের মধ্যেই পিতা দারুণ মাতাল হইয়া পড়িলেন, তাঁহার ব্যবসায় মাটী হইল। যাহা কিছু ধন সম্পত্তি ছিল, তাহা জুয়ায় ও মদে নিঃশেষিত হইল। এই সময় মনস্তাপে আমার জননী দুরারোগ্য ক্ষয়রোগে প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহার কয়েকদিন পরেই পিতা আমার পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করিলেন। মৃত্যুকালে আমার জন্য তিনি যে পত্র রাখিয়া যান তাহাতে জানিলাম, তত্রস্থ কোনও সম্ভ্রান্ত ধনবানের নিকট আমাকে আশ্রয় লইতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তখন আমার বয়স চতুর্দ্দশ।

পিতার আদেশ অনুযায়ী আমি সেই ধনবানের আশ্রয়প্রার্থী হইলাম, তিনিও আমায় সাদরে আশ্রয় দান করিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই আমি বুঝিলাম, আমার আশ্রয় দাতার স্বভাব চরিত্র ভাল নয়। আমার স্বর্গীয়া জননী মৃত্যুকালে গোপনে আমাকে ৫০০ পাঁচশত ফ্রাঙ্কের নোট ও তাঁহার ৪ চারিখানি

অলঙ্কার দিয়া গিয়াছিলেন। অলঙ্কার চারিখানির মুল্য দশহাজার ফ্রাঙ্কের কম নয়! কিন্তু অলঙ্কার কয়খানি বিক্রয় করিবার কল্পনাও কখন আমি করি নাই—কেননা সেগুলি আমার জননীর শেষ চিহ্ন। আজিও আমি তাহা সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছি। ইচ্ছা আছে জীবনের শেষ দিনে অলঙ্কারগুলি আমার পুত্র কন্যাগণকে দিয়া যাইব।

তখন আমার বয়স পঞ্চদশ পূর্ণ হয় নাই,—আমি বালিকা বলিলেই হয়, আমার সেই কৈশরেই আমার আশ্রয় দাতা আমার প্রতি এত অত্যধিক আদর যত্ন দেখাইতে লাগিলেন, যে তাহা আমার আদবেই পছন্দ হইত না। অবশেষে একদিন তিনি তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। নিজের ধর্ম্মরক্ষা করিতে, বাধ্য হইয়া আমার জননীর শেষ দান পাঁচশত ফ্রাঙ্কের নোটখানি ভাঙ্গাইলাম। তাহার পর অতি গোপনে, আমি জন্মভূমি ফ্রান্সদেশ ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে পলাইয়া আসিলাম। আসিবার সময় পথে এক ইংরাজ মহিলার সহিত আলাপ হইল। তাঁহারই সাহায্যে আজ দুই বৎসর আমি হার্লি পরিবারে পাচিকার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আছি।

কাজকর্ম্মের মধ্যে হার্লি পরিবারে বেশ নিরুপদ্রবে আমার দিন গুলি কাটিয়া যাইতেছিল। কিন্তু অধিক দিন এমন নিশ্চিন্তে কাটাইতে পারিলাম না। কেননা আমার মনিবের একমাত্র যুবক পুত্র আমার প্রতি একান্ত আগ্রহ পূর্ণ দৃষ্টিতে মধ্যে মধ্যে চাহিয়া থাকে, ইহা আমি বেশ লক্ষ্য করিয়াছি। তবে মাষ্টার হার্লির চালচলনে বোধ হয়, সে আমায় যথার্থই ভালবাসে। তাহার দৃষ্টির ভিতর যে আকর্ষণ তাহা পবিত্র ভিন্ন অপবিত্র হইতেই পারে না।

সে দিন আমাকে নির্জ্জনে পাইয়া মাষ্টার হার্লি আমায় জিজ্ঞাসা করিল, "অলিন্দা, তুমি আমায় ভালবাস কি?" মাষ্টার হার্লি কর্ত্তৃক আমি যে এরূপ ভাবে জিজ্ঞাসিত হইতে পারি, এমন কল্পনা আমি কখনও করি নাই। আমি ভাবিয়া দেখিলাম, ঘটনা আর একটুমাত্র অগ্রসর হইলে, তাহার ও আমার উভয়েরই সমূহ বিপদ। কেননা মাষ্টার হার্লি যদি আমায় বিবাহ করে, তবে সে তাহার পিতামাতার বিরাগভাজন আর আত্মীয় স্বজনের কাছে হাস্যাস্পদ হইবে। আর আমার প্রতি তাহার প্রণয়ের কথার কণামাত্রও প্রকাশ হইলে, আমায় এমন আশ্রয়টী হারাইতে হইবে। আমার জন্য আমি ততটা ভাবি না, যতটা মাষ্টার হার্লির জন্য আমার ভাবনা! সুতরাং সেদিন আমি মাষ্টার হার্লিকে আমাদের অবস্থার তারতম্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া ভাবিলাম,

সে বুদ্ধিমান যুবক, ভবিষ্যতে বুঝিয়া চলিবে। কিন্তু সেই দিন হইতে আমাকে একা পাইলেই আমি তাহাকে ভালবাসি কিনা, এবং তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত কিনা, ইহার স্পষ্ট উত্তর সে চায়।

আমি মাষ্টার হার্লিকে ভালবাসি—খুবই ভালবাসি, তাই যাহাতে তাহার কোনও অনিষ্ট না হয়, তাহার উপায় স্থির করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলাম। প্রত্যহ প্রার্থনার সময় আমি একান্ত মনে প্রার্থনা করিতাম, "দয়াময়, আমাদের পরস্পরের অন্তর হইতে পরস্পরকে সরাইয়া দাও।" অবশেষে মাষ্টার হার্লির মঙ্গলের জন্য আমি শীঘ্রই অন্যত্র কোথাও বিবাহ করিব, স্থির করিলাম। হার্লি পরিবারের সহিত সংস্রব ত্যাগ আমার একান্ত কর্ত্তব্য হইয়া পড়িল।

ঘটনাক্রমে চাওয়ালা মিষ্টার পিয়ার্সনের সহিত আমার আলাপ হইল। কেহ কেহ বলিত, কিছু অর্থ থাকিলে কি হয়, লোকটা তেমন ভাল নয়, বিশেষতঃ দাঙ্গাবাজ বলিয়া তাহার একটা বদনাম ছিল। কিন্তু তাহার সরল কথাবার্ত্তায়, আমার মনে হইত সে লোক মন্দ নয়। বিশেষতঃ আমাদের প্রথম পরিচয়েই তাহার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছিলাম। একদিন একটা লোক বিরল পথের মধ্যে সে একটা দুর্দ্দান্ত মাতালকে দুই ঘুষি দিয়া আমাকে দারুণ অপমানের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিল। সেই আমাদের পরিচয়ের সূত্রপাত। সে দিনে তাহার ঘুসীর সেই সদ্ব্যবহার দেখিয়া, আমার কেমন একটা ধারণা হইয়াছিল, যে আমার মত দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচারের দমন করিতে গিয়াই সে দাঙ্গাবাজ আখ্যা পাইয়াছে। যাহা হউক, আমার মাষ্টার হার্লির মঙ্গলের নিমিত্তই আমি এই পিয়ার্সনকে বিবাহ করিতে মনস্থ করিলাম। কিন্তু মাষ্টার হার্লির চাতুরীতে আমাদের বাটীতে পিয়ার্সনের যাতায়াত বন্ধ হইল। আমি কিন্তু অবসরমত মধ্যে মধ্যে নিকটস্থ পার্কে গিয়া পিয়ার্সনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতাম।

হার্লি পরিবারের বসতবাটী, সেই গ্রামের মধ্যে ছিল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমার মনিব, মাষ্টার হার্লির পিতা ছিলেন, সেই গ্রামের প্রধান ব্যক্তি, তাঁহার বংশ পরম্পরায় উপাধি ছিল, "স্কোয়ার।" তাঁহার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গোলাঘর সুবিস্তৃত আবাদী জমী, গৃহপালিত অসংখ্য পশু পক্ষী, শস্য পিষিবার চার পাঁচটী সুবৃহৎ কল তাঁহার প্রধানত্বের পরিচয় প্রদান করিত। ইহার অধিকারীও সদাশয় ব্যক্তি বলিয়া সকলের নিকট সুপরিচিত ছিলেন।

সেদিন রবিবার। স্কোয়ার হার্লির সহিত বাটীর সকলেই গীর্জ্জায়

গিয়াছে। রবিবার প্রাতে গীর্জ্জায় যাওয়া সম্বন্ধে আমার মনিব বিশেষ কড়া ছিলেন। এমন কি গ্রামের প্রত্যেক নর-নারী যাহাতে সপ্তাহের এই দিনটীতে প্রার্থনায় যোগ দেয়, সে বিষয় তাঁহার কড়া হুকুম ছিল। কেবল আমাদের বাটীতে একজনমাত্র লোক থাকিত, বাটী পাহারা দিবার জন্য। সেদিন গোপনে পিয়ার্সনের আমার সহিত সাক্ষাতের বন্দোবস্ত ছিল বলিয়া আমি অসুখের অছিলায় গীর্জ্জায় যাই নাই। পল্লী প্রায় জনশূন্য। এমন সময় পিয়ার্সন হাসিতে হাসিতে আমাদের বাটীতে উপস্থিত হইল। আমি তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলাম।

আমি চা ও নানারূপ মিষ্টান্ন আনিয়া তাহার পার্শ্বে বসিয়া নানারূপ কথাবার্ত্তার সহিত উহাদের সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণ পরে সহসা পিয়ার্সন উঠিয়া পশ্চাৎ হইতে আমার গলা টিপিয়া ধরিয়া বলিল, "অলিন্দা, যদি তুমি তোমার প্রভুর অর্থ কোথায় আছে দেখাইয়া দাও, তবেই তোমায় ছাড়িব, নচেৎ এই বৃহৎ ছুরী তোমার বুকে আমূল বসাইয়া দিব।" সত্যই প্রকাণ্ড একটা ছোরা আমার বক্ষের সম্মুখে উদ্যত করিল। আমি তখন কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়! ঘটনাটা এতই অকস্মাৎ এবং কল্পনার অতীত, যে তখনও আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই, যে ঘটনাটা প্রকৃত না আমি একটা ভয়াবহ স্বপ্ন দেখিতেছি। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে যখন আমার মুখে স্বর বাহির করিতে পারিলাম, তখন বলিলাম, "পিয়ার্সন, তুমি কি আমার সহিত পরিহাস করিতেছ?" "মানুষ এরূপ পরিহাস করে না, যদি নিজের জীবনের প্রতি একটুও মমতা থাকে তবে শীঘ্রই তোমার প্রভুর অর্থ কোথায় আছে দেখাইয়া দাও। জানিও আমি আর এক মুহূর্ত্ত সময় অপব্যয় করিতে পারি না।"

আমি পিয়ার্সনের করতলগত। একটু ইতস্ততঃ করিলে, সে আমার বক্ষে ঐ উদ্যত সুতীক্ষ্ণ ছোরাখানা বসাইয়া দিবে। মুহূর্ত্ত মধ্যে আমি সকল দিক একবার ভাবিয়া লইতে চেষ্টা করিলাম। তখন রবিবারের প্রাতঃকাল পল্লী জনশূন্য! অন্যূন দুইঘণ্টা কেহই এদিকে আসিবে না; সুতরাং চীৎকার করিয়া কোন ফল নাই। পুনরায় কঠোরস্বরে পিয়ার্সন বলিল; "অলিন্দা শুনিতেছ, তোমার সুখের জন্যই, আমি তোমার প্রভুর অর্থ চাই।"

হায় আমার সুখ! তোর মত পিশাচের সহিত স্বর্গে গিয়াও আমি সুখী হইতে চাই না। ভগবান, ভগবান, আমার জীবন ও আমার প্রভুর সম্পত্তি রক্ষা কর।

"অলিন্দা, অলিন্দা,—যদি ভবিষ্যতে সুখী হইতে চাও, তবে চট্ করিয়া তোমার প্রভুর সম্পত্তি কোথায় আছে দেখাইয়া দাও। আমার জন্য নয়, তোমার সুখের জন্যই আমি এমন কাজে হাত দিয়াছি। আমার অর্থ, তোমার প্রভুর অর্থ একত্র করিয়া তোমায় লইয়া এমন দূরে চলিয়া যাইব যে, কেহ আমাদের সন্ধান পাইবে না। সমস্ত বন্দোবস্ত আমি ঠিক করিয়া রাখিয়াছি।"

চট্ করিয়া আমার মাথায় একটা ফন্দী আসিল। আমি বলিলাম, "প্রিয় পিয়ার্সন, আমি তোমায় ভালবাসি, সেই ভালবাসার খাতিরে আমি সব করিতে পারি। তুমি যদি প্রতিজ্ঞা কর, আজীবন তুমি আমায় ত্যাগ করিবে না, তাহা হইলে শুধু অর্থের সিন্দুক দেখাইয়া নিশ্চিন্ত হইব না, ঐ অর্থ অপহরণে বিধিমতে তোমায় সাহায্য করিব।"

"নিশ্চয় নিশ্চয়" বলিতে বলিতে একমুখ হাসি লইয়া, সে আমায় চুম্বন করিতে অগ্রসর হইল। আমি ঘৃণায় দুই তিন পদ পশ্চাতে হটিয়া আসিতে আসিতে বলিলাম, "ইহার জন্য প্রচুর সময় আছে,—এখন শীঘ্র শীঘ্র কাজ সারিয়া লও।"

"এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা কর," বলিয়া একটা বড় গ্লাসে এক গ্লাস মদ্য ঢালিয়া পান করিয়া বলিল, "চল, ঈশ্বর আমাদের মঙ্গল করুন।" এমন পাপ কার্য্যে এই মহাপাপীর মুখে পবিত্র নামের দোহাই শুনিয়া, সেই ঘোর উৎকণ্ঠার সময়ও আমি না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না।

প্রভুর সম্পত্তি যে সিন্দুকের মধ্যে, তাহা আমি পিয়ার্সনকে দেখাইয়া বলিলাম, "কুঠার ভিন্ন ত ইহা ভাঙ্গিবার উপায় নাই। তুমি অপেক্ষা কর, আমি শীঘ্র একটা কুঠার লইয়া আসিতেছি" বলিয়া আমি সে কক্ষ ত্যাগ করিলাম। সম্মুখে বারান্দার জালানা দিয়া দেখিলাম, পল্লী জনশূন্য। কেবল অদূরে পথের উপর আমাদের মালীর দশ বৎসরের পুত্রটী লাটিম লইয়া খেলিতেছে। একটা কুঠার হাতে করিয়া আবার দ্রুতপদে ফিরিলাম। দেখিলাম পিয়ার্সন একটা লৌহশলক লইয়া সিন্দুকের ফাঁকটার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া চাড় দিতেছে। সে খুবই ব্যস্ত। আমি সেই দরজার উপর পা দিতেই, আমার দিকে না চাহিয়া বলিল, "কুঠার আনিয়াছ, দাও।" আমি মুহূর্ত্তের মধ্যে দরজার বাহিরে আসিয়া দরজা টানিয়া দিয়া, চাবি ঘুরাইলাম। পরক্ষণেই পিয়ার্সনের দরজা টানিয়া খুলিবার বৃথা চেষ্টার সহিত তাহার ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম, "সয়তানী অলিন্দা—বিশ্বাস ঘাতকতা! শীঘ্র দরজা খুলিয়া

দে।" আমি ক্রোধে চীৎকার করিয়া বলিলাম "দুষ্ট দস্যু! কে পূর্ব্বে বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়াছে, আমি না তুই?"

তাহার পর আর তাহার প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বাহিরে আসিয়া, অদূরে পথের উপর ক্রীড়ারত সেই বালককে চীৎকার করিয়া বলিলাম, "দৌড়িয়া গীর্জ্জায় যাও, আমাদের বাটীতে ডাকাত আসিয়াছে" বালক খেলা ছাড়িয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আমি আবার বলিলাম, "দেরী করিও না, শীঘ্র যাও, বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছে।" বালক গীর্জ্জাভিমুখে ছুটিল।

অকস্মাৎ বাটীর ভিতর হইতে তীব্র বংশীধ্বনি শুনিতে পাইলাম। তাহার পরই পিয়ার্সন চীৎকার করিয়া কাহাকে বলিতেছে, "ঐ বালককে ধর।" আমি দরজার উপর হইতে দেখিলাম, তৎক্ষণাৎ একটা বৃক্ষের অন্তরাল হইতে একটা লোক বাহির হইয়া, গীর্জ্জাভিমুখে ধাবিত বালককে ধরিয়া আমাদের বাটীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। আমি তাড়াতাড়ি বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম। তখন ভিতর হইতে পিয়র্সনের আর বাহির হইতে তাহার সঙ্গীর ক্রুদ্ধ তর্জ্জন গর্জ্জন আমার অন্তরে দারুণ ভয় সঞ্চার করিতে লাগিল। ভিতরে বাহিরে শত্রু, মধ্যে কেবলমাত্র এক একটা দরজার ব্যবধান! এই দুইটা ব্যবধানের একটাকে কোনও ক্রমে সরাইয়া ফেলিতে পারিলে, মুহূর্ত্ত মধ্যে আমার জীবন ও প্রভুর সম্পত্তি দস্যুদের হস্তগত হইবে। একমাত্র ক্ষীণ আশা যদি পল্লীবাসী কেহ সত্বর গীর্জ্জা হইতে ফিরে।

রবিবার শস্য পিষিবার কল চলেনা। আমি ভাবিলাম, আজ যদি অকস্মাৎ কল চালাইয়া দিই, তাহা হইলে, বোধ হয় কলের ঘর্ঘর শব্দ গীর্জ্জা পর্য্যন্ত পঁহুছিতে পারে। তখনই আবার মনে হইল, কলঘরে রাস্তার দিকে প্রকাণ্ড একটা গর্ত্ত আছে, বাহিরের লোক গর্ত্তের মধ্য দিয়া কলঘরে আসিয়া, কলের সুবৃহৎ চাকার উপর দিয়া উপরে উঠিয়া, বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। বাহিরের দস্যুটা যদি তাই করে! আমি সাহসে ভর করিয়া একটা গবাক্ষ দিয়া বাহিরের দিকে দেখিলাম। কি দেখিলাম,—বাহিরের দস্যুটা রজ্জুদ্বারা সেই সুকুমার বালকের হস্তপদ আবদ্ধ করিয়া কলঘরের দিকে চলিয়াছে। আর পিয়ার্সন উপরের গবাক্ষ হইতে বলিতেছে "ঐ দিকে—ঐ দিকে।"

আমি ছুটিলাম, কলঘরের দিকে ছুটিলাম! যথা সম্ভব শীঘ্র কলঘরে প্রবেশ করিয়া কল চালাইয়া দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যকণ্ঠ নিঃসৃত কাতর চীৎকার

চক্রের ঘর্ঘর শব্দের সহিত চতুর্দ্দিকে নিনাদিত হইতে লাগিল। তখন চাকার প্রতি চাহিয়া দেখি, চক্র সবেগে ঘুরিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে ডাকাইতটাও চক্র ধরিয়া ঘুরিতেছে। আর এক মিনিট বিলম্ব হইলেই সমস্ত পণ্ড হইয়া যাইত। আমি প্রাণ খুলিয়া ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে সবেগে হ্যাণ্ডেল ঘুরাইতে লাগিলাম, আর চক্রের সহিত ঘুর্ণিত দস্যুর উৎকণ্ঠাপূর্ণ চীৎকার শুনিতে লাগিলাম। প্রথম শাসন, তৎপরে গর্জ্জন, তারপর প্রলোভন প্রদর্শন। নানাপ্রকার ডাকাতটা আমাকে কল থামাইতে অনুরোধ করিতে লাগিল। ক্ষণে ক্ষণে প্রাণনাশের আশঙ্কায় তাহাকে মুহ্যমান করিয়া ফেলিতেছিল। আমি তাহার অনুনয়ে কর্ণপাত করিলাম না। কেবল মাত্র মাষ্টার হার্লি ও তাহার পিতা মাতার প্রতীক্ষা করিয়া কল চালাইতে লাগিলাম।

কতক্ষণ এমন ভাবে কাটিয়াছিল, আমার ঠিক স্মরণ নাই। তবে যখন বাহির দরজায় ঘন ঘন আঘাত এবং হার্লি পরিবার ও ভৃত্যবর্গের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম, তখন যেন উড়িয়া কলঘর হইতে বাহিরে আসিয়া সদর দরজা খুলিয়া দিয়া, "ভিতরে ডাকাত, কলঘরে ডাকাত বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম।"

(হার্লির কথা।)

মিস্ অলিন্দা যেমন সুন্দরী, তেমনই বুদ্ধিমতী। বেচারা নিজের জীবনের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া আমাদের সম্পত্তি রক্ষা করিয়াছে। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, অলিন্দা ছাড়া আর কাহাকেও বিবাহ করিব না।

সান্ধ্য ভোজনের পর, চেয়ারটা পিতার চেয়ারের নিকট একটু সরাইয়া লইয়া বলিলাম, "অলিন্দা যেমন সুন্দরী, তেমনই বুদ্ধিমতী। লেখা পড়াও সে বেশ জানে। সঙ্গীত বিদ্যায়ও সে বিশেষ পারদর্শী।"

পিতা গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "হইতে পারে।"

আমি বলিলাম, "আমি তাহাকে বিবাহ করিব।"

পিতা নিশ্চিন্ত ভাবে বলিলেন, "অলিন্দা পাচিকা।"

আমি বলিলাম, "অলিন্দাকে দেখিয়া কি আপনার বোধ হয় না যে, সে কোন ভদ্রঘরে জন্মিয়াছে?"

"হইতে পারে, এ বিষয় তোমার জননীর সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করিও। তোমার গর্ভধারিণীর মত হইলে, আমার কোন বাধা নাই।" পিতা

আর কোন কথা কহিলেন না। আমিও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। কারণ আমি জানিতাম, আমার জননী আমার সুখের পথে কণ্টক হইবেন না। বিশেষ তিনি আবার অলিন্দার রূপ গুণের পক্ষপাতিনী ছিলেন।

যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই হইল। মাতা আমার সানন্দে এই বিবাহ অনুমোদন করিলেন।

(হার্লি ও অলিন্দার কথা।)

হার্লি। আমার প্রাণময়ী অলিন্দা।

অলিন্দা। কি মাষ্টার হার্লি?

হার্লি। ছিঃ এখনও মাষ্টার হার্লি!

অলিন্দা। আমি তোমায় "মাষ্টার হার্লি" বলিব।

হার্লি। আমি তোমায় আমাদের "রক্ষাকারিণী দেবী" বলিয়া ডাকিব।

অলিন্দা। আমি তোমায় আমার "প্রিয়তম হার্লি" বলিব।

হার্লি। আমি তোমায় "আমার চির প্রিয়তমে অলিন্দা" বলিব। কেমন আমারই জয়! হাঃ হাঃ হাঃ।

অলিন্দা। আমি যখন তোমারই; আর তুমি যখন আমারই! তখন তোমার জয় আমারই জয়।

হার্লি। এইবার আমার পরাজয় অলিন্দা! হাঃ—হাঃ—হাঃ। হিঃ —হিঃ—হিঃ। হোঃ—হোঃ—হোঃ!

—•—

আশা।

লেখক,—ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য M. B.

জীবন ভরে ডেকেছি কত,
তুমিও ত সবারই মত,
ডাকিলে ফিরে এসোনা।

তুমি বলেছ আসিবে বলে,
আমি আছি আশা পথ চেয়ে;
তুমি ত ফিরে এলেনা।

তুমি বলেছ যাইবে লইয়া,
আমি রেখেছি সুরটা বাঁধিয়া,
তুমি ত লয়ে গেলেনা।

এখনো এলে, বাঁচ্‌বে পরাণ,
গেয়ে যাও স্নেহ-প্রীতির গান,
(না হ'লে) আর ত আমি ডাক্‌ব না।

—•—

ধনাগমের সহজ উপায়।

(By S. K. Banerji, Ph. D. Sc, F, I, A, Sc; Dip in Mining & Prospecting (Landon), Dip in Divinity (Benares) etc, etc,

সৌভাগ্যার্জ্জনের সুগম পন্থা নাই, ধন উপায় করা সহজ-সাধ্য নহে। যাহারা চতুর, শিল্পী, মিতব্যয়ী, এবং বুদ্ধিমান, তাহারাই ধনার্জ্জন করিতে পারে। ধনার্জ্জন নির্ব্বোধের ক্রীড়া নহে।

যদি আপনারা ধনার্জ্জন করিতে চাহেন, যদি আপনারা সৌভাগ্য লাভ করিতে চাহেন, তাহা হইলে প্রথমেই আপনাদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে, কি করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়। এইরূপে ব্যবসা, জীবিকা বা পরিশ্রম দ্বারা কিঞ্চিৎ উপায় করিতে শিখিলে আপনাদের আয়ের কতক অংশ সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করুন। কেবল মাত্র সঞ্চয়েই অনেক দীনকে ধনী করিতে পারিবে ইহা নিশ্চিত, বিনা সঞ্চয়ে আপনি ধনী হইতে পারিবেন না। সঞ্চয় বিদ্যাই কৃতকার্য্যতার প্রথম সোপান। সঞ্চয়ের অভ্যাস না করিলে আপনারা ধনী হইতে পারিবেন না। যদি আপনারা স্বনামধন্য বড়লোকদের জীবন চরিত পাঠ করেন, তাহা হইলে দেখিবেন, কিরূপ মিতব্যয়ী হইয়া তাঁহারা তাঁহাদের প্রথমাবস্থায় ধনার্জ্জন করিয়াছিলেন। জগতের প্রসিদ্ধ ধনীশ্রেষ্ঠ জন ডি রকফেলার বলেন,—"আমি আমার প্রথমাবস্থায় অত্যন্ত মিতব্যয়ী ছিলাম এবং এখনও তাহাই আছি।"

ইহা বাস্তবিকই অর্থনীতির একটী সমস্যা যে, মনুষ্যসমহ তাহাদের দৈনিক বেতন বা প্রাপ্য হইতে ধনী হয় না। যদি আপনারা ধনার্জ্জন শীঘ্র এবং নিরাপদ পন্থায় করিতে চান, তাহা হইলে সঞ্চয় করিতে শিক্ষা করুন এবং এরূপ ভাবে সঞ্চয় করুন,—যাহাতে আপনি অভীপ্সিত ফললাভ করিবেন। ইহা করিতে হইলে শিক্ষা করিতে হইবে কিরূপে স্বল্প কিম্বা বেশী অর্থ আরও অর্থ উৎপাদন করিতে হইবে। তারপর আপনারা বিভিন্ন পন্থার মধ্যে নিজোপযোগী পন্থা বাছিয়া লইতে পারিবেন।

আমেরিকার সর্ব্বাপেক্ষা মিতব্যয়ী বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন এক সময় বলিয়াছিলেন, "টাকায় টাকা উৎপাদন করে এবং এই উৎপন্ন টাকা আরও টাকা উৎপাদন করে।" কেবল মজুরীতে আপনাদিগকে অধিক অর্থ প্রদান করিবে না বা আপনারা ধনী হইতে পারিবেন না। ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, টাকা অপেক্ষা পরিশ্রম বেশী উৎপন্ন করিতে পারে না। টাকার উৎপাদিকা শক্তিই বেশী। পরের জন্য পরিশ্রম করিয়া কেহই ভাগ্য-লক্ষ্মীর অনুগ্রহ লাভ করিতে পারে নাই। কোন ব্যবসা, স্থাপত্য বিদ্যা বা ইঞ্জিনিয়ারিং, কৌশল এবং পরিশ্রম অপেক্ষা টাকার উৎপাদিকা শক্তি এবং অর্জ্জন শক্তি অত্যন্ত অধিক। একবার কেহও কোন লোক জানিতে চাহিয়াছিল, কি করিয়া ইংলণ্ডের ধনকুবের লর্ড রথচাইল্ড কোটী কোটী টাকা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ধনকুবের উত্তর দিয়াছিলেন, "কে বলিল, আমি কোটী কোটী টাকা অর্জ্জন করিয়াছি; আমি কোটী কোটী টাকা অর্জ্জন করি নাই, আমি কয়েক হাজার মাত্র অর্জ্জন করিয়াছিলাম এবং তাহারাই কোটী কোটী করিয়াছে।"

আমাদিগকে অর্থোপার্জ্জন করিতে হইলে কিঞ্চিৎ বা অধিক সঞ্চয় আমাদিগকে করিতেই হইবে। ক্ষণভঙ্গুর জীবনকালে কেবল সঞ্চয়েই আমাদিগকে ধনী করিতে পারিবে না। সঞ্চয় ধনাগমের প্রথম সোপান। কিঞ্চিৎ অর্থোপায় হইলে আপনারা অর্থ কিরূপে খাটাইবেন, তাহা চিন্তা করিতে হইবে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের তৈল খনির রাজা জন ডি রকফেলার বলেন, "টাকা যেখান হইতে উৎপন্ন হইবে, সেইখানেই স্থাপন কর, টাকাকে তোমার ক্রীতদাস কর, এবং তুমি যখন নিদ্রা যাইবে, তখন ইহা তোমার জন্য উপায় করিবে।" আর্থার ব্রিসবেন বলেন, "অর্থ টাকার আকারে পরিশ্রম, সুতরাং যে মনুষ্য অর্থ উপার্জ্জন করে, তাহার অর্থকে কার্য্যে এবং উপার্জ্জনে নিযুক্ত রাখা উচিত। তালা বন্ধ এবং লুক্কায়িত অর্থ জেলবদ্ধ মনুষ্যের ন্যায় নিরর্থক।"

আমেরিকার প্রসিদ্ধ ধনা মহিলা শ্রীমতী হেটী গ্রীন বলেন, "আমি রীতিমত মূলধন খাটাইয়া ধনী হইয়াছি, দালালীতে ধনী হই নাই—কেবলমাত্র নির্ব্বোধেরাই দালালী করে।" শ্রীমতী গ্রীন সম্ভবতঃ জগতের মধ্যে একমাত্র এরূপ ধনী যে, তিনিই তাঁর ছেলেদের ক্রীড়ার জন্য সমস্ত রেলওয়ে খরিদ করিতে পারেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে টেক্সাস মিডল্যণ্ড রেল বোর্ডের সমস্ত দামের এক চেক নিউইয়র্ক ব্রডওয়ের কেমিকেল ন্যাসন্যাল বাঙ্কের বরাবর তাঁহার পুত্রকে দিয়াছিলেন। শ্রীমতী গ্রীণের অতুল বিভব আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সর্ব্বত্র গিয়াছে এবং আরও বিভব আনয়ন করিতেছে। আমেরিকানদের মত কোন জাতি ধনী নাই, ধনকুবেরেই দেশ পরিপূর্ণ। আমেরিকা কমলার লীলাভূমি। "আমাদের দেশের প্রসিদ্ধ ধনী কয়লা খনির রাজা শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কিরূপে ধনার্জ্জন করিয়াছেন, তাহাও প্রকাশিত হইবে। মূলধন ভিন্ন ধনাগম হয় না, ধার দিয়া, দালালি করিয়া এবং জুয়া খেলিয়া প্রকৃত ধনাগম হয় না।

দেবী।

সঙ্গীতাচার্য্য—শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ সরস্বতী।

ঘুমাও ঘুমাও দেবি!—নিদ্রার দেবতা
দিয়ে যাক্ দীর্ঘ ক'রে মধুর অতলে
তব আঁখি-পাতে! তব ফুল্ল তনু-লতা
ধরায় দিয়াছে ঢালি নয়ন-রঞ্জন
লাবণ্য-কুসুম তার—তবু অগোচরে!
সৌরভে গিয়াছে ভরি আজি দশ-দিশি!
আসিয়া প্রমত্ত অলি তব মধুতরে—
বহুক তোমারে ঘিরি আজি সারানিশি।
আলোক অনিল নীর বিনা আর কেহ
সাহস করেনি এই ধরণীর তলে—

পূর্ণভাবে পরশিতে তব বর দেহ—
স্বর্গভ্রষ্টা দেবী তুমি কার শাপ ফলে!
মানবী হয়েও ধরা নহে তব গেহ—
দেহ বরমাল্য তুমি মরণের গলে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

মণ্ডলেশ্বর রাজর্ষি—শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য মোহন রায় চৌধুরী।

জন্ম—২৫এ জানুয়ারী ১৮২৪, যশোহর সাগরদাঁড়ী।
মৃত্যু—২৯ জুন ১৮৭৩, কলিকাতা দাতব্য চিকিৎসালয়।

সুবিখ্যাত কবি মাইকেল মধুসূদনদত্তের জীবনের ইতিহাস অপূর্ব্ব শিক্ষাপ্রদ। প্রতিভা যতই সমুজ্জল হউক, আত্ম-সংযম না থাকিলে তাহার পরিণাম যে কিরূপ শোচনীয় হইতে পারে, ঐ ইতিহাস হইতে তাহা সর্ব্ব-সাধারণে শিক্ষা করিতে পারেন। মনুষ্য যতই বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হউন, ধর্ম্মভাব ব্যতীত যে জগতে শান্তির আশা নাই, মাইকেলের জীবন তাহারও দৃষ্টান্ত-স্থল। যাঁহারা প্রতিভার অভিমানে ধর্ম্মের ও নীতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, এবং নিজের সুখ কিম্বা স্বার্থের জন্য আত্মীয় স্বজন ও সমাজের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন, তাঁহারা যেন মধুসূদনের পরিণাম হইতে জ্ঞান লাভ করেন। তরুণ বয়সে নীতি শিক্ষার ও সদুপদেশের অভাবে এতদ্দেশের কত প্রতিভাবান যুবক কিরূপ চরিত্রহীন ও আচার-ভ্রষ্ট হইতেছেন, তাঁহার জীবন হইতে সকলেই তাহা অনুমান করিতে পারেন। মধুসূদনের উন্মার্গগামী স্বদেশীয়গণের পরি-মিতাচার ভিন্ন প্রকৃত উন্নতি কি উপকার হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু মিতাচারে ও ইন্দ্রিয় সংযমে অনভ্যস্ত হইলেও অর্থাৎ চরিত্রে নৈতিক দুর্ব্বলতা যথেষ্ট থাকিলেও মধুসূদন দত্তের সরলচিত্তে স্বার্থপরতা, ক্রূরতা, হিংসা, ঈর্ষা কি পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি নীচ ভাব আদৌ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে মধু-সূদনকে উদারচেতা ও সরল স্বভাবশালী মহাপুরুষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে এই মত ছিল যে, তিনি ইহার বিরুদ্ধাচারী ছিলেন না। তিনি বলিতেন—"খৃষ্ট ধর্ম্ম জগতে সভ্যতা প্রচারের বিশেষ উপায়; কেহ ইহার

বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলে আমি তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রস্তুত আছি; কিন্তু আমার মানসিক প্রবণতা হিন্দুধর্ম্মেরই দিকে। তাঁহার মৃত্যুসংবাদে তাঁহার স্বদেশীয় সাবাদপত্রসমূহে যে শোক-প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল, বঙ্গদেশের অন্য কোন সাহিত্য-সেবকের মৃত্যুতে সেরূপ দেখা যায় নাই। সংবাদ পত্রে প্রকাশ্য সভায় এবং রঙ্গভূমির মঞ্চে প্রত্যেক স্থানেই তাঁহার স্বদেশীয়গণ তাঁহার প্রতি আন্তরিক সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র প্রভৃতি বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখকগণ তাঁহার জন্য যে শোকগাথা রচনা করেন, তাহা সাহিত্যানুরাগী মাত্রেই অবগত আছেন। মধুসূদনের শিশুগণের শিক্ষার ও গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থার জন্য ব্যারিষ্টার মিঃ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা দিগম্বর মিত্র, বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু গৌরদাস বসাক, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মিঃ মনোমোহন ঘোষ, বাবু কৃষ্ণদাস পাল এবং বাবু শিশির কুমার ঘোষের দ্বারা একটী কমিটী গঠিত হইয়াছিল।

যশোহর খুলনা সম্মিলনীর ও মধ্য বাঙ্গালা সম্মিলিনীর চেষ্টায় এবং বামা-বোধিনী-সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয়ের উদ্যোগে তাঁহার সমাধির উপর এক স্মৃতি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বঙ্গের ধনাঢ্য মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র অনেকেই তজ্জন্য অর্থ সাহায্য করিয়াছেন; স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি অনেক সুপণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তজ্জন্য সাধারণের নিকট হইতে অর্থ প্রাপ্ত হন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর ব্যারিষ্টার মিঃ মনোমোহন ঘোষ সাধারণের সমক্ষে সেই সমাধি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেন। এতদুপলক্ষে বঙ্গের সুশিক্ষিত নরনারীগণের প্রতিনিধি স্বরূপ বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ, বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, চন্দ্রনাথ বসু এবং মিঃ কালীচরণ বন্দ্যো-পাধ্যায় প্রভৃতি সেই সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া সেই জাতীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন।

এই স্মৃতিস্তম্ভ কালে বিলুপ্ত হইতে পারে, কিন্তু মধুসূদন তাঁহার গ্রন্থাবলীরূপ যে অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরকাল তাঁহার গৌরব ঘোষণা করিবে। যে দেশে জগদ্বিখ্যাত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের প্রকৃত স্মৃতিচিহ্ন অদ্যাপি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সে দেশে মধুসূদনের জন্য যাহা হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট বলিতে হইবে। কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতের এক-

কালে লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল বাবু রাজনারায়ণ দত্তের প্রিয় পুত্র মধুসূদন দত্তের পৃষ্ঠপোষক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায়, বাবু কালিপ্রসন্ন সিংহ, বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র, বাবু ভোলানাথ চন্দ্র, বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতিকে ধন্যবাদ প্রদান করা কর্ত্তব্য।

মধুসূদন হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। বঙ্গদেশ যাহাদিগকে লইয়া গৌরবান্বিত, তাঁাদিগের মধ্যে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত প্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং বঙ্গীয় লেখককুল-গৌরব অক্ষয়কুমার দত্ত ভিন্ন, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যো, রামগোপাল ঘোষ, রমাপ্রসাদ রায়, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, প্যারিচাঁদ মিত্র, কেশবচন্দ্র সেন, দ্বারকানাথ মিত্র, দীনবন্ধু মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষ, ভূদেব মুখোপাধ্যায় রামতনু লাহিড়ী, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, আনন্দকৃষ্ণ বসু, মহেন্দ্রলাল সরকার, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, প্যারিচরণ সরকার এবং উক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই কলেজকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ধর্ম্মে, কর্ম্মে, চরিত্রে ও বিদ্যায় ইহাঁরা বঙ্গদেশের গৌরবস্থল। প্রকৃতপক্ষে বঙ্গের রাজনৈতিক সামাজিক ধর্ম্মসম্বন্ধীয় এবং সাহিত্য বিষয়ক যে কোন প্রকার উন্নতি হউক, প্রধানতঃ ইহাঁদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ রাজনীতির আলোচনায় রামগোপাল ঘোষের এবং সাহিত্যে মধুসূদনের নাম বঙ্গবাসী মাত্রেরই আদরের সামগ্রী হইয়াছে।

মধুসূদন সংস্কৃত, পারসীক, লাটীন গ্রীক, ইংরাজী, ফরাসীস, জর্ম্মাণ, তেলিগু, ইতালিয়ান এবং বঙ্গভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। ইনি ১৬ বৎসর বয়সে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন, এবং বিশপস্ কলেজে অধ্যয়ন করেন। অতঃপর মান্দ্রাজে গমন করিয়া ইংরাজী সংবাদপত্রে সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তথায় তিনি এক ইউরোপীয় মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়া ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। তদনন্তর দুই তিন বৎসরের মধ্যে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি প্রণয়ণ করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন—শর্ম্মিষ্ঠা নাটক, পদ্মাবতী নাটক, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, মেঘনাদবধ কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, কৃষ্ণকুমারী নাটক, একেই কি বলে সভ্যতা এবং বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো। অবশেষে তিনি ইংলণ্ড হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসেন, কিন্তু তাহতে উন্নতি করিতে পারেন নাই।

নির্ভর।

লেখক,—ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য M. B.

১

আজি প্রণমি: তোমায়
হে চির-সুন্দর কায়
যাত্রা করিলাম হে—
অকূল ভব পাথারে;

২

বিপদ: যদি হয়গো প্রভু,
হে অশরণ শরণ প্রভু,
দয়া করে তুমি হে—
ফিরায়ে আনিও তীরে।

৩

মুছে ফেলেছি অতীতের শত অপরাধ,
ভেঙ্গে ফেলেছি কুটিল সংসার বাধ,
আজি ছেড়ে দিয়েছি হাল।
যদি হতে পারি পার এ পারাবার,
জীবন:তরী আমি বাধব আবার,
আবার তুলব হে পাল।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

সঙ্কলিত।

ভয়ে শোকে বা অন্য কোন রকম উগ্র ভাবের আবেগে মানুষের মুখ দিয়া লালা বাহির হয় না। তাই মানুষের মুখ শুকাইয়া যায়।

প্রথম Safety Match বা নিরাপদ দেশলাইয়ের সৃষ্টি হয়, সুইডেন দেশে।

৩০ ত্রিশ গ্রেণ সালফারেটেড পটাস, ৩০ ত্রিশ গ্রেটজিঙ্ক সালফেট (Sulphurated potash and Qinc sulphurated) দুই আউন্স গোলাপ-জলে মিশ্রিত করিয়া স্নানের পর প্রত্যহ মুখে মাখিলে মুখের রং পরিষ্কার হইবে।

অত্যন্ত অপরিষ্কার বোতল পরিষ্কার করিতে হইলে, প্রথমে তাহার ভিতরে পাঁচ মিনিট কাল তীব্র সাল্‌ফারিক এসিড ঢালিয়া রাখিয়া দিলে, পরে এসিড ফেলিয়া দিয়া বোতলটা কয়েকবার জলে ধুইয়া লইলেই অত্যন্ত অপরিষ্কার বোতলও পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

খাদ্যের পরিমাণ। অলস লোকের পক্ষে দিনে আধসের আধ ছটাক ওজনের খাদ্যই যথেষ্ঠ। যাহারা কঠোর পরিশ্রম করে, তাহাদের পক্ষে দিনে তিন পোয়া তিন ছটাক আহার্য্য গ্রহণ প্রশস্ত। যাহাদিগকে অত্যন্ত শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয়, দিনে দেড় সের আধ ছটাক ওজনের আহার গ্রহণ করিলেই তাহাদের পক্ষে প্রচুর হইবে।

স্নায়বিক দুর্ব্বলতা। স্নায়বিক বিকারের জন্য যাহারা নিদ্রাহীনতায় কষ্ট পান, নিম্নলিখিত ব্যবস্থাটি তাঁহাদের জন্য ;—ঘুমের সময় ঘরের হাওয়া চলাচল বন্ধ করিবেন না। শয়নের পূর্ব্বে পূর্ণমাত্রায় গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করা নিষিদ্ধ। শারীরিক ব্যায়াম করা কর্ত্তব্য। নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে ভাবনা চিন্তা পরিত্যাগ করিবেন। নরম বিছানা অপেক্ষা শক্ত বিছানা ভাল, ইহা স্মরণ রাখিবেন।

জলে আধ পেয়ালা য়্যামোনিয়া মিশাইয়া সেই জলে কাপড় কাচিলে ময়লা কাপড় সত্বর ফরসা হয়।

চীনে মাটির উপরে গিল্‌টি করা নক্সা থাকিলে, সোডার জলে ধৌত করা উচিত, নতুবা নক্সা অধিক দিন থাকিবে না।

গিল্‌টি করা মূল্যবান চায়ের পেয়ালা প্রভৃতি সোডার জলে না ধুইয়া সাবান জলে ধোয়া দরকার।

সিদ্ধ করা শাক সব্‌জী ফেলিয়া দিয়া কেবল তাহার জল কিছু কম আধ গেলাস করিয়া প্রতিদিন নিয়মিত রূপে পান করিলে দেহের চামড়ার রং খুব পরিষ্কার হয়।

সংক্রামক ব্যাধিদুষ্ট রোগীর গৃহ ধৌত করিবার প্রয়োজন হইলে, এক গামলা জলে কিছু কর্পূর ও এক ছটাক লবণ মিশ্রিত করিয়া সেই জলে গৃহাদি ধৌত করিলে সংক্রামক বিষ নষ্ট হইয়া থাকে।

শাল আলোয়ান প্রভৃতি বাক্স তোরঙ্গে তুলিয়া রাখিবার সময়, তাহার ভাঁজে ভাঁজে সংবাদ পত্র এবং সাবানকে টুকরা টুকরা করিয়া গুঁজিয়া দিবেন। পোকারা ছাপাখানার কালি আর সাবানের গন্ধ মোটেই সহ্য করিতে পারেনা।

পালিস করা আলমারি, দেরাজ, গ্লাসকেশ প্রভৃতির কাঠ লিনসিড তৈলে ভিজানো ফ্লানেলের কাপড় দিয়া ঘসিয়া, তৎপরে নরম কাপড় দিয়া মুছিয়া ফেললে পুরাতন বার্ণিশও নূতনের মত দেখিতে হইবে।

যাঁহাদের বাটীতে মাছির অত্যন্ত উপদ্রব হয়, তাঁহারা দুগ্ধ ও জল একত্র একপাত্রে রাখিয়া কয়েক ফোটা "ফর্ম্মালীন" (Formalin) মিশ্রিত করিয়া গৃহে রাখিয়া দিবেন! মাছি মারিবার এমন ঔষধ আর নাই।

কেবলমাত্র জলপান করিয়া ঘোড়া ২৫ পঁচিশ দিন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু জল না খাইয়া ঘোড়া অন্যান্য খাদ্য বস্তু ভক্ষণ করিয়া ৫ পাঁচ দিন মাত্র জীবিত থাকিতে পারে।

রঙ্গরস।

সঙ্কলিত।

ভাগ্যে ভিক্ষা।—রাম ও শ্যামের কথোপকথন:—

রাম। ভাই শ্যাম, তুমি তোমার স্ত্রীকে কত টাকা মাসে হাত খরচ দাও?

শ্যাম। আমি কিছুই দিইনা।

রাম। কেন? কারণ কি?

শ্যাম। কারণ আমার স্ত্রীই আমাকে দয়া করে প্রত্যহ হাত-খরচ দেন।

রাম। তুমি ত অনেক টাকা ওকালতি করে পাও, তোমার পৈতৃক আয়ও যথেষ্ট, তোমার ভাগ্যেও ভিক্ষা।

শ্যাম। কি করিব, আমার সমস্ত আয়, তিনি দয়া করে গ্রহণ করেন।

জীব জন্তুগুলি কষ্ট পায় নি ত?—বাড়ীর গিন্নিঠাকুরাণী পিত্রালয় হইতে আসিয়াই ঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার জীবজন্তুগুলি কোন কষ্ট পায় নি ত? ঝী উত্তর করিল, না, আমি বাড়ীতে থাকতে তাদের কি কষ্ট দিতে পারি?

তবে আপনার মেনি বেড়ালটিকে আমি একদিন খেতে দিতে ভুলে গিয়েছিলুম।

গিন্নি।—আহা, তবে খেতে না পেয়ে, মেনির বড় কষ্ট হয়েছিল ত?

ঝী।—না মা, কোন কষ্ট হয় নি। মেনি সেদিন আপনার ময়না ও টিয়া দুইটা পাখী ধরে পেট ভরে খেয়েছিল।

গিন্নি। এ্যা! এ্যা!! আর তুই মাগী তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুপ করে দেখ্‌লি?

ঝী। সে কি মা, আমি কি তেমনি মেয়ে যে চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখ্‌ব? আমি তখনি পপী কুকুরটাকে লেলিয়ে দিলুম, পপী গিয়ে মেনির গলা কামড়ে মেরে ফেলেছে।

ঝি ও বিমাতা। ঝি। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া) ওগো মা! কি হবে গো! খোকা পাত কুয়োয় পড়ে গেছে!

বিমাতা। (উপন্যাস হইতে মুখ তুলিয়া) অ্যা! বলিস্ কি? যা, ধীরে ধীরে যা, অন্য জিনিষ না পোড়ে যায়, সাবধানে আস্তে আস্তে আমার আলমারির ওপরের তাক থেকে ঐ "সন্তান পালন" নামে রাঙা মলাটের বইখানা শীগ্‌গির নামিয়ে নিয়ে আয়। ওতে একটা পরিচ্ছেদে আছে, কি করে সন্তানের জীবন রক্ষা কর্‌তে হয়।

নিয়মপালন। ডাক্তার।—ওকি, ওকি! ওযে মারা যাবে! ওর যে জিব বেরিয়ে পড়েছে!

ছেলের সংমা। ওষুধের শিশির ওপরে লেখা ছিল, ব্যবহারের আগে ভাল করে ওষুধটা নেড়ে নিও আমি ভুল করে না নেড়েই খাইয়ে দিয়েছিলুম। এখন পেটের ভিতরে গিয়েও ওষুধটা যাতে নাড়া পায়, তাই আমি খোকার গলাটা ধরে বেশ করে নেড়ে চেড়ে দিচ্চি।

কৃষ্ণবর্ণের কারণ কি? হোটেলে খাইতে বসিয়া একটি বাঙ্গালীযুবক চটিয়া বলিলেন, "বয় বয় কাট্‌লেট খানা পুড়ে একেবারে আলকাৎরার মত হয়ে গেছে, ডেকে আন্ তোর ম্যানেজারকে দেখাই সে কি বলে?"

ম্যানেজার আসিয়া কাট্‌লেটের কৃষ্ণবর্ণ আকৃতি দেখিয়াই বলিলেন, "ওটা শোক চিহ্ন বাবু! আমাদের হোটেলের প্রধান রসুইকরের পিতৃবিয়োগ হয়েছে।"

[library stamp]